জীবন জিজ্ঞাসা

গ্রন্থকার : নূর হোসেন মজিদী

ভূমিকা

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম

মহান আল্লাহর প্রতি লাখ লাখ শুকরিয়া যে, তিনি আমাকে অত্র গ্রন্থের পাণ্ডুলিপি পরিমার্জিতভাবে প্রস্তুত করার তাওফীক্ব দিয়েছেন।

মূল পাণ্ডুলিপিটি প্রাথমিকভাবে বেশ কয়েক বছর আগে প্রস্তুত করা হয়, কিন্তু সময়স্বল্পতার কারণে পরিমার্জিতভাবে প্রস্তুতকরণে বেশ বিলম্ব হয়।

এ গ্রন্থের প্রথম দিককার কয়েকটি প্রবন্ধ খৃস্টীয় বিংশ শতাব্দীর নব্বই- এর দশকের মাঝামাঝি সময়ে দৈনিক বাংলাবাজার পত্রিকায় পর্যায়ক্রমে প্রকাশিত হয়েছিলো এবং এগুলোর মধ্য থেকে কয়েকটি প্রবন্ধ পরিমার্জিতভাবে সাপ্তাহিক রোববার- এ পুনঃপ্রকাশিত হয়। এছাড়া প্রথম দিককারই কোনো কোনো প্রবন্ধ দৈনিক আল- মুজাদ্দেদ- এ ও দৈনিক দিনকাল- এ প্রকাশিত হয়েছিলো। (এগুলোর প্রকাশে যারা ভূমিকা পালন করেছিলেন আল্লাহ্ তা'আলা তাঁদেরকে শুভ প্রতিদান প্রদান করুন।) তবে প্রথম দিককার কোনো কোনো প্রবন্ধ এবং শেষের দিককার প্রবন্ধগুলো (দু'টি পরিশিষ্ট বাদে - যা কম্পিউটারে কম্পোজ করা হয় ও পত্রিকায় প্রকাশিত হয়) হাতে লেখা পাণ্ডুলিপি আকারেই ছিলো; কোথাও প্রকাশিত হয় নি। প্রবন্ধগুলোর কম্পিউটার কম্পোজ আমাকে নিজেকেই করতে হয়েছে এবং তা করার সময় প্রয়োজনীয় বিবেচনায় অধিকতর পরিমার্জনের চেষ্টা করেছি।

অত্র গ্রন্থে বিচারবুদ্ধির (আক্বল্) আলোকে জীবন ও জগতের পিছনে নিহিত মহাসত্য সংক্রান্ত প্রশ্নগুলোর জবাব উদঘাটন করা হয়েছে। আশা করছি যে, এ সব প্রশ্নের জবাব যথাযথভাবেই উদঘাটন করা সম্ভব হয়েছে। বিচারবুদ্ধি নিরপেক্ষভাবে অনুসন্ধান করে এ সব প্রশ্নের যে জবাব

উদঘাটন করে তা এবং জীবন ও জগতের পিছনে নিহিত মহাসত্য সম্বন্ধে ইসলাম- প্রদত্ত জবাব অভিন্ন লক্ষ্য করা যায়।

অত্র লেখক একজন জন্মসূত্রে মুসলমান এবং আজীবন ইসলামের খেদমতে আত্মনিয়োজিত বিধায় কেউ হয়তো মনে করতে পারেন যে, ইসলামের মৌলিক উপস্থাপনাসমূহকে সত্য প্রমাণ করা ও প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যেই এ গ্রন্থ রচনা করা হয়েছে। কিন্তু তাঁদেরকে এ নিশ্চয়তা দিতে পারি যে, জন্মসূত্রে এ সত্যের সাথে পরিচিত হলেও এখানে সত্যকে সম্পূর্ণরূপে নিরপেক্ষভাবে ও কেবল বিচারবুদ্ধির আলোকে উদঘাটন করেছি। এ কারণেই পাঠক- পাঠিকাগণ লক্ষ্য করবেন যে, অত্র গ্রন্থের মৌলিক প্রতিপাদ্য বিষয়সমূহের কতক শাখা- প্রশাখাগত ব্যাপারে সমাজে ইসলামের নামে প্রচলিত ধ্যান- ধারণা থেকে স্বত উপসংহারে উপনীত হয়েছি; নিরপেক্ষভাবে বিচারবুদ্ধির রায় অনুসরণ করার ফলেই এমনটি হয়েছে। অর্থাৎ অত্র গ্রন্থকারের মতে, যেহেতু ইসলাম তার মৌলিক উপস্থাপনাসমূহকে বিচারবুদ্ধির আলোকে উপস্থাপন করেছে, সেহেতু ইসলামের নামে প্রচলিত ধারণাসমূহ নয়, বরং বিচারবুদ্ধি যে উপসংহারে উপনীত হয়েছে তা- ই ঐ সব বিষয়ে প্রকৃত ইসলামী মত।

বস্তুতঃ অত্র গ্রন্থ রচনার ভিত্তিভূমি তৈরীর পিছনে গ্রন্থকারের আজীবন অধ্যয়নের একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে। কিন্তু এ কাজ করতে গিয়ে কেবল ইসলামের ধ্যান- ধারণাকে নয়, বরং এ বিষয়ে অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ ধর্ম ও দর্শনের ধ্যান- ধারণা এবং নাস্তিক্যবাদী তত্ত্বসমূহকেও পর্যালোচনামূলক দৃষ্টিকোণ থেকে অধ্যয়ন করেছি ও বিচারবুদ্ধির আলোকে বিশ্লেষণ করে উপসংহারে উপনীত হয়েছি। তারপরও যেহেতু বিচারবুদ্ধি ভুল করতে বা প্রভাবিত হতে পারে, অন্যদিকে বিচারবুদ্ধির ভুলভ্রান্তি নির্দেশ ও সংশোধনের কাজও স্বয়ং বিচারবুদ্ধির পক্ষেই সম্ভব, সেহেতু মুক্ত ও সুস্থ বিচারবুদ্ধির অধিকারী পাঠকগণ, বিশেষ করে অমুসলিম পাঠকগণ এ গ্রন্থে উপস্থাপিত যুক্তিসমূহকে বিচারবুদ্ধির আলোকে পরীক্ষা- নিরীক্ষা করে কোনো দুর্বলতা পেলে তা নির্দেশ করতে পারেন এবং সে ক্ষেত্রে তাঁদের বক্তব্য পর্যালোচনা করে দেখবো; গ্রহণযোগ্য

বিবেচিত হলে অবশ্যই গ্রহণ করবো এবং গ্রহণযোগ্য বিবেচিত না হলে বিচারবুদ্ধির আলোকে তা গ্রহণ না করার কারণ পেশ করবো।

অনেক মুসলিম পাঠক-পাঠিকার মনে প্রশ্ন জাগতে পারে যে, ইসলামের সত্য দ্বীন হওয়ার ব্যাপারে যেখানে সন্দেহের অবকাশ নেই সেখানে ইসলামের মৌলিক উপস্থাপনাসমূহকে বিচারবুদ্ধি দ্বারা নতুন করে উদঘাটনের কী প্রয়োজন রয়েছে? এ প্রশ্নের জবাবে বলবো, দু'টি কারণে এর প্রয়োজন রয়েছে। প্রথমতঃ এ দেশে ও বিশ্বে মুসলমানের সংখ্যা যতো বেশীই হোক না কেন, ইসলাম কোনো সুনির্দিষ্ট সংখ্যক মুসলমান পেয়ে সন্তুষ্ট নয়, বরং বিশ্বের বুকে একজন অমুসলিমও বর্তমান থাকতে তার নিকট সত্যকে তুলে ধরা মুসলমানদের ইসলামী ও ঈমানী দায়িত্ব। কিন্তু কোনো অমুসলিমের কাছে সত্যকে তুলে ধরতে হলে তা 'কোরআনে বলা হয়েছে' যুক্তিতে তুলে ধরলে তা তার কাছে গ্রহণযোগ্য হবে না, কারণ, সে তো কোরআনকে ঐশী গ্রন্থ জ্ঞান করে না। তাই তার নিকট গ্রহণযোগ্য সর্বজনীন মানদণ্ডে অর্থাৎ বিচারবুদ্ধির আলোকে তার সামনে সত্যকে পেশ করতে হবে। আর এটা করতে হলে স্বয়ং মুসলমানকে বিষয়টি বিচারবুদ্ধির আলোকে জানতে হবে। দ্বিতীয়তঃ অন্ধ বিশ্বাস সর্বাবস্থায়ই ঝুঁকিপূর্ণ ও ঠুনকো, এমনকি ঘটনাক্রমে তা সত্য হলেও (যদিও অনেক অন্ধ বিশ্বাসই ভ্রান্ত হয়ে থাকে)। কারণ, বাস্তবতার আঘাতে অথবা কোনো সঠিক বা বিভ্রান্তিকর ভ্রান্ত যুক্তির আঘাতে যে কোনো সময় এ বিশ্বাস ভেঙ্গে যেতে পারে। ইতিহাসে ও যে কারো অভিজ্ঞতায় এর ভুরি ভুরি দৃষ্টান্ত পাওয়া যাবে। অতএব, সত্যকে বিচারবুদ্ধির সর্বজনীন মানদণ্ডে জেনে নিলে অতঃপর কোনো বাস্তবতা বা কোনো বিভ্রান্তিকর অপযুক্তিই ব্যক্তির মন-মগয থেকে সে সত্যকে মুছে দিতে ও তাকে পথভ্রষ্ট করতে পারবে না।

এ প্রসঙ্গে উল্লেখ করা প্রয়োজন মনে করি যে, জীবন ও জগতের অন্তরালে নিহিত মহাসত্য সম্পর্কে বিচারবুদ্ধির রায় উদঘাটন করার মানে এ নয় যে, এ বিষয়টি এখানেই শেষ হয়ে যাচ্ছে। কারণ, বিচারবুদ্ধি যা উদঘাটন করে তা হচ্ছে সত্যসমূহের মৌলিকতম ও সংক্ষিপ্ততম রূপ। এ ব্যাপারে জানার এখানেই শেষ নয়। আর যেহেতু বিচারবুদ্ধি কোরআন মজীদকে অকাট্য

সত্য এবং পূর্ণাঙ্গ, সর্বশেষ ও একমাত্র সংরক্ষিত ঐশী গ্রন্থ রূপে উদঘাটন করে, অতঃপর তাকে এ সব সত্য সম্পর্কে কোরআন মজীদ থেকে বিস্তারিত জানার চেষ্টা করতে হবে।

এ ক্ষেত্রে কোরআন মজীদের সঠিক তাৎপর্য গ্রহণেও বিচারবুদ্ধি সহায়তা করবে। কারণ, কোরআন মজীদের সঠিক তাৎপর্য গ্রহণে এর পাঠক- পাঠিকাদের মধ্যে যে সব মতপার্থক্যের উদ্ভব ঘটে তার অন্যতম প্রধান কারণ হচ্ছে প্রথমতঃ একে ঐশী গ্রন্থ হিসেবে বিচারবুদ্ধির রায়ের ভিত্তিতে গ্রহণ না করে অন্ধ বিশ্বাসের ভিত্তিতে গ্রহণ করা, দ্বিতীয়তঃ এর তাৎপর্য গ্রহণে বিচারবুদ্ধিকে অন্যতম সহায়ক শক্তি হিসেবে গ্রহণ না করা ও অন্যান্য পূর্বপ্রস্তুতির অভাব।

কোরআন মজীদের তাৎপর্য গ্রহণের লক্ষ্যে বিভিন্ন মনীষী যে সব মানদণ্ড উদঘাটন করেছেন তার মধ্যে যেমন পারস্পরিক অভিন্নতা রয়েছে, তেমনি বিভিন্নতাও রয়েছে এবং ইসলামের বিভিন্ন বিষয়ে মতপার্থক্যের জন্য মতের এ বিভিন্নতা সবচেয়ে বড় কারণ। এমতাবস্থায় সকলের জন্যে সমভাবে গ্রহণযোগ্য মানদণ্ড বিচারবুদ্ধিকে অন্যতম মানদণ্ড হিসেবে গ্রহণ করলে এবং তার আলোকে তাঁদের মতপার্থক্যের মূলনীতিসমূহকে পরীক্ষা- নিরীক্ষা করে গ্রহণ- বর্জন করলে নিঃসন্দেহে তাঁদের মধ্যে মতপার্থক্য হ্রাস পেতে বাধ্য।

বস্তুতঃ ইসলামের মৌলিক উপস্থাপনাসমূহকে বিচারবুদ্ধির আলোকে গ্রহণ না করে অন্ধভাবে গ্রহণ করলে শাখা- প্রশাখাগত দিকসমূহে কতক ভিত্তিহীন ভ্রান্ত বিশ্বাসকে ইসলামী ধারণা নামে গ্রহণ করা হতে পারে এবং এর ফলেই অনেক বিষয়ে মুসলমানদের নিজেদের মধ্যে পরস্পর বিরোধী বিভিন্ন ধারণা ও বিতর্ক বিস্তারলাভ করেছে। কিন্তু ইসলামের মৌলিক উপস্থাপনাসমূহকে প্রথমে বিচারবুদ্ধির আলোকে গ্রহণ করলে এ জাতীয় বিতর্কের ও ধারণার ক্ষেত্রে পারস্পরিক বৈপরীত্যের অবসান ঘটতে বাধ্য। অতঃপর কোরআন মজীদ অধ্যয়ন করলে তার অনেক আয়াত থেকে এমন তাৎপর্য ধরা পড়বে যা অন্ধ বিশ্বাস জাত ধারণা থেকে ভিন্ন এবং তা বহু বিতর্ক ও বিভ্রান্তির অবসান ঘটাতে সক্ষম।

তেমনি বিচারবুদ্ধি হাদীছকে যাচাই- বাছাই করে গ্রহণ- বর্জনেও সাহায্য করে। এখানে উদাহরণস্বরূপ উল্লেখ করা যায় যে, যেহেতু বিচারবুদ্ধি কোরআন মজীদের আয়াতের হুকুম বা

পাঠ মানসূখ্ (রহিত) হওয়ার ধারণাকে প্রত্যাখ্যান করে, সেহেতু এর ভিত্তিতে কোরআন মজীদের বহু আয়াতের তাৎপর্য মানসূখে বিশ্বাসীদের গৃহীত তাৎপর্য থেকে ভিন্নতর রূপে ধরা পড়বে। দৃশ্যতঃ কোরআন মজীদের যে সব আয়াতে কোনো কোনো নবীর (আ.) ওপর গুনাহ্ আরোপিত হয়েছে সে সব আয়াতের ক্ষেত্রেও তা-ই। তেমনি খেজুর গাছে ফুল পিটিয়ে দেয়া সংক্রান্ত যে বিখ্যাত হাদীছ বর্ণনা করা হয় - যার ভিত্তিতে বলা হয় যে, হযরত রাসূলে আকরাম (ছ্বাঃ) অনেক পার্থিব ব্যাপারে তাঁর সঠিক জ্ঞান না থাকার কথা স্বীকার করেছেন। কিন্তু বিচারবুদ্ধির রায় হচ্ছে, যেহেতু নবী ভুলের উর্ধে, সেহেতু তিনি কোনো বিষয়ে না জানলে সে বিষয়ে কোনো মত প্রকাশ থেকে বিরত থাকবেন; না জানা সত্ত্বেও মত প্রকাশ করবেন না। কারণ, না জানা বিষয়ে মত প্রকাশ করা সাধারণ মানুষের জন্যও অনিচ্ছাকৃত ভুলের চেয়েও গুরুতর ও গর্হিত কাজ, সুতরাং তা নবীর মর্যাদার গুরুতর বরখেলাফ। অতএব, বিচারবুদ্ধি উক্ত হাদীছকে মিথ্যা হিসেবে চিহ্নিত ও প্রত্যাখ্যান করে।

বিচারবুদ্ধির দলীল সম্পর্কে উল্লেখ্য একটি গুরুত্বপূর্ণ কথা হচ্ছে এই যে, এ দলীল যদি ব্যক্তিবিশেষের পক্ষ থেকেও উপস্থাপন করা হয় তথাপি তা ব্যক্তিবিশেষের বক্তব্য হিসেবে গণ্য করা উচিত হবে না। কারণ, বিচারবুদ্ধির দলীল হচ্ছে সর্বজনীন দলীল। এমতাবস্থায় পাঠক-পাঠিকাগণ যখন অত্র গ্রন্থে উপস্থাপিত বক্তব্যকে সত্যিকারের সুস্থ বিচারবুদ্ধির রায় হিসেবে দেখতে পাবেন এবং অন্যত্র তা ব্যবহার করবেন তখন তাকে অত্র লেখকের উপস্থাপিত যুক্তি হিসেবে পেশ করা বা উদ্ধৃত করা উচিত হবে না, বরং তাকে সর্বজনীন বিচারবুদ্ধির রায় হিসেবে পেশ করাই উচিত হবে। কারণ, বিচারবুদ্ধির দলীল ব্যক্তিবিশেষ উদঘাটন করলেও তা ব্যক্তিবিশেষের সম্পদ নয়, বরং সকলের সম্পদ; ব্যক্তিবিশেষ তা উদঘাটন করেছে মাত্র। একে ব্যক্তিবিশেষের বক্তব্য হিসেবে উপস্থাপন করা হলে তাতে বরং এ দলীলের গুরুত্ব হ্রাস পাবে। বলা বাহুল্য যে, এই একই কারণে অত্র গ্রন্থে বিচারবুদ্ধির যে সব দলীল পেশ করা হয়েছে তার মধ্য থেকে অনেক দলীলই অনেক মনীষী লেখকের গ্রন্থ অধ্যয়ন থেকে পাওয়া

গেলেও তা তাঁদের যুক্তি হিসেবে পেশ করা হয় নি, বরং সর্বজনীন বিচারবুদ্ধির রায় হিসেবে পেশ করা হয়েছে।

অত্র গ্রন্থে অন্তর্ভুক্ত প্রথম প্রবন্ধটি (বিচারবুদ্ধি ও ইসলাম) সম্পর্কে কৈফিয়ৎ দেয়া প্রয়োজন মনে করছি যে, বিচারবুদ্ধির দলীল ভিত্তিক এ গ্রন্থের শুরুতে কোরআন মজীদের দলীল ভিত্তিক উক্ত প্রবন্ধটি অন্তর্ভুক্তকরণের কারণ, মূল প্রবন্ধে যেমন উল্লেখ করা হয়েছে, মুসলমানদের মধ্যে বিচারবুদ্ধির বিরোধিতার যে একটি প্রবণতা গড়ে উঠেছে সে ভ্রান্তি থেকে মুক্ত করে তাদেরকে বিচারবুদ্ধির মহাসড়কে উঠে আসতে সহায়তা করা। তাই প্রকৃত পক্ষে উক্ত প্রবন্ধটি অত্র ভূমিকারই একটি সম্প্রসারিত অংশ মাত্র। মূল গ্রন্থ্ শুরু হয়েছে ‘জীবন জিজ্ঞাসার জবাব সন্ধানে জ্ঞানতত্ত্বের পথনির্দেশ’ প্রবন্ধ থেকে।

পরিশিষ্টের প্রবন্ধ দু’টি পত্রিকায় প্রকাশিত বিচ্ছিন্ন প্রবন্ধ, কিন্তু বিষয়বস্তু গ্রন্থের বিষয়বস্তুর সাথে সংশ্লিষ্ট বিধায় গ্রন্থের ধারাবাহিকতায় উভয় প্রবন্ধের কতক বক্তব্য অভিন্ন বা পুনরাবৃত্তিমূলক। এতদসত্ত্বেও কিছু অতিরিক্ত বক্তব্য থাকায় এবং সংশ্লিষ্ট বিষয়ে পূর্ণাঙ্গ আলোচনা বিধায় স্বত ভাবে তা গ্রন্থশেষে স্থান দেয়া হলো।

সব শেষে, অত্র গ্রন্থ্ পাঠক- পাঠিকাদের সামনে জীবন ও জগতের অন্তরালে নিহিত মহাসত্যের দরযা উন্মুক্ত করে দিতে সক্ষম হলেই আমার শ্রমকে সার্থক গণ্য করবো। আল্লাহ্ তা‘আলা অত্র গ্রন্থকে এর লেখক এবং এর প্রচার- প্রসারের সাথে জড়িত সকলের জন্য অনন্ত জীবনের পাথেয় করে দিন। আমীন।

বিনীত

নূর হোসেন মজিদী

৩রা ছ্বাফার্ ১৪৩৫

২৩শে অগ্রহায়ণ ১৪২০

৭ই ডিসেম্বর ২০১৩।

বিচারবুদ্ধি ও ইসলাম

বিচারবুদ্ধি (عقل)- এর বিচরণক্ষেত্রের সীমা নিয়ে যথাযথভাবে চিন্তা না করার ফলে প্রায় সকল সমাজেই বিচারবুদ্ধির গ্রহণযোগ্যতা নিয়ে বিতর্কের সৃষ্টি ও এ ব্যাপারে প্রান্তিক দৃষ্টিকোণের উদ্ভব হয়েছে। অনেকে মানুষের জীবনপথে চলার জন্যে বিচারবুদ্ধির পথনির্দেশকেই যথেষ্ট গণ্য করেছেন এবং পুরোপুরিভাবে এর ওপর নির্ভর করার পক্ষে রায় দিয়েছেন। আবার অনেকে বিচারবুদ্ধির গ্রহণযোগ্যতাকে পুরোপুরি অস্বীকার করেছেন। দুর্ভাগ্যজনক যে, কতক ইসলামী মনীষী বিচারবুদ্ধি ও তার হাতিয়ার যুক্তিপ্রয়োগের বিরোধিতা করায় মুসলিম দ্বীনী সমাজে তাত্ত্বিক ক্ষেত্রে বিচারবুদ্ধি ও যুক্তির প্রতি নেতিবাচক মনোভাব প্রাধান্য লাভ করেছে এবং অন্ধ বিশ্বাসের ব্যাপক বিস্তার ঘটেছে, যদিও কার্যক্ষেত্রে সকলেই কমবেশী বিচারবুদ্ধি ও যুক্তির আশ্রয় গ্রহণ করছে। পরিহাসের ব্যাপার হলো এই যে, যারা বিচারবুদ্ধি ও তার হাতিয়ার যুক্তিপ্রয়োগের গ্রহণযোগ্যতা প্রত্যাখ্যান করছেন তা তাঁরা করছেন বিচারবুদ্ধিরই আশ্রয় নিয়ে এবং বহু রকমের যুক্তি প্রদর্শন করে।

অন্যদিকে কতক মনীষী বিচারবুদ্ধিবাদীদের (عقليون) কঠোর সমালোচনা করেছেন ও তাঁদেরকে প্রত্যাখ্যান করেছেন, অথচ তাঁরা নিজেরাও বিভিন্ন ক্ষেত্রে বিচারবুদ্ধির আশ্রয় নিয়েছেন। কিন্তু তাঁদের অনুসারীদের ও পরবর্তীদের অনেকে বিষয়টি সম্পর্কে তলিয়ে চিন্তা না করে তাঁরা নিরঙ্কুশভাবেই বিচারবুদ্ধিকে প্রত্যাখ্যান করেছেন বলে মনে করে তাঁদের প্রতি ভক্তি- শ্রদ্ধাবশতঃ বিচারবুদ্ধি প্রত্যাখ্যানের সপক্ষে অবস্থান গ্রহণ করেছেন। অথচ প্রকৃত ব্যাপার হলো, এ ধরনের মনীষীগণের সমালোচনা ও প্রত্যাখ্যানের লক্ষ্য স্বয়ং বিচারবুদ্ধি ও যুক্তিপ্রয়োগ নয়, বরং যারা জীবন ও জগতের অন্তরালে নিহিত মহাসত্য উদঘাটন এবং সঠিক পথ ও পথনির্দেশ উদঘাটনের জন্য একমাত্র বিচারবুদ্ধির ফয়সালাকেই যথেষ্ট গণ্য করেন এবং মানুষকে ওয়াহী ও নবুওয়াত

থেকে বেনিয়ায মনে করেন সেই বিচারবুদ্ধিবাদীগণ (عقليون) ও যুক্তিবাদীগণই হচ্ছেন উপরোক্ত মনীষীদের সমালোচনা ও প্রত্যাখ্যানের লক্ষ্য।

‘আক্ল্ (عقل) বা বিচারবুদ্ধি প্রশ্নে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ও মৌলিক সমস্যা এটাই।

এ ব্যাপারে দ্বিতীয় গুরুত্বপূর্ণ সমস্যাটি প্রায়োগিক ক্ষেত্রের সাথে সম্পৃক্ত। তা হচ্ছে, যারা বিচারবুদ্ধির অনুসরণের পক্ষপাতী তাঁরা অনেক ক্ষেত্রে একটি উপসংহারকে বিচারবুদ্ধির ফয়সালা বলে দাবী করেন অথচ প্রকৃত পক্ষে তা হয়তো বিচারবুদ্ধির ফয়সালা নয়। কারণ, বিচারবুদ্ধি যতোক্ষণ কোনো বিষয়ে অকাট্য ও অভ্রান্ত উপসংহারে উপনীত হতে না পারে, বরং তাতে কিছুটা সংশয়, বা অনিশ্চয়তা, বা দুর্বলতা থেকে যায়, ততোক্ষণ ঐ উপসংহারকে বিচারবুদ্ধির ফয়সালা বলা যেতে পারে না। কিন্তু কার্যতঃ দেখা যায় যে, দু’জন দার্শনিক বিচারবুদ্ধির ফয়সালার নামে একই বিষয়ে পরস্পরবিরোধী উপসংহারে উপনীত হচ্ছেন এবং উভয়ই স্বীয় দাবীর ওপর অটল থাকছেন, অথচ তাঁদের উপসংহারের এই পারস্পরিক বৈপরীত্যই প্রমাণ করে যে, তাঁদের দু’জনের মধ্যে অন্ততঃ একজনের মতামত অবশ্যই ভ্রান্ত। (অবশ্য কতক ক্ষেত্রে উভয়ের মতামত ভ্রান্ত হওয়াও অসম্ভব নয়।[১])

উপরোক্ত কারণেই দেখা যায় যে, বিচারবুদ্ধি তথা যুক্তির ওপর ভিত্তিশীল অন্যতম প্রধান শাস্ত্র দর্শনের কতক পণ্ডিত জীবন ও জগতের অন্তরালে নিহিত মহাসত্য উদঘাটন সংক্রান্ত আলোচনায় ভ্রান্ত যুক্তি প্রয়োগের মাধ্যমে নাস্তিকতার উপসংহারে উপনীত হয়েছেন এবং সঠিকভাবে সমালোচনা ও পর্যালোচনা ব্যতীতই আধুনিক উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহে তাঁদের মতামত পড়ানো হচ্ছে। ফলে এসব নামী- দামী দার্শনিকের মতামতকে অন্ধভাবে গ্রহণ করে অনেকে নাস্তিক হয়ে গেছে। আর এরই প্রতিক্রিয়ায় অনেকে ইসলাম বিষয়ক আলোচনায় বিচারবুদ্ধি ও যুক্তিপ্রয়োগকে স্থান দিতে পুরোপুরি অস্বীকৃতি জানিয়েছেন। কারণ, তাঁদের ভয়, বিচারবুদ্ধির আশ্রয়গ্রহণ বা যুক্তিপ্রয়োগ নাস্তিকতার পথকে উন্মুক্ত করে দেবে এবং দ্বীনে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করবে। এর বিপরীতে

আরেক দল বিচারবুদ্ধির ওপর এতো বেশী গুরুত্ব আরোপ করেছেন যে, তাঁরা মানুষকে খোদায়ী পথনির্দেশের মুখাপেক্ষিতা থেকে মুক্ত গণ্য করেছেন।

এ সব কারণে বিচারবুদ্ধির বিচরণ ও প্রয়োগের ক্ষেত্রসমূহ, বিভিন্ন প্রয়োগক্ষেত্রে বিচারবুদ্ধির মর্যাদা ও ভুমিকার মধ্যকার তারতম্য এবং বিচারবুদ্ধির অকাট্য রায় ও বিচারবুদ্ধির রায়ের নামে ভ্রমাত্মক যুক্তি বা অপযুক্তি (fallacy- مغالطة)- এর মধ্যকার পার্থক্য সম্পর্কে স্বচ্ছ ধারণা অপরিহার্য।

দ্বীন ও দর্শন হচ্ছে বিচারবুদ্ধির দুই বিচরণক্ষেত্র। তবে এ দুই বিচরণক্ষেত্রে বিচারবুদ্ধির ভূমিকা ও মর্যাদায় যথেষ্ট পার্থক্য রয়েছে। বস্তুতঃ জীবন ও জগতের মৌলিকতম সত্য উদঘাটন দ্বীন ও দর্শন উভয়েরই লক্ষ্য। আর এ লক্ষ্যে উপনীত হবার সর্বপ্রথম একমাত্র সর্বজনীন মাধ্যম হচ্ছে বিচারবুদ্ধি। কিন্তু পরবর্তী পর্যায়ে দ্বীন ও দর্শনে বিচারবুদ্ধির বিচরণক্ষেত্র ও ভূমিকা পৃথক হয়ে যায়। দর্শন তার খুটিনাটি বিষয়েও বিচারবুদ্ধিকে একমাত্র আবিষ্কর্তা হিসেবে গণ্য করে, কিন্তু দ্বীনের ক্ষেত্রে খুটিনাটি বিষয়ে বিচারবুদ্ধির ভূমিকা হচ্ছে সহায়ক শক্তির ভূমিকা। অন্যদিকে দ্বীনের ক্ষেত্র দর্শনের ক্ষেত্রের তুলনায় অনেক বেশী প্রশস্ত। ফলে আয়তনের দৃষ্টিতে দ্বীনী ক্ষেত্রে বিচারবুদ্ধির ভূমিকা অনেক বেশী, যদিও দর্শনে একমাত্র তথ্যসূত্র ও বিচারকর্তা হবার কারণে বিচারবুদ্ধির ভূমিকা সেখানে অধিকতর অনুভূত হয়ে থাকে।

দর্শন ও দ্বীন উভয়ই জীবন ও জগত সংক্রান্ত যে মৌলিক প্রশ্নগুলোর জবাব বিচারবুদ্ধির সাহায্যে উদঘাটন করে তা হচ্ছে: এ জীবন ও জগতের অন্তরালে কোনো সৃষ্টিকর্তা আছেন কি? থাকলে এক, নাকি একাধিক? থাকলে সে সৃষ্টিকর্তার গুণবৈশিষ্ট্যসমূহ কী? আমাদের বস্তুদেহের অন্তরালে কোনো অবস্তুগত সত্তা আছে কি? সৃষ্টিকর্তার সাথে আমাদের সম্পর্ক কী? আমরা কি তাঁর নিকট থেকে প্রত্যক্ষ পথনির্দেশের মুখাপেক্ষী, নাকি আমাদের মধ্যে নিহিত সহজাত পথনির্দেশই যথেষ্ট? পথনির্দেশ অনুযায়ী আমাদের পার্থিব জীবনের কর্ম ও আচরণের ব্যাপারে কোনোরূপ জবাবদিহিতা (পরকালীন বিচার) কি অপরিহার্য? সৃষ্টিকর্তার পথনির্দেশ কীভাবে ও

কা'র মাধ্যমে পাওয়া যেতে পারে? তাঁকে (নবীকে) চেনার উপায় কী? খোদায়ী পথনির্দেশ হিসেবে দাবীদার গ্রন্থাবলীর দাবীর সত্যাসত্য নির্ণয়ের উপায় কী?

বিচারবুদ্ধির সাহায্যে বিস্তারিত আলোচনা- পর্যালোচনার মাধ্যমে এ সব প্রশ্নের জবাব উদঘাটন করা সম্ভব ও অপরিহার্য।

বিচারবুদ্ধি সম্ভাব্য সকল পন্থায় বিচার- বিশ্লেষণের পর যখন সৃষ্টিকর্তার অস্তিত্ব ও একত্ব (তাওহীদ), পরকালীন জীবনের অস্তিত্বের ও সে জীবনে ইহজীবনের কর্ম ও আচরণের ব্যাপারে জবাবদিহিতার অপরিহার্যতা, প্রত্যাদেশ (ওয়াহী) ও প্রত্যাদেশবাহক (নবী- রাসূল)- এর প্রয়োজনীয়তা, হযরত মুহাম্মাদ (ছ্বাঃ)- এর বিশ্বজনীন ও সর্বশেষ নবী হওয়া এবং কোরআন মজীদের পূর্ণাঙ্গ, অবিকৃত ও সংরক্ষিত সর্বশেষ ঐশী গ্রন্থ হওয়ার সত্যতা উদঘাটন করে, তখন তার সামনে এসব মৌলিক ধারণার শাখা- প্রশাখা এবং মানুষের দায়িত্ব- কর্তব্য - এই দু'টি বিশাল ক্ষেত্র সমুপস্থিত হয়। এ দু'টি ক্ষেত্র এমন যেখানকার কতক প্রশ্নের জবাব দেয়া বিচারবুদ্ধির পক্ষে সম্ভব হলেও অনেক প্রশ্নের জবাব দেয়াই তার পক্ষে সম্ভব নয়। উদাহরণস্বরূপ, মানব প্রজাতির সূচনার ইতিহাস, ফেরেশতা নামক বিশেষ সৃষ্টির অস্তিত্ব আছে কি নেই, সৃষ্টিকর্তার নিকট আনুষ্ঠানিক প্রার্থনার প্রয়োজন আছে কিনা এবং থাকলে তা কীভাবে করতে হবে - এসব প্রশ্নের জবাব দেয়া বিচারবুদ্ধির পক্ষে সম্ভব নয়। তাই এ বিশাল ক্ষেত্রের সকল প্রশ্নের মুখ্য জবাবদানকারী হিসাবে কোরআন মজীদের দ্বারস্থ হতে হবে। যেহেতু বিচারবুদ্ধি রাসূলে আকরাম হযরত মুহাম্মাদ (ছ্বাঃ)- এর নবুওয়াত ও কোরআন মজীদের ঐশিতার ব্যাপারে অকাট্য প্রত্যয়ে উপনীত হয়েছে সেহেতু বিচারবুদ্ধির জন্যে কোরআন মজীদের প্রতিটি তত্ত্ব, তথ্য, পথনির্দেশ ও আদেশ- নিষেধকে বিনা প্রশ্নে গ্রহণ করে নেয়া ছাড়া গত্যন্তর নেই। কারণ, এর ব্যতিক্রম করা মানে তার (বিচারবুদ্ধির) নিজের প্রত্যয়ের অকাট্যতাকেই প্রশ্নের সম্মুখীন করা।

অবশ্য এর মানে এ নয় যে, কোরআন মজীদের সত্যতার ব্যাপারে অকাট্য প্রত্যয়ে উপনীত হবার পর আর বিচারবুদ্ধির কোনো ভূমিকা থাকবে না। বরং পরবর্তী পর্যায়ে বিচারবুদ্ধি সব

সময়ই কোরআন মজীদের পার্শ্বচরের ভূমিকা পালন করবে এবং কোরআন থেকে সঠিক তাৎপর্য গ্রহণে কোরআন- চর্চাকারীকে সহায়তা করবে। বিচারবুদ্ধি দ্বীনী সূত্র হিসেবে কোরআন মজীদের পরে গোটা মুসলিম উম্মাহর মধ্যে শুরু থেকে চলে আসা মতৈক্য ('ইজমা'এ উম্মাহ্) ও প্রতি স্তরে বিপুল সংখ্যক সূত্রে বর্ণিত (মুতাওয়াতির) হাদীছকে সত্যায়িত করে এবং এ তিন সূত্রের সহায়তায়, কম সূত্রে বর্ণিত (খবরে ওয়াহেদ্) হাদীছের গ্রহণযোগ্যতা বিচার করে। বিচারবুদ্ধি এ সব সূত্রের সহায়তায় দ্বীনী যুগজিজ্ঞাসার জবাব দান করে।

মোটামুটি এই হলো কোরআন মজীদের সত্যায়ন পরবর্তী পর্যায়ে বিচারবুদ্ধির ভূমিকা।

তবে বিচারবুদ্ধির প্রাথমিক পর্যায়ের ভূমিকা সম্পর্কে আরো কয়েকটি কথা উল্লেখ করা প্রয়োজন। তা হচ্ছে, বিচারবুদ্ধির অবস্থান ইসলাম ও কোরআন মজীদের আগে। অন্য কথায়, বিচারবুদ্ধি হচ্ছে ইসলাম- গৃহে প্রবেশের দরযা।

ইসলাম গ্রহণ করা- নাকরার বিষয়টি যে সম্পূর্ণরূপে বিচারবুদ্ধির ওপর নির্ভরশীল সে ব্যাপারে দ্বিমতের অবকাশ নেই। কারণ, যারা জন্মসূত্রে মুসলমান ইসলাম ও কোরআন কেবল তাদের কাছে আসে নি, বরং সকল মানুষের কাছে এসেছে। প্রশ্ন হচ্ছে, যে ব্যক্তি এক ও অদ্বিতীয় সৃষ্টিকর্তার অস্তিত্বে ও মৃত্যুর পরে পুনরুত্থান বা পরকালীন জীবনের অস্তিত্বে অকাট্য প্রত্যয় পোষণ করে না অথবা তা করলেও হযরত মুহাম্মাদ (ছ্বাঃ) কে আল্লাহর রাসূল ও কোরআন মজীদকে আল্লাহর প্রেরিত গ্রন্থ বলে জানে না, তার নিকট তো আল্লাহ্, রাসূল ও কোরআনের দোহাই অর্থহীন; কীভাবে সে ইসলাম গ্রহণ করবে? অবশ্যই তার বিচারবুদ্ধির সামনে আল্লাহ্, পরকাল, রাসূল (ছ্বাঃ) ও কোরআন মজীদের সত্যতা তুলে ধরতে হবে। তার বিচারবুদ্ধি যখন এ সবের ব্যাপারে অকাট্য প্রত্যয়ে উপনীত হবে এবং তা গ্রহণ করে নেবে কেবল তার পরেই কোরআন মজীদ তার নিকট প্রশ্নাতীত দলীল (ডকুমেন্ট) রূপে পরিগণিত হবে।

এ প্রসঙ্গে উল্লেখ্য (বিচারবুদ্ধিও যার সত্যায়ন করে) যে, বিশ্বে প্রচলিত সকল ধর্মীয় মতাদর্শের মধ্যে একমাত্র ইসলামই হচ্ছে মানুষের জন্য আল্লাহ্ তা'আলার দেয়া চিরন্তন জীবনব্যবস্থা। প্রচলিত ধারণায় হযরত মুহাম্মাদ (ছ্বাঃ)- এর নবুওয়াত লাভের মাধ্যমে ইসলামের সূচনা বলে

মনে করা হলেও প্রকৃত ব্যাপার তা নয়। বরং মানব প্রজাতির আদি পিতা হযরত আদম (আ.) থেকে এ দ্বীনের যাত্রা শুরু হয়েছিলো - এটাই কোরআন মজীদের দাবী। হযরত ইবরাহীম (আ.) সহ অতীতের অনেক নবী- রাসূলের উক্তি কোরআন মজীদে উদ্ধৃত হয়েছে যে সব উক্তিতে তাঁরা নিজেদেরকে 'মুসলিম' বলে উল্লেখ করেছেন এবং বিশেষ করে হযরত ইবরাহীম (আ.) তাঁর অনুসারীদেরকে 'মুসলিমুন্' (আল্লাহ্ তা'আলার নিকট আত্মসমর্পিত জনগোষ্ঠী) নামকরণ করেন।

মূলতঃ অন্যান্য ধর্মীয় মতাদর্শের সৃষ্টি হয়েছে এ চিরন্তন খোদায়ী জীবনব্যবস্থা থেকে পথচ্যুতি, বিকৃতি ও বিভ্রান্তির মাধ্যমে। বিভিন্ন ধর্মের নামকরণ থেকেও ইসলাম ও এ সব ধর্মের মধ্যকার একটি মৌলিক পার্থক্য ধরা পড়ে। অন্যান্য ধর্মের নামকরণ হয়েছে বিভিন্ন ব্যক্তি, গোষ্ঠী বা স্থানের নামে। যেমন: বুদ্ধের নামে বৌদ্ধ ধর্ম, ঈসা (আ.)/ ক্রাইস্ট- এর নামে ঈসায়ী বা খৃীস্টধর্ম, ইয়াহূদা/ যীহূদা- র গোত্রের নামে ইয়াহূদী ধর্ম, হিন্দ্- এর (ভারতের) অধিবাসীদের ধর্ম হিসেবে হিন্দু ধর্ম ইত্যাদি। কিন্তু একমাত্র 'ইসলাম'- এর নামকরণ করা হয়েছে এ ধর্মের বৈশিষ্ট্যের ভিত্তিতে; আল্লাহ্ তা'আলার নিকট নিঃশর্ত আত্মসমর্পণই এ ধর্মের মূল কথা বিধায় এ ধর্মের নাম হয়েছে 'ইসলাম' (আত্মসমর্পণ)। আর যেহেতু আল্লাহ্ তা'আলা স্থান- কাল নির্বিশেষে সকল মানুষের স্রষ্টা সেহেতু বংশ- গোত্র, স্থান- কাল নির্বিশেষে সকল মানুষেরই তাঁর নিকট আত্মসমর্পণ অপরিহার্য। অবশ্য অন্যান্য সৃষ্টির ন্যায় তারাও তাঁর প্রাকৃতিক বিধানের নিকট আত্মসমর্পণ করে আছে, তাই বিচারবুদ্ধির দাবী হচ্ছে, স্বাধীন এখিতয়ারাধীন বিষয়াদিতেও তারা আল্লাহ্ তা'আলার পসন্দ- অপসন্দের নিকট স্বেচ্ছায় আত্মসমর্পণ করবে।

ব্যক্তি, গোষ্ঠী ও স্থানকে কেন্দ্র করে (মূলতঃ ব্যক্তি, গোষ্ঠী ও স্থানের নামকে স্লোগান হিসেবে ব্যবহার করে) আদি ও চিরন্তন সত্য দ্বীন ইসলাম থেকে বিচ্যুত হওয়ার কারণেই অন্য সমস্ত ধর্মই তাদের উপস্থাপিত মৌলিক তাত্ত্বিক দাবীসমূহকে অন্ধ বিশ্বাসের ওপর ভিত্তিশীল করে উপস্থাপন করেছে। তারা তাদের মৌলিক বিশ্বাসসমূহকে 'আক্ল্ বা বিচারবুদ্ধির আদালতে পেশ করতে ও যুক্তির মানদণ্ডে পরীক্ষা করতে দিতে রাযী হয় নি। তারা 'ভক্তিতে মুক্তি' এবং 'বিশ্বাসে মিলায়

বস্তু, তর্কে বহু দূর' ইত্যাদি আবেগময় বক্তব্যের সাহায্যে মানুষকে অন্ধ বিশ্বাসের ওপর ধরে রাখার চেষ্টা করেছে। আর এর বিপরীতে কোরআন মজীদ মানুষকে অন্ধ বিশ্বাস পরিত্যাগ করে 'আক্বল্ বা বিচারবুদ্ধির ভিত্তিতে জীবন ও জগতের মহাসত্য সংক্রান্ত প্রশ্নসমূহের জবাব সন্ধানের আহবান জানিয়েছে এবং তাদেরকে বিচারবুদ্ধি প্রয়োগের জন্য বার বার উৎসাহিত করেছে, আর যারা বিচারবুদ্ধির প্রয়োগ করে না তাদেরকে তিরস্কার করেছে।

বস্তুতঃ দ্বীনের উপস্থাপিত মৌলিকতম দাবীসমূহের ক্ষেত্রে বিচারবুদ্ধির আশ্রয় গ্রহণ করা না হলে ইসলামের প্রচার ও বিস্তার লাভের কোনো পথই থাকে না। কারণ, এ ব্যাপারে অন্ধ বিশ্বাসের নীতি অনুসরণ ও অন্ধ বিশ্বাস গ্রহণের আবেদন জানানোর (যা অনেক মুসলমানই করে থাকেন) অনিবার্য পরিণাম হচ্ছে এই যে, প্রত্যেকেই জন্মসূত্রে প্রাপ্ত নিজ নিজ ধর্মের ওপর স্থির থাকবে; ইসলাম গ্রহণ করবে না। কিন্তু যেহেতু অন্ধ বিশ্বাস হচ্ছে মিথ্যার আশ্রয়স্থল সেহেতু ইসলাম বিচারবুদ্ধির অস্ত্র দ্বারা তাদের বিশ্বাসের দুর্গে আঘাত হেনেছে। তাই অন্ধ বিশ্বাসকে যদি 'ধর্মের' ভিত্তি বলে স্বীকার করা হয়, তাহলে বলতে হবে যে, ইসলাম একটি 'ধর্মবিরোধী' মতাদর্শ বা দর্শন, যা মানুষকে বিশ্বাসের বা ধর্মের অন্ধ গলি থেকে বের করে এনে বিচারবুদ্ধির মহাসড়কে তুলে দেয় এবং দেখেশুনে নিজের জন্য চলার পথ বেছে নিতে বলে।

বস্তুতঃ জীবন ও জগতের মহাসত্য প্রশ্নে ইসলাম সকল যুগেই মানুষকে বিশ্বাসের[২] অনুসরণ পরিত্যাগ করে বিচারবুদ্ধির ফয়সালা মেনে নেয়ার জন্যে অনুপ্রাণিত করেছে। ইসলাম বলছে: তুমি নিজেই চিন্তা করে দেখো, এটাই সত্য, নাকি ঐগুলো সত্য?

কোরআন মজীদ যে বিচারবুদ্ধির ওপর কতখানি গুরুত্ব আরোপ করেছে তা অনুধাবনের জন্য ইসলামের মূলনীতি উপস্থাপনে যুক্তির আশ্রয় গ্রহণ সহ কোরআনে 'বিচারবুদ্ধি' (عقل- 'আক্বল্) শব্দটির ব্যবহারের প্রতি দৃষ্টি দেয়াই যথেষ্ট। বিচারবুদ্ধি বা যুক্তির আশ্রয় গ্রহণের পাশাপাশি কোরআন মজীদ মোট ৪৯ বার 'আক্বল্ শব্দমূল থেকে নিষ্পন্ন শব্দাবলী ব্যবহার করেছে। এর মধ্যে ১৩ বার বলা হয়েছে: ((افلا تعقلون (অতঃপর তোমরা কি বিচারবুদ্ধি কাজে লাগাবে না?)

৮টি আয়াতে বিভিন্ন বিষয় বর্ণনা করার পর বর্ণনার উদ্দেশ্য সম্বন্ধে বলা হয়েছে: (لعلكم تعقلون) (যাতে তোমরা বিচারবুদ্ধি প্রয়োগ করো/ বিচারবুদ্ধি দ্বারা অনুধাবন করো)। দু'টি আয়াতে বলা হয়েছে: (ان كنتم تعقلون) (যদি তোমরা বিচারবুদ্ধি প্রয়োগ করো)।

কোরআন মজীদ স্বয়ং তার দ্বীনের মৌলিকতম বিষয়সমূহ উপস্থানের ক্ষেত্রে বার বার বিচারবুদ্ধি (عقل)- এর আশ্রয় নিয়েছে। যেমন, এরশাদ হয়েছে:

(وَهُوَ الَّذِي يُحْيِي وَيُمِيتُ وَلَهُ اخْتِلافُ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ أَفَلا تَعْقِلُونَ.)

"আর তিনিই প্রাণের উদ্ভব ঘটান ও মৃত্যু প্রদান করেন এবং দিন ও রাত্রির পরিবর্তন তাঁরই এখিতয়ারে; অতঃপর তোমরা কি বিচারবুদ্ধি প্রয়োগ করবে না?" (সূরা আল- মু'মিনূন্: ৮০)

সমগ্র সৃষ্টিজগতের পরতে পরতে একজন মহাজ্ঞানী স্রষ্টার নিদর্শন বিদ্যমান - এদিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করে কোরআন মজীদের বিভিন্ন আয়াতে বিচারবুদ্ধির ভিত্তিতে সৃষ্টিকর্তা সংক্রান্ত বিতর্কের সমাধানের জন্য আহবান জানানো হয়েছে। এ ক্ষেত্রে অনেক আয়াতে সরাসরি 'বিচারবুদ্ধি' ('আক্বল্) শব্দমূল থেকে নিষ্পন্ন শব্দাবলী ব্যবহৃত হয়েছে। যেমন, এরশাদ হয়েছে:

(وَسَخَّرَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ وَالنُّجُومُ مُسَخَّرَاتٌ بِأَمْرِهِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ).

"আর তিনিই তোমাদের জন্য রাত্রি ও দিনকে এবং সূর্য ও চন্দ্রকে নিয়ি ত করেছেন। নক্ষত্রমণ্ডলী তাঁরই আদেশে নিয়ি ত। নিঃসন্দেহে এতে সেই লোকদের জন্য নিদর্শন রয়েছে যারা বিচারবুদ্ধি প্রয়োগ করে।" (সূরা আন্- নাহল্: ১২)

অনুরূপভাবে এরশাদ হয়েছে:

(وَإِنَّ لَكُمْ فِي الأَنْعَامِ لَعِبْرَةً نُسْقِيكُمْ مِمَّا فِي بُطُونِهِ مِنْ بَيْنِ فَرْثٍ وَدَمٍ لَبَنًا خَالِصًا سَائِغًا لِلشَّارِبِينَ. وَمِنْ ثَمَرَاتِ النَّخِيلِ وَالأَعْنَابِ تَتَّخِذُونَ مِنْهُ سَكَرًا وَرِزْقًا حَسَنًا إِنَّ فِي ذَلِكَ لآيَةً لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ).

"আর অবশ্যই তোমাদের জন্যে চতুষ্পদ জন্তুদের মধ্যে চিন্তার খোরাক রয়েছে। আমি তোমাদেরকে তার উদরস্থিত বস্তু থেকে - গোবর ও রক্ত হতে নিঃসৃত খাঁটি দুগ্ধ পান করাই যা পানকারীদের জন্য সুপেয়। আর (খাওয়াই) খেজুর গাছের ফল ও আঙ্গুর; তোমরা তা থেকে

নেশাকর দ্রব্য ও উত্তম খাদ্য তৈরী করছো। নিঃসন্দেহে এতে সেই লোকদের জন্য নিদর্শন রয়েছে যারা বিচারবুদ্ধি প্রয়োগ করে।” (সূরা আন্- নাহ্‌ল্: ৬৬- ৬৭)

আরেক আয়াতে এরশাদ হয়েছে:

(إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ وَاخْتِلافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَالْفُلْكِ الَّتِي تَجْرِي فِي الْبَحْرِ بِمَا يَنْفَعُ النَّاسَ وَمَا أَنْزَلَ اللَّهُ مِنَ السَّمَاءِ مِنْ مَاءٍ فَأَحْيَا بِهِ الأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَبَثَّ فِيهَا مِنْ كُلِّ دَابَّةٍ وَتَصْرِيفِ الرِّيَاحِ وَالسَّحَابِ الْمُسَخَّرِ بَيْنَ السَّمَاءِ وَالأَرْضِ لآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ.)

“নিঃসন্দেহে আসমানসমূহ ও পৃথিবীর সৃষ্টিতে, রাত্রি ও দিনের বিবর্তনে, সমুদ্রে চলাচলরত জাহাযসমূহে - যা মানুষকে উপকৃত করে, আল্লাহ্ আসমান থেকে যে পানি বর্ষণ করেন - অতঃপর যা দ্বারা মৃত যমীনকে সঞ্জীবিত করে তোলেন ও তাতে সব ধরনের জীবজন্তু ছড়িয়ে দেন - তাতে এবং বায়ুর আবর্তনে ও আসমান- যমীনের মাঝে ভেসে চলা মেঘমালার মধ্যে অবশ্যই সেই লোকদের জন্য নিদর্শন রয়েছে যারা বিচারবুদ্ধি প্রয়োগ করে।” (সূরা আল্- বাক্বারাহ্: ১৬৪)

আবার কোনো কোনো আয়াতে একই অর্থে ‘চিন্তা করা’র কথা বলা হয়েছে। যেমন, এরশাদ হয়েছে:

(وَأَوْحَى رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ أَنِ اتَّخِذِي مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا وَمِنَ الشَّجَرِ وَمِمَّا يَعْرِشُونَ. ثُمَّ كُلِي مِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ فَاسْلُكِي سُبُلَ رَبِّكِ ذُلُلا يَخْرُجُ مِنْ بُطُونِهَا شَرَابٌ مُخْتَلِفٌ أَلْوَانُهُ فِيهِ شِفَاءٌ لِلنَّاسِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لآيَةً لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ).

“আর (হে রাসূল!) আপনার রব মৌমাছিকে এ মর্মে অনুপ্রাণিত করলেন যে, পাহাড়ে, বৃক্ষে ও যা কিছু উঁচু তাতে বাসা বাঁধো, এরপর ফলসমূহ থেকে ভক্ষণ করো, অতঃপর বিনীতভাবে স্বীয় রবের উন্মুক্ত পথসমূহে চলাচল করো। তার উদর থেকে বিভিন্ন রঙের পানীয় বহির্গত হয় যাতে মানুষের জন্য নিরাময় রয়েছে। অবশ্যই এতে সেই লোকদের জন্য নিদর্শনাবলী রয়েছে যারা চিন্তা করে।” (সূরা আন্- নাহ্‌ল্: ৬৮- ৬৯)

এভাবে আল্লাহ্ তা'আলা চান যে, মানুষ চিন্তা-চেতনার অন্ধত্ব থেকে বিচারবুদ্ধির দিকে প্রত্যাবর্তন করুক এবং বিচারবুদ্ধির ফয়সালার ভিত্তিতে আল্লাহ্ তা'আলার অস্তিত্ব ও একত্বকে গ্রহণ করুক।

মুশরিকদেরকে তাওহীদের দিকে আহ্বান জানাতে গিয়ে হযরত ইবরাহীম (আ.)-এর উক্তি সম্পর্কে কোরআন মজীদে এরশাদ হয়েছে:

(قَالَ أَفَتَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لا يَنْفَعُكُمْ شَيْئًا وَلا يَضُرُّكُمْ. أُفٍّ لَكُمْ وَلِمَا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ أَفَلا تَعْقِلُونَ.)

"(ইবরাহীম) বললো: অতঃপরও কি তোমরা আল্লাহকে ব্যতীত এমন কিছুর উপাসনা করবে যা না তোমাদের কোনো কল্যাণ সাধন করতে পারে, আর না কোনো ক্ষতি সাধন করতে পারে? ধিক্কার তোমাদের প্রতি ও তার প্রতি তোমরা আল্লাহ্ ব্যতীত যার উপাসনা করছো; অতঃপর তোমরা কি বিচারবুদ্ধি প্রয়োগ করবে না?" (সূরা আল্-আম্বিয়া': ৬৬-৬৭)

এখানে সুস্পষ্টতঃই যুক্তির সাহায্যে অংশীবাদকে খণ্ডন করা হয়েছে। এছাড়া অনেক আয়াতে 'আক্বল্ (عقل) শব্দমূল থেকে নিষ্পন্ন শব্দাবলী ব্যবহার ব্যতীতই কেবল যুক্তি প্রয়োগের মাধ্যমে নাস্তিক্যবাদ ও অংশীবাদকে খণ্ডন করা হয়েছে। যেমন, এরশাদ হয়েছে:

(أَمْ خُلِقُوا مِنْ غَيْرِ شَيْءٍ أَمْ هُمُ الْخَالِقُونَ.)

"তারা কি কোনো কিছু (কোনো সৃষ্টি-উৎস/ সৃষ্টিকর্তা) ছাড়াই (নিজে নিজেই/ শূন্য থেকেই) সৃষ্ট হয়েছে, নাকি তারা (নিজেরাই নিজেদের) সৃষ্টিকর্তা?" (সূরা আত্-তূর: ৩৫)

(لَوْ كَانَ فِيهِمَا آلِهَةٌ إِلا اللَّهُ لَفَسَدَتَا فَسُبْحَانَ اللَّهِ رَبِّ الْعَرْشِ عَمَّا يَصِفُونَ).

"এতদুভয়ে (আসমান ও যমীনে) যদি আল্লাহ্ ছাড়া অন্য উপাস্যমণ্ডলী থাকতো তাহলে এতদুভয়ই ধ্বংস হয়ে যেতো। অতএব, 'আরশের মালিক আল্লাহ্ তা থেকে পরম প্রমুক্ত যা তারা তাঁর প্রতি আরোপ করছে।" (সূরা আল-আম্বিয়া': ২২)

অনুরূপভাবে পরকালীন জীবনের সত্যতা সম্বন্ধেও বিচারবুদ্ধির দলীল (যুক্তি) উপস্থাপন করা হয়েছে:

(قَالَ مَنْ يُحْيِي الْعِظَامَ وَهِيَ رَمِيمٌ. قُلْ يُحْيِيهَا الَّذِي أَنْشَأَهَا أَوَّلَ مَرَّةٍ وَهُوَ بِكُلِّ خَلْقٍ عَلِيمٌ.)

“সে (পরকাল অস্বীকারকারী ব্যক্তি) বলে: ‘পচে- গলে যাওয়া অস্থিগুলোকে কে জীবিত করবে?’ (হে রাসূল!) বলুন, তিনিই তাকে (পচে- গলে যাওয়া অস্থিগুলোকে) জীবিত করবেন যিনি প্রথম বার সৃষ্টি করেছেন; আর তিনি প্রতিটি বিষয় সম্পর্কে চিরজ্ঞানী।” (সূরা ইয়া- সীন্: ৭৮- ৭৯)

(فَسَيَقُولُونَ مَنْ يُعِيدُنَا قُلِ الَّذِي فَطَرَكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ.)

“অতঃপর অচিরেই তারা বলবে: ‘কে আমাদেরকে (মৃত্যুর পরে) প্রত্যাবর্তিত করাবে?’ (হে রাসূল!) বলুন, তিনিই যিনি প্রথম বারের মতো তোমাদের সৃষ্টির সূচনা করেন।” (সূরা আল্- ইসরা/ বানী ইসরাঈল: ৫১)

তেমনি রাসূলে আকরাম হযরত মুহাম্মাদ (ছ্বাঃ)- এর নবুওয়াত সম্বন্ধেও বিচারবুদ্ধির নিকট আবেদন জানানো হয়েছে। হযরত নবী করীম (ছ্বাঃ) নবুওয়াত- প্রাপ্তির পূর্বে দীর্ঘ ৪০ বছর মক্কাহ্ শরীফে বসবাস করেন। এ সময় তিনি নিষ্কলুষ চরিত্রের লোক হিসেবে সকলের নিকট পরিচিত ছিলেন, তবে লেখাপড়া জানতেন না এবং কারো কাছ থেকে মৌখিকভাবেও জ্ঞান আহরণ করেন নি। মোটের ওপর তিনি জ্ঞানী বা প্রতিভাধর ব্যক্তি হিসেবে পরিচিত ছিলেন না। এমতাবস্থায় আল্লাহ্ তা‘আলার পক্ষ থেকে নাযিল হওয়া ব্যতীত কোরআন মজীদের ন্যায় উন্নততম সাহিত্যগুণসমৃদ্ধ সীমাহীন জ্ঞানে পরিপূর্ণ মহাগ্রন্থ নিজে রচনা করে উপস্থাপন করা তাঁর পক্ষে কিছুতেই সম্ভব নয়। এদিকে ইঙ্গিত করে এরশাদ হয়েছে:

(قُلْ لَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا تَلَوْتُهُ عَلَيْكُمْ وَلا أَدْرَاكُمْ بِهِ فَقَدْ لَبِثْتُ فِيكُمْ عُمُرًا مِنْ قَبْلِهِ أَفَلا تَعْقِلُونَ).

“(হে রাসূল! তাদেরকে) বলে দিন: আল্লাহ্ যদি চাইতেন (যে, আমাকে নবুওয়াতের দায়িত্ব দেবেন না) তাহলে আমি তোমাদের নিকট তা (কোরআন) পাঠ করতাম না এবং তিনি তোমাদেরকে (এ বিষয়ে) অবহিত করতেন না; এর আগে থেকেই তো আমি আমার জীবন তোমাদের মধ্যেই কাটিয়েছি; অতঃপর তোমরা কি বিচারবুদ্ধি কাজে লাগাবে না?” (সূরা ইউনুস: ১৬)

কোরআন মজীদ আল্লাহর কিতাব কিনা তা- ও বিচারবুদ্ধির সাহায্যে পরীক্ষা করে দেখার জন্যে আহবান জানানো হয়েছে।

এ প্রসঙ্গে উল্লেখ্য যে, বিশ্বের সকল ভাষার মধ্যে আরবী ভাষা হচ্ছে ব্যাপকতম ও সূক্ষ্মতম ভাব প্রকাশের সম্ভাবনার অধিকারী একমাত্র ভাষা, আর হযরত রাসূলে আকরাম (ছ্বাঃ)- এর ওপর কোরআন নাযিলের যুগে আরবী ভাষার চর্চা (কবিতা ও ভাষণ উভয় ক্ষেত্রে) উন্নতির চরমতম শিখরে উপনীত হয়েছিলো। অন্য যে কোনো ভাষার ও আরবী ভাষার প্রকাশ ক্ষমতার মধ্যে পার্থক্য এতোই বেশী যে, আরবরা এ পার্থক্য লক্ষ্য করে অনারবদেরকে "আ'জামী" (বোবা) বলে অভিহিত করতো। বস্তুতঃ আরবী ভাষার নামটিও এর বৈশিষ্ট্য প্রকাশক; عربی ('আরাবী) মানে 'উন্নততম ও সূক্ষ্মতম ভাব প্রকাশক্ষম প্রাঞ্জলভাষী' এবং لسان عربی (লিসানে 'আরাবী) মানে 'উন্নততম ও সূক্ষ্মতম ভাব প্রকাশক্ষম প্রাঞ্জল ভাষা'। আল্লাহ্ তা'আলা উন্নততম প্রকাশ ক্ষমতাসম্পন্ন ভাষায় কোরআন নাযিল করেছেন এবং এ গ্রন্থের সাহিত্যিক মান ও প্রকাশ ক্ষমতা এমন চূড়ান্ত পর্যায়ের যে, আরবী ভাষী শ্রেষ্ঠতম কবি ও বাগ্মীগণ এর মোকাবিলায় চরমভাবে নিস্প্রভ হয়ে পড়ায় অকাট্যভাবে প্রমাণিত হয় যে, এ গ্রন্থ কোনো মানুষের পক্ষে রচনা করা সম্ভব নয়। এদিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করে আল্লাহ্ তা'আলা এরশাদ করেন:

(إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ.)

"অবশ্যই আমি একে (এ গ্রন্থকে) উন্নততম ও সূক্ষ্মতম ভাবপ্রকাশক্ষম প্রাঞ্জলতম (আরবী) পঠনীয় (কোরআন) রূপে অবতীর্ণ করেছি যাতে তোমরা বিচারবুদ্ধি প্রয়োগ করো (এবং এটি যে আল্লাহ্ কর্তৃক প্রেরিত গ্রন্থ তা বুঝতে পারো)।" (সূরা ইউসুফ: ২; সূরা আয্- যুখরূফ: ৩)

আল্লাহ্ তা'আলা কাফেরদেরকে কোরআনের সমতুল্য বক্তব্য রচনা করার জন্য চ্যালেঞ্জ প্রদান করে বলেন:

(أَمْ يَقُولُونَ تَقَوَّلَهُ بَلْ لا يُؤْمِنُونَ. فَلْيَأْتُوا بِحَدِيثٍ مِثْلِهِ إِنْ كَانُوا صَادِقِينَ.)

"তারা কি বলে যে, তিনি (মুহাম্মাদ ছ্বাঃ) নিজেই এটি (কোরআন) রচনা করেছেন? বরং তারা তো (নিজেরাই তাদের এ কথায়) আস্থা পোষণ করে না। তারা যদি (তাদের দাবীর প্রশ্নে) সত্যবাদী হয়ে থাকে (তারা মুখে যা বলছে এটাই যদি তাদের অন্তরের প্রত্যয় হয়ে থাকে) তাহলে

তারা এর (কোরআনের) অনুরূপ (মানসম্পন্ন) বক্তব্য নিয়ে আসুক (রচনা করুক)।" (সূরা আত্-তূর্: ৩৩- ৩৪)

বস্তুতঃ সমগ্র সৃষ্টিলোকে আল্লাহ্ তা'আলার অস্তিত্বের অসংখ্য নিদর্শন বিদ্যমান যা থেকে বিচারবুদ্ধি প্রয়োগকারী লোকেরা খুব সহজেই মহাসত্যে উপনীত হতে সক্ষম। কোরআন মজীদের বিভিন্ন আয়াতে এ বিষয়টি উল্লেখ করা হয়েছে। শুধু তা- ই নয়, আল্লাহ্ তা'আলা কোরআন মজীদে তাঁর নিদর্শনাবলীর যে বিস্তারিত বিবরণ দিয়েছেন তার মূল লক্ষ্যই হচ্ছে বিচারবুদ্ধি প্রয়োগকারী লোকেরা। তাই এক আয়াতের শেষাংশে এরশাদ হয়েছে:

(كَذَلِكَ نُفَصِّلُ الآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ)

"আমি এভাবেই সেই লোকদের জন্য বিস্তারিতভাবে নিদর্শনাবলী বর্ণনা করি যারা বিচারবুদ্ধি প্রয়োগ করে।" (সূরা আর্- রূম্: ২৮)

যারা পূর্ববর্তীদের অন্ধ অনুসরণকে বিচারবুদ্ধির ওপর অগ্রাধিকার প্রদান করে কোরআন মজীদ তাদের কঠোর সমালোচনা ও নিন্দা করেছে এবং তাদের এ কর্মনীতিকে তাদের হেদায়াত (সঠিক পথের সন্ধান) না পাওয়ার কারণ স্বরূপ গণ্য করেছে। শুধু তা- ই নয়, আল্লাহ্ তা'আলা তাদেরকে চতুষ্পদ জন্তুর সাথে তুলনা করেছেন এবং অন্ধ, বধির ও বোবা বলে তিরস্কার করেছেন। এরশাদ হয়েছে:

(وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنْزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا أَلْفَيْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا أَوَلَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ لا يَعْقِلُونَ شَيْئًا وَلا يَهْتَدُونَ. وَمَثَلُ الَّذِينَ كَفَرُوا كَمَثَلِ الَّذِي يَنْعِقُ بِمَا لا يَسْمَعُ إِلا دُعَاءً وَنِدَاءً صُمٌّ بُكْمٌ عُمْيٌ فَهُمْ لا يَعْقِلُونَ.)

"আর যখন তাদেরকে বলা হয়, 'আল্লাহ্ যা নাযিল করেছেন তার অনুসরণ করো', তখন তারা বলে, 'বরং আমরা তারই অনুসরণ করবো যার ওপর আমাদের পিতৃপুরুষদের পেয়েছি'। তাদের পিতৃপুরুষরা যদি মোটেই বিচারবুদ্ধি প্রয়োগ না করে থাকে এবং সঠিক পথ (হেদায়াত) প্রাপ্ত না হয়ে থাকে (তবুও কি তারা তাদের অনুসরণ করবে)? আর যারা কাফের হয়েছে (সত্য দ্বীনকে প্রত্যাখ্যান করেছে) তাদের উপমা হচ্ছে তার ন্যায় যাকে ডাকা হলে সে হাকডাক ছাড়া

আর কিছুই শুনতে পায় না (অর্থ বুঝতে পারে না); তারা বধির, বোবা ও অন্ধ, সুতরাং তারা বিচারবুদ্ধি প্রয়োগ করবে না।" (সূরা আল- বাক্বারাহ্: ১৭০- ১৭১)

অন্যত্র এরশাদ হয়েছে:

(وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَى مَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ قَالُوا حَسْبُنَا مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا أَوَلَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ لا يَعْلَمُونَ شَيْئًا وَلا يَهْتَدُونَ).

"তাদেরকে যখন বলা হয়, 'আল্লাহ্ যা নাযিল করেছেন তার দিকে ও রাসূলের দিকে এসো,' তখন তারা বলে, 'আমরা আমাদের পিতৃপুরুষদেরকে যার ওপর পেয়েছি তা- ই আমাদের জন্য যথেষ্ট।' তাদের পিতৃপুরুষরা যদি মোটেই জ্ঞানের অধিকারী না থেকে থাকে এবং সঠিক পথ না পেয়ে থাকে (তবুও কি তারা তাদের অনুসরণ করবে)?" (সূরা আল্- মায়েদাহ্: ১০৪)

যুগে যুগে যারা নবী- রাসূলগণের (আ.) দাও'আত প্রত্যাখ্যান করে তাদের অন্যতম প্রধান বৈশিষ্ট্য ছিলো এই যে, তারা তাদের পিতৃপুরুষদের অনুসৃত নীতি- আদর্শ অনুসরণের যুক্তিতে তা প্রত্যাখ্যান করে। এরশাদ হয়েছে:

(بَلْ قَالُوا إِنَّا وَجَدْنَا آبَاءَنَا عَلَى أُمَّةٍ وَإِنَّا عَلَى آثَارِهِمْ مُهْتَدُونَ. وَكَذَلِكَ مَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ فِي قَرْيَةٍ مِنْ نَذِيرٍ إِلا قَالَ مُتْرَفُوهَا إِنَّا وَجَدْنَا آبَاءَنَا عَلَى أُمَّةٍ وَإِنَّا عَلَى آثَارِهِمْ مُقْتَدُونَ.)

"বরং তারা বলে, 'অবশ্যই আমরা আমাদের পিতৃপুরুষদেরকে একটি আদর্শের ওপর পেয়েছি এবং অবশ্যই আমরা তাঁদের কর্মের ভিত্তিতে সঠিক পথপ্রাপ্ত আছি।' আর এভাবেই, আপনার আগে কোনো জনপদে এমন কোনো সতর্ককারী পাঠাই নি যাকে সেখানকার প্রভাবশালী ব্যক্তিরা বলে নি, 'অবশ্যই আমরা আমাদের পিতৃ- পুরুষদেরকে একটি আদর্শের ওপর পেয়েছি এবং অবশ্যই আমরা তাঁদের কর্মের অনুসরণকারী'।" (সূরা আয্- যুখরূফ্: ২২- ২৩)

অনুরূপভাবে সূরা আল্- আ'রাফ- এর ২৮ ও ৯৫, সূরা ইউনুস- এর ৭৮, সূরা আল্- আম্বিয়া'- এর ৫৩ ও ৫৪, সূরা আশ্- শূ'আরা'- এর ৭৪ এবং সূরা লোকমান্- এর ২১ নং আয়াতে কাফের- মোশরেকদের পক্ষ থেকে পূর্বপুরুষদের অনুসরণের যুক্তি পেশ করার কথা উল্লেখ করা হয়েছে। বলা বাহুল্য যে, বিচারবুদ্ধি ও আল্লাহর কালামের বিপরীতে পূর্ববর্তীদের

(পিতৃপুরুষ, মুরুব্বী, ধর্মীয় পণ্ডিত ও ধর্মনেতা নির্বিশেষে) অনুসরণের যুক্তি উপস্থাপন কোরআন মজীদের দৃষ্টিতে নিন্দনীয় ও বাতিল কর্মনীতি এবং তা কেবল কাফের- মোশরেকদের বেলায়ই প্রযোজ্য নয়, বরং সর্বজনীনভাবে সকলের বেলায়ই প্রযোজ্য। তাই 'অতীতের মনীষীগণ কি ইসলামকে কম বুঝেছিলেন?' এরূপ যুক্তিতে বিচারবুদ্ধির যুক্তি ও কোরআন মজীদ কী বলেছে তা শুনতে না চাওয়া যে গোমরাহীর কারণ তাতে সন্দেহ নেই। বস্তুতঃ বিচারবুদ্ধির অকাট্য রায়, আল্লাহ্‌র কালাম এবং রাসূলে আকরাম হযরত মুহাম্মাদ (ছ্বাঃ)- এর মত, আচরণ ও তাঁর অনুমোদিত আচরণ হিসেবে অকাট্য ও সর্বসম্মতভাবে প্রমাণিত বক্তব্য (মুতাওয়াতির হাদীছ ও ইজমা'এ উম্মাহ্) ছাড়া কারো কোনো কথাই ভুলের উর্ধে বলে গণ্য করে অন্ধভাবে অনুসরণ পুরোপুরিভাবে ইসলাম কর্তৃক প্রত্যাখ্যাত কর্মনীতি।

মুসলমানের অন্যতম বৈশিষ্ট্য হচ্ছে কোনো মতের পক্ষে- বিপক্ষে উপস্থাপিত বক্তব্য শোনা এবং এরপর তার মধ্য থেকে সঠিক বা উত্তমটিকে গ্রহণ করা। শুনলে পূর্বেকার ধারণা পাল্টে যেতে পারে বা যা বলা হবে তা শ্রোতার অনুসৃত বা শ্রদ্ধাভাজন ব্যক্তির মতের সাথে সাংঘর্ষিক হবার সম্ভাবনা আছে, এ কারণে কারো তত্ত্ব বা তথ্যপূর্ণ কথা শুনতে অস্বীকার করা মুসলমানের বৈশিষ্ট্য নয়। আল্লাহ্ তা'আলা এরশাদ করেন:

(فَبَشِّرْ عِبَادِي. الَّذِينَ يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ أُولَئِكَ الَّذِينَ هَدَاهُمُ اللَّهُ وَأُولَئِكَ هُمْ أُولُو الأَلْبَابِ.)

"অতএব, (হে রাসূল!) সেই বান্দাহেদরকে সুসংবাদ দিন যারা বক্তব্য শোনে, অতঃপর তার মধ্য থেকে যা কিছু অধিকত উত্তম তার অনুসরণ করে। এরাই হচ্ছে তারা যাদেরকে আল্লাহ্ সঠিক পথ দেখিয়েছেন এবং এরাই হচ্ছে প্রকৃত জ্ঞানবান।" (সূরাহ্ আয্- যুমার : ১৭- ১৮) অন্যত্র ঈমানদারদেরকে সতর্ক করে দিয়ে এরশাদ হয়েছে :

(وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ قَالُوا سَمِعْنَا وَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ إِنَّ شَرَّ الدَّوَابِّ عِندَ اللَّهِ الصُّمُّ الْبُكْمُ الَّذِينَ لَا يَعْقِلُونَ)

"আর তোমরা তাদের ন্যায় হয়ো না যারা বলে, 'আমরা শুনেছি,' অথচ তারা (ঠিক যেরূপ মনোযোগ দিয়ে শোনা উচিত ছিলো সেভাবে) শোনে নি। নিঃসন্দেহে আল্লাহর নিকট নিকৃষ্টতম

জন্তু হচ্ছে সেই বধির- বোবার দল যারা বিচারবুদ্ধি প্রয়োগ করে না।" (সূরাহ্ আল- আনফাল : ২১- ২২)

যারা বিচারবুদ্ধি প্রয়োগ করে না তাদেরকে আরো কয়েকটি আয়াতে তিরস্কার করা হয়েছে। শুধু তা- ই নয়, যারা বিচারবুদ্ধি কাজে লাগায় না আল্লাহ্ তা'আলা তাদেরকে ঈমানের নে'আমত প্রদান করেন না। এরশাদ হয়েছে :

(دَعْوَاهُمْ فِيهَا سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَتَحِيَّتُهُمْ فِيهَا سَلَامٌ وَآخِرُ دَعْوَاهُمْ أَنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ)

"আল্লাহর অনুমতি ব্যতীত কেউ ঈমান (পরকালীন জীবনে সুরক্ষা) অর্জন করতে পারে না। আর যারা বিচারবুদ্ধি প্রয়োগ করে না তিনি (আল্লাহ্) তাদেরকে কলুষলিপ্ত করে রাখেন (ফলে তারা ঈমানের সুযোগ পায় না)।" (সূরাহ্ ইউনুস : ১০০)

এ আয়াতে বিশেষভাবে লক্ষ্য করার বিষয় এই যে, কাউকে বিচারবুদ্ধি না থাকার কারণে নিন্দা ও সমালোচনা করা হয় নি, বরং বিচারবুদ্ধি থাকা সত্ত্বেও তা কাজে না লাগানোর কারণে নিন্দা ও সমালোচনা করা হয়েছে। কোরআন মজীদ এ ক্ষেত্রে ক্রিয়াপদ ব্যবহার করেছে যা প্রমাণ করে যে, এরা বিচারবুদ্ধিবঞ্চিত মানসিক প্রতিবন্ধী নয়, বরং বিচারবুদ্ধির অধিকারী হয়েও তা কাজে লাগানো থেকে বিরত রয়েছে এবং এভাবে নিজেদেরকে বিচারবুদ্ধিবঞ্চিত পশুর পর্যায়ে নামিয়ে এনেছে।

মোদ্দা কথা, কোরআন মজীদ বিচারবুদ্ধির নিকট ইসলামের দাওয়াত পেশ করেছে। কারণ, কোনো মানুষ যতক্ষণ না অন্ধ বিশ্বাসের খোলস ভেঙ্গে বেরিয়ে এসে বিচারবুদ্ধির আশ্রয় গ্রহণ করে ততক্ষণ তার পক্ষে সঠিক অর্থে ইসলাম গ্রহণ করা সম্ভব নয়।

ইসলাম গ্রহণের পরে দ্বীনের বিস্তারিত বিষয়াদির ক্ষেত্রে অবশ্যই তাকে সংশ্লিষ্ট বিষয়ে বিশেষজ্ঞ কোনো ব্যক্তির অনুসরণ করতে হবে। আর যেহেতু বিস্তারিত বিষয়ে বিশেষজ্ঞের অনুসরণ অপরিহার্য, সেহেতু আদৌ কোনো বিশেষজ্ঞ না পেলে সে ক্ষেত্রে ব্যক্তির নিজের জন্যই বিশেষজ্ঞ হওয়া অপরিহার্য। কিন্তু কেউ যদি কোনো বিশেষজ্ঞের সন্ধান না পায় এবং নিজেও বিশেষজ্ঞত্ব

অর্জন না করে শুধু বিচারবুদ্ধির সাহায্যে স্বীয় করণীয় নির্ধারণ করতে চায় তাহলে তা গ্রহণযোগ্য নয়। কারণ, স্বয়ং বিচারবুদ্ধি একে সঠিক প্রক্রিয়া বলে রায় দেয় না।

মোদ্দা কথা, বিচারবুদ্ধিকে পুরোপুরি বর্জন করা অথবা শুধু বিচারবুদ্ধির ওপর নির্ভর করা উভয়ই ভুল কর্মপন্থা। বরং বিচারবুদ্ধিকে যথাযথ ক্ষেত্রে ব্যবহার করতে হবে - এটাই ‘আক্বল্ বা বিচারবুদ্ধির দাবী; ইসলামের আবেদনও এটাই। বিচারবুদ্ধি হচ্ছে ইসলাম গৃহের দরযা; এ পথেই ইসলামে প্রবেশ করতে হবে এবং এরপর ইসলামকে সঠিকভাবে জানা-বুঝা ও অনুসরণের ক্ষেত্রে বিচারবুদ্ধির ভূমিকা হচ্ছে সহায়ক বা হাতিয়ারের ভূমিকা।

জীবন জিজ্ঞাসার জবাব সন্ধানে জ্ঞানতত্ত্বের পথনির্দেশ

জীবন ও জগতের পশ্চাতে কোন্ সত্য নিহিত? ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বস্তুজগতের অন্তরালে কোনো অতিন্দ্রিয় জগত আছে কি? বিশ্বজগতের কোনো আদি স্রষ্টা আছেন কি? মানুষের বস্তুদেহের অন্তরালে কোনো অবস্তুগত সত্তা আছে কি? তার চেয়েও বড় কথা, আমাদের ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য জগতের স্বরূপ কী? বস্তুরই বা স্বরূপ কী? আমরা নিজেরাই বা কী অথবা কে?

এ সব প্রশ্ন হচ্ছে এমন কতগুলো মৌলিক জিজ্ঞাসা যা প্রতিটি মানুষের অন্তরে জাগ্রত হতে বাধ্য। আর সামাজিক পরিমণ্ডলে জন্মগ্রহণকারী মানুষ জন্মের পর থেকে স্বীয় পরিবেশে পূর্ব হতে বিদ্যমান জবাবসমূহ গ্রহণ করে এ সব প্রশ্নের জবাব লাভের জন্যে তার মধ্যে সৃষ্ট পিপাসার নিবৃত্তি করার চেষ্টা করে। কিন্তু বিভিন্ন পরিবেশে এ সব প্রশ্নের জবাবে বিভিন্নতা থাকার কারণে একই প্রশ্নের জবাব বিভিন্ন ব্যক্তির নিকট বিভিন্ন হয়ে থাকে। আবার অনেক ক্ষেত্রে একই ব্যক্তি অন্য পরিবেশে প্রদত্ত জবাব জানার পর নিজ পরিবেশে প্রাপ্ত জবাব পরিত্যাগ করে অন্য পরিবেশ থেকে প্রাপ্ত জবাব গ্রহণ করে অথবা উভয় জবাবের মধ্যে তুলনা ও বিশ্লেষণের মাধ্যমে তৃতীয় কোনো জবাব উদঘাটন করে - যা অবশ্য পরবর্তীকালীন লোকদের জন্য আরেক ধরনের গতানুগতিক জবাব হিসেবে পরিগণিত হয়।

নিঃসন্দেহে একই প্রশ্নের বিভিন্ন জবাবের মধ্যে সবগুলো বা একাধিক জবাব সঠিক হতে পারে না। এমনকি সবগুলো জবাব ভুল হবার সম্ভাবনাও উড়িয়ে দেয়া যায় না। তাই প্রশ্ন হচ্ছে, সঠিক জবাব লাভের উপায় কী? একটি প্রশ্নের যতোগুলো জবাব দেয়া হয়েছে তার মধ্য থেকে প্রত্যেকটি জবাবই নিজেকে সঠিক বলে দৃঢ়তার সাথে দাবী করে এসেছে। এমতাবস্থায় কী করে বুঝবো যে, কোন্ জবাবটি সঠিক বা আদৌ কোনো সঠিক জবাব পাওয়া গেছে কি না?

অন্যদিকে জীবন ও জগত সম্পর্কে এ সব প্রশ্ন এতোই গুরুত্বপূর্ণ যে, এগুলোকে জবাববিহীনভাবে রেখে দেয়াও সম্ভব নয়। কারণ, এ সব প্রশ্নের জবাবের ওপর মানুষের গোটা

জীবনের কর্মনীতি নির্ভর করে। এ সব প্রশ্নের জবাবের বিভিন্নতার কারণে এক ব্যক্তি আক ভোগ- বিলাসে নিমি ত থাকে, এক ব্যক্তি ব্যক্তিগত স্বার্থে যে কোনো অন্যায়- অপরাধ করতে দ্বিধা করে না, কেউ কেউ তো 'অন্যায়', 'অপরাধ' ইত্যাদি পরিভাষাকেই অর্থহীন ও হাস্যষ্কর বলে মনে করে, অন্যদিকে এক ব্যক্তি কোনো নীতি- আদর্শের জন্য বা দেশের জন্য বা মানুষের জন্য অথবা হৃদয়বৃত্তিকতা ও ভাবাবেগের জন্য স্বীয় ধনসম্পদ, এমনকি জীবন পর্যন্ত বিলিয়ে দিচ্ছে। আবার দেখা যায়, এক ব্যক্তি সংসার ত্যাগ করে পাহাড়ে- জঙ্গলে চলে যাচ্ছে বা ছন্নছাড়া হয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে অথবা সন্ন্যাস ত অবলম্বন করছে, এক ব্যক্তি স্রষ্টাকে বা দেবতাকে সন্তুষ্ট করতে নরবলি দিচ্ছে, এক ব্যক্তি আত্মহত্যা করে এ দুনিয়া থেকে বিদায় নিচ্ছে, এক ব্যক্তি সন্তান- সন্ততির মাধ্যমে এবং আরেক ব্যক্তি কীর্তির মাধ্যমে নিজেকে অমর করে রাখার চেষ্টা করছে।

এ ধরনের আরো অনেক উদাহরণ দেয়া যায়। অতএব, এ প্রশ্নগুলো যে খুবই গুরুত্বপূর্ণ তাতে কোনোই সন্দেহ নেই। এমনকি যারা বলে, এ সব প্রশ্নের জবাব খুঁজে লাভ নেই, তার চেয়ে দু'দিনের এ দুনিয়ার জীবনটা ভোগ- আনন্দে কাটিয়ে দাও; সঠিক জবাব খুঁজতে খুঁজতে জীবনটা ব্যয় করে ফেললে পরে সে জবাব কী কাজে লাগবে? - বাহ্যতঃ তারা এ সব প্রশ্নের প্রতি উদাসীনতা ও উপেক্ষা প্রদর্শন করলেও কার্যতঃ তারাও এ সব প্রশ্নের এক ধরনের জবাব নির্ধারণ করে নিয়ে তার ভিত্তিতে আচরণ করছে। অর্থাৎ তারা মুখে স্বীকার করুক বা না- ই করুক, কার্যতঃ এই বস্তু ও জীব জগৎকেই একমাত্র সত্য বলে এবং এ পার্থিব জীবনকেই একমাত্র জীবন বলে গণ্য করছে।

তবে যারা এ সব প্রশ্নের জবাব সন্ধান থেকে বিরত থাকতে বলে তাদের মধ্যে অনেকে তাদের বক্তব্যকে যৌক্তিক ভিত্তির ওপর দাঁড় করিয়ে তার গ্রহণযোগ্যতা সৃষ্টির চেষ্টা করে থাকে। এদের কথা হচ্ছে, জীবন ও জগতের পিছনে কোনো সত্য আছে কিনা এবং থাকলে তা কী - তা আদৌ জানা সম্ভব নয়। অন্য কথায়, 'জ্ঞান' অর্জন করা সম্ভব নয়, তা যে কোনো বিষয়ের জ্ঞানই হোক না কেন।

এ ব্যাপারে তাদের যুক্তি অনেক। তাদের দাবী হচ্ছে, মানুষের সামনে নির্ভুল জ্ঞান অর্জন করার কোনো পথ নেই। মানুষের বস্তুগত দেহের অন্তরালে কোনো অবস্তুগত সত্তা আছে কি নেই সে ব্যাপারে নিশ্চিত হওয়া তো দূরের কথা, যে ইন্দ্রিয়নিচয়কে জ্ঞানমাধ্যম হিসেবে সকলেই স্বীকার করে তার ওপরেও নির্ভর করা যায় না। উদাহরণস্বরূপ, চোখ অনেক সময় ছোট জিনিসকে বড় দেখে, আবার বড় জিনিসকে ছোট দেখে। সূর্যটা কতো বড়, কিন্তু চোখ তাকে ছোট দেখে। অন্যমনস্ক অবস্থায় কানের কাছে শব্দ হলেও কান তা শুনতে পায় না। আবার অনেক সময় কোনো শব্দ না হলেও কান কাল্পনিক শব্দ শুনে থাকে। তেমনি মানুষের অন্যান্য ইন্দ্রিয়ও ভুল করে থাকে। তিনটি পাত্রে অল্প, মধ্যম ও বেশী তাপমাত্রার পানি রেখে অল্প ও বেশী তাপমাত্রার পানিতে দুই হাত ডুবিয়ে রেখে পরে উভয় হাত মধ্যম তাপমাত্রার পানিতে ডুবালে এক হাতে গরম ও আরেক হাতে ঠাণ্ডা মনে হবে, যদিও দুই হাতই অভিন্ন পানিতে ডুবানো হয়েছে। অতএব, সঠিক জ্ঞান অর্জন করা সম্ভব নয়।

উপরোক্ত ধারণা পোষণকারীদের সবচেয়ে শক্তিশালী যুক্তি হচ্ছে এই যে, আমরা যখন স্ব দেখি তখন তাকে বাস্তব বলে মনে করি, স্ব বলে মনে করি না। এমতাবস্থায় আমরা আমাদের এই জীবনকে যে বাস্তব মনে করছি, এ- ও যে এক বড় ধরনের স্ব নয় তা কী করে বুঝবো? হয়তো বা এ- ও এক ধরনের স্ব , মৃত্যুর মাধ্যমে যা ভেঙ্গে যাবে এবং অন্য এক জগতে আমরা জেগে উঠবো। অতএব, এ জীবনে সত্য উদঘাটন তথা সঠিক জ্ঞান লাভ করা সম্ভব নয়। তাই জীবনজিজ্ঞাসা সহ কোনো জিজ্ঞাসারই জবাব সন্ধান করে লাভ নেই।

এদের দাবী দৃশ্যতঃ সঠিক মনে হলেও আসলে তাদের বক্তব্যের মধ্যেই তাদের মূল দাবীর ভ্রান্তির প্রমাণ নিহিত রয়েছে। তাদের মূল দাবী: সত্যকে জানা বা উদঘাটন করা সম্ভব নয়। এখন প্রশ্ন হচ্ছে: তাদের দৃষ্টিতে তাদের এ দাবী সঠিক কিনা? যদি তারা এ দাবীকে সঠিক বলে গণ্য করে তাহলে তাদের এটা মানতেই হবে যে, তারা অন্ততঃ একটি সত্যকে উদঘাটন করেছে, তা হচ্ছে: “সত্যকে উদঘাটন করা যায় না।” কিন্তু একটি সত্যও যদি উদঘাটন করা সম্ভব হয় তাহলে তা থেকেই তাদের দাবী মিথ্যা প্রমাণিত হয়ে যাচ্ছে।

আমাদের এ জবাবকে একটা জটিল টতার্কিক জবাব বলে কেউ দাবী করতে পারে। কিন্তু সত্যকে জানা যায় না বা সঠিক জ্ঞান অর্জন করা সম্ভব নয় - এটা প্রমাণের জন্য তারা যে সব উদাহরণ দিয়ে থাকে তা থেকেই প্রমাণিত হয় যে, সকল ব্যাপারে না হলেও অন্ততঃ কতগুলো ব্যাপারে অকাট্য জ্ঞান অর্জন করা সম্ভব। যেমন: তারা তাদের দাবী পেশ করতে গিয়ে কতগুলো বিষয় স্বীকার করে নিয়েছে। এর মধ্যে রয়েছে: (১) তাদের নিজেদের অস্তিত্ব, যদিও তার স্বরূপ তারা জানে না। (২) তারা ছাড়া অন্য মানুষের বা তাদের কাছে যে বা যা তাদেরই মতো মানুষ বলে প্রতিভাত হচ্ছে তাদের অস্তিত্ব - যাদের সাথে তারা জ্ঞান সংক্রান্ত বিতর্ক করছে, যদিও তাদের অস্তিত্বের স্বরূপ তারা জানে না। (৩) এই বিতর্ককারী পক্ষদ্বয় ছাড়া তৃতীয় একটি অস্তিত্ব আছে যা হচ্ছে বাইরের বস্তু ও জীব জগৎ - যার স্বরূপ তারা জানে না। (৪) তাদের ও তাদের প্রতিপক্ষের বস্তুদেহের মধ্যে একটি বিতর্ককারী শক্তি আছে, যার স্বরূপ তারা জ্ঞাত নয়। (৫) জ্ঞান বলে একটা কিছু আছে যা সকলে অর্জন করতে চায়, কিন্তু অর্জন করা সম্ভব নয় বলে তারা মনে করে। (৬) অর্জন বলে একটা কাজ আছে যা সম্পাদন করা সম্ভব বা অসম্ভব বলে তারা দুই পক্ষ বিতর্ক করছে। (৭) সঠিক জ্ঞানের যেমন অস্তিত্ব রয়েছে, তেমনি ভুল জ্ঞানেরও অস্তিত্ব রয়েছে, যদিও তারা মনে করে যে, সঠিক জ্ঞান অর্জন করা সম্ভব নয় এবং তাদের প্রতিপক্ষ যে জ্ঞান অর্জন করেছে তা তাদের মতে ভুল জ্ঞান, তবে তার অস্তিত্ব রয়েছে; ভুল জ্ঞান অস্তিত্বহীন নয়। (৮) মানুষ স্ব দেখে যদিও তার স্বরূপ তার জানা নেই। (৯) যে মানুষ জাগ্রত সে বাস্তব জগতে রয়েছে, যদিও এ বাস্তব জগতের স্বরূপ সম্পর্কে নিশ্চিত জ্ঞান অর্জন করা সম্ভব নয় বলে তারা মনে করে এবং মৃত্যুর পরে এর সঠিক রূপ ধরা পড়ার সম্ভাবনা আছে। (১০) মানুষ স্ব র ভিতরে যা দেখে তাকে বাস্তব গণ্য করে, জাগ্রত হবার পর যা বাস্তব নয় বলে মনে হয়। (১১) সে জানে যে, মানুষের ইন্দ্রিয়নিচয় তার তথ্য বা জ্ঞান আহরণের মাধ্যম। (১২) সে এ- ও জানে যে, ইন্দ্রিয়নিচয় অনেক সময় ভুল তথ্য সরবরাহ করে। (১৩) মানুষ অনেক সময় বুঝতে পারে যে, ইন্দ্রিয়নিচয় তাকে ভুল তথ্য সরবরাহ করছে। (১৪) মানুষের ভিতরে এমন একটি ইন্দ্রিয়বহির্ভূত শক্তি রয়েছে যা ইন্দ্রিয়ের ভুল সম্পর্কে নিশ্চিত হতে পারে।

অতএব, দেখা যাচ্ছে, সকল বিষয়ে না হলেও অনেক বিষয়ে মানুষ অকাট্য জ্ঞানের অধিকারী হতে পারে। আরো উদাহরণ দিতে গেলে এ তালিকা অনেক দীর্ঘ হয়ে যাবে। কিন্তু সমস্যা হচ্ছে এই যে, মানুষের পক্ষে 'অনেক' বিষয়ে (সকল বিষয়ে নয়) সঠিক জ্ঞানের অধিকারী হওয়ার সম্ভাবনা থাকার মানে হচ্ছে 'অনেক' বিষয়ে ভুল জ্ঞান অর্জিত হওয়ার সম্ভাবনাও রয়েছে। এমতাবস্থায় এমন কোনো প্রক্রিয়া বা পথ থাকা প্রয়োজন যা সকল বিষয়ে, বা অন্ততঃ গুরুত্বপূর্ণ বিষয়সমূহের ক্ষেত্রে মানুষের জন্য সঠিক জ্ঞান প্রাপ্তিকে নিশ্চিত করবে অথবা সঠিক জ্ঞান উদঘাটনের কৌশলকে তার আয়ত্তে এনে দেবে। প্রশ্ন হচ্ছে, এমন কোনো প্রক্রিয়া বা পথ আছে কি? যদি থেকে থাকে, তো কী সে প্রক্রিয়া বা পথ? কীভাবে আমরা জীবনজিজ্ঞাসার সঠিক জবাব পেতে পারি এবং ভুল জবাবগুলোকে ভুল জবাব হিসেবে চিহ্নিত করতে পারি?

এ প্রশ্নের জবাব পেতে হলে আমাদেরকে সবগুলো জ্ঞান- উৎস ও জ্ঞানার্জনের মাধ্যমকে বিশ্লেষণ করতে হবে।

সবগুলো জ্ঞান- উৎস ও জ্ঞানার্জনের মাধ্যমকে বিশ্লেষণ করলে আমরা এগুলোকে মোট চার ভাগে ভাগ করতে পারি।

এ ক্ষেত্রে প্রথমেই বিবেচনায় আসে অভিজ্ঞতা ও পরীক্ষামূলক বিজ্ঞান থেকে ল   জ্ঞান। অভিজ্ঞতা এবং এই অভিজ্ঞতারই উন্নততম সংস্করণ পরীক্ষামূলক বিজ্ঞান বা বস্তুবিজ্ঞান আমাদেরকে জীবনজিজ্ঞাসার জবাব দানে সক্ষম নয়। কারণ, প্রথমতঃ অভিজ্ঞতা এবং পরীক্ষামূলক বিজ্ঞান বা বস্তুবিজ্ঞান ইন্দ্রিয়জ পর্যবেক্ষণের ওপর নির্ভরশীল। আর ইন্দ্রিয়নিচয় সব সময় নির্ভুল তথ্য সরবরাহ করে না। এ কারণে, জীবন ও জগতের অন্তরালে নিহিত রহস্য উদঘাটন করা তো দূরের কথা, ইন্দ্রিয়নিচয় অন্য কোনো জ্ঞান- আহরণ মাধ্যমের সাহায্য ছাড়া শুধু বস্তুজগত সম্পর্কেও সঠিক জ্ঞান সরবরাহের নিশ্চয়তা দিতে পারে না।

দ্বিতীয়তঃ মৌলিক জীবনজিজ্ঞাসাসমূহের বিষয়বস্তু কোনো বস্তুজাগতিক বিষয় নয়। এ কারণে, না তা ইন্দ্রিয়ের দ্বারা পর্যবেক্ষণ করা সম্ভব, না পরীক্ষাগারে এতদসংক্রান্ত তথ্যাদির সত্যাসত্য পরীক্ষা করা সম্ভব। সৃষ্টিকর্তা আছেন অথবা নেই - এর কোনোটাই ইন্দ্রিয়নিচয় বলতে সক্ষম

নয়। তেমনি মানুষের গোটা শরীর পরীক্ষাগারে বিশ্লেষণ করে জবাব পাওয়া যাবে না যে, তার মধ্যে আত্মার অস্তিত্ব আছে অথবা নেই। অতএব, বস্তুবিজ্ঞান আমাদেরকে বস্তুসংক্রান্ত অনেক জ্ঞান (অবশ্য অন্যান্য জ্ঞানমাধ্যমের সহায়তায়) দিতে সক্ষম হলেও জীবনজিজ্ঞাসার জবাবদানে সক্ষম নয়।

দ্বিতীয় একটি জ্ঞানমাধ্যম হচ্ছে পূর্ববর্তীদের রেখে যাওয়া জ্ঞানভাণ্ডার যাকে এক কথায় - علوم نقلی ('উলূমে নাক্বলী - transferable knowledge - উদ্ধৃতিযোগ্য জ্ঞানবলে অভিহিত করা যেতে (পারে। এর মধ্যে ইতিহাস, রা বিজ্ঞান, সাহিত্য, ধর্ম, দর্শন, যুক্তিবিজ্ঞান, ভাষাতত্ত্ব, জ্ঞানতত্ত্ব এবং অন্যদের অভিজ্ঞতা, অনুভূতি ও পরীক্ষানিরীক্ষা ইত্যাদি সকল বিষয়েরই কথিত - বা লিখিত বিবরণ ও উপসংহার অন্তর্ভুক্ত।

উদ্ধৃতিযোগ্য জ্ঞানসমূহের মধ্যে বিশেষভাবে দর্শন ও ধর্মসমূহ জীবনজিজ্ঞাসার জবাব দেয়ার চেষ্টা করেছে। কিন্তু এ সব জ্ঞানসূত্রের মাধ্যমে মৌলিক জীবনজিজ্ঞাসাসমূহের জবাব উদঘাটনের পথে কতগুলো কঠিন সমস্যা দেখা দেয়। এ ক্ষেত্রে বড় সমস্যা হচ্ছে, বিভিন্ন ধর্ম ও দর্শন এ সব প্রশ্নের বিভিন্ন জবাব দিয়েছে। স্রষ্টার সংজ্ঞা, সংখ্যা, গুণাবলী, স্বরূপ, আত্মার সংজ্ঞা ও স্বরূপ, স্রষ্টা ও মানুষের মধ্যকার সম্পর্ক ইত্যাদি প্রশ্নে বিভিন্ন ধর্ম ও দর্শন বিভিন্ন জবাব দিয়েছে। এ সব জবাবের মধ্যে কতগুলো ক্ষেত্রে কোনো কোনো ধর্ম ও দর্শন অপর কোনো কোনো ধর্ম ও দর্শনের সাথে অভিন্ন জবাব দিলেও অধিকাংশ ক্ষেত্রেই তাদের জবাবের মধ্যে পারস্পরিক বিভিন্নতাই শুধু নয়, বরং বৈপরীত্যও দেখা যায়। শুধু তা- ই নয়, এমনকি অনেক ক্ষত্রে একই ধর্মের বিভিন্ন সূত্র একই প্রশ্নের বিভিন্ন জবাব দিয়েছে। তাছাড়া বিশেষ করে ধর্মীয় জবাবের ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট জবাব যে সব ব্যক্তির নিকট থেকে প্রাপ্ত বলে দাবী করা হয়েছে তাঁদের ঐতিহাসিকতা, গ্রহণযোগ্যতা এবং তাঁদের দেয়া জবাব নির্ভুলভাবে বর্তমান প্রজন্ম পর্যন্ত পৌঁছার বিষয়টি সুনিশ্চিত নয়। তারপর কথা হচ্ছে, একই প্রশ্নের ক্ষেত্রে বিভিন্ন ধর্মীয় সূত্র যে পরস্পর বিরোধী বিভিন্ন জবাব দিয়েছে তা গ্রহণ- বর্জনের মানদণ্ড কী?

অতএব, দেখা যাচ্ছে, ধর্মীয় বা দার্শনিক জ্ঞানসূত্রসমূহ জীবনজিজ্ঞাসাসমূহের যে সব জবাব দিয়েছে তা গ্রহণ- বর্জনের জন্য অন্য কোনো জ্ঞানমাধ্যমের দ্বারা পরীক্ষা- নিরীক্ষা ও যাচাই- বাছাইয়ের প্রয়োজন রয়েছে।

জ্ঞানার্জনের, বিশেষতঃ জীবনজিজ্ঞাসার জবাব প্রাপ্তির তৃতীয় মাধ্যমটি হচ্ছে জ্ঞানের স্বতঃপ্রকাশিত হবার প্রক্রিয়া। 'ইরফানী (আধ্যাত্মিক) ধারাও এ পর্যায়ের। কোনোরূপ পার্থিব কারণ ছাড়াই যেভাবে হঠাৎ করে কারো মস্তিষ্কে একটি বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার খেলে যায়, ঠিক সেভাবেই কারো নির্মল অন্তঃকরণে জীবনজিজ্ঞাসাসমূহের এক ধরনের জবাব ধরা পড়ে যেতে পারে। কিন্তু এর দ্বারা আমাদের সমস্যার সমাধান হতে পারে না। কারণ, এটা কোনো সর্বজনীন জ্ঞানমাধ্যম নয় এবং এর যথার্থতা সম্বন্ধে নিশ্চিত হওয়ার কোনো সর্বজনীন পার্থিব পন্থা জানা নেই। এ ধরনের অনর্জিত ও ইন্দ্রিয়াতীত মাধ্যম ল জ্ঞান বস্তুবিজ্ঞান বিষয়ক হলে তার যথার্থতা অভিজ্ঞতা দ্বারা বা পরীক্ষাগারে পরীক্ষা করে দেখা যেতে পারে, কিন্তু তা জীবনজিজ্ঞাসার জবাব বিষয়ক হলে তার যথার্থতা অভিজ্ঞতা দ্বারা বা পরীক্ষাগারে পরীক্ষা করে দেখা সম্ভব নয়। অন্যদিকে যে কেউ চাইলে এবং চেষ্টা করলেই তার অন্তরে জীবন ও জগতের মহাসত্যসমূহ সংক্রান্ত প্রশ্নের জবাব ধরা দেবেই তার কোনো নিশ্চয়তা নেই। তেমনি এরূপ জ্ঞানের প্রকৃত উৎস কী এবং সে উৎস সঠিক কিনা - এ প্রশ্ন থেকে যায়। কারণ, এটা ব্যক্তির সচেতন চিন্তাচেতনার অবচেতন প্রভাবজাতও হতে পারে। অন্যদিকে যার নিকট এ জ্ঞান উদ্ভাসিত হয়েছে তিনি এ ব্যাপারে যে পর্যায়ের নিশ্চয়তার অধিকারী তাঁর নিকট থেকে যারা শুনবে তাদের পক্ষে ত প নিশ্চয়তার অধিকারী হওয়া সম্ভব নয়। ফলে তাদের জ্ঞান অকাট্য পর্যায়ের হবে না। তাছাড়া এরূপ ব্যক্তির দাবীর সত্যাসত্য সম্পর্কে নিশ্চিত হবার প্রয়োজন রয়েছে। আর তা হতে হলে অন্য কোনো জ্ঞানমাধ্যমের সাহায্য নিতে হবে।

বস্তুতঃ কারো কাছে যে জ্ঞান স্বতঃপ্রকাশিত হয় অন্যদের জন্য তাঁর সে জ্ঞান এক ধরনের ধর্মীয় জ্ঞান বৈ নয়, লোকেরা যা তাদের দৃষ্টিতে নির্ভরযোগ্য বলে পরিগণিত লোকদের নিকট থেকে গ্রহণ করে থাকে। এখানে আরো স্মরণীয় যে, এভাবে অন্তরে জীবন ও জগতের মহাসত্য ধরা

পড়ার বিষয়টি (ইলহাম্ বা কাশফ্) সাধারণতঃ সুদীর্ঘ কাল ব্যাপী ধর্মীয় জীবন যাপন ও বিশেষ 'ইরফানী (আধ্যাত্মিক) প্রক্রিয়ায় সাধনার ফলশ্রুতি হয়ে থাকে। সে হিসেবে তা ধর্মীয় জ্ঞানেরই পর্যায়ভুক্ত বা তার একটা প্রধান শাখা মাত্র, অন্যদের জন্য যার গ্রহণযোগ্যতা পরীক্ষা- নিরীক্ষার মুখাপেক্ষী।

চতুর্থ জ্ঞানমাধ্যমটি হচ্ছে বিচারবুদ্ধি ('আক্বল্)। আসলে বিচারবুদ্ধি হচ্ছে মানুষের ব্যক্তিসত্তায় নিহিত এমন একটি শক্তি যা একই সাথে জ্ঞানের উৎস এবং অন্যান্য জ্ঞানসূত্র থেকে প্রাপ্ত তথ্যাদির সত্যাসত্য পরীক্ষাকারী ও সে সবের মধ্যে সমন্বয়সাধনকারী।

বস্তুতঃ 'জ্ঞান' বিষয়টি পুরোপুরিভাবেই বিচারবুদ্ধির সাথে সম্পৃক্ত। ইন্দ্রিয়নিচয় মানুষকে যে সব তথ্য সরবরাহ করে বিচারবুদ্ধি তা বিশ্লেষণ করে সত্য, মিথ্যা, ঠিক, ভুল, মিশ্রিত, বিভ্রান্তিকর, মায়া ইত্যাদি বিভিন্ন বিশেষণে বিশেষিত করে। শুধু বস্তুবিজ্ঞানই নয়, বরং ব্যক্তিগত কাশফ্ বা ইলহাম্ বা ওয়াহী বাদে পুরো ধর্মীয় জ্ঞানই ইন্দ্রিয়ের মাধ্যমে (শ্রবণ ও পঠনের মাধ্যমে) সংগৃহীত হয়ে থাকে। কিন্তু তার গ্রহণ- বর্জন ঘটে বিচারবুদ্ধির দ্বারা।

বিশেষ করে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি বিষয় হচ্ছে এই যে, ইন্দ্রিয়নিচয়ের কাজ একমুখী অর্থাৎ শুধু তথ্য সরবরাহ করা। তার সত্যাসত্য যাচাই করা বা অন্য তথ্যের সাথে তার তুলনা করে তৃতীয় কোনো সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া ইন্দ্রিয়নিচয়ের কাজ নয়। বরং বিচারবুদ্ধিই এ সব তথ্য বিশ্লেষণ করে উপসংহারে উপনীত হয়।

বিচারবুদ্ধি যে ইন্দ্রিনিচয়ের দেয়া তথ্যাদি বিশ্লেষণ করে শুধু তা- ই নয়, বরং স্বয়ং জ্ঞানের উৎসও বটে। কারণ, ইন্দ্রিয়নিচয়ের সাহায্য ছাড়াই বিচারবুদ্ধি স্বীয় অস্তিত্ব অনুভব করে এবং ইন্দ্রিয়ের ওপরে স্বীয় শ্রেষ্ঠত্ব সম্পর্কে নিশ্চিত হয়। বিচারবুদ্ধি বস্তুসম্পর্কহীন- ভাবে বহু অকাট্য জ্ঞান অর্জন করে। যেমন, বিচারবুদ্ধি বলে: অভিন্ন স্থান- কালে কোনো জিনিস আছে এবং নেই - দুইই সত্য হতে পারে না, যে কোনো সমগ্রের অংশ ঐ সমগ্র হতে ক্ষুদ্রতর হতে বাধ্য, কারণ ছাড়া কোনো কার্য ঘটে না, দুই যোগ দুই (দুই বস্তু যোগ দুই বস্তু নয়) সমান চার, জ্যামিতিক বিন্দু ও রেখা কোনো জায়গা দখল করে না, কোনো ফলশ্রুতি যে কারণ থেকে উদ্ভূত সে

কারণটি ঐ ফলশ্রুতি থেকে উদ্ভূত হতে পারে না, পরিবর্তনশীল বস্তুজগতের আদি উৎস অবশ্যই পরিবর্তনশীলতা থেকে মুক্ত হতে হবে; যার অস্তিত্ব নেই বস্তুর ওপরে তা প্রতিক্রিয়া করতে পারে না, যেহেতু মানুষ অবস্তুগত সত্তা নিয়ে বিতর্ক করে, অতএব, তা আছে, নইলে তা আছে বলে তার মনে হতো না অর্থাৎ আছে বলেই তা মানুষের মনে প্রতিক্রিয়া করেছে, ইত্যাদি।

মোদ্দা কথা, বিচারবুদ্ধি স্বয়ং জ্ঞানের উৎস এবং অন্যান্য জ্ঞানসূত্রের সত্যাসত্য বিচারকারী। অবশ্য বিভিন্ন কারণে বিচারবুদ্ধি ভুল করতে পারে, তবে বিচারবুদ্ধির বিশ্লেষণেই সে ভুল ধরা পড়ে ও সংশোধিত হয়। এমতাবস্থায় জীবন ও জগতের মহাসত্য সংক্রান্ত জিজ্ঞাসাসমূহের সঠিক জবাব পেতে হলে স্বয়ং বিচারবুদ্ধির কাছ থেকে জবাব শুনতে হবে এবং অন্যান্য সূত্রে প্রাপ্ত জবাবসমূহকেও বিচার- বিশ্লেষণের জন্য বিচারবুদ্ধির সামনে পেশ করতে হবে।

জীবন জিজ্ঞাসাঃ বিচারবুদ্ধির জবাব

মানুষ, অন্যান্য প্রাণীপ্রজাতি, উদ্ভিদরাজি ও মহাকাশের জ্যোতিষ্কনিচয় সহ এই যে সুবিশাল বিশ্বলোক স্বীয় অস্তিত্ব নিয়ে বিরাজ করছে এর পিছনে কোনো অস্তিত্বদাতা আছেন কি? এ হচ্ছে এমন একটি প্রশ্ন যা এড়িয়ে যাওয়া বিচারবুদ্ধিসম্পন্ন কোন মানুষের পক্ষেই সম্ভব নয়। আর এর জবাব হবে হয় 'হ্যা' অথবা 'না'; এর বাইরে তৃতীয় কোন জবাব হতে পারে না।

উপরোক্ত প্রশ্নের জবাবে কেউ হয়তো বলবে: "আমি জানি না।" কিন্তু এ প্রশ্নটি মানুষের জন্য এতোই গুরুত্বপূর্ণ যে, এর জবাবের ওপর তার গোটা জীবনের কর্মনীতি ও কর্মধারা নির্ভর করছে। অতএব, এর জবাবে "জানি না" বলে পাশ কাটিয়ে যাওয়ার কোনোই উপায় নেই। বরং অন্য যে কোনো কাজের আগে, এমনকি বেঁচে থাকার জন্যে অপরিহার্য দৈনন্দিন মামুলি কাযকর্মেরও আগে, এ প্রশ্নের সঠিক জবাব সন্ধান ও উদঘাটন করা অপরিহার্য।

অবশ্য যারা মুখে "জানি না" বলে পাশ কাটিয়ে যাবার চেষ্টা করে কর্মনীতি ও কর্মধারার দিক থেকে তারা "না" জবাব- দানকারীদেরই দলভুক্ত। কারণ, এ প্রশ্নের "হ্যা" জবাব দিলে এরপর আরো অনেক প্রশ্নের উদয় হয় এবং সেগুলোরও সঠিক জবাব সন্ধান ও উদঘাটন করা অপরিহার্য

হয়ে পড়ে। তাছাড়া "হ্যা" জবাবদানের সাথে সাথেই বিশ্বলোকের অস্তিত্বদাতার সাথে তার ("হ্যা" জবাবদানকারীর) সম্পর্ক নির্ণয় করা এবং তার ভিত্তিতে বহু দায়িত্ব পালন অপরিহার্য হয়ে পড়ে। অন্যদিকে "না" জবাব দেয়া হলে এতদসংক্রান্ত প্রশ্নের এখানেই সমাপ্তি; অতঃপর আর কোনো দায়িত্ব থাকে না। কারণ, স্রষ্টা না থাকলে স্রষ্টার প্রতি এবং স্রষ্টার কাছে জবাবদিহি করার ভয়ে সৃষ্টির প্রতি দায়িত্ব পালনের প্রশ্নই ওঠে না। তেমনি যারা 'জানি না' বলে আর জানার চেষ্টাও করে না, তাদের জন্যও নতুন কোনো প্রশ্ন থাকে না। ফলতঃ এই দুই দল লোক চিন্তার দিক থেকে পরস্পর কিছুটা স্বত হলেও বাস্তব আচরণ ও কর্মনীতি- কর্মধারার দিক থেকে পরস্পর অভিন্ন।

ঠিক হোক বা ভুল হোক, উক্ত প্রশ্নের যদি একটিমাত্র জবাব পাওয়া যেতো; হয় শুধু 'হ্যা' অথবা শুধু 'না' জবাব পাওয়া যেতো, তাহলেও অন্ততঃ মানুষের পক্ষে নিশ্চিন্ত থাকার একটা উপায় হতো। কিন্তু যেহেতু এ প্রশ্নের দু'টি জবাব দেয়া হয়েছে এবং দু'টি জবাব পরস্পরের বিপরীত - 'হ্যা' এবং 'না', সেহেতু এ বিতর্কের ফয়সালা অপরিহার্য। কিন্তু কে করবে এর ফয়সালা? এজন্য এমন একজন ফয়সালাকারীর দ্বারস্থ হতে হবে যাকে মেনে নেয়া উভয় পক্ষের জন্যই সমানভাবে সম্ভব। এমন একমাত্র ফয়সালাকারী হচ্ছে বিচারবুদ্ধি (عقل)।

জীবনজিজ্ঞাসার জবাবদানের জন্য যতোগুলো জ্ঞানসূত্র এগিয়ে এসেছে তার মধ্যে একমাত্র বিচারবুদ্ধি ছাড়া আর কোনোটিরই সর্বজনীন গ্রহণযোগ্যতা নেই। এর মানে অবশ্য এ নয় যে, বিচারবুদ্ধির বাইরে সত্য উদঘাটনের জন্য আর কোনো মাধ্যম নেই বা থাকতে পারে না; অবশ্যই থাকতে পারে বা আছে। কিন্তু সমস্যা হচ্ছে, সে সব জ্ঞানসূত্র বা মাধ্যমের সর্বজনীন গ্রহণযোগ্যতা নেই; সে সবের সর্বজনীন গ্রহণযোগ্যতা থাকলে অন্ততঃ জীবন ও জগৎ সংক্রান্ত মৌলিক প্রশ্নসমূহের জবাবের ক্ষেত্রে মতপার্থক্যের সৃষ্টি হতো না। তাই জীবনজিজ্ঞাসাসমূহের ক্ষেত্রে বিভিন্ন জ্ঞানসূত্র বা মাধ্যম কর্তৃক প্রদত্ত সকল জবাবকে পরীক্ষা- নিরীক্ষার জন্যে বিচারবুদ্ধির আদালতে পেশ করা ছাড়া গত্যন্তর নেই।

অবশ্য এমন অনেক লোকও রয়েছেন যারা বিচারবুদ্ধির যোগ্যতা ও এর রায়ের গ্রহণযোগ্যতা সম্পর্কে প্রশ্ন তোলেন। তাঁরা বিচারবুদ্ধির ভুল, দ্বন্দ্ব ও স্ব- বিরোধিতা প্রদর্শনের চেষ্টা করেন। নিঃসন্দেহে বিচারবুদ্ধিও ভুলের উর্ধে নয়। কিন্তু মজার ব্যাপার হচ্ছে, যারা বিচারবুদ্ধিকে সালিস মানার বিরোধিতা করছেন তাঁরা কিন্তু বিচারবুদ্ধির অশ্রয় নিয়েই এ কাজ করছেন। কারণ, তাঁরা এ ক্ষেত্রে যুক্তিতর্ক ও বিচারবিশ্লেষণের আশ্রয় নিচ্ছেন। তাহলে দেখা যাচ্ছে যে, বিচারবুদ্ধি ভুল করলে তা- ও বিচারবুদ্ধির কাছেই ধরা পড়ে। 'ক'- এর বিচারবুদ্ধি সঠিক মনে করে যে রায় দিয়েছে 'খ'- এর বিচারবুদ্ধি বিচার- বিশ্লেষণ করে তার ভুল ধরিয়ে দিচ্ছে। কিন্তু শেষ পর্যন্ত ভুলটি ধরা পড়ে যাচ্ছে এবং তা বিচারবুদ্ধির কাছেই ধরা পড়ে যাচ্ছে। এখানেই অন্যান্য জ্ঞানসূত্রের তুলনায় বিচারবুদ্ধির শ্রেষ্ঠত্ব। কারণ, ঐসব জ্ঞানসূত্র গ্রহণকারীরা বিচারবুদ্ধির আশ্রয় নিয়েই তাঁদের নিজেদের সমর্থিত জ্ঞানসূত্রসমূহের গ্রহণযোগ্যতা ও অন্যদের সমর্থিত জ্ঞানসূত্রসমূহের অগ্রহণযোগ্যতা প্রমাণ করার চেষ্টা করেন। আবার তাঁদের প্রতিপক্ষও তাঁদের সমর্থিত জ্ঞানসূত্রসমূহ প্রত্যাখ্যান ও নিজেদের সমর্থিত জ্ঞানসূত্রসমূহের গ্রহণযোগ্যতা বিচারবুদ্ধির মানদণ্ডের সাহায্যেই প্রমাণের চেষ্টা করেন। এভাবে তাঁরা সকলেই নিজেদের অজ্ঞাতসারেই স্বীয় সমর্থিত জ্ঞানসূত্রসমূহের গ্রহণযোগ্যতা বিচারের জন্য মানদণ্ড বা বিচারক হিসেবে বিচারবুদ্ধিকে 'কার্যতঃ' মেনে নেন। অন্যদিকে বিচারবুদ্ধি যদি কখনো ভুল করে তখন সে অন্য কারো দ্বারস্থ হয় না, বরং নিজেই নিজের ভুল চিহ্নিত করে। যদিও হতে পারে যে, একজনের বিচারবুদ্ধির ভুল আরেক জনের বিচারবুদ্ধির কাছে ধরা পড়ছে, কিন্তু যখন তা অকাট্যভাবে ভুল বলে প্রমাণিত হচ্ছে তখন প্রথমোক্ত ব্যক্তির বিচারবুদ্ধিও তা গ্রহণ করে নেয়।

যা- ই হোক, অন্যান্য জ্ঞানসূত্র জীবনজিজ্ঞাসার যে জবাব দিয়েছে তা যেহেতু অভিন্ন নয় এবং তার কোনোটাই সর্বজনীনভাবে গ্রহণযোগ্য প্রমাণিত হয় নি সেহেতু বাধ্য হয়ে আমাদেরকে বিচারবুদ্ধির নিকট থেকেই ফয়সালা নিতে হবে।

এখানে প্রথমেই একটি কথা স্মরণ করিয়ে দেয়া প্রয়োজন, তা হচ্ছে, মানবসভ্যতার অগ্রগতির সাথে সাথে জ্ঞান- বিজ্ঞানের অসংখ্য শাখা- প্রশাখার বিকাশ ও বিস্তার ঘটেছে। জ্ঞান- বিজ্ঞানের এ

সব শাখা- প্রশাখা প্রতিনিয়তই আমাদেরকে অসংখ্য বিষয়ে সঠিক ও ভুল উভয় ধরনের ধারণা দিচ্ছে। কিন্তু ভুল ধারণাগুলোকেও অনেকেই সঠিক বলে ধরে নিচ্ছে। তেমনি সামাজিক, পারিবারিক, রাজনৈতিক, ধর্মীয়, সাংস্কৃতিক ও প্রতিষ্ঠানিক শিক্ষা আমাদেরকে একইভাবে অসংখ্য সঠিক ও ভুলের মিশ্রণ গলাধঃকরণ করাচ্ছে। আর এ মিশ্রণের দ্বারা আমাদের বিচারবুদ্ধিও অনেকখানি প্রভাবিত হয়ে পড়ছে। অবশ্য বিচারবুদ্ধির বৈশিষ্ট্য হচ্ছে এই যে, তার ভুলকে ধরিয়ে দেয়া হলে সে বুঝতে পারে যে, এটা ভুল (যদিও কোনো বিশেষ স্বার্থের কারণে ব্যক্তি মুখে তা স্বীকার না- ও করতে পারে, কিন্তু অন্তরে 'ঠিক'কে 'ঠিক' বলে ও 'ভুল'কে 'ভুল' বলে জানবেই)। তবে যে নির্মল ও সুস্থ বিচারবুদ্ধি কোনোরূপ জটিল ভ্রান্ত জ্ঞানের পর্দা দ্বারা আবৃত হয় নি সে যেরূপ সহজেই 'সঠিক' ও 'ভুল' নির্ণয় করতে পারে ভ্রান্ত জ্ঞানের পর্দায় আবৃত বিচারবুদ্ধি ততো সহজে তা পারে না। বরং অসংখ্য নতুন নতুন সংশয় ও প্রশ্ন এসে তাকে সত্য থেকে দূরে সরিয়ে রাখে। এ কারণেই এ ধরনের বিচারবুদ্ধির সামনে বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে সত্যকে উপস্থাপন করা অপরিহার্য। অর্থাৎ শুধু মূল প্রশ্নের সঠিক জবাব দেয়াই যথেষ্ট নয়, বরং সংশয়ের পর্দা ছিন্ন করাও অপরিহার্য। অন্য কথায় বলা চলে, বিচারবুদ্ধিকে প্রতিটি ব্যক্তির অবস্থা বিবেচনা করে তার সামনে জীবনজিজ্ঞাসার জবাব পেশ করতে হবে। অর্থাৎ প্রত্যেক ব্যক্তিকে তার জন্যে সহজবোধগম্য করে জবাব দিতে হবে।

এবার আমরা বিচারবুদ্ধির আলোকে জীবনজিজ্ঞাসার জবাব সন্ধান করব।

জীবনজিজ্ঞাসার জবাব দিতে গিয়ে বিচারবুদ্ধি প্রথমেই আমাদেরকে একটি কর্মনীতি অনুসরণের জন্যে নির্দেশ প্রদান করে, তা হচ্ছে সতর্কতার কর্মনীতি। আস্তিক- নাস্তিক নির্বিশেষে প্রতিটি মানুষই সতর্কতার কর্মনীতিকে গ্রহণযোগ্য মনে করে। অর্থাৎ সকলেই সংশয়ের ক্ষেত্রে সতর্কতা অবলম্বন করে। যেমন: কেউ যদি বলে যে, 'এ গ্লাসের পানিতে বিষ মেশানো আছে', তখন এ কথার সত্যাসত্য সম্বন্ধে নিশ্চিত হওয়া সম্ভব না হলেও পিপাসার্ত ব্যক্তি সতর্কতার কারণে ঐ পানি পান করা থেকে বিরত থাকে। তেমনি পরিচয়পত্রবিহীন কোনো ব্যক্তি যদি প্রথম বারের মত অন্য কোনো দেশে যাবার জন্যে প্রস্তুতি নেয় এবং তখন যদি তাকে কেউ বলে যে, 'পরিচয়পত্র

ছাড়া কেউ ঐ দেশে প্রবেশ করলে তাকে গ্রেফতার ও কারারুদ্ধ করা হয়', সে ক্ষেত্রে ঐ কথার সত্যাসত্য যাচাই করা সম্ভব না হলেও ঐ ব্যক্তি সতর্কতার কারণে পরিচয়পত্র ছাড়া ঐ দেশে গমন করা থেকে বিরত থাকে এবং সেখানে গমনের জন্যে পরিচয়পত্র সংগ্রহ করে। ইতিবাচক তথ্যের ক্ষেত্রেও তা-ই। মরুভূমিতে পানিবিহীন কোনো ব্যক্তিকে যদি কেউ বলে যে, অমুক দিকে এতোদূর গেলে পানি পাওয়া যাবে সে ক্ষেত্রে এ তথ্যের সত্যাসত্য যাচাই করা সম্ভব না হলেও সে ঐদিকে ছুটে যায়। তেমনি ক্ষুধার্ত ভিক্ষুককে যদি বলা হয় যে, আজ অমুক সময় অমুক ঠিকানায় কাঙ্গালী ভোজ হবে তাহলে এ তথ্যের সত্যাসত্য যাচাই করা সম্ভব না হলেও ক্ষুধার্ত ভিক্ষুক খাদ্যের আশায় সেখানে চলে যায়। আমাদের জীবন থেকে এ ধরনের অসংখ্য দৃষ্টান্ত মিলবে।

জীবনজিজ্ঞাসার ক্ষেত্রেও বিচারবুদ্ধি আমাদেরকে প্রথমতঃ সতর্কতার কর্মনীতি অনুসরণের নির্দেশ দেয়, তা হচ্ছে, বিচারবুদ্ধি বলে: এ জীবন ও জগতের পিছনে যদি কোনো অস্তিত্বদাতা শক্তি থাকেন তো অবশ্যই তাঁর নিকট নিজেকে দায়িত্বশীল গণ্য করে জীবনপথে পথ চলা ব্যক্তিদের জন্য অপরিহার্য, অন্যথায় ব্যক্তির জন্য বিপর্যয় অনিবার্য। এখন পরিস্থিতি যদি এরূপ হয় যে, আসলেই এরূপ কোনো সত্তার অস্তিত্ব নেই, সে ক্ষেত্রে যে ব্যক্তি অযথাই এরূপ সত্তার অস্তিত্ব আছে মনে করে দায়িত্বশীল জীবনযাপন ও আচরণ করলো এবং যে ব্যক্তি এরূপ সত্তার অস্তিত্ব নেই মনে করে দায়িত্বহীন জীবনযাপন ও আচরণ করলো এতদুভয়ের শেষ পরিণতিতে কোনোই পার্থক্য ঘটবে না; মৃত্যু উভয়ের অস্তিত্বের ওপর অনস্তিত্বের পর্দা টেনে দেবে এবং উভয়ের জন্যই লাভ-ক্ষতি অর্থহীন হয়ে যাবে। অর্থাৎ যে ব্যক্তি সৃষ্টিকর্তা না থাকা সত্ত্বেও আছে মনে করে দায়িত্বশীল জীবনযাপন ও আচরণ করেছে তা তাকে ক্ষতিগ্রস্ত করে নি; সে ভুলবশতঃ পার্থিব জীবনের অনেক ভোগ-আনন্দ থেকে নিজেকে বঞ্চিত করলেও তাতে তার আদৌ কোনো ক্ষতি হয় নি। কারণ, অনন্ত কালের তুলনায় এ পার্থিব জীবনকাল মহাসমুদ্রের তুলনায় বারিবিন্দুর সমতুল্যও নয়, বরং তার চেয়েও অকিঞ্চিৎকর। এহেন মূল্যহীন জীবনের ভোগ-আনন্দেরও আদৌ কোনো মূল্য নেই, বিশেষ করে যখন এ ভোগ-আনন্দের জন্যে অনেক ক্ষেত্রেই দুঃখ-

কষ্ট ও ব্যথাবেদনার ঝুঁকি নিতে হয়। তাই মৃত্যুতেই যে জীবনের চিরপরিসমাপ্তি, প্রাকৃতিক মৃত্যুর জন্যে অপেক্ষা না করে সে জীবনকে বরং এখনি শেষ করে দেয়াই উত্তম।

কিন্তু প্রকৃতই যদি এ জীবন ও জগতের পিছনে কোনো স্রষ্টাসত্তা থেকে থাকেন তাহলে মৃত্যুতে এ জীবনের চিরপরিসমাপ্তি ঘটার কোনোই নিশ্চয়তা নেই। কারণ, এরূপ সত্তা - যিনি শূন্য থেকে সবকিছু সৃষ্টি করতে পেরেছেন, তাঁর পক্ষে ব্যক্তিদের জন্যে পার্থিব মৃত্যুর পরে নতুন ধরনের কোনো জীবনের ব্যবস্থা রাখা অসম্ভব কিছু নয়। সে ক্ষেত্রে যে ব্যক্তি দায়িত্বশীল জীবনযাপন ও আচরণ করেছে সে ব্যক্তি তার নতুন ধরনের জীবনে কোনোরূপ বিপদের সম্মুখীন হবে না। অন্যদিকে যে ব্যক্তি সৃষ্টিকর্তা নেই মনে করে দায়িত্বহীন জীবনযাপন ও আচরণ করেছে তার জন্যে ভয়াবহ বিপর্যয়কর অনন্ত জীবন অপেক্ষা করছে। এমতাবস্থায় বিচারবুদ্ধির পথনির্দেশ হচ্ছে, অনিশ্চয়তা ও সংশয়ের ক্ষেত্রে সতর্কতার কর্মনীতি অনুসরণ করতে হবে; সম্ভাব্য ভয়াবহ বিপর্যয় এড়ানোর লক্ষ্যে দায়িত্বশীল জীবনযাপন ও আচরণ করতে হবে।

তবে বিচারবুদ্ধি আমাদেরকে শুধু সতর্কতার কর্মনীতি অনুসরণেরই নির্দেশ দেয় না, বরং জীবনজিজ্ঞাসার অকাট্য জবাবও প্রদান করে। বিচারবুদ্ধি জীবনজিজ্ঞাসার জবাব কয়েকভাবে প্রদান করে থাকে।

বিচারবুদ্ধি জীবনজিজ্ঞাসার যে সব জবাব প্রদান করে তার মধ্যে এক ধরনের জবাব অত্যন্ত সহজ- সরল যা জ্ঞানী- মূর্খ যে কারো জন্যে সহজবোধগম্য। তা হচ্ছে: আমি ছিলাম না, কিন্তু আছি, অতএব, নিঃসন্দেহে আমার কোনো স্রষ্টা আছেন।

যে কোনো নির্মলজবাব গ্রহণ করতে বাধ্য। কিন্তু যে ব্যক্তির বিচারবুদ্ধির নিষ্কলুষ বিচারবুদ্ধিই এ - -ওপর ভ্রান্ত জ্ঞানের আবরণ পড়েছে সে এতে তৃপ্ত হয় না। তাই সে এ ব্যাপারে নানা ধরনের পার্শ্ব প্রশ্ন তুলতে পারে। যে সব তথ্যের অকাট্যতা নিশ্চিত নয় তাকে অকাট্য ধরে নিয়ে তার ভিত্তিতেও সে প্রশ্ন উত্থাপন করে থাকে। উদাহরণস্বরূপ, বস্তুবাদীদের দাবী হচ্ছে, গোটা বিশ্বলোকে শুধু বস্তুই আছে; আর কিছুই নেই। তাদের মতে, বস্তুজগতের সূচনার পূর্বে 'স্রেফ বস্তু' (absolute matter) বা 'নির্গুণ বস্তু' অর্থাৎ কোনো বিশেষ আকারআকৃতি -, গঠনমিশ্রণ বা -

বস্তুধর্ম বিহীন বস্তু বিরাজমান ছিল যৌগিকতা বিহীন ও গুণাবলী বা প্রাকৃতিক, পরে এক সময় 'ঘটনাক্রমে' (accidentally) তাতে আলোড়ন বা বিস্ফোরণের ফলে গতিসঞ্চারের মাধ্যমে সৃষ্টির সূচনা হয় এবং বস্তুর ক্রিয়াপ্রতিক্রিয়ায় ক্রমান্বয়ে বিভিন্ন ধরনের বস্তুনিচয়, বিশ্বজগৎ ও প্রজাতিসমূহ অস্তিত্বলাভ করে। অতএব, স্রষ্টা বলতে কিছু নেই।

কিন্তু এ তথাকথিত বৈজ্ঞানিক সৃষ্টিতত্ত্বের প্রবক্তারা অনেকগুলো মৌলিক প্রশ্নের জবাব দিতে সক্ষম হন নি। তা হচ্ছে:

এককথিত এ আদি নির্গুণ বস্তু কোত্থেকে এলো :? কে তার অস্তিত্বদাতা? কারণ, বস্তু বা কথিত আদি বস্তু তো এমন কোনো অস্তিত্ব হতে পারে না যা নিজে নিজে সতত বিদ্যমান। বলা হয় : "ছিলো।" এ এক অবৈজ্ঞানিক জবাব। কারণ, বস্তুজগৎ 'কারণ ও ফলশ্রুতি' (cause and effect - علة و معلول) বিধির অধীন। অতএব, এটা হতে পারে না যে, 'অনাদি কাল' থেকে 'আদি বস্তু'র অস্তিত্ব ছিলো, তারপর তা কারণ ও ফলশ্রুতি বিধির আওতাভুক্ত হলো।

দুই: বস্তুর ধর্ম অনুযায়ী তার ওপর কোনো শক্তি ক্রিয়া- প্রতিক্রিয়া না করলে তা অনন্ত কাল একই অবস্থায় থাকবে। অর্থাৎ যা স্থির তা স্থিরই থাকবে এবং যা গতিশীল তা গতিশীলই থাকবে। এমতাবস্থায় কথিত 'আদি বস্তু'তে - যা প্রথমে স্থির বা গতিহীন ছিলো বলে এ মতের প্রবক্তাগণও স্বীকার করেন - গতিসঞ্চার (তা আলোড়ন বা বিস্ফোরণ যা- ই হোক না কেন) করলো কে? কোনো কারণ ছাড়া নিজে নিজে তো আর তাতে গতিসঞ্চার হওয়া সম্ভব ছিলো না।

তিন: কথিত আদি বস্তুতে গতি সঞ্চারিত হবার পর বিভিন্ন ধরনের মৌলিক পদার্থ ও যৌগিক বস্তুনিচয় এবং প্রাণশীল প্রজাতিসমূহ সৃষ্টি হলো যে প্রাকৃতিক নিয়মে বা যে কারণ ও ফলশ্রুতি বিধির অধীনে সে নিয়ম বা বিধি কোত্থেকে এলো? কারণ, নির্জ্ঞান বস্তু নিজের জন্য প্রাকৃতিক বিধি- বিধান তৈরী করতে, বিভিন্ন ধরনের অপরিবর্তনীয় বস্তুগুণ সৃষ্টি করতে, বিশ্বজগতে নিখুঁত শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠা করতে এবং প্রাণের উদ্ভব ঘটাতে সক্ষম নয়। স্বয়ং বস্তু যে প্রাকৃতিক নিয়ম বা কার্যকারণ বিধির অধীন সে নিজেই তো আর তা সৃষ্টি করতে পারে নি।

বিজ্ঞানের নামে কেউ কেউ দাবী করেছেন যে, দুর্ঘটনাক্রমে (accidentally) এক বিস্ফোরণের ফলে আদি বস্তুতে গতিসঞ্চার হয়। কিন্তু 'দুর্ঘটনা' একটি সাহিত্যিক, মানবিক ও লৌকিক পরিভাষা। খাঁটি বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিতে 'দুর্ঘটনা' তথা কারণবিহীন বা নিয়মবহির্ভূতভাবে কোনো কিছু সংঘটিত হওয়া অসম্ভব। যদিও প্রচলিত কথায় যে ঘটনা সংঘটিত হতে পারে বলে পূর্বে ধারণা করা যায় নি বা ক্ষেত্রবিশেষে যে ঘটনার প্রকৃত কারণ পূর্বে জানা ছিলো না বা হয়তো পরেও জানা যায় নি সে ঘটনাকে 'দুর্ঘটনা' বলা হয়, কিন্তু প্রকৃত বিজ্ঞানের দৃষ্টিতে, কোনো ঘটনা সম্পর্কে তা সংঘটিত হবার পূর্বে ধারণা করা যাক বা নাই যাক -, অথবা ঘটনার প্রকৃত কারণ পূর্বে বা পরে জানা যাক বা নাই যাক -, কারণ ছাড়া কোনো ঘটনাই সংঘটিত হতে পারে না। আর পরিবর্তনশীলতার বৈশিষ্ট্যের অধিকারী বস্তু অনাদি হতে পারে না; তার একটা শুরু বা সূচনা থাকতেই হবে এবং সে শুরু বা সূচনার উৎসকে অবশ্যই পরিবর্তনশীলতার বৈশিষ্ট্য থেকে মুক্ত থাকতে হবে। বলা বাহুল্য যে, বস্তু নিজেই সে সূচনা-উৎস হতে পারে না। কারণ, বস্তু পরিবর্তনশীলতার বৈশিষ্ট্য থেকে মুক্ত নয়। তার চেয়েও বড় কথা, বস্তুর তো অস্তিত্বই ছিল না, তাই সে স্বয়ং নিজের সূচনাকারী হবে কী করে? অতএব, এমন কোনো সত্তা থাকতেই হবে যিনি বস্তুর সূচনা বা সৃষ্টিকারী এবং তাতে প্রাণসঞ্চারকারী। আর সে সত্তা বস্তুগত হতে পারেন না, কারণ আমরা তো বস্তুরই উৎস সন্ধান করছি - যে বস্তু অনাদি ও পরিবর্তনশীলতামুক্ত হতে পারে না।

অবশ্য 'স্রেফ আদি বস্তু' তত্ত্ব অনেক আগেই স্বয়ং বিজ্ঞানের দ্বারাই অর্থহীন প্রমাণিত হয়েছে। সর্বশেষ বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারউদ্ভাবন অনুযায়ী বস্তুলোকের মৌলিকতম পর্যায় কোনোরূপ - কারণ ।ন্ন বস্তু নয়সমগুণসম্প, বস্তুর ক্ষুদ্রতম একক অণুসমূহের গুণবৈশিষ্ট্য বিভিন্ন বস্তুর ক্ষেত্রে বিভিন্ন। আবার অণুসমূহ পরমাণু সমবায়ে গঠিত। পরমাণুগুলোও মৌলিকতম একক নয়। কারণ, বিভিন্ন ধরনের পরমাণু রয়েছে। প্রতিটি পরমাণু একেকটি যৌগিক শক্তি এবং বিভিন্ন ধরনের পরমাণুর যৌগিক গঠন বিভিন্ন। প্রতিটি পরমাণুর কেন্দ্রে রয়েছে এক বা একাধিক প্রোটন যাকে কেন্দ্র করে আবর্তিত হচ্ছে এক বা একাধিক ইলেকট্রন। এমনকি প্রোটন ও নিউট্রন পর্যন্ত মৌলিক নয়, বরং যৌগিক। প্রতিটি প্রোটন বা নিউট্রন তিনটি কোয়ার্ক দ্বারা গঠিত। কোয়ার্ক ছয় ধরনের

এবং প্রত্যেক ধরনের কোয়ার্ক লাল, সবুজ বা নীল রঙের। অবশ্য এ রং কোনোভাবেই) দৃশ্যমান নয়, বরং বৈজ্ঞানিক কল্পনা।অর্থাৎ আঠারো রকমের কোয়ার্ক থেকে প্রোটন বা (নিউট্রন গঠিত যার প্রতিটিতে তিনটি করে কোয়ার্ক রয়েছে। ইলেকট্রন সহ ঊনিশটি মৌলিক একক দিয়ে পরমাণুসমূহ গঠিত। এছাড়া প্রতিটি বস্তুকণারই বিপরীত বা নেতিবাচক বস্তুকণা রয়েছে যাকে anti-matter বা পরাবস্তু বা প্রতিবস্তু বলা হয়। কোনো বস্তু ও সেই বস্তুর পরাবস্তু পরস্পর সংস্পর্শে এলে উভয়েরই বিলুপ্তি ঘটে।

মোদ্দা কথা, বস্তুর স্বরূপ সম্বন্ধে সর্বশেষ আবিষ্কার- উদ্ভাবন অনুযায়ী সমরূপ আদি 'স্রেফ বস্তু' বলে কখনো কিছু ছিলো না। বিশেষ করে ইলেকট্রন পরমাণুকেন্দ্রের চতুর্দিকে অস্বাভাবিক গতিতে ঘূর্ণনরত। এমতাবস্থায় অনাদি কাল থেকে ঊনিশটি এককে গঠিত পরমাণু বা তা থেকে গঠিত বস্তুনিচয় স্থির ছিলো এবং হঠাৎ 'বিনা কারণে' তা গতিশীল হলো - এরূপ দাবী হবে চরম অবৈজ্ঞানিক। বরং এ স্তরে এসে প্রশ্ন হচ্ছে, এই ঊনিশটি মৌলিক এককের আদি উৎস কী? এগুলোর বৈশিষ্ট্য এবং এগুলোর দ্বারা পরমাণুসমূহের গঠন একজন সূক্ষ্মদর্শী সুপরিকল্পনাবিদ মহাবিজ্ঞানীর অস্তিত্বের কথাই ঘোষণা করে। কারণ, তথাকথিত সমরূপবিশিষ্ট সীমাহীন বস্তুকণার নিষ্ক্রিয় অনাদি অস্তিত্ব যতোখানি অসম্ভব ঊনিশটি বিভিন্ন মৌলিক একক দ্বারা গঠিত পরমাণুসমূহের নিষ্ক্রিয় অনাদি অস্তিত্ব তার চেয়েও অনেক বেশী অসম্ভব।

মোদ্দা কথা, বস্তুজগতের সৃষ্টি, বিবর্তন ও তাতে প্রতিষ্ঠিত প্রাকৃতিক নিয়ম বা কার্যকারণ বিধির উৎস হিসেবে একটি অবস্তুগত পরম জ্ঞানী সুপরিকল্পনাবিদ উৎসের অস্তিত্ব মেনে নেয়া ছাড়া গত্যন্তর নেই।

এখানে প্রসঙ্গতঃ ডারউইনের বিবর্তনবাদের ওপর সামান্য আলোকপাত করা প্রয়োজন বলে মনে করছি। কারণ, অনেকে ভ্রান্তিবশতঃ ডারউইনের বিবর্তনবাদকে সৃষ্টিকর্তা না থাকার প্রমাণ হিসেবে দাবী করে থাকেন। বস্তুতঃ এ এক উদ্ভট ও হাস্যকর দাবী। কারণ, প্রথমতঃ ডারউইনের বিবর্তনতত্ত্ব অকাট্যভাবে প্রমাণিত কোনো তত্ত্ব নয়, বরং সৃষ্টিবৈচিত্র্যের একটি কাল্পনিক ব্যাখ্যা মাত্র। দ্বিতীয়তঃ জেনেটিক বিজ্ঞানের সর্বশেষ আবিষ্কারউদ্ভাবন প -্রমাণ করেছে যে,

প্রজাতিসমূহের মধ্যকার ক্রোমোজমক্যজনিত দেয়াল অতিক্রম করে এক প্রজাতির সংখ্যার পার্থ - অন্য প্রজাতিতে উত্তরণ অসম্ভব। অর্থাৎ প্রজাতিসমূহের উদ্ভব বিবর্তন (evolution)-এর প্রক্রিয়ায় হয় নি, বরং হস্তক্ষেপ (revolution) প্রক্রিয়ায় হয়েছে। তাহলে নিঃসন্দেহে বস্তুজগতের উর্ধে এমন - নি তাঁর পরিকল্পনা বাস্তবায়নের জন্য বস্তুজগতে একজন সুবিজ্ঞ পরিকল্পনাকারী রয়েছেন যি হস্তক্ষেপ করে প্রাণীপ্রজাতি সমূহকে সৃষ্টি করেছেন।

এর চেয়েও মৌলিক কথা হচ্ছে, এমনকি তর্কের খাতিরে বিবর্তনবাদকে সত্য হিসেবে ধরে নিলেও তা সৃষ্টিকর্তার অস্তিত্বহীনতা প্রমাণে সক্ষম নয়। কারণ, সৃষ্টিকর্তার জন্য অপরিহার্য নয় যে, তিনি প্রতিটি প্রজাতিকে আলাদাভাবে সৃষ্টি করবেন। বরং তিনি যদি সৃষ্টির শুরুতেই তাঁর পরিকল্পনা নির্ধারণ করে বিবর্তনপ্রক্রিয়া সহ প্রাকৃতিক বিধিবিধানসমূহ নির্ধারণ করে দিয়ে থাকেন এবং কালের প্রবাহে তা যথাসময়ে রূপ পরিগ্রহ করে থাকে তো তাতে বাধা কোথায়? (যদিও প্রমাণিত হয়েছে যে, তা বিবর্তনপ্রক্রিয়ায় হয় নি।) কিন্তু কোনো অবস্থাতেই বস্তুলোকের অবস্তুগত সজ্ঞান আদি উৎস ও নিয়ন্তার অস্তিত্ব অস্বীকার করার উপায় নেই।

বিচারবুদ্ধি উন্নততর প্রজ্ঞাসম্পন্ন লোকদের নিকট জীবনজিজ্ঞাসার অন্য একটি জবাব উপস্থাপন করে, তা হচ্ছে দার্শনিক জবাব।

‘অস্তিত্ব’ বলতে যা কিছু আছে বিচারবুদ্ধি প্রথমতঃ তাকে দুইভাবে চিন্তা করতে পারেহয় তা : যা না থাকা আদৌ সম্ভব নয় - থাকা অপরিহার্য অর্থাৎ থাকতেই হবে, অথবা তা থাকা অপরিহার্য নয়, বরং প্রয়োজনীয় শর্তাবলী পূর্ণ হলে তার অস্তিত্বলাভ অনিবার্য হয়ে ওঠে এবং প্রয়োজনীয় পূর্ণাঙ্গ কারণ উপস্থিত না থাকলে বা তাতে কোথাও ঘাটতি থাকলে তার অস্তিত্বপ্রাপ্তি অসম্ভব হয়ে পড়ে। দার্শনিকগণ প্রথম ধরনের অস্তিত্বকে বলেছেন ‘অপরিহার্য অস্তিত্ব’ (Essential Existence - واجب الوجود) এবং দ্বিতীয় ধরনের অস্তিত্বকে বলেছেন ‘সম্ভব অস্তিত্ব’ (Possible Existence - ممکن الوجود) অর্থাৎ যার অস্তিত্ব সর্বাবস্থায় অপরিহার্য বা অনিবার্য নয়, তবে তার অস্তিত্বলাভ সম্ভব অর্থাৎ শর্তাবলী পূর্ণ হলে সম্ভব, অন্যথায় অসম্ভব।

বলা বাহুল্য যে, কোনো অস্তিত্বকে অপরিহার্য অস্তিত্ব হতে হলে তাকে শুরু- শেষ, হ্রাস- বৃদ্ধি এবং যে কোনো ধরনের প্রয়োজন বা অভাববোধ থেকে মুক্ত থাকতে হবে। কিন্তু আমাদের অভিজ্ঞতার বস্তুজগতে আমরা যা কিছু ইন্দ্রিয়নিচয় দ্বারা প্রত্যক্ষ করছি তার সব কিছুই অস্তিত্বলাভের ক্ষেত্রে বিভিন্ন উপাদান ও বিভিন্ন কারণ বিদ্যমান থাকার শর্তসাপেক্ষ এবং অস্তিত্ব অব্যাহত থাকার জন্যও নিজের বাইরের অনেক কিছুর প্রতি মুখাপেক্ষী, তেমনি সদাপরিবর্তনশীল। অর্থাৎ ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য জগতের সব কিছুই 'সম্ভব অস্তিত্বের' অন্তর্ভুক্ত; এর কোনোটিই 'অপরিহার্য অস্তিত্ব' নয়।

এখন প্রশ্ন হচ্ছে, এই পরিবর্তনশীল সম্ভব অস্তিত্বসমূহের আদি উৎস কী?

আমরা রূপান্তরপ্রক্রিয়ার ধারাবাহিকতায় পিছন দিকে যেতে যেতে অর্থাৎ উৎসের উৎস এবং তারও উৎস খুঁজতে খুঁজতে এমন এক স্তরে গিয়ে উপনীত হবো যার পিছনে আর কোনো বস্তুগত পর্যায় নেই। এক সময় এ পর্যায়কে আদি নির্গুণ বস্তু বলে দাবী করা হতো যার ভ্রান্তির বিষয়টি ইতিপূর্বেই তুলে ধরা হয়েছে।

সৃষ্টির সূচনা সম্বন্ধে বিজ্ঞানের নামে যে সব তত্ত্ব উপস্থাপন করা হয়েছে তার মধ্যে সর্বশেষ হচ্ছে স্টিফেন হকিংএর বিগ্ ব্যাং বা মহাবিষ্ফোরণ তত্ত্ব। তাঁর মতে-, অসীম ভর সম্পন্ন আদি বস্তুকণায় (primary particle) সংঘটিত মহাবিস্ফোরণের মধ্য দিয়ে বিশ্বজগতের সূচনা হয়েছে। তাঁর মহাবিষ্ফোরণ তত্ত্ব বিশ্বব্যাপী মহা আলোড়ন সৃষ্টি করেছে। কিন্তু তিনি কথিত আদি বস্তুকণা ও তার অসীম ভরের উৎস, বিস্ফোরণের কারণ এবং বিস্ফোরণকালে অনুসৃত কারণ ও ফলশ্রুতি বিধির উৎস সম্বন্ধে নীরব।

কথিত আদি বস্তুকণা 'অস্তিত্বলাভ করা' বা 'সৃষ্টি হবার' পূর্বে তো কোনো 'সম্ভব অস্তিত্ব' (Possible Existence) ছিলো না; তাহলে তা কোন্ উৎস থেকে উৎসারিত? নিঃসন্দেহে কোনো অবস্তুগত অপরিহার্য অস্তিত্ব থেকেই তা উৎসারিত হয়েছিলো। আর বস্তুর ওপরে প্রাণী- প্রজাতিসমূহকে যা শ্রেষ্ঠত্ব ও প্রাধান্য প্রদান করেছে তা হচ্ছে তার হস্তক্ষেপক্ষমতা তথা তার

জীবন, জ্ঞান ও ইচ্ছাশক্তি। এমতাবস্থায় বস্তুজগতের আদি উৎস অপরিহার্য সত্তা যে প্রাণময়, ইচ্ছাশক্তিসম্পন্ন ও মহাজ্ঞানময় হবেন এটাও অপরিহার্য।

বিচারবুদ্ধি আরো এক ধরনের জবাব প্রদান করে। তা হচ্ছে, আমরা আমাদের অভিজ্ঞতার মধ্যেই বস্তুর ওপরে হস্তক্ষেপকারী এক ধরনের উচ্চতর অবস্তুগত সত্তার সন্ধান পাই। এ হচ্ছে এমন এক ধরনের সত্তা যা প্রাণী প্রজাতিতে রয়েছে। এটা স্রেফ বস্তুগত ও রাসায়নিক প্রতিক্রিয়ার ফল নয়। কারণ, আমাদের মধ্যে যে ইচ্ছাশক্তি ও বিচারবুদ্ধি রয়েছে তাকে আমরা সুস্পষ্ট অনুভব করি।

তর্কের খাতিরে আমরা আমাদের জীবনকে যদি যা ি ক ক্রিয়া বা রাসায়নিক ক্রিয়ার ফল বলে ধরে নেই, তথাপি ইচ্ছাশক্তি ও বিচারবুদ্ধিকে সে পর্যায়ে ফেলা যায় না। কারণ, এ দু'য়ের সাথে বস্তুধর্মের সামঞ্জস্য নেই। বস্তুর একটি প্রধান গুণ হচ্ছে একমুখিতা; তাতে দ্বিধাদ্বন্দ্ব, দ্বৈততা, সংশয়, বিতর্ক, বিশ্বাস, প্রত্যয় ইত্যাদি থাকতে পারে না। কিন্তু প্রাণীর মধ্যে তা রয়েছে; বিশেষ করে মানুষের মধ্যে এ সব বৈশিষ্ট্য এতোই প্রবল যে, তা কেবল মানুষকে বস্তুগত সত্তার উর্ধস্থ সত্তারূপেই তুলে ধরে না, বরং ক্ষেত্রবিশেষে তা তাকে অন্যান্য প্রাণীপ্রজাতি থেকে সম্পূর্ণ স্বত হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করে। উদাহরণস্বরূপ, প্রাণীকুলের সহজাত প্রবণতা (যা অবশ্য তার মধ্যে এক অবস্তুগত শক্তির অস্তিত্ব প্রমাণ করে) হচ্ছে এই যে, যে কোনো প্রাণীই ক্ষুধা পেলে তার দেহের চাহিদা মিটানোর উপযোগী খাবার খেতে চায়। তর্কের খাতিরে যদি ধরে নেই যে, তার এ ক্ষুধা লাগার বিষয়টি এক ধরনের বস্তুগত রাসায়নিক ক্রিয়া, তাহলে মানতে হবে যে, তার পক্ষে ক্ষুধা নিবৃত্তি করা সম্ভব হলে অবশ্যই সে ক্ষুধা নিবৃত্তি করবে। যেমন: ঝুঁকি না থাকলে একটি ক্ষুধার্ত মশা যে কোনো মানুষের রক্ত পান করে। ক্ষুধার্ত অবস্থায় একটি বিড়ালও তার খাওয়ার উপযোগী যে কোনো খাবারে কামড় দেয়। অবশ্য কাছাকাছি মানুষ দেখলে সে 'ভয়' পায়; তার এ 'ভয় পাওয়া'ও প্রমাণ করে যে, তার মধ্যে অবস্তুগত কিছু আছে। কিন্তু একজন রোযাদার নারী বা পুরুষ চরম ক্ষুধার্ত অবস্থায় শেষ বিকেলে সুস্বাদু খাবার তৈরী করে এবং ইফতারীর সময় ভক্ষণ ও পরিবেশনের জন্যে সাজিয়ে রাখার কাজে ব্যস্ত থাকে, অথচ

কোনোরূপ ঝুঁকি না থাকা সত্ত্বেও সে তখন খাবার খায় না। এটা নিঃসন্দেহে বস্তুগত রাসায়নিক ক্রিয়া- প্রতিক্রিয়ার ধর্মের সাথে সাংঘর্ষিক। তার এ আচরণ তার মধ্যে এক প্রবল ইচ্ছাশক্তি ও বিচারবুদ্ধির অস্তিত্বের প্রমাণ বহন করে যা বস্তুধর্মের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ও লড়াই করতে পারে।

উপরোক্ত ক্ষেত্রে কেউ হয়তো মানুষের অভ্যাস ও সংস্কারের কথা তুলতে পারে। কিন্তু ব্যাপার হচ্ছে এই যে, বস্তুর বেলায় 'সংস্কার' ও কুসংস্কার' কোনোটাই প্রযোজ্য নয়। অতএব, প্রাণীপ্রজাতিসমূহের সদস্যদের, বিশেষ করে মানুষের বস্তুগত শরীর জুড়ে এক বা একাধিক এমন ধরনের অবস্তুগত অস্তিত্ব রয়েছে যা বস্তুর ওপরে হস্তক্ষেপ করে থাকে এবং স্বয়ং বস্তুধর্মের বিরুদ্ধে লড়াই করতে পারে (তা সে লড়াইয়ে তার হার- জিত যা- ই হোক না কেন)। অতএব, গোটা সৃষ্টিলোকের সূচনা অর্থাৎ এর বস্তুগত ও অবস্তুগত উপাদানসমূহ সৃষ্টি এবং প্রাকৃতিক বিধান নির্ধারণ ও সৃষ্টিজগতের পরিচালনার পিছনে সীমাহীন ক্ষমতার অধিকারী এক অবস্তুগত শক্তির অস্তিত্ব থাকা খুবই সম্ভব, বরং অপরিহার্য।

বিচারবুদ্ধি এছাড়া আরো একভাবেও জীবনজিজ্ঞাসার জবাব দিতে পারে। তা হচ্ছে, বস্তুর ওপরে কেবল তা- ই প্রতিক্রিয়া করতে পারে যার অস্তিত্ব আছে। (অবশ্য অবস্তুর ওপরেও তা প্রতিক্রিয়া করতে পারে, তবে যারা অবস্তুগত অস্তিত্ব অস্বীকার ও অস্তিত্বহীন মনে করে তাদের জন্যে বস্তুগত অস্তিত্ব থেকেই অবস্তুগত অস্তিত্বে উপনীত হতে হবে।) উদাহরণস্বরূপ, একটা টেলিভিশনের পর্দায় কেবল সেই অনুষ্ঠানই দেখা যায় যা কোথাও না কোথাও থেকে প্রচার করা হয়। একটি সুপার কম্পিউটার কেবল সেই সব তথ্যই প্রদর্শন করে যা পূর্বেই তার মধ্যে দেয়া হয়েছে এবং যা সংগ্রহ করে পরিবেশন করার জন্যে তার মধ্যে যথাযথ 'প্রোগ্রাম' দেয়া হয়েছে; বস্তুতঃ যে প্রোগ্রাম তাকে নিয় ণ করে সে তদনুযায়ীই কাজ করে থাকে। এর বাইরে সে কিছুই করতে পারে না। বিশেষ করে তার মধ্যে যার অস্তিত্ব নেই বা যা তৈরী করার মত প্রোগ্রাম তাকে দেয়া হয় নি এমন কোনো কিছু সে প্রদর্শন বা সম্পাদন করতে পারে না। অর্থাৎ একটি কম্পিউটারের কার্যাবলী একজন প্রোগ্রামারের অস্তিত্ব প্রমাণ করে যিনি তার মধ্যে সংশ্লিষ্ট তথ্যাদি বা প্রোগ্রাম সমূহ প্রদান করেছিলেন।

এখন প্রশ্ন হচ্ছে, মানুষ যে সৃষ্টিকর্তার অস্তিত্ব ও অন্যান্য অবস্তুগত সত্তা, বিশেষ করে আত্মার অস্তিত্ব সম্বন্ধে বিতর্ক করছে, মানুষ যদি বস্তু ছাড়া আর কিছুই না হবে তাহলে তার মধ্যে এ বিতর্কের সূত্রপাত হলো কীভাবে? বলা যেতে পারে যে, এক কম্পিউটার থেকে অন্য কম্পিউটারে তথ্য ও প্রোগ্রাম স্থানান্তরের ন্যায় বংশানুক্রমে প্রাপ্ত ধারণা এ বিতর্কের সৃষ্টি করেছে। কিন্তু সে ক্ষেত্রে প্রশ্ন আসে, প্রথম বার যে ব্যক্তির মনে স্রষ্টা- প্রসঙ্গ উদিত হলো তার মনে তা কোত্থেকে এলো? যদি ইন্দ্রিয়াতীত অবস্তুগত স্রষ্টার অস্তিত্ব না- ই থাকবে তাহলে তার মন- মস্তিষ্কে এ ধারণা এলো কীভাবে? কীভাবে এ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হলো? যার অস্তিত্বই নেই তা তো প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করতে পারে না। অতএব, স্রষ্টা সম্বন্ধে মানুষের মন- মস্তিষ্কে ধারণা সৃষ্টি এবং এতদসংক্রান্ত বিতর্ক সৃষ্টিই তাঁর অস্তিত্ব প্রমাণ করে।

এভাবে বিচারবুদ্ধি আরো অনেক পন্থায় জীবনজিজ্ঞাসার জবাব দিতে পারে। তার মধ্যে একটি গুরুত্বপূর্ণ জবাব হচ্ছে এই যে, যে ব্যক্তি সৃষ্টিকর্তার অস্তিত্ব অস্বীকার করে সে- ও তার নিজের মধ্যে বস্তু- উর্ধ এক সত্তার অস্তিত্বকে অস্বীকার করতে পারে না। এ সত্তার সংজ্ঞা নিয়ে মতপার্থক্য থাকতে পারে, কিন্তু দু'টি বিষয়ে মতপার্থক্য থাকতে পারে না। তা হচ্ছে, তার নিজের অস্তিত্ব ও তার মধ্যকার বস্তু- উর্ধ বৈশিষ্ট্য। এমনকি সে মুখে যদি তা অস্বীকার করেও তথাপি কাজে ও আচরণে তা স্বীকার করে নেয়। সে বিতর্ক করে, আর বিতর্ক করা বস্তুর ধর্ম নয়। সত্য ও মিথ্যা, ভাল ও মন্দ, জ্ঞান ও অজ্ঞতা, সম্মান ও লাঞ্ছনা, ল া ও গৌরব ইত্যাদি পরিভাষা ও এসবে পরিব্যক্ত তাৎপর্যের সাথে জড়িয়ে পড়ার ক্ষেত্রে সে স্রষ্টার অস্তিত্বে প্রত্যয় পোষণকারীদের সাথে অভিন্ন। শুধু তা- ই নয়, তার ব্যক্তিত্বের বিকাশ, রুচিবোধ, সাহিত্য- সংস্কৃতি, স্বাধীনতা, সাম্য, মৈত্রী, মুক্তি, জয়- পরাজয়, সুখ- দুঃখ, শোক- বেদনা, শ্রদ্ধা ও সম্মান ইত্যাদি সকল পরিভাষার সাথেই সে নিজেকে সম্পৃক্ত করে। অথচ বস্তুর ক্ষেত্রে এ সব পরিভাষা কোনো তাৎপর্য বহন করে না। এ সব পরিভাষা কেবল বস্তুদেহকে আশ্রয়কারী অবস্তুগত আত্মিক সত্তারই সৃষ্টি এবং এ আত্মিক সত্তার জন্যই তাৎপর্য বহন করে। অতএব, এ আত্মিক সত্তাকে অস্বীকার করা তার পক্ষে সম্ভব নয়। এমতাবস্থায় গোটা বিশ্বলোকের অস্তিত্ব ও পরিচালনার পিছনে এর

চেয়ে অসংখ্য গুণ শক্তিশালী একজন পূর্ণতম অবস্তুগত সত্তার অস্তিত্ব অস্বীকার করার পক্ষে কোন্ যুক্তি থাকতে পারে?

অতঃপর সে কি সর্বজনীনভাবে গ্রহণযোগ্য জ্ঞান- উৎস বিচার- বুদ্ধির রায় মেনে নেবে? নাকি অন্ধভাবে সৃষ্টিকর্তাকে অস্বীকার করে চলবে? সে যদি তার বিচারবুদ্ধির রায়কে মুখে অস্বীকার করেও তথাপি তার বিচারবুদ্ধি যে এ রায়ই দিতেই থাকবে তাতে সন্দেহ নেই।

বস্তুবিজ্ঞানের দৃষ্টিতে অবস্তুগত অস্তিত্ব

বাংলা অভিধানে ‘বিজ্ঞান’ মানে ‘অপরোক্ষ জ্ঞান’, ‘বিশেষ জ্ঞান’. তত্ত্বজ্ঞান’ ইত্যাদি। কিন্তু পশ্চিমা বস্তুবাদী সংস্কৃতির প্রভাবে ‘বিজ্ঞান’ পরিভাষাটি নতুন এক তাৎপর্য পরিগ্রহণ করেছে। তা হচ্ছে, ‘বিজ্ঞান’ বলতে সাধারণভাবে বস্তুসংশ্লিষ্ট বিজ্ঞান বা পরীক্ষাযোগ্য বিজ্ঞানকেই বুঝানো হয়।

বস্তুবিজ্ঞান নিঃসন্দেহে মানবসমাজের জন্য একটি অপরিহার্য বিষয়, তবে তার বিচরণক্ষেত্র বস্তুর মধ্যেই সীমাবদ্ধ। বস্তু নিয়ে গবেষণা ও পরীক্ষা- নিরীক্ষা করা এবং বস্তুধর্ম উদঘাটন করে তা মানুষের স্বার্থে কাজে লাগানোই বস্তুবিজ্ঞান ও বস্তুবিজ্ঞানীর কাজ। যা বস্তু নয় তা নিয়ে বস্তুবিজ্ঞান বা বস্তুবিজ্ঞানীর কিছুই করার নেই। বস্তুবিজ্ঞানী যদি নিজ কর্মক্ষেত্রের মধ্যে নিজেকে সীমাবদ্ধ রাখেন এবং এর বাইরের বিষয়ে মতামত প্রদান থেকে বিরত থাকেন তো তা- ই হবে সঙ্গত ও যথার্থ কর্মনীতি। কারণ, বস্তু- উর্ধ কোনো বিষয়ে মতামত প্রদান করা তাঁর কাজ নয়; তাঁর পক্ষে তা সম্ভবও নয়। অতএব, বস্তুবহির্ভূত কোনো অস্তিত্বের সম্ভাবনা অস্বীকার করা নেহায়েতই অবৈজ্ঞানিক কাজ। কেননা, বস্তুবিজ্ঞানী তাঁর গবেষণাগারে বস্তু নিয়েই গবেষণা ও পরীক্ষা- নিরীক্ষা করতে পারেন; অবস্তুগত অস্তিত্ব নিয়ে গবেষণা ও পরীক্ষা- নিরীক্ষা করা তাঁর গবেষণাগারে সম্ভব নয়। বিশ্বলোকের সৃষ্টিকর্তা আল্লাহ্ তা‘আলা বস্তুগত সত্তা নন। ফেরেশতারাও তা- ই। তেমনি মানুয়ের নাফস্ বা ব্যক্তিসত্তাও অবস্তুগত সত্তা। তাই এর কোনোটাই বস্তুবিজ্ঞানের গবেষণাগারে পরীক্ষাযোগ্য বিষয় নয়। বস্তুবিজ্ঞানী তাঁর গবেষণাগারে পরীক্ষা করে যেমন এ সবের অস্তিত্ব প্রমাণ করতে সক্ষম নন, তেমনি তাঁর পরীক্ষার আওতাবহির্ভূত বিধায় এ সবের অস্তিত্ব অস্বীকার করাও হবে তাঁর জন্য অজ্ঞতার পরিচায়ক। ‘আমি যা জানি না, যা আমার আওতায় নেই বা যা আমার গবেষণাগারে পরীক্ষা করতে পারছি না তার অস্তিত্ব নেই’ - এরূপ

দাবী করার চেয়ে অজ্ঞতাপ্রসূত ও অবৈজ্ঞানিক দাবী আর কিছূই হতে পারে না। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ বস্তুবাদী বস্তুবিজ্ঞানীরা এ অজ্ঞতাপ্রসূত অবৈজ্ঞানিক দাবী করে বসেছেন।

এখানে একটি বিষয়ে গভীরভাবে তলিয়ে চিন্তা করার প্রয়োজন রয়েছে। তা হচ্ছে, বিজ্ঞানীদের আবিষ্কার- উদ্ভাবনসমূহ ভ্রান্তির সম্ভাবনা থেকে পুরোপুরি মুক্ত নয়। তাই দেখা যায়, আজ এক বিজ্ঞানী কোনো বিষয়ে যে অভিমত ব্যক্ত করছেন, কাল অপর এক বিজ্ঞানী এসে তা খণ্ডন করছেন। দ্বিতীয় বিষয়টি এই যে, কতক বিজ্ঞানী বা বিজ্ঞানবাদী হবার দাবীদার লোক এমন বিষয়েও মতামত ব্যক্ত করছেন যা তাঁদের বিশেষজ্ঞত্বের ক্ষেত্রের আওতাভুক্ত নয়, অথবা তা পরীক্ষিত নয় (বা পরীক্ষা করা আদৌ সম্ভব নয়), বরং তাঁদের মতামত নেহায়েতই ধারণা- কল্পনার ওপর ভিত্তিশীল। যেমন: ডারউইনের বিবর্তন তত্ত্ব। পানির অণু যে অক্সিজেন ও হাইড্রোজেনের সমন্বয়ে গঠিত তা গবেষণাগারে পরীক্ষা করে প্রমাণ করা যায়। কিন্তু সৃষ্টিলোকের সূচনা ও অগ্রগতি এবং প্রজাতিসমূহের উৎপত্তি সম্পর্কে ডারউইন যা বলেছেন তা গবেষণাগারে প্রমাণ করা সম্ভব নয়। অতএব, স্বয়ং বস্তুবিজ্ঞানের দৃষ্টিতেই এরূপ একটি তত্ত্ব বৈজ্ঞানিক তত্ত্বরূপে পরিগণিত হতে পারে না। কিন্তু এ সত্ত্বেও এরূপ একটি কাল্পনিক তত্ত্বকে দীর্ঘদিন যাবত বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব হিসেবে গণ্য করা হয়েছে। প্রজাতিসমূহের মধ্যে ক্রোমোজমের অনতিক্রম্য দেয়ালসম পার্থক্য লক্ষ্য করে অনেক বস্তুবিজ্ঞানী ডারউইনের বিবর্তন তত্ত্বের অসারতা ও ভিত্তিহীনতা স্বীকার করে নিলেও এখনো তাঁদের একাংশ সহ তথাকথিত বিজ্ঞানমনস্ক লোকেরা এ তত্ত্বকে অভ্রান্ত বলে মনে করে।

বস্তুতঃ সৃষ্টিলোকের উৎস এবং মানুষের বস্তুদেহে নিহিত তার অবস্তুগত ব্যক্তিসত্তা বস্তুবিজ্ঞানের আলোচ্য বিষয় হতে পারে না, বরং তা বিচারবুদ্ধির আলোচ্য বিষয়। বিচারবুদ্ধি এরূপ অবস্তুগত অস্তিত্বকে স্বীকার বা অস্বীকার করার এক্তিয়ার রাখে, কিন্তু বস্তুবিজ্ঞান তা রাখে না। অন্যদিকে বিচারবুদ্ধির বিশ্লেষণে বিশ্বলোকের অবস্তুগত উৎস অকাট্যভাবে প্রমাণিত হয় - যে উৎস সীমাহীন প্রাণ, শক্তি ও জ্ঞানের অধিকারী। তাই বস্তুবিজ্ঞানীদের উচিত তাঁদের বিশেষজ্ঞত্বের আওতাবহির্ভূত এ বিষয়ে বিচারবুদ্ধির রায়কেই মেনে নেয়া। কিন্তু দুর্ভাগ্য এই যে, পের ব্যাঙ

কর্তৃক সমুদ্রের অস্তিত্ব অস্বীকার করার ন্যায় কতক বস্তুবিজ্ঞানী বস্তু- উর্ধ অস্তিত্বের সম্ভাবনাকে প্রত্যাখ্যান করেছেন। আর সাধারণ মানুষের এক বিরাট অংশ অজ্ঞতাবশতঃ তাঁদের ধারণাকেই গ্রহণ করে বসে আছে।

যদিও বিতর্কিত বিষয়ে বিচারবুদ্ধির রায়ের কাছে আত্মসমর্পণ করা ছাড়া গত্যন্তর নেই, তথাপি বস্তুবাদী ধ্যান- ধারণার দ্বারা মন- মগযের ওপর সৃষ্ট ভ্রান্তির পর্দা ভেদ করে অনেকের পক্ষেই তা গ্রহণ করা সম্ভব হয় না। অবশ্য স্বয়ং বস্তুবিজ্ঞান থেকে অবস্তুগত অস্তিত্বের প্রমাণের অনু লে কোনো আলোকের সন্ধান পেলে তা হয়তো তাদের মন- মগযের ওপরকার অন্ধকার পর্দাকে ছিন্ন করতে সক্ষম হতে পারে। সৌভাগ্যক্রমে এরূপ আলোর সন্ধানলাভ সম্ভব হয়েছে যদিও বস্তুবাদীরা তা তলিয়ে দেখার অবকাশ পায় নি বা তা চায় নি।

বস্তুবিজ্ঞান তার গবেষণাগারে আল্লাহ্ তা'আলার বা মানুষের বস্তুদেহ জুড়ে বিরাজমান তার অবস্তুগত ব্যক্তিসত্তার অস্তিত্ব থাকা বা না- থাকা কোনোটাই প্রমাণ করতে সক্ষম নয়। তবে বস্তুবিজ্ঞান এমন কতক অস্তিত্বের অভিজ্ঞতা হাছিল করেছে যা বস্তু নয়। কারণ, তাতে বস্তুর সংজ্ঞা প্রযোজ্য নয়। আর এসব অস্তিত্ব 'বস্তু ছাড়া কোনো অস্তিত্ব না থাকা'র ধারণাকে মিথ্যা বলে প্রমাণিত করে ।

বস্তুর সংজ্ঞায় বলা হয়েছে যে, বস্তুর তিনটি মাত্রা (Dimension) আছে, তা হচ্ছে দৈর্ঘ্য, প্রস্থ ও বেধ। বস্তুর আরেকটি বৈশিষ্ট্য হচ্ছে, তা জায়গা দখল করে। মাধ্যাকর্ষণের আওতায় এলে ওযনের অধিকারী হওয়াও বস্তুর অন্যতম বৈশিষ্ট্য। যে কোনো বস্তুর ক্ষুদ্রতম একক অণু এতোই ক্ষুদ্র যে, তার দৈর্ঘ্য, প্রস্থ, বেধ, আয়তন ও ওযন কোন যে র সাহায্যে পরিমাপ করা সম্ভব নয়। কিন্তু যেহেতু ট্রিলিয়ন ট্রিলিয়ন সংখ্যক অণু একত্রিত হলে তা পরিমাপ করা সম্ভব হয় সেহেতু প্রতিটি অণুতেই যে এ বৈশিষ্ট্য রয়েছে তা সপ্রমাণিত। কিন্তু মানুষের অভিজ্ঞতায় এমন কতক অস্তিত্ব রয়েছে যার ক্ষেত্রে বস্তুর সংজ্ঞা প্রয়োগ করা সম্ভব নয়। এর মধ্যে রয়েছে আগুন, আলো, তাপ, বিদ্যুত, চৌম্বক ক্ষেত্র ইত্যাদি। অবশ্য এগুলোর প্রতিটিরই নিজস্ব ও

স্বাত ্যবাচক বৈশিষ্ট্য রয়েছে। কিন্তু এগুলোকে বস্তুর সংজ্ঞার আওতায় আনা সম্ভব নয়। আমরা এখন এ বিষয়ের ওপর আলোকপাত করবো।

এ প্রসঙ্গে আলোচনা করতে গিয়ে আমাদেরকে বস্তুর বস্তুবিজ্ঞানস্বীকৃত আরো দু -'টি বৈশিষ্ট্য বা বস্তুধর্মের কথা উল্লেখ করতে হয়। একটি হচ্ছে এই যে, কোনো বস্তু যখন কোনো জায়গা দখল করে তখন তা সেখানে পূর্ব থেকে বিদ্যমান বস্তুকে হটিয়ে দেয়। অর্থাৎ যে স্থানে একটি বস্তুঅণু - অণু অবস্থান -অবস্থান করছে তাকে সরিয়ে না দিয়ে সেই একই স্থানে একই সময় আরেকটি বস্তু গ্রহণ করতে পারে না। দ্বিতীয় বৈশিষ্ট্যটি হচ্ছে এই যে, বস্তু রূপ পরিবর্তন করতে পারে যেম)ন : কঠিন, তরল ও বায়বীয় অবস্থা ধারণ করতে পারেপানির অণু :যেমন) এবং বিশ্লিষ্ট হতে পারে ((বিশ্লিষ্ট হয়ে অক্সিজেন ও হাইড্রোজেনের অণুতে পরিণত হতে পারে, কিন্তু, বস্তুবিজ্ঞানীদের মতে, বস্তু অস্তিত্বহীন হয়েও যেতে পারে না বা অনস্তিত্ব থেকে অস্তিত্ব লাভ করতে পারে না। অবশ্য কথিত এই সর্বশেষ বৈশিষ্ট্যটি বিতর্কের উর্ধে নয়। বরং সাম্প্রতিক বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার] অনুযায়ী যে কোনো বস্তুর প্রতিবস্তু (anti-matter) হতে পারে যা ঐ বস্তুকে নিশ্চিহ্ন করে দেবে এবং নিজেও নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে। তবে আমরা যে বিষয়ে আলোচনা করছি তাতে বস্তুকে এ পর্যায়ে অবিনাশী ধরে নেয়াতে কোনো বাধা নেই। তাছাড়া প্রতিবস্তু আবিষ্কৃত হলেও অনস্তিত্ব থেকে নতুন বস্তুর আবির্ভাবকে বস্তুবাদী বিজ্ঞানীরা অসম্ভবই গণ্য করেন। কারণ, তা না হলে তাঁদেরকে বস্তুর পিছনে নিহিত অবস্তুগত স্রষ্টার অস্তিত্বকে স্বীকার করে নিতে হবে।[

এখন আমরা ইতিপূর্বে মানুষের অভিজ্ঞতার আওতাধীন যে ক'টি অবস্তুগত অস্তিত্বের কথা উল্লেখ করেছি তার মধ্য থেকে কয়েকটির অবস্থা বিশ্লেষণ করে সে সবের অবস্তুত্ব প্রমাণ করবো।

আলো কোনো বস্তু নয়। কারণ, আলোর বা তার ক্ষুদ্রতম এককের দৈর্ঘ, প্রস্থ ও বেধ নেই। তা তার চলার পথ থেকে অন্য বস্তুকে হটিয়ে দেয় না। তার ওযন নেই এবং তা বস্তু থেকে উদ্ভূত হলেও বস্তুর বিশ্লিষ্ট রূপ বা কোনো বস্তুর গঠন- উপাদানসমূহের অন্যতম উপাদান নয়। তেমনি তা বিশ্লিষ্ট হয়ে অন্যান্য উপাদানে পরিণত হয় না, বরং নিঃশেষ হয়ে যায়। অন্য কথায়, অস্তিত্ব লাভ করে ও অস্তিত্ব হারায়। বিদ্যুতের অবস্থাও তা- ই।

পানির তিনটি রূপ আছে: কঠিন, তরল ও বায়বীয় এবং পানির অণু বিশ্লেষণ করলে অক্সিজেন ও হাইড্রোজেন অণু পাওয়া যায়। পানি না আলো বা বিদ্যুতে রূপান্তরিত হতে সক্ষম, না তাকে বিশ্লেষণ করলে অক্সিজেন ও হাইড্রোজেনের পাশাপাশি তৃতীয় উপাদান হিসেবে আলো বা বিদ্যুত পাওয়া যাবে। কিন্তু জলীয় বাষ্প থেকে সৃষ্ট মেঘের মধ্যে যে পারস্পরিক প্রতিক্রিয়া ঘটে তার ফলে বিদ্যুত এবং সে বিদ্যুত থেকে আলো সৃষ্টি হয়। প্রশ্ন হলো, কোন্ বস্তু আলো বা বিদ্যুতে রূপান্তরিত হলো? নিশ্চয় জলীয় বাষ্পের কণা আলো বা বিদ্যুতে রূপান্তরিত হতে পারে নি। অন্যদিকে আলো কাঁচের দেয়াল ভেদ করে যাবার সময় কাঁচের বস্তুকণাকে হটিয়ে দেয় না। কিছু সময়ের জন্য হলেও আলো তার চলার পথে কাঁচের বস্তুকণার সাথে অভিন্ন স্থান- কালে অবস্থান করে। অন্যদিকে অনেক বস্তু আলো শুষে নেয়, কিন্তু ঐ বস্তুকে বিশ্লেষণ করলে তার মধ্যে 'আলো'কে পাওয়া যায় না। এর অর্থ হচ্ছে, আলো তার অস্তিত্ব হারিয়ে ফেলে।

বিদ্যুতপ্রবাহের বিষয়টি আরো বিস্ময়কর। কোনো একটি বিদ্যুতকেন্দ্রে বিদ্যুত উৎপাদিত হয় এবং তারের মধ্য দিয়ে বহু দূরে গিয়ে তা আলো ও তাপ প্রদান করে। তারের মধ্য দিয়ে বিদ্যুতপ্রবাহ কীভাবে যায়? নলের মধ্য দিয়ে পানির প্রবাহ যাবার ন্যায় কি? মোটেই নয়। বিদ্যুতপ্রবাহ তারের বস্তুকণাগুলোকে অপসারণ করে পথ চলে না, তারের ওপর দিয়েও যায় না। আবরণবিহীন তারের মধ্য দিয়েও বিদ্যুত স্থানান্তরিত করা যায়, কিন্তু প্রবাহিত বিদ্যুতের মাত্রার তুলনায় তারটি খুবই সরু না হলে তারটি থেকে আলোর বিচ্ছুরণ ঘটে না, বা তা থেকে তাপ ছড়িয়ে পড়ে না। তাহলে এ বিদ্যুতের স্বরূপ কী? তা কি পদার্থ? তার মধ্যে কি পদার্থের বৈশিষ্ট্য আছে? না, নেই।

আলো ও বিদ্যুত পদার্থের প্রতিক্রিয়া থেকে উৎপন্ন হয় - এটা অনস্বীকার্য। কিন্তু যা উৎপন্ন হলো তাতে পদার্থের বৈশিষ্ট্য নেই। তবে কি তা অস্তিত্বমান নয়?

কোনো কোনো প্রতিক্রিয়ার ফলের (result) প্রকৃত অস্তিত্ব (real existence) থাকানাথাকা নিয়ে - পানির ওপরে বায়ুর আঘাতে যে তরঙ্গের সৃষ্টি হয় :বিতর্ক থাকতে পারে। যেমন আসলে কি তার কোনো অস্তিত্ব আছে? অর্থাৎ বায়ু ও পানিকে বাদ দিলে তরঙ্গের কোনো অস্তিত্ব আছে কি? এটা

একটা বিতর্কিত ব্যাপার যার ফয়সালা আমাদের অত্র আলোচনার জন্যে অপরিহার্য নয়। অবশ্য তরঙ্গকে অস্তিত্ব বিবেচনাকারী ও অনস্তিত্ব বিবেচনাকারী দুই মতের মাঝামাঝি একটি তৃতীয় মত অনুযায়ী এটি এক ধরনের 'আপেক্ষিক অস্তিত্ব' (relative existence) বা 'পরনির্ভরশীল অস্তিত্ব' যার অস্তিত্ব পানি ও বায়ুর ওপর নির্ভরশীল। কিন্তু আলো ও বিদ্যুত এ ধরনের কোনো আপেক্ষিক অস্তিত্ব নয়, বরং তার প্রকৃত অস্তিত্ব রয়েছে। কারণ, বস্তুর প্রতিক্রিয়া থেকে উদ্ভূত হলেও উৎপত্তিস্থলের বাইরেও তার অস্তিত্ব অকাট্যভাবে প্রমাণিত। মেঘে সৃষ্ট বিদ্যুতের আলো মেঘের বাইরে বহু নীচে ভূপৃষ্ঠ পর্যন্ত পৌঁছে থাকে; উর্ধে কতদূর যায় তা জানা নেই। একইভাবে বৈদ্যুতিক তরঙ্গ তার উৎপত্তিস্থল ও গন্তব্যস্থলের মাঝখানেও অস্তিত্বমান। কিন্তু আলো ও বৈদ্যুতিক তরঙ্গের অস্তিত্ব আপেক্ষিক বা নির্ভরশীল অস্তিত্ব না হলেও, বরং প্রকৃত অস্তিত্ব হওয়া সত্ত্বেও, তাতে বস্তুর বৈশিষ্ট্য নেই।

চৌম্বক ক্ষেত্রের বিষয়টি আরো বেশী প্রণিধানযোগ্য। আলো তো প্রবহমান অস্তিত্ব যা স্থির থাকে না। কিন্তু চৌম্বক ক্ষেত্র চুম্বকের চারদিকে স্থির। বস্তুতঃ চৌম্বক ক্ষেত্র একটি শক্তি যা চুম্বক থেকে উৎসারিত হলেও চুম্বকের বাইরে স্থিরভাবে অবস্থান করে থাকে এবং তাতে বস্তুর কোনো বৈশিষ্ট্যই বিদ্যমান নেই। এমনকি চুম্বক ও তার ক্ষেত্রের মাঝে আড়াল সৃষ্টি করা হলেও অনেক ক্ষেত্রেই তা কাজ করতে সক্ষম। একটি চুম্বক ও তার ক্ষেত্রের মাঝখানে একটি কাগজ রাখা হলেও কোনো লোহার টুকরা (যেমন: আলপিন) ঐ ক্ষেত্রের আওতায় এলে তা ছুটে এসে কাগজে ঠেকে যাবে এবং তার সাথেই লেগে বা ঝুলে থাকবে। চুম্বক প্রাকৃতিকই হোক বা বৈদ্যুতিকই হোক, চৌম্বক ক্ষেত্র যে একটা শক্তি এবং তার যে স্বত অস্তিত্ব আছে অথচ তাতে বস্তুর ধর্ম নেই - এটা অনস্বীকার্য।

[প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ্য যে, আলো ও শক্তির সংজ্ঞা এবং এতদুভয়ের 'ধর্ম' সম্পর্কে বস্তুবিজ্ঞানীগণ এখনো কোনো অভিন্ন মতে উপনীত হতে পারেন নি। এমনকি আলোর গতিকে ইতিপূর্বে ধ্রুব মনে করা হলেও ইদানীং সে ধারণাও পাল্টে গেছে। বিশেষ করে কোয়ান্টাম বলবিদ্যা পদার্থবিজ্ঞানের অনেক বিধিকেই অনিশ্চয়তার মুখে ঠেলে দিয়েছে।]

আমাদের এ আলোচনা থেকে অকাট্যভাবে প্রমাণিত হলো যে, 'অস্তিত্ব' মানে শুধু বস্তুগত অস্তিত্ব নয়, বরং অবস্তুগত অস্তিত্বও আমাদের অভিজ্ঞতায় রয়েছে। অবশ্য এসব অস্তিত্বের পরস্পরের মধ্যে গুণগত, বৈশিষ্ট্যগত ও মাত্রাগত পার্থক্য রয়েছে। তবে বস্তুলোকের সাথে সংশ্লিষ্ট বিধায় আমরা এগুলোকে 'বস্তুসদৃশ অবস্তুগত অস্তিত্ব' বলে অভিহিত করতে পারি।

এবার আমরা প্রাণীকুল, বিশেষতঃ মানুষের সাথে সংশ্লিষ্ট অবস্তুগত অস্তিত্বের দিকে দৃষ্টি দেবো যা বৈজ্ঞানিক অভিজ্ঞতায় প্রমাণিত হয়েছে।

বৈজ্ঞানিক অভিজ্ঞতায় প্রমাণিত হয়েছে যে, মানুষসহ প্রতিটি প্রাণশীল ও সজীব অস্তিত্বেরই বস্তুদেহ ছাড়াও একটি আলোকময় অবস্তুগত দেহ রয়েছে। কিরলিয়ান ফটোগ্রাফিতে এ ধরনের আলোর দেহের অস্তিত্ব ধরা পড়েছে।

কৃষ্ণসাগরের তীরবর্তী ক্রাস্নোর্দা শহরের তুখোর বিদ্যুতবিজ্ঞানী সেমিওন্ দাভিদোভিচ্ কিরলিয়ান ১৯৩৯ সালে এক বিশেষ ধরনের যে র সাহায্যে আবিষ্কার করেন যে, প্রতিটি জীবিত শরীর এবং তার যে কোনো অঙ্গপ্রত্যঙ্গ বা অংশ থেকে এক ধরনের আলোকরশ্মি বের হয়ে থাকে। তিনি ও মিসেস কিরলিয়ান এর ছবি তুলতে সক্ষম হন। তাঁরা আরো প্রমাণ করেন যে, এই আলো অসুস্থতা ও মৃত্যুর পূর্বাভাস দিতে পারে। তা হচ্ছে, চিকিৎসাবিজ্ঞানে ধরা না পড়লেও, যার শরীরে রোগের উপাদান প্রবেশ করেছে ও শীঘ্রই সে রোগাক্রান্ত হতে বা মৃত্যুবরণ করতে যাচ্ছে তার শরীর থেকে বহির্গত আলো ম্লান হয়ে থাকে।

কিরলিয়ান দম্পতি ছাড়াও মার্কিন মহিলা সাইকিক এলিন গ্যারেটও মানুষসহ সকল প্রাণীর দেহের চারদিকে কুয়াশাচ্ছন্ন আলোর আভা লক্ষ্য করেন। এর আগে খৃস্টীয় ১৯০০ অব্দের প্রথম দিকে লন্ডনের সেন্ট টমাস হাসপাতালের ডওয়াল্টার কিলনার্ লক্ষ্য করেন যে ., ডিসাইয়ানিন ডাই রঞ্জিত কাঁচের ভিতর দিয়ে তাকালে মানুষের দেহের চারপাশে উজ্জ্বল আলোর একটা আভা দেখতে পাওয়া যায়। শরীরের চারপাশে ছয় থেকে আট সেন্টিমিটার জায়গা জুড়ে এ আভা মেঘের মতো ভাসছে। এছাড়া এক শতাব্দীকাল পূর্বে বিখ্যাত জার্মান রসায়নবিদ ব্যারোন্ ভন্ রিচেনবাখ্ গবেষণা করে বলেছিলেন যে, মানুষ, গাছপালা ও পশুপাখীর শরীর থেকে এক ধরনের জ্যোতি

বের হয়। বিংশ শতাব্দীর তিরিশের দশকে সোভিয়েত বিজ্ঞানী ডআলেকজান্ডার গুরভিচ . আবিষ্কার করেন যে, জীবন্ত সব কিছু থেকেই এক ধরনের শক্তি আলোর আকারে বের হয় যা দেখা যায় না। তিনি প্রমাণ করেন যে, পিয়াযের একটি শিকড় কীভাবে দূর থেকে অন্য একটি শিকড়ে আলো বিকিরণ করে তার কোষসংখ্যা বাড়িয়ে দিচ্ছে। কবির :কিরলিয়ান ফটোগ্রাফি) আশরাফ, রহস্য পত্রিকা, জুন ১৯৮৫ - Psychic Discoveries Behind the Iron Curtain গ্রন্থ অবলম্বনে(

এ থেকে কারো মনে হতে পারে যে, উক্ত বিজ্ঞানীদের আবিষ্কার বোধ হয় স্রেফ বিশেষ ধরনের আলো যা সাধারণভাবে চোখে ধরা পড়ে না। কিন্তু প্রকৃত পক্ষে তা শরীর থেকে নির্গত নেহায়েত আলোমাত্র নয় যা অনবরত বেরোচ্ছে ও বাইরে ছড়িয়ে পড়ে অন্যান্য আলোর ন্যায় হারিয়ে যাচ্ছে। বরং এটা হচ্ছে এক ধরনের স্থির আলো যা শরীরকে ঘিরে অবস্থান করছে যদিও তার কিছুটা রশ্মি ছড়িয়ে পড়ছে। অর্থাৎ এটা শরীর থেকে নির্গত আলোমাত্র নয়, বরং এ হচ্ছে শরীরকে ঘিরে বা শরীর জুড়ে এক আলোর শরীর। কেননা "র্কিলিয়ান ফটোগ্রাফি প্রমাণ করেছে যে, মানুষের হাত বা পা কেটে ফেললেও তার আলোর হাত বা পা সেখানে রয়ে যায়।" (প্রাগুক্ত সূত্র)

এ থেকে এটাই প্রমাণিত হয় যে, কিরলিয়ান দম্পতি যা আবিষ্কার করেন তা শরীর থেকে নির্গত আলো নয়, বরং তা হচ্ছে আলোর শরীর। আরো অনেক বিজ্ঞানী এ ধারণা সমর্থন করেছেন।

"অনেক গবেষণার পর ইনুশিন্, গ্রিশ্চেংকো ও অন্য কয়েক জন রুশ বিজ্ঞানী সিদ্ধান্তে আসেন যে, সমস্ত জীবন্ত প্রাণীরই রয়েছে একটি দ্বিতীয় শরীর বা প্রতিদেহ (counter-body) যা সম্পূর্ণ বায়বীয়, ইথারীয় ও আলোকময়। তাঁরা এর নাম দিয়েছেন Biological Plasma body; এটাই হচ্ছে আসল শরীর যার মধ্য দিয়ে 'প্রাণ' বা জীবনীশক্তি চলাচল করে। যে সমস্ত ভারতীয় যোগী দাবী করেন যে, তাঁরা নিজের শরীর থেকে বের হয়ে যেতে পারেন, সম্ভবতঃ তাঁদের এই আলোর দেহটিই 'ভৌত শরীর' থেকে বের হয়ে যায়। তাঁদের ইচ্ছা মতো সেটা আবার দেহে ফেরত আসে।" (প্রাগুক্ত সূত্র(

বলা বাহুল্য যে, এটা আলোমাত্র হলে দেহের কর্তিত অঙ্গের শূন্যস্থানে আলোর অঙ্গ থাকতো না। অতএব, এটা যে, একটি অবস্তুগত দেহ তাতে সন্দেহ নেই। কিন্তু প্রশ্ন হচ্ছে, মানুষের বস্তুগত দেহের অভ্যন্তরে বা দেহকে ঘিরে বা দেহজুড়ে কি কেবল এই একটিমাত্র অবস্তুগত আলোর দেহ রয়েছে, নাকি আরো কোনো অস্তিত্ব রয়েছে যা র্কিলিয়ান ফটোগ্রাফিতেও ধরা পড়ে নি? এরূপ থাকাটাই স্বাভাবিক। আর যদি না- ই থাকে তো বলতে হবে যে, এই আলোর দেহটাই মানুষের প্রাণ বা প্রাণের কারণ।

এখানে স্মরণ করিয়ে দেয়া প্রয়োজন মনে করি যে, আমরা ইতিপূর্বে যে সব অবস্তুগত অস্তিত্ব সম্বন্ধে আলোচনা করেছি অর্থাৎ আগুন, শক্তি, আলো, বিদ্যুত ও চৌম্বক ক্ষেত্র, সেগুলো অবস্তুগত অস্তিত্ব হলেও প্রাণ বা প্রাণের বাহক নয়। কিন্তু কিরলিয়ান দম্পতি যা আবিষ্কার করলেন তা হচ্ছে প্রাণ বা প্রাণের বাহক। অর্থাৎ পর্যায় ও মর্যাদাগত দিক থেকে এটি উচ্চতর অবস্তুগত অস্তিত্ব। এমতাবস্থায় অনুরূপ উচ্চতর অবস্তুগত অস্তিত্ব, যেমন: জিন্ ও ফেরেশতার অস্তিত্ব থাকা অসম্ভব বলার কোনো উপায় নেই, যদিও আরো উচ্চতর হবার কারণে তাকে বস্তুবিজ্ঞানীদের অভিজ্ঞতার আওতায় নিয়ে আসা সম্ভব নয়।

এ পর্যায়ে এসে উল্লেখ করা যেতে পারে যে, প্রতিটি ধর্মই মানবদেহে অবস্তুগত সত্তার অস্তিত্বের কথা বলেছে। দর্শন ও ‘ইরফান্ (তাছাওউফ্)ও তা- ই বলে। তবে এরূপ অবস্তুগত সত্তার সংখ্যা ও স্বরূপ নিয়ে মতপার্থক্য রয়েছে।

সাধারণ মানুষের দৃষ্টিতে মানুষ দেহ ও আত্মার সমন্বয়ে সৃষ্ট। কিন্তু ইসলামী সূত্রে মানুষের দেহে একাধিক অবস্তুগত অস্তিত্ব থাকার কথা উল্লেখ রয়েছে। ইসলামী সূত্রে বস্তুদেহ জিসম্) - body) ছাড়াও একটি ‘সদৃশ দেহ’ (জিসমে মিছালী(, প্রাণ হায়াত)- life), মানবিক চেতনা ও (রূহ্) -ব্যক্তিসত্তা) নাফস্sel f) - এর কথা উল্লেখ করা হয়েছে। এ নিয়ে বিস্তারিত বিশ্লেষণ এখানে যরূরী নয়। সংক্ষেপে বলা যেতে পারে যে, প্রাণ সম্ভবতঃ তাই যা সর্বাবস্থায় শরীরের ন্যূনতম - সক্রিয়তা চালু রাখে এবং মৃত্যুতে তার বিলয় ঘটে; রূহ্ হচ্ছে মানবিক চেতনাশক্তি ও ইচ্ছাশক্তি যা রোগজীবাণুর মধ্যে নেই; আর নাফস্ হচ্ছে সেই ব্যক্তিসত্তা যা তিলে তিলে মানুষের মধ্যে

গড়ে ওঠে এবং ভাল বা মন্দ গুণের বা উভয় গুণের অধিকারী হয়। আর জিসমে মিছালী বা সদৃশ দেহ হচ্ছে তাই বস্তুদেহের মৃত্যুর পরে ব্যক্তির রূহ্ ও নাফস্ যাকে আশ্রয় - করে পুনরুত্থানপূর্ব অন্তর্বর্তী জগতে অবস্থান করে।

এখানে উল্লেখ্য যে, অনেক মুসলিম দার্শনিক জিসমে মিছালী বা সদৃশ দেহকে এক ধরনের সূক্ষ্ম পদার্থ (ماده لطیف)- এর দ্বারা সৃষ্ট বলে উল্লেখ করেছেন। যেহেতু তা পদার্থ বা বস্তুর সংজ্ঞায় পড়ে না সেহেতু তাঁরা একে ‘সূক্ষ্ম অস্তিত্ব’ (وجود لطیف) নামে অভিহিত করেছেন যা অস্তিত্বের স্তরগত বিচারে বস্তুর কাছাকাছি হলেও বস্তু নয়। সে হিসেবে ‘অস্তিত্ব’ তিন ধরনের: বস্তুগত অস্তিত্ব (وجود ماده), সূ^{2} অস্তিত্ব (وجود لطیف) ও অবস্তুগত অস্তিত্ব (وجود مجرد)। অবশ্য এই তিন ধরনের অস্তিত্বের প্রতিটি ভাগেরই বিভিন্ন স্তর রয়েছে এবং উচ্চতর ও নিম্নতর পর্যায় রয়েছে।

অত্র আলোচনার উপসংহারে বলতে চাই যে, বস্তুবিজ্ঞানের অভিজ্ঞতায়ও আমরা কতক অবস্তুগত সূক্ষ্ম অস্তিত্বের প্রমাণ পাই যার মধ্যে স্তর ও পর্যায়ভেদ রয়েছে - যার কোনো কোনোটি বস্তুর খুবই কাছাকাছি (যেমন: আগুন), কোনো কোনোটি বস্তুর বৈশিষ্ট্য থেকে খুবই দূরে (যেমন: চৌম্বক ক্ষেত্র) এবং কোনো কোনোটি তার চেয়েও উন্নততর ও প্রাণশীল (যেমন: মানুষের আলোর শরীর)। এমতাবস্থায় আরো উচ্চতর বস্তু- উর্ধ অস্তিত্ব, যেমন: জিন, রূহ্ ও ফেরেশতার অস্তিত্ব থাকার জোর সম্ভাবনা স্বীকার করতে হয়। সর্বোপরি সকল প্রকার বস্তু ও বস্তুসদৃশতার সীমাবদ্ধতা থেকে মুক্ত অবস্তুগত অপরিহার্য সত্তা এক মহাজ্ঞানময় সৃষ্টিকর্তার অস্তিত্ব অস্বীকার করার কোনোই উপায় নেই।

মানবিক বিচারবুদ্ধি আত্মা বা নাফস্ ও সৃষ্টিকর্তার অস্তিত্ব অকাট্যভাবে প্রমাণ করার পরেও জীবন ও জগতের উৎস সম্পর্কে বিজ্ঞানের নামে বস্তুবাদীদের পক্ষ থেকে প্রদত্ত কাল্পনিক ব্যাখ্যা যাদের বিচারবুদ্ধির সামনে অন্ধত্বের দেয়াল সৃষ্টি করায় তারা বিচারবুদ্ধির রায় উপেক্ষা করে অবস্তুগত অস্তিত্ব অস্বীকার করে চলেছে, তাদের অন্ধত্বের দেয়াল চুরমার করে দেয়ার জন্য বস্তুবিজ্ঞানের অভিজ্ঞতা থেকে পেশকৃত আমাদের প্রমাণসমূহই যথেষ্ট হওয়া উচিত। এরপরও যদি কেউ বস্তু

ছাড়া অন্য কিছুর অস্তিত্ব অস্বীকার করেই চলে তো তাদের প্রসঙ্গে বলতে হয়: যার চোখে ছানি পড়েছে তার দৃষ্টি ফিরিয়ে দেয়া যায়, কিন্তু যার চোখই উৎপাটিত হয়েছে তাকে দৃষ্টি ফিরিয়ে দেয়ার উপায় নেই।

বিশ্বলোকে স্রষ্টার অস্তিত্বের নিদর্শন

এ বিশ্বলোকের উৎস যে এক অবস্তুগত অপরিহার্য সত্তা, এটা মানবিক বিচারবুদ্ধির অকাট্য রায়। বিচারবুদ্ধি বিভিন্ন পন্থায় এ সত্যে উপনীত হয়। অবশ্য এর মধ্যে কতক পন্থা কিছুটা জটিল এবং উচ্চতর বুদ্ধিবৃত্তিকতার সাথে জড়িত, আবার কতক পন্থা খুবই সহজ- সরল। তবে সহজ- সরল মানেই গুরুত্বহীন নয়। কারণ, অনেক সময় যা সহজলভ্য তার গুরুত্ব দুর্লভের তুলনায়ও বেশী হয়ে থাকে। যেমন: খাদ্যের তুলনায় পানি সহজলভ্য, কিন্তু প্রাণ বাঁচাতে তার গুরুত্ব খাদ্যের চেয়ে বেশী। তেমনি পানির তুলনায় বায়ু অধিকতর সহজলভ্য, কিন্তু বেঁচে থাকার জন্যে তার গুরুত্ব পানির তুলনায় বহু গুণে বেশী।

অনুরূপভাবে বিচারবুদ্ধি যে সব সহজ- সরল পন্থায় জীবন ও জগতের উৎসের সন্ধান দেয় তা সুস্থ ও নিষ্কলুষ বিচারবুদ্ধির অধিকারী সরলমনা মানুষের নিকট সহজে গ্রহণযোগ্য হলেও যাদের বিচারবুদ্ধির ওপর ভ্রান্ত জ্ঞানের পর্দা পড়েছে সেই পাণ্ডিত্যাভিমানী নাস্তিকরা তাতে সন্তুষ্ট হতে পারে না। কারণ, তাদের দৃষ্টিতে যা অত্যন্ত জটিল প্রশ্ন, তার সহজ জবাব তথা জটিল সমস্যার সহজ সমাধান তাদের মনে খুঁতখুঁতে ভাব সৃষ্টি করে। কিন্তু বিচারবুদ্ধির সহজ জবাব নিয়ে খানিকক্ষণ চিন্তা করলেই এ জবাবের সহজতায় মনের মধ্যে খুঁতখুঁতে ভাব সৃষ্টির পরিবর্তে এহেন সহজ জবাবটি ইতিপূর্বে দৃষ্টি এড়িয়ে যাওয়ায় বিস্মিত হওয়া ছাড়া গত্যন্তর থাকে না।

নাস্তিকরা জীবন ও জগতের মূলে নিহিত রহস্য উদঘাটনে শোচনীয়ভাবে ব্যর্থ হয়েছে। জীবন ও জগতের উৎস সম্পর্কে তারা যা কিছু এ পর্যন্ত দাবী করেছে তা না তাদের অভিজ্ঞতার ফসল, না তা তাদের গবেষণাগারে পরীক্ষা- নিরীক্ষার ফসল। তা সত্ত্বেও তারা অত্যন্ত হাস্যস্করভাবে তাদের এতদসংক্রান্ত কাল্পনিক ধারণাকে 'বৈজ্ঞানিক ধারণা' বলে দাবী করেছে। অথচ পর্যবেক্ষণ ও পরীক্ষা - এ দু'য়ের বাইরে প্রাপ্ত কোনো তথ্য বা প্রদত্ত কোন বক্তব্য বস্তুবিজ্ঞানের আওতায় আসে

না এবং 'বিজ্ঞান' পরিভাষাটি যখন 'বস্তুবিজ্ঞান' অর্থে ব্যবহৃত হয় (যদিও আমাদের দৃষ্টিতে তা ভুল ব্যবহার) তখন এরূপ কোনো ধারণা 'বৈজ্ঞানিক ধারণা' হিসেবে বিবেচিত হতে পারে না।

এর চেয়েও বিড়ম্বনাকর বিষয় হলো, তারা তাদের নাস্তিকতার যথার্থতা প্রমাণ করতে গিয়ে গতকাল যে কাল্পনিক দাবী পেশ করেছে, আজ তার কাল্পনিকতা ধরা পড়ে যাওয়ায় তারা তা বাতিল করে দিয়ে নতুন কাল্পনিক দাবী পেশ করছে এবং সন্দেহ নেই যে, আগামী কাল তাদের আজকের দাবীর ভ্রান্তি ধরা পড়ে যাবার পর তারা নতুন অন্য কোনো কাল্পনিক দাবী পেশ করবে। আসলে নাস্তিকরা তাদের নাস্তিকতার প্রশ্নে অন্ধবিশ্বাসী বা কুসংস্কারাচ্ছন্ন। তাই তারা যে কোনো মূল্যে তাদের নাস্তিকতার দাবীকে প্রমাণিত বলে দেখানোর জন্যে যে কোন ধরনের গোঁজামিলের আশ্রয় নিতে দ্বিধাবোধ করে না। তাই একবার তাদের দাবী: বিশ্বলোকের আদি উৎস 'স্রেফ বস্তু'; বস্তুর সৃষ্টিও নেই, ধ্বংসও নেই; আদিতে ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়াবিহীন এ 'স্রেফ বস্তু'তে আলোড়ন বা বিস্ফোরণ সৃষ্টি এবং তার ফলে উদ্ভূত ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার পরিণতিতে লক্ষ-কোটি বছরের ব্যবধানে বিশ্বলোক রূপ পরিগ্রহ করেছে ও বর্তমান অবস্থায় এসে দাঁড়িয়েছে।

কিন্তু তাদেরকে যখন প্রশ্ন করা হয় যে, তোমাদেরই দাবী অনুযায়ী এ বস্তুজগত যখন 'কারণ ও ফলাফল' (cause and effect) বিধির অধীন (ই -এবং আসলেও তা), তখন আদি কালের সেই ক্রিয়াপ্রতিক্রিয়াহীন নিথর 'স্রেফ বস্তু' কোন্ কারণে এবং কোন্ উৎস থেকে কীভাবে উৎসারিত হয়েছিলো? তখন তারা এ প্রশ্নের জবাব দিতে পারে নি। তেমনি তারা এ প্রশ্নেরও জবাব দিতে পারে নি যে, আদি কালের সেই ক্রিয়াপ্রতিক্রিয়াহীন নিথর 'স্রেফ বস্তু'তে কোন্ কারণে প্রথম বারের মতো আলোড়ন সৃষ্টি বা বিস্ফোরণ সংঘটিত হলো? কথিত এ আলোড়ন কে সৃষ্টি করলো বা এ বিস্ফোরণ কে ঘটালো? কোন্ নিয়ম বা বিধির অধীনে কথিত এ আলোড়ন বা বিস্ফোরণ সংঘটিত হলো? আর কে সেই কথিত আলোড়ন বা বিস্ফোরণের বিধি ও তার পরবর্তীতে কার্যকর প্রাকৃতিক বিধিবিধান প্রণয়ণ করলো যার পরিণতিতে এ অত্যন্ত জটিল ও বিস্ময়কর বিশ্বজগত রূপলাভ করলো?

পরবর্তীকালে বস্তুর বাইরে সর্বত্র বস্তুবহির্ভূত অস্তিত্বসমূহ, বিশেষ করে শক্তির মহাসমারোহের সন্ধান পাবার পর নাস্তিক বিজ্ঞানীরা সৃষ্টির উৎস ও সূচনা সংক্রান্ত তাদের নাস্তিক্যবাদী তত্ত্বকে পরিবর্তিত রূপে উপস্থাপন করে। এখন আর তারা সৃষ্টিপ্রক্রিয়া শুরুর পূর্বে সর্বত্র নিথরনিশ্চল - ক্রিয়াপ্রতিক্রিয়াহীন সীমাহীন 'স্রেফ বস্তু'র অস্তিত্ব ছিলো বলে দাবী করে না, বরং সীমাহীন সম্ভাবনাযুক্ত 'আদি বস্তুকণিকা'র (primary particle) কথা বলে এবং বিগ্ ব্যাং বা এক মহাবিস্ফোরণের মাধ্যমে সৃষ্টির সূচনা হয়েছে বলে দাবী করে থাকে।

অবশ্য বিগ্ ব্যাং তত্ত্ব খণ্ডন করা সৃষ্টিকর্তার অস্তিত্ব প্রমাণের জন্যে অপরিহার্য নয়। কারণ, সৃষ্টিকর্তা যদি একটি আদি বস্তুকণা বা একটি আদি পরমাণুর মাধ্যমে গোটা সৃষ্টিলোককে পর্যায়ক্রমে অস্তিত্ব দান করে থাকেন এবং বিগ্ ব্যাং- এর মাধ্যমে সে সৃষ্টিকর্মের সূচনা করে থাকেন তো তাতে সমস্যা কোথায়? যে সৃষ্টিকর্তা সীমাহীন জ্ঞান ও শক্তি- ক্ষমতার অধিকারী - যে কারণে তিনি কোনো উপায়- উপাদান ছাড়াই সৃষ্টি করতে সক্ষম, বরং উপায়- উপাদানেরই স্রষ্টা; যিনি সৃষ্টিকর্ম সম্পাদনের জন্যে কোনোরূপ নিয়ম বা বিধির অনুসরণে বাধ্য নন, বরং স্বয়ং নিয়ম ও বিধির স্রষ্টা, তিনি তো যেমন খুশী ও যেভাবে খুশী সৃষ্টি করবেন। তাঁর সম্বন্ধে তো বলা চলে না যে, তিনি প্রতিটি বস্তু ও প্রজাতিকে আলাদা আলাদাভাবে সৃষ্টি করতে বাধ্য, অতএব, বিগ্ ব্যাং- এর মাধ্যমে 'আদি বস্তুকণিকা' থেকে বিশ্বলোক সৃষ্টি হয়ে থাকলে প্রমাণিত হবে যে, কোনো সৃষ্টিকর্তা ছাড়াই বিশ্বজগৎ সৃষ্টি হয়েছে।

কিন্তু পরিহাসের বিষয় এই যে, বিজ্ঞানমনস্ক হবার দাবীদার নাস্তিক্যবাদীরা তাদের নাস্তিক্যবাদে অন্ধ বিশ্বাসী বিধায় তারা কথিত এ 'আদি বস্তুকণিকা ও বিগ্ ব্যাং'- এর তত্ত্বকে স্রষ্টার অস্তিত্ব অস্বীকৃতির অবলম্বন হিসেবে গ্রহণ করছে। তাই অত্যন্ত ন্যায়সঙ্গতভাবেই তাদেরকে প্রশ্ন করা যেতে পারে যে, কথিত এ আদি বস্তুকণিকার উৎস কী? তাদের কাছে এ প্রশ্নের কোনো সন্তোষজনক জবাব নেই। তারা বলে :"এটি ছিলো।" প্রশ্ন হচ্ছেএটি কোত্থেকে এলো যে :, বলবো, "ছিলো"? 'বস্তু যখন 'কারণ ও ফলাফল' (cause and effect) বিধির অধীন তখন কথিত এ আদি বস্তুকণিকাকেও কোথাও থেকে বা কারো কাছ থেকে অস্তিত্ব লাভ করতে হবে।

কারণ, পরিবর্তনশীল বস্তুকণিকা আদিতে অপরিবর্তিতরূপে অস্তিত্বমান ছিলো, অস্তিত্ব 'লাভ করে নি' - এটা পুরোপুরি অসম্ভব ব্যাপার। বরং পরিবর্তনশীলতার গতিধারার ও ধারাবাহিকতার দাবীই হচ্ছে এই যে, যেহেতু সে পরিবর্তনশীল অস্তিত্ব সেহেতু সে ছিল না, বরং অস্তিত্ব লাভ করেছে অর্থাৎ তাকে কেউ অস্তিত্বদান করেছে এবং অস্তিত্ব লাভের পর মুহূর্ত থেকেই সে পরিবর্তিত হয়ে চলেছে, অবশ্য সুনির্দিষ্ট নিয়মবিধির অধীনে -, যে নিয়মবিধি সে - নিজে সৃষ্টি করে নি।

সৃষ্টি মানেই তার স্রষ্টা আছে

বিচারবুদ্ধি অত্যন্ত সহজ- সরল পন্থায় একই উপসংহারে উপনীত হয় এভাবে যে, যেহেতু বিশ্বলোক অস্তিত্বমান রয়েছে এবং তা সুনির্দিষ্ট নিয়ম- বিধি অনুসরণ করে চলেছে, সেহেতু অবশ্যই এর পিছনে সীমাহীন জ্ঞান ও শক্তি- ক্ষমতার অধিকারী একজন স্রষ্টার অস্তিত্ব রয়েছে।

এই সহজ- সরল যুক্তি আমাদের দৃষ্টিকে যেদিকে আকৃষ্ট করে তা আমাদেরকে বিস্ময়ে হতবাক করে দেয়। এ যুক্তি দু'টি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের প্রতি আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। তা হচ্ছে, এ সৃষ্টিলোক ও তাতে কার্যকর নিয়ম- বিধানসমূহ।

বিজ্ঞানীরা শতাব্দীর পর শতাব্দী সাধনা করে এ সৃষ্টিলোক সংক্রান্ত অনেক তথ্য ও অনেক প্রাকৃতিক বিধিবিধান উদঘাটন করেছেন। শুধু তা- ই নয়, তাঁরা অসংখ্য নতুন জিনিস তৈরী করেছেন। অবশ্য এমন নয় যে, তাঁরা শূন্য থেকে কিছু সৃষ্টি করেছেন বা নিজেরাই কোনো নতুন প্রাকৃতিক বিধান তৈরী করে তার ভিত্তিতে কিছু তৈরী করেছেন। বরং তাঁরা প্রকৃতিতে নিহিত উপাদান ব্যবহার করে এবং পূর্বে অজ্ঞাত বিভিন্ন প্রাকৃতিক বিধান উদঘাটন করে তা কাজে লাগিয়ে এসব জিনিস তৈরী করেছেন। তবে বিজ্ঞানীরা স্বীকার করেন যে, এ সৃষ্টিলোকে বিদ্যমান অনেক কিছু তাঁরা এখনো আবিষ্কার করতে পারেন নি এবং প্রাকৃতিক জগতে এখনো অনেক প্রাকৃতিক বিধান তাঁদের জানার বাইরে রয়ে গেছে। কিন্তু তা সত্ত্বেও তাঁরা এ পর্যন্ত প্রাকৃতিক জগতের যা কিছু আবিষ্কার করেছেন ও যতো প্রাকৃতিক বিধানের ওপর থেকে অজানার পর্দা উন্মোচন করতে সক্ষম হয়েছেন কেবল তার ভিত্তিতেই যদি কেউ এ বিশ্বলোকের বিশালতা, তার অভ্যন্তরস্থ সৃষ্টিনিচয়ের সূক্ষ্মতা এবং তাতে কার্যকর প্রাকৃতিক বিধিবিধানমূহের ব্যাপকতা, সূক্ষতা, জটিলতা ও নিখুঁত- নির্ভুলতা অনুভব করার চেষ্টা করে তাহলে খুব শীঘ্রই তার চিন্তাশক্তি ক্লান্ত হয়ে পড়তে বাধ্য। এ সুবিশাল সৃষ্টিলোক, তার অভ্যন্তরস্থ ক্ষুদ্র থেকে ক্ষুদ্রতম ও বৃহৎ থেকে বৃহত্তম সৃষ্টিসমূহ এবং সৃষ্টিলোকে কার্যকর নিখুঁত, সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম ও অত্যন্ত জটিল বিধিবিধানসমূহ কি কোনো মহাজ্ঞানময় সৃষ্টিকর্তা ছাড়া অস্তিত্বলাভ করতে পারে? বরং বলতে

হবে যে, এর সব কিছুই একজন মহাজ্ঞানময় মহান সৃষ্টিকর্তার অস্তিত্বেরই নিদর্শন; এ সব কিছুই স্বীয় অস্তিত্বের দ্বারা তাঁরই অস্তিত্ব ঘোষণা করছে।

মানুষ আজ মঙ্গল গ্রহে যাবার চেষ্টা করছে। আগামী দিনে সেখানে গিয়ে যদি তারা কোনো পর্বতশীর্ষে একটি কম্পিউটার দেখতে পায়, তাহলে তারা কী উপসংহারে উপনীত হবে? তারা কি বলবে যে, "এটি এমনি এমনিই সৃষ্টি হয়েছে।"? নাকি বলবে যে, "কেউ এটা সৃষ্টি করেছে।"? তারা সমগ্র মঙ্গল গ্রহে অনুসন্ধান চালিয়েও যদি এরূপ একটা কম্পিউটার তৈরীর উপযুক্ত কোনো প্রাণীর সন্ধান না পায়, তখন তারা এ ব্যাপারে কী ধারণা করবে? তখন তাদের সামনে তিনটি সম্ভাব্য জবাব থাকবেএর স্রষ্টা কালের প্রবাহে মঙ্গলের মাটির (১) : সাথে মিশে গেছে, কিন্তু তার সৃষ্টি রয়ে গেছে, অথবা নো গ্রহ থেকে অথবা অন্য কোনো তৃতীয় কো (২) নক্ষত্রলোক থেকে কোনো বুদ্ধিমান প্রজাতির প্রাণী এসেছিলো বা পৃথিবী থেকেই গোপনে কেউ এসেছিলো এবং সে বা তারা এটি রেখে চলে গেছে, অথবা এর স্রষ্টা এই মঙ্গল গ্রহেই (৩) আমাদেরআশেপাশেই রয়েছে, কিন্তু আমাদের এবং তার বা তাদের অস্তিত্বের মধ্যে মাত্রাগত (dimensional) পার্থক্যের কারণে আমরা তাকে বা তাদেরকে খুঁজে পাচ্ছি না।

কম্পিউটার তো এক বিরাট জটিল ব্যাপার; এমনকি সেখানে যদি একটা ক্ষুদ্র আলপিন- ও পাওয়া যায় তাহলেও তারা এই একই উপসংহারে উপনীত হবে এবং ধরে নেবে না যে, কোনো স্রষ্টা ছাড়া নিজে নিজেই আলপিনটি সৃষ্টি হয়েছে।

কিন্তু কী আশ্চর্য! অসংখ্য বিস্ময়কর সৃষ্টিতে গোটা প্রাকৃতিক জগৎ ভরপুর এবং তার প্রায় প্রতিটি সৃষ্টিই কম্পিউটারের চেয়ে বিস্ময়কর, কিন্তু তা সত্তে¡ ও নাস্তিক লোকেরা এ বিশ্বজগতের পিছনে কোনো মহাজ্ঞানময় স্রষ্টার অস্তিত্ব মানতে রাযী নয়।

সৃষ্টিলোকের আয়তন ও বস্তুর গঠনকাঠামো

সৃষ্টিলোকের ব্যাপকতা কতোখানি?

এ পর্যন্ত মানবিক জ্ঞান সৃষ্টিলোকের যতোখানি সম্বন্ধে জানতে পেরেছে তারই আয়তন চতুর্দিকে বিলিয়ন বিলিয়ন আলোকবর্ষের দূরত্ব। তবে নক্ষত্রবিজ্ঞানীগণ স্বীকার করেন যে, নিঃসন্দেহে তাঁদের জ্ঞানের বাইরেও সৃষ্টিলোকের ব্যাপ্তি বিরাজমান।

এবার সৃষ্টিলোকের আয়তনের পরিবর্তে বিভিন্ন ধরনের সৃষ্টির প্রতি, বিশেষ করে বৃহত্তম ও ক্ষুদ্রতম সৃষ্টির প্রতি তাকানো যাক। বৃহত্তম সৃষ্টির দৃষ্টান্ত হচ্ছে নক্ষত্র ও ছায়াপথসমূহ। আর ক্ষুদ্রতম সৃষ্টি হচ্ছে পরমাণু - সাম্প্রতিক বৈজ্ঞানিক ধারণায় ইলেক্ট্রন, প্রোটন ও নিউট্রন। আমাদের বাসস্থান এই পৃথিবীর বুকে বিরাজমান প্রাণশীল বা সচল সৃষ্টির মধ্যে ক্ষুদ্রতম হচ্ছে কোনো কোনো ধরনের রোগজীবাণু এবং বৃহত্তম হচ্ছে এক ধরনের তিমি মাছ। তবে এ বিশাল সৃষ্টিলোকের অন্য কোথাও প্রাণের অস্তিত্ব আছে কিনা এবং থাকলে আমাদের এ পৃথিবীর ক্ষুদ্রতম ও বৃহত্তম প্রাণশীল সৃষ্টির তুলনায় ক্ষুদ্রতর ও বৃহত্তর প্রাণশীল সৃষ্টি আছে কিনা তা আমাদের জানা নেই, তবে থাকা অসম্ভব নয়।

আমরা আমাদের অভিজ্ঞতার জগতে যে সব সৃষ্টিকে ইন্দ্রিয়নিচয় দ্বারা বা জ্ঞানগতভাবে প্রত্যক্ষ করছি তার মৌলতম গঠনকাঠামোতে এমন বিস্ময়কর বৈচিত্র্য রয়েছে যে সম্পর্কে চিন্তা করলে আমাদের সকল সাধারণ জ্ঞান মিথ্যা প্রমাণিত হবে। উদাহরণস্বরূপ, আমরা জড় পদার্থকে কঠিন, তরল ও বায়বীয় এই তিন রূপে দেখতে পাই, তবে কোনো কোনো পদার্থ তাপমাত্রা ভেদে রূপ পরিবর্তন করে উপরোক্ত তিন রূপই পরিগ্রহ করে। আমরা কঠিন (solid) বস্তুকে সংবদ্ধ 'বস্তুকণাসমূহ' বলে ধারণা করি, কিন্তু প্রকৃত পক্ষে তা মোটেই সংবদ্ধ নয়; যে কোনো কঠিন বস্তুরই অণুসমূহের মধ্যে বিরাট ফাঁক রয়েছে যদিও আমরা চর্মচক্ষে তা দেখতে পাই না। পদার্থের অণুসমূহের প্রকৃত আয়তন ও তার মধ্যকার ফাঁকের আয়তনের অনুপাত কেমন? অবিশ্বাস্য

হলেও সত্য যে, এই ফাঁকসমূহ পুরোপুরি দূর করে পদার্থের অণুগুলোকে প্রকৃতই সংবদ্ধ করতে পারলে আমাদের এই পৃথিবীর আকার হয়তো একটি ফুটবলের চেয়েও ছোট হবে।

শুধু তা- ই নয়, আরো বিস্ময়ের ব্যাপার হলো এই যে, প্রতিটি বস্তুর অণুই কতগুলো পরমাণু সমবায়ে গঠিত। আর প্রতিটি পরমাণু গঠিত এক বা একাধিক প্রোটন ও নিউট্রন এবং তাকে কেন্দ্র করে ইলেক্ট্রনের আবর্তনের দ্বারা।

প্রায় উপবৃত্তাকারভাবে ইলেক্ট্রনের আবর্তন এমন এবং এতোই দ্রুতগতি যে, তার ফলে একটিমাত্র ইলেক্ট্রনই একটি প্রোটনের চারদিকে একটি দুর্ভেদ্য খোলস তৈরী করতে সক্ষম। প্রকৃত পক্ষে এ খোলসটি স্বয়ং কোনো প্রকৃত বস্তু নয়; কেবল দ্রুতগতি ঘূর্ণনের কারণে ইলেক্ট্রনটি সময়ের অত্যন্ত ক্ষুদ্র অংশের মধ্যেই তার ঘূর্ণনপথের প্রতিটি বিন্দুতে প্রত্যাবর্তন করে বিধায় খোলসরূপ এ আপেক্ষিক অস্তিত্বের উদ্ভব ঘটে।

বিষয়টি একটি বৈদ্যুতিক পাখার ব্লেডগুলোর ঘূর্ণন থেকে বুঝা যেতে পারে। একটি বৈদ্যুতিক পাখার তিনটি বা চারটি ব্লেড থাকে এবং প্রতি দুই ব্লেডের মাঝখানে বিরাট জায়গা ফাঁকা থাকে। পাখাটি যখন বন্ধ থাকে তখন খুব সহজেই দুই ব্লেডের মাঝখান দিয়ে তার কেন্দ্রে অবস্থিত বডি স্পর্শ করা যেতে পারে। কিন্তু পাখাটি চালু থাকা অবস্থায় কেউ কোনো লাঠি দ্বারা যে কোনো দুই ব্লেডের মাঝখান দিয়ে পাখাটির বডিতে আঘাত করার চেষ্টা করলে তাতে সফল হবে না; পাখার ব্লেডগুলো একটি চাকতির ন্যায় কাজ করবে এবং পাখার বডি পর্যন্ত লাঠিটির পৌঁছা প্রতিহত করবে। মজার ব্যাপার হলো, পাখাটির ব্লেডগুলোর ঘূর্ণনের গতি যদি শতগুণ বাড়িয়ে দেয়া যায় তাহলে বাহ্যতঃ তা পুরাপুরি চাকতিতে পরিণত হবে এবং ব্লেডগুলা অবিশ্বাস্য অল্প সময়ে তার পরিধি- পথের প্রতিটি বিন্দুতে ফিরে আসার ফলে কারো পক্ষে তার গতি অনুভব করাই সম্ভব হবে না, বরং তাকে একটি গতিহীন কঠিন চাকতি বলে মনে হবে এবং হাত দিয়ে স্পর্শ করলেও তা- ই মনে হবে; ঘূর্ণনরত পাখায় হাত দেয়ার যে বিপদ তা- ও ঘটবে না। তা সত্ত্বেও এটা অনস্বীকার্য যে, সেখানে কোনো চাকতির অস্তিত্ব নেই। কারণ, তার গতি বন্ধ হয়ে গেলে বা হ্রাস পেয়ে স্বাভাবিক পর্যায়ে চলে এলেই তার প্রকৃত অবস্থা প্রকাশ পাবে। পাখার ব্লেডের প্রান্তভাগ

সমতলে অঙ্কিত বৃত্তের পরিধির ন্যায় পথে ঘুরে প্রতিবার ঘূর্ণনের সূচনাবিন্দুতে ফিরে আসে বিধায় সে একটি আপেক্ষিক চাকতি তৈরী করে।

কিন্তু পরমাণুকেন্দ্রের চতুর্দিকে পরিক্রমণরত ইলেক্ট্রন বৃত্তাকার পথে নয়, বরং প্রায় উপবৃত্তাকার পথে ঘুরতে থাকে বিধায় সে প্রতিবার ঘূর্ণনের সময়ই তার পূর্ববর্তী ঘূর্ণনপথের বিন্দুগুলো থেকে কিছুটা দূর দিয়ে অতিক্রম করে, ফলে তার ঘূর্ণনপথের রেখাগুলো একটি বলের ওপর সূতা জড়িয়ে বলটিকে ঢেকে দেয়ার মতো একটি আপেক্ষিক বল তৈরী করে। এক্ষেত্রে উক্ত ইলেক্ট্রন ও প্রোটনের প্রকৃত আয়তনের যোগফলের তুলনায় ঐ আপেক্ষিক খোলসটির আয়তন হয় অনেক বেশী (হয়তো হাজার হাজার গুণ বেশী)। আর প্রোটন, নিউট্রন ও ইলেক্ট্রন সম্বলিত এই আপেক্ষিক বলটিই পরমাণু নামে পরিচিত।

ইলেক্ট্রন, প্রোটন ও নিউট্রনের সংখ্যা ও বিন্যাস (pattern of combination) ভেদে বিভিন্ন ধরনের পরমাণু রয়েছে যা দ্বারা বিভিন্ন মৌলিক পদার্থ সৃষ্টি হয়েছে। এ ছাড়াও রয়েছে বিভিন্ন ধরনের আলো ও শক্তি। কিন্তু বিস্ময়ের এখানেই শেষ নয়; পরমাণুকেন্দ্রের একেকটি প্রোটন ও নিউট্রন গঠিত হয় আঠারো রকমের কোয়ার্কের মধ্য থেকে তিনটি কোয়ার্ক নিয়ে। কিন্তু কোয়ার্ক এবং ইলেক্ট্রনও অন্য কিছুর দ্বারা গঠিত যৌগিক সৃষ্টি কিনা বিজ্ঞান সে সম্পর্কে এখনো কিছু বলতে পারে নি। প্রশ্ন হচ্ছে, বস্তুর মূল উপাদানের এহেন বিস্ময়কর গঠনকাঠামো গড়ে ওঠা কি কোন মহাবিজ্ঞানী ও মহাশক্তিমান সৃষ্টিকর্তা ছাড়া আদৌ সম্ভবপর?

কোন্ সে কুশলী শিল্পী?

আমরা এখানে সৃষ্টিলোকের সীমাহীন বিস্ময়ের মধ্যে বিক্ষিপ্তভাবে কতোগুলো বিস্ময়ের ওপর দৃষ্টিপাত করবো।

উদ্ভিদ প্রজাতিসমূহের মধ্যে বৈচিত্র্য, অর্থনৈতিক ও পরিবেশগত কল্যাণকারিতা, পুষ্টি ও রোগনিরাময়ক্ষমতা, শিল্প- সভ্যতায় এ সবের অবদান ইত্যাদি নিয়ে দীর্ঘ আলোচনা করা যেতে পারে। আমরা সেদিকে না গিয়ে যদি শুধু এর সৌন্দর্যের দিকে তাকাই তো আমাদেরকে ভেবে

বিস্মিত হতে হয় যে, কতো বড় শিল্পী তিনি যিনি এ পৃথিবীকে উদ্ভিদরাজি দিয়ে এমন সুন্দর করে সাজিয়েছেন!

উদ্ভিদরাজির সামগ্রিক সৌন্দর্য ছাড়াও বিভিন্ন উদ্ভিদের নিজস্ব সৌন্দর্য পর্যবেক্ষণ করলে অধিকতর বিস্মিত হতে হয়। কতক উদ্ভিদের গঠনপ্রকৃতি দেখে মনে হয়, কোনো সুনিপুণ শিল্পী বিশেষভাবে তাঁর পসন্দমাফিক একে সৃষ্টি করেছেন। 'সার্ভ্' নামক এক প্রকার চিরহরিৎ বৃক্ষ আছে যা প্রায় একশ' ফুট পর্যন্ত উঁচু হয়ে থাকে। কিন্তু ছোটবড় সর্বাবস্থায়ই দূর থেকে দেখে - মনে হয় যে, একটি বিশালায়তন কলার মোচাকে বোঁটা নীচের দিকে রেখে দাঁড় করিয়ে রাখা হয়েছে। পান্থপাদক গাছের (traveller's tree) দিকে লক্ষ্য করে চিন্তা করে দেখেছেন কি কীভাবে সে তার ডাগরগুলোকে দুই বিপরীত দিকে বিন্যস্ত করে বিস্তার করে দিয়েছে এবং ভুলেও অপর দুই দিকে একটি ডাগরও বিস্তৃত হচ্ছে না!? এর চেয়েও বিস্ময়কর এক ধরনের ছোট পুস্প - উদ্ভিদ যার ফুলের পাপড়িগুলো পূর্ণ বিকশিত হলে দেখা যায় যে, ফুলটির কেন্দ্রস্থল থেকে সবগুলো পাপড়ির গোড়ার দিক জুড়ে একটি কালো প্রজাপতি অঙ্কিত রয়েছে, যেন কোনো খেয়ালী শিল্পী রংতুলি দিয়ে ফুলটির বুকে প্রজাপতির ছবি এঁকে দিয়েছেন। -

কোন্ সে শিল্পী যিনি ফুলের বুকে এভাবে প্রজাপতি আঁকেন? নাকি কোনো শিল্পী ছাড়াই এমনি এমনিই ফুলের বুকে এ ধরনের ছবি অঙ্কিত হয়ে যাচ্ছে?

কাঁচ গলিয়ে পেপারওয়েট বানানোর সময় যে কারিগর (আসলে শিল্পী) তার মাঝে সুপরিমিতভাবে রং ফুঁকে দিয়ে চমৎকার ফুল তৈরী করেন তাঁর কর্মকুশলতা ভেবে আমরা চমৎকৃত হই। একজন আতশবাযী প্রস্তুতকারক এমনভাবে রঙিন বারূদ বিন্যস্ত করে আতশবাযী তৈরী করেন যে, অগ্নিসংযোগের পর সেটি আকাশে উঠে একটি মনোরম সৌন্দর্যের অধিকারী ফুল বা অন্য কোন দৃশ্য তৈরী করলে আমরা চমৎকৃত হয়ে তার প্রশংসা করি। আতশবাযীটি তৈরী করার সময় হাযির না থাকলেও আমরা আকাশে তা দেখেই তার পিছনে কুশলী শিল্পীর অস্তিত্ব সম্পর্কে নিশ্চিত হই; কখনো মনে করি না যে, এটি এমনি এমনিই তৈরী হয়েছে। কিন্তু

পাশাপাশি রঙ ও বারূদ রাখা আছে এমন একটি গুদামে আগুন লেগে গেলে তা থেকে কেউ কখনো এ ধরনের দৃশ্যের উৎপত্তি হতে দেখে নি, যদিও তা- ও কার্যকারণবিহীন নয়, তবে তার পিছনে কোনো কুশলী শিল্পীর পরিকল্পনা থাকে না বলেই তাতে কোনো সুন্দর দৃশ্য তৈরী হয় না। কিন্তু কী আশ্চর্য! আমরা আতশবাযী দেখে তার পিছনে একজন শিল্পীর অস্তিত্ব স্বীকার করি বটে, কিন্তু ফুলের বুকে প্রজাপতির ছবি অঙ্কিত দেখে আমরা প্রীত বোধ করলেও তার পিছনে কোনো কুশলী শিল্পীর কম্পিউটারাইজড্ প্রোগ্রাম থাকার কথা মানতে চাই না!

সৃষ্টিলোকের বিস্ময় ক্ষুদ্রতম পিপিলিকা

খালি চোখে দেখার মতো ক্ষুদ্রতম প্রাণশীল সৃষ্টি হচ্ছে এক ধরনের ছোট পিঁপড়া যার শরীর একগাছি চুলের চেয়ে বেশী মোটা নয় এবং দৈর্ঘে সম্ভবতঃ এক সেন্টিমিটারের এক দশমাংশের বেশী নয়। আর তার পাগুলো তুলার আঁশের মত সরু, ফলে সে যখন পথ চলে তখন তার পাগুলো হাল্কা ছায়ার মতো মনে হয়। যে কোনো পিঁপড়াই তার শরীরের ওযনের তুলনায় কয়েক গুণ বেশী ওযন অনায়াসে বহন করে নিয়ে যেতে পারে। শরীরের আয়তন ও ওযনের প্রেক্ষাপটে বিবেচনা করলে সম্ভবতঃ পিঁপড়াই সর্বাধিক ভার বহনক্ষম প্রাণী বলে প্রমাণিত হবে। তেমনি শরীরের দৈর্ঘ্য অনুপাতে পথ অতিক্রমের বিবেচনায় সম্ভবতঃ পিঁপড়াই প্রাণীকুলের মধ্যে সর্বাধিক দ্রুতগামী। শুধু তা- ই নয়, পিঁপড়া হচ্ছে সমাজবদ্ধ জীবন যাপনকারী প্রাণী যার সমাজবদ্ধতার মান মানুষের সমাজবদ্ধতার মানের সমান না হলেও খুবই কাছাকাছি। তেমনি পিঁপড়ারা অত্যন্ত বুদ্ধিমান প্রাণী, যদিও মানুষের মতো বুদ্ধিমান নয়।

ক্ষুদ্রতম প্রজাতির পিঁপড়া ও বৃহত্তম প্রাণশীল সৃষ্টি তিমির মাঝখানে অসংখ্য প্রাণশীল সৃষ্টি রয়েছে। প্রকৃত পক্ষে সৃষ্টিলোকে প্রাণশীল সৃষ্টিপ্রজাতিসমূহের সংখ্যা ও তার প্রকরণ সম্পর্কে সঠিক ধারণা লাভ করা এখনো মানুষের পক্ষে সম্ভব হয় নি। এ পর্যন্ত যে সব প্রজাতিকে চিহ্নিত করা সম্ভব হয়েছে তার এক অসম্পূর্ণ পরিসংখ্যান অনুযায়ী শুধু পৃথিবীর বুকে কোটি কোটি প্রাণী- প্রজাতি রয়েছে। ১৯৪৮ সালে প্রকাশিত এক পরিসংখ্যান অনুযায়ী ঐ সময় পর্যন্ত ছয় লক্ষ ৮৬

হাজার জাতের পোকা- মাকড় আবিষ্কৃত হয় এবং এর পর থেকে এ তালিকায় প্রতি বছর গড়ে ছয়- সাত হাজার জাতের নতুন পোকা- মাকড়ের নাম যোগ হচ্ছিলো। ধারণা করা হয়েছে যে, পৃথিবীর বুকে কম পক্ষে এক কোটি জাতের পোকা- মাকড় রয়েছে। এছাড়া এ পর্যন্ত বিশ হাজার জাতের মাকড়শা, এক লাখ জাতের প্রজাপতি, বাইশ হাজার জাতের পিঁপড়া, আড়াই হাজার জাতের সাপ এবং এভাবে অন্যান্য প্রাণীর অসংখ্য জাত চিহ্নিত করা সম্ভব হয়েছে।

এবার সেই ক্ষুদ্রতম পিপিলিকা প্রসঙ্গে আসা যাক।

একটি অত্যাধুনিক সুপার কম্পিউটার তৈরী করাই বেশী কঠিন, নাকি ক্ষুদ্রতম পিপিলিকাটিকে সৃষ্টি করাই বেশী কঠিন? নিঃসন্দেহে পিপিলিকাটিকে সৃষ্টি করাই বেশী কঠিন। এ কারণে বিজ্ঞানীরা সুপার কম্পিউটার তৈরী করতে সক্ষম হলেও এবং কারখানায় তা বিপুল সংখ্যায় উৎপাদন করা সম্ভব হলেও অন্য পিপিলিকার সাহায্য ব্যতীত গবেষণাগারে একটি ক্ষুদ্র পিপিলিকা সৃষ্টি করা বিজ্ঞানীদের পক্ষে আজো সম্ভব হয় নি। তাঁরা যদি ভবিষ্যতে তা করতে সক্ষম হন তো তাতেও প্রমাণিত হবে যে, পিপিলিকা সৃষ্টি করা সুপার কম্পিউটার তৈরীর তুলনায় অধিকতর কঠিন, এ কারণেই বিজ্ঞানের যে পরিমাণ উন্নতি সুপার কম্পিউটার তৈরীকে সম্ভব করেছে পিপিলিকা সৃষ্টির জন্যে তার তুলনায় অনেক বেশী বৈজ্ঞানিক উন্নতি অপরিহার্য। এমতাবস্থায় স্বাভাবিকভাবেই প্রশ্ন জাগে যে, যে পিপিলিকা সৃষ্টি করা সুপার কম্পিউটারের তুলনায় অনেক বেশী কঠিন ও জটিল কাজ তা কি কোনো মহাবিজ্ঞানী স্রষ্টা ছাড়াই কেবল প্রকৃতিতে ঘটনাক্রমে (accidentally) সৃষ্টি হতে পেরেছে?

মানুষ প্রাকৃতিক বিধিবিধানের স্রষ্টা নয়; সে শুধু প্রাকৃতিক বিধিবিধান উদঘাটন করতে পারে। এই উদঘাটিত বিধিবিধানকে কাজে লাগিয়ে সে সুপার কম্পিউটার তৈরী করেছে। আমরা যদি কোথাও কোনো বিশালাকার কারখানা দেখতে পাই যেখানে কোনো মানুষ নেই, বরং বিভিন্ন য স্বয়ংক্রিয়ভাবে খনি ও অন্যান্য উৎস থেকে বিভিন্ন ধরনের ধাতব পদার্থ ও রাসায়নিক দ্রব্য বা তার মৌল উপাদান সংগ্রহ করে এনে কারখানার নির্দিষ্ট অংশে বা যে পৌঁছে দিচ্ছে এবং

কারখানার বিভিন্ন অংশ থেকে স্বয়ংক্রিয়ভাবে টেলিভিশন, কম্পিউটার, গাড়ী ইত্যাদি বেরিয়ে আসছে তখন আমরা বলবো না যে, এ য গুলো এমনি এমনিই গড়ে উঠেছে ও কাজ করছে। বরং আমরা বলবো যে, কেউ এগুলো তৈরী করে সুনির্দিষ্ট প্রোগ্রাম দিয়ে চালু করে দিয়ে গেছে এবং এ কারণেই এগুলো স্বয়ংক্রিয়ভাবে কাজ করে চলেছে। কিন্তু কী আশ্চর্য! কতক লোক রোবট বা কম্পিউটারের চেয়ে অনেক বেশী জটিল ও কঠিন কাজ পিপিলিকা সৃষ্টির জন্যে কোনো মহাজ্ঞানী স্রষ্টা থাকা প্রয়োজন বলে মনে করছে না।

একটি বড় আকারের (ধরুন এক ইঞ্চি লম্বা) পিপিলিকার যে সব অঙ্গপ্রত্যঙ্গ রয়েছে একটি ক্ষুদ্রতম প্রজাতির পিপিলিকারও তা রয়েছে। তার ছ'টি পা রয়েছে, খাদ্য খাবার জন্য মুখ, কামড় দেয়ার জন্যে দু'টি দাঁত, তিনটি ক্ষুদ্র চোখ, শ্বাসপ্রশ্বাসয (তা যে ধরনের ও যতো সরলই হোক না কেন), খাদ্য ধারণের জন্যে পেট ও তা হযমের জন্যে পরিপাকয (তা যে ধরনের ও যতো সরলই হোক না কেন), মলদ্বার, যৌনাঙ্গ (ও স্ত্রী পিপিলিকার তলপেটে ডিম উৎপাদনের আধার) ইত্যাদি এবং মাথার মধ্যে মস্তিষ্ক তথা প্রয়োজনীয় সব কিছুই রয়েছে। সে তার মাথায় অবস্থিত দু'টি শিং- এর সাহায্যে রাসায়নিক উপাদান, বায়ুপ্রবাহের দিক ও কম্পন নির্ণয় করে এবং বাণী পাঠায় ও গ্রহণ করে। কোনো কোনো অন্ধ প্রজাতির পিঁপড়া এর দ্বারা দর্শনের প্রয়োজনও পূরণ করে। তারা যৌন সংসর্গ করে এবং তার ফলে স্ত্রী পিপিলিকা ডিম পাড়ে যার মাধ্যমে তাদের বংশবৃদ্ধি ঘটে। তারা খাদ্য সংগ্রহ করে এবং তা শুধু খায় না, বরং বে-মওসূমের জন্যে সঞ্চয় করেও রাখে।

পিঁপড়ারা সমাজবদ্ধ জীবন যাপন করে; তাদের সমাজে কর্মবিভাজন আছে; যেমন: কাজ করার জন্যে শ্রমিক আছে, বাসা পাহারা দেয়া ও শৃঙ্খলা রক্ষার জন্যে সৈনিক আছে এবং সমাজকেন্দ্রে একজন রাণী আছে। তারা তাদের জন্যে ঠিক যেমনটি উপযোগী তেমন ধরনের বাসস্থান নির্মাণ করে থাকে।

পিঁপড়াদের শরীরে আত্মরক্ষার জন্যে শত্রুকে কামড়াবার উপযোগী দাঁত আছে এবং শত্রুর ক্ষতস্থানে লাগিয়ে দিয়ে তাকে কাবু করার জন্যে তাদের কাছে বিষের থলি আছে। এ বিষ এতোই

মারাত্মক যে, সূচের ডগার ক্ষুদ্রতম বিন্দুতে যতোটুকু বিষ ধারণ করা সম্ভব মাত্র ততোটুকু বিষ একজন মানুষের চামড়ার সামান্য অভ্যন্তরে প্রবেশ করিয়ে দিলেই তাতে যে অসহনীয় তী জ্বালা হয় তা ঐ মানুষটিকে পরমাণুর অস্তিত্ব ও পারমাণবিক শক্তির ভয়াবহতার কথা স্মরণ করিয়ে দেয়ার জন্যে যথেষ্ট। আর একটি সূচের পিছন দিক এ বিষে স্পর্শ করলে তাতে যে পরিমাণ বিষ লেগে যাবে এ বিষ ততোটুকু পরিমাণে কোনো মানুষের শরীরে প্রবেশ করালে সাথে সাথে তার মৃত্যু অনিবার্য।

কিন্তু এ ভয়ঙ্কর বিষ স্বয়ং পিপিলিকার শরীরেই উৎপন্ন হয় এবং এ বিষের থলি বয়ে বেড়ানো সত্ত্বেও এতে তার নিজের সামান্যতম ক্ষতিও হয় না। শুধু তা- ই নয়, এ বিষ কার বিরুদ্ধে কতোটুক ব্যবহার করতে হবে সে ব্যাপারে তার মাত্রাজ্ঞান বিস্ময়করভাবে নিখুঁত। আশ্চর্যের বিষয় এই যে, সে এ বিষ শুধু তার শত্রুকে কাবু করার জন্যেই ব্যবহার করে না, বরং খাদ্য সংগ্রহের জন্যে অর্থাৎ শিকার ধরার জন্যেও ব্যবহার করে।

সে তার নিজের চেয়ে অনেক গুণ বড় কীট- পতঙ্গও শিকার করে থাকে। এ ক্ষেত্রে সে এমন নির্ভুল হিসাব- নিকাশের ভিত্তিতে সঠিক মাত্রায় শিকারের শরীরে বিষ প্রয়োগ করে যার ফলে শিকার মারা যায় না, বরং চলচ্ছক্তিরহিত হয়ে পড়ে। তারপর সে একাই অথবা অনেক বেশী বড় আকারের শিকার হলে সকলে মিলে শিকারকে তাদের বাসস্থানে টেনে নিয়ে যায় এবং তাৎক্ষণিক প্রয়োজন হলে সবাই মিলে ভক্ষণ করে, নয়তো খারাপ মওসুমে ভক্ষণের জন্যে গুদামে জমা করে রাখে। শিকারের শরীরে প্রয়োগকৃত বিষের মাত্রা নির্ভুল না হলে তা তাদের ক্ষতির কারণ হয়ে দাঁড়াতে পারে। প্রয়োজনীয় পরিমাণের চেয়ে কম হলে শিকার চলচ্ছক্তি হারাবে না, বরং পালিয়ে যাবে; অন্যদিকে পরিমাণ বেশী হলে বিষক্রিয়ার ফলে শিকারটি মারা যাবে এবং এমতাবস্থায় তা খেলে ভক্ষণকারীদের জন্যে স্বাস্থ্যসমস্যা সৃষ্টি হবে, এমনকি মৃত্যুও ঘটতে পারে। আর তা গুদামজাত করে রাখলে তা পচে নষ্ট হয়ে যাবে; এমন কি পচে না গেলেও তা খাওয়ার পরিণতি হবে ভয়াবহ। কিন্তু পিঁপড়া যখন শিকারের শরীরে বিষ প্রয়োগ করে তখন ক্ষেত্রবিশেষে তা প্রয়োজনীয় মাত্রার চেয়ে কম হলেও (শিকারী পিঁপড়ার থলিতে মওজূদ বিষ

যথেষ্ট না হওয়ায় বা শিকারটির সহনশক্তি ধারণার চেয়ে বেশী হওয়ায়) কখনোই তা প্রয়োজনীয় মাত্রার চেয়ে বেশী হয় না। ফলে এ ধরনের শিকার দীর্ঘ কয়েক মাস যাবত পিঁপড়াদের গুদামে অচেতন অবস্থায় পড়ে থাকে, মারা যায় না। (অবশ্য পিঁপড়ারা বিষ ছাড়া স্বাভাবিক কারণে মরে যাওয়া পোকা- মাকড়ের মৃতদেহও ভক্ষণ করে এবং এ ধরনের শুকনা মৃতদেহ গুদামজাত করেও রাখে।)

পিঁপড়াদের সমাজবদ্ধ জীবন যাপন সম্পর্কে সর্বসাম্প্রতিক আবিষ্কারসমূহ রূপকথার কল্পকাহিনীকেও হার মানায়।

এতোদিন যাবত ধারণা করা হতো যে, পিঁপড়াদের সমাজবদ্ধ বা সংঘবদ্ধ জীবন আরো অনেক ইতর প্রাণীর সংঘবদ্ধ জীবনের ন্যায় স্রেফ সহজাত প্রবণতার ফল। কিন্তু সর্বসাম্প্রতিক পর্যবেক্ষণল তথ্যাদি অনুযায়ী মোটেই তা নয়; তাদের সমাজবদ্ধতা কোনো যা কি ধরনের বা স্বয়ংক্রিয় সমাজবদ্ধতা নয়। বরং বুদ্ধিমান প্রাণী মানুষের মতো তারাও বুদ্ধিমান প্রাণী এবং এ কারণে মানুষের সমাজের মতোই তারা সর্বজনীন কল্যাণের স্বার্থে জেনে- বুঝে স্বেচ্ছায় সমাজবদ্ধ জীবন গড়ে তোলে।

তারা তাদের সমাজের শাসিকা রাণীকে নিজেরা নির্বাচন করে, তবে মানুষের সমাজের সাংবিধানিক রাজতা কি ব্যবস্থাধীন রাজা বা রাণীর ন্যায় পিঁপড়াদের রাণী যে কেবল তাদের শৃঙ্খলার কেন্দ্র তা নয়, বরং সে একজন সর্বময় ক্ষমতাসম্পন্ন দোর্দণ্ডপ্রতাপ শাসিকা। মানব সমাজে যেমন কোনো কোনো শাসক বা শাসিকা লৌহমানব বা লৌহমানবী হয়ে থাকেন পিপিলিকাদের রাণী সর্বাবস্থায়ই সে ধরনের একজন লৌহপিপিলিকা হয়ে থাকে। এমনকি সে মানুষ- স্বৈরশাসকের মতোই পুরোপুরি স্বৈরাচারী হয়ে থাকে। অবশ্য মানুষ স্বৈরশাসক যেমন বিভিন্ন পরিস্থিতি বিবেচনায় অনেক ক্ষেত্রে আত্মসংযমের পরিচয় দিতে বাধ্য হয় ঠিক সেভাবেই পিপিলিকাদের রাণীও পরিস্থিতি বিবেচনায় অনেক ক্ষেত্রে আত্মসংযমের পরিচয় দিলেও সাধারণতঃ সে তার খেয়ালখুশী মোতাবেক সমাজ পরিচালনা করে থাকে এবং সে শুধু অন্যদেরকে খাটিয়ে ও অন্যদের শ্রমের ফল ভোগ করে আরাম- আয়েশ করেই ক্ষান্ত থাকে না,

বরং কোনো কারণে কেউ তার বিরাগভাজন হলে তার আর রক্ষা নেই; মৃত্যুদণ্ডই হচ্ছে তার একমাত্র প্রাপ্য। আর বিস্ময়কর ব্যাপার হলো এই যে, মানুষের সমাজে গুপ্ত স ্রাসী সংগঠনসমূহ যেভাবে দলের অভ্যন্তরীণ অপরাধীকে (বিশ্বাসঘাতককে) মৃত্যুদণ্ড দেয় এবং ক্ষেত্রবিশেষে তা আত্মহত্যার মাধ্যমে অপরাধীকে নিজের হাতেই কার্যকর করার জন্য নির্দেশ দেয় বলে শোনা যায়, ঠিক সেভাবেই পিপিলিকা সমাজে মৃত্যুদণ্ড কার্যকর করার জন্য এটাকে সর্বোত্তম পন্থা হিসেবে গণ্য করা হয়।

এর চেয়েও বিস্ময়কর হচ্ছে এই যে, অনেক সময় রাণীর চরম যুলুম- অত্যাচারে অতিষ্ঠ হয়ে প্রজাদের মধ্য থেকে কেউ কেউ অগ্রবর্তী হয়ে রাণীর বিরুদ্ধে ষড়য ্ত্র করে এবং অত্যন্ত গোপনে সুসংগঠিত দল গঠন করে অতঃপর মওকা মতো একযোগে রাণীর ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে তাকে হত্যা করে, এরপর তারা নতুন রাণী নির্বাচিত করে। আর এটা করতে গিয়ে তাদেরকে রাণীর ঘনিষ্ঠতম অনুগত সৈনিকদের বিরুদ্ধে রীতিমতো যুদ্ধ করতে হয় এবং এ যুদ্ধে স্বভাবতঃই উভয় পক্ষেই বহু হতাহত হয় এবং শেষ পর্যন্ত পরাজিত পক্ষের কারোই আর আর বেঁচে থাকার অধিকার থাকে না।

এর চেয়ে বিস্ময়কর আর কী হতে পারে! এতো বুদ্ধিমান, এতো কর্মঠ ও এতো সুশৃঙ্খল এবং একই সাথে স্বাধীন ইচ্ছাশক্তির অধিকারী এ ক্ষুদ্রতম সামাজিক প্রাণীর সৃষ্টি, জীবনধারা, বুদ্ধিমত্তা ও সমাজবদ্ধতা কি নিজে নিজেই এবং কোনো মহাজ্ঞানী ও নিখুঁত পরিকল্পনাকারী সৃষ্টিকর্তার ভূমিকা ছাড়াই অস্তিত্বলাভ করা সম্ভবপর?

এভাবে সৃষ্টিলোকের কোটি কোটি প্রজাতির প্রতিটির গঠনপ্রকৃতিই একজন মহাজ্ঞানময় ও নিখুঁত পরিকল্পনাকারী সৃষ্টিকর্তার অস্তিত্বের প্রমাণ বহন করছে।

স্বয়ং মানুষের অস্তিত্বও সে সাক্ষ্যই দিচ্ছে। যে নাস্তিক মানুষটি সৃষ্টিকর্তার অস্তিত্ব অস্বীকার করছে এবং নিজেকে বস্তুমাত্র ও বস্তুগত ক্রিয়াপ্রতিক্রিয়ার ফসলমাত্র বলে দাবী করছে সে কি কোনোদিন তার শরীরের সকল রহস্য নিয়ে চিন্তা করে দেখেছে? তার শরীরের রক্ত- মাংস, অস্থি- ম ্জা, নখ- চলু , শিরা- ধমনী, স্নায়ুত , মস্তিষ্ক, ফুসফুস, হৃদপিন্ড ইত্যাদি মিলিয়ে সে কতো

বড় এক জটিল সৃষ্টি এবং কীভাবে তার এ শরীরযন্ত্রের প্রতিটি অংশ পরস্পরের পরিপূরক হিসেবে সমন্বিতভাবে কাজ করে যাচ্ছে তা কি সে লক্ষ্য করেছে? তার শরীরের অভ্যন্তরে যে আরো কোটি কোটি স্বাধীন প্রাণশীল অস্তিত্ব (শ্বেতকণিকা, রোগজীবাণু, শুক্রকীট ইত্যাদি) বিরাজ করছে তা নিয়ে কি সে কখনো চিন্তা করে দেখেছে?

মানুষ মহাবিস্ময়ের আধার

এ পর্যন্তকার সমস্ত রকমের বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারের মধ্যে জেনেটিক বিজ্ঞানের সাম্প্রতিক আবিষ্কার সর্বাধিক বিস্ময়কর।

এ আবিষ্কার অনুযায়ী যে কোনো প্রাণীদেহের প্রতিটি কোষে এমন কতগুলো বিশেষ উপাদান-একক রয়েছে যা তার বংশগত বৈশিষ্ট্য বহন করে; জীববিজ্ঞানীগণ এগুলোর নামকরণ করেছেন ডিএন্এ, আর ডিএন্এ- র গঠন- উপাদান বা অংশসমূহের নামকরণ করেছেন জিন্। এই সাথে থাকে বিভিন্ন ধরনের রাসায়নিক উপাদান। একটি জিনে ১৫০ থেকে ৬, ০০০ নিউক্লিওটাইড্ থাকে। একটি ছোট ভাইরাস্- ডিএন্এ- তে ৫, ৩৮৬ জোড়া নিউক্লিওটাইড্ বেস্ থাকে। মানবদেহের প্রতিটি কোষে ৪৬টি ক্রোমোজম্ থাকে যার মধ্যে ২৩টি পিতার ও ২৩টি মাতার বৈশিষ্ট্য বহন করে। (পিতার শুক্রকীটে ২৩টি ক্রোমোজম্ থাকে এবং এই ২৩টি ক্রোমোজমের মধ্যে একটি থাকে সেক্স ক্রোমোজম্ যা থেকে নির্ধারিত হয় সন্তানটি ছেলে হবে, নাকি মেয়ে হবে।) মানবদেহের একেকটি কোষে (৪৬টি ক্রোমোজমে) এক লাখ জিন্ ও ৬৬০ কোটি নিউক্লিওটাইড্ বেস্ থাকে এবং এতে জৈব রাসায়নিক উপাদানের সংখ্যা ৩০০ কোটি।

বিভিন্ন মানুষের জিনের মধ্যে অভিন্নতা ও বিভিন্নতা রয়েছে এবং সব মিলিয়ে মানবিক জিনের সংখ্যা ৩০০ কোটি জোড়ার মতো -১৯৯৯যার মধ্যে -র শেষ নাগাদ ১০০ কোটি জোড়া চিহ্নিত করা সম্ভব হয়। ডিএন্এগুলোর গঠন মইএর মতো -, বা বলা চলে, যিপারের (zipper) মতো। এগুলো কতো সূক্ষ্ম আর কতো সরু তা এ থেকেই ধারণা করা যেতে পারে যে, আধা গ্রাম ডিএন্এ অর্থাৎ পৃথিবী) লাখ মাইল ৩০কে সোজা করে সামনাসামনি জোড়া দিলে নয় কোটি - দীর্ঘ হবে। প্রতিটি ড (থেকে সূর্য পর্যন্তিএন্এ র মধ্যে সংশ্লিষ্ট মানুষ বা প্রাণীর সারা জীবনের - এভাবে প্রথম মানুষ পর্যন্ত .... এবং তার পিতামাতার (দেহ থেকে বিচ্ছিন্ন হওয়া পর্যন্ত সময়ের) পুরুষদের জীবনের পূর্ব (প্রতিটি স্তরে পিতামাতার শরীর থেকে বিচ্ছিন্ন না হওয়া পর্যন্ত সময়ের)

চেতনা -চিন্তা) ইতিহাস, চরিত্র ও কর্ম সহকোড্ আকারে লিপিবদ্ধ আছে যার মধ্য থেকে বড় (বড় বৈশিষ্ট্যগুলো বর্তমানে গবেষণাগারে পরীক্ষা করে বের করা সম্ভব হচ্ছে।

কিন্তু কী আশ্চর্য! মস্তিস্কের কোষে কোষকেন্দ্র থাকলেও ক্রোমোজম্ নেই, ফলে কারো পক্ষেই স্বীয় পূর্বপুরুষদের ইতিহাস, জ্ঞান ও চিন্তাধারা স্মরণ করা সম্ভব হয় না, বরং কেবল চেষ্টাসাধনা করে জ্ঞানার্জনের পন্থায়ই তা আয়ত্ত করা সম্ভব হয়। তবে একটি মানুষের মস্তিষ্কে রয়েছে একশ' কোটি স্মৃতিকোষ সহ বিভিন্ন ধরনের এক হাজার কোটি স্নায়ুকোষ। একটি স্মৃতিকোষ বা নিউরনের ক্ষমতা একটি সুপার কম্পিউটারের চেয়ে বেশী। একটি সুপার কম্পিউটারের দাম আনুমানিক চার হাজার ডলার ধরা হলে একটি মানুষের মস্তিষ্কের শুধু স্মৃতিকোষগুলোর দামই দাঁড়ায় চার হাজার বিলিয়ন ডলার। আর অধিকাংশ মানুষের অবস্থাই এমন যে, তার মস্তিষ্কের ক্ষমতার হাজার ভাগের এক ভাগও সে সারা জীবনে ব্যবহার করে না। কেউ যদি তার মস্তিষ্কের ক্ষমতার তিনশ' ভাগের এক ভাগও সারা জীবনে ব্যবহার করতে পারে তো সে ব্যক্তি বিস্ময়কর প্রতিভা হিসেবে পরিচিত হতে ও প্রচলিত কথায়, অসাধ্য সাধন করতে পারবে।

মানব মস্তিষ্কের এই প্রায় সীমাহীন ক্ষমতা সম্পর্কে কিছুটা ভিন্নভাবে বললে বলা যেতে পারে যে, মানসিক প্রতিবন্ধী নয় এমন যে শিশুটি মেধার দিক থেকে অন্য সকলের তুলনায় পিছনে পড়ে আছে তার মেধার 'যথাযথ' পরিচর্যা ও বিকাশের ব্যবস্থা করা হলে তার পক্ষেও এমন বহুদর্শী মনীষী হয়ে গড়ে ওঠা সম্ভব যে, সে একই সাথে আইনস্টাইনের চেয়ে বড় পদার্থবিজ্ঞানী, ইবনে সীনার চেয়ে বড় দার্শনিক ও চিকিৎসা বিজ্ঞানী, রূমী ও হাফিযের চেয়ে বড় কবি, ইবনে খাল্দূনের চেয়ে বড় ইতিহাসবিশারদ এবং অন্যান্য ক্ষেত্রেও তথা মানব জাতির ইতিহাসে শ্রেষ্ঠতম মেধা- প্রতিভার স্বাক্ষর রেখে যাওয়া ব্যক্তিদের ক্ষেত্রসমূহেও তাঁদের তুলনায় শ্রেষ্ঠতর হতে সক্ষম হবে। (কিন্তু যথাযথ বিকাশের জন্যে মনোযোগী না হওয়ার কারণেই মানবমস্তিষ্কের এ বিস্ময়কর সম্ভাবনা অবিকশিত থেকে যাচ্ছে।)

এই হলো মহাবিস্ময়কর ও জটিলতম সৃষ্টি মানুষ। বিজ্ঞানীরা আজ কৃত্রিম জীবকোষ তৈরীর চেষ্টা করছেন। এজন্য কত আয়োজন! একটি জীবকোষ সৃষ্টির জন্যে জটিলতম য পাতি সমৃদ্ধ গবেষণাগার সহ লক্ষ লক্ষ ডলারের বাজেট নিয়ে কাজ করছেন বিশ্বসেরা বিজ্ঞানীগণ। এমতাবস্থায় কোনো মহাবিজ্ঞানী স্রষ্টা ছাড়াই এমনি এমনিই প্রাণহীন পদার্থ থেকে এককোষ বিশিষ্ট জীবাণু ও তা থেকে পর্যায়ক্রমে প্রজাতিসমূহ এবং সবশেষে মহাবিস্ময়কর প্রাণশীল সৃষ্টি মানুষ অস্তিত্বলাভ করলে!?

মানবদেহের প্রতিটি কোষে যে সব ডিএন্এ রয়েছে তাতে যে কেবল তার নিজের জীবনেতিহাস লিপিবদ্ধ আছে তা নয়, বরং এ ভূপৃষ্ঠে বিচরণকারী প্রথম মানুষ থেকে শুরু করে তার সকল পূর্বপুরুষের জীবনেতিহাসও এক বিশেষ পদ্ধতিতে লিপিবদ্ধ রয়েছে, আর প্রতিনিয়ত সে যা কিছুই করছে তার সবই লিপিবদ্ধ হয়ে যাচ্ছে - এ সর্বশেষ বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার কি তার মধ্যে এ চিন্তার উদয় ঘটায় না যে, কোন্ সূক্ষ্মদর্শী মহাজ্ঞানী মহাশক্তিধর সত্তা তার প্রতিটি ডিএন্এ- র মধ্যে আড়িপাতা য বসিয়ে রেখেছেন?

শুধু তার শরীরের গঠনকৌশল ও মেধা- প্রতিভা- সম্ভাবনাই বিস্ময়কর নয়, বরং গোটা সৃষ্টিলোকের সাথে তার অস্তিত্বের যে অবিচ্ছেদ্য সম্পর্ক রয়েছে, তা- ও এক বিরাট বিস্ময়। তার জন্ম, বৃদ্ধি, বিকাশ ও লক্ষ্যপানে অভিযাত্রার ক্ষেত্রে গোটা বিশ্বলোক তাকে সহযোগিতা করছে। তার জন্যে এবং তার লক্ষ্যে উপনীত হবার জন্যে যা কিছু প্রয়োজন এ বিশ্বলোকে তার সব কিছুই মওজূদ রয়েছে। আলো, বায়ু, বায়ুতে অক্সিজেন, পানি, পানিতে শরীর বিশোধন ক্ষমতা, বিভিন্ন ধরনের খাদ্যদ্রব্য, তাতে ভিটামিন, শর্করা ইত্যাদি খাদ্য- উপাদান, রোগ- ব্যাধিতেও শরীরে প্রতিরোধশক্তি সৃষ্টির ব্যবস্থা ও তার পাশাপাশি প্রকৃতিতে রোগনিরাময়কারী ওষুধের ব্যবস্থা, তার মধ্যে বিভিন্ন ধরনের মানসিক ও মনস্তাত্ত্বিক চাহিদা এবং তা পূরণের জন্যে রং, রস, স্বাদ, ঘ্রাণ, রূপ ও যৌন কামনা, আর তা পূরণের উপাদান তথা সবকিছুই রয়েছে। যেন গোটা প্রাকৃতিক জগতই তার প্রয়োজন পূরণের জন্যই অস্তিত্বলাভ করেছে। ('যেন' নয়, প্রকৃতই তা- ই।)

বায়ু ও পানি হচ্ছে তার জীবনরক্ষার অপরিহার্য উপাদান। তার এবং অন্যান্য ভূচর, খেচর ও উভচর প্রাণীর শ্বাস- প্রশ্বাস ও অন্যবিধ বহু উপায়ে (তারই গড়া যানবাহন ও কল- কারখানার দ্বারা) এ বায়ু বিষাক্ত হচ্ছে, কিন্তু উদ্ভিদকুল তা বিশোধন করে দিচ্ছে। পানি গড়িয়ে সমুদ্রে চলে যাচ্ছে বা মাটির নীচে বসে যাচ্ছে, মেঘ ও বৃষ্টির আকারে আবার তা তার কাছে ফিরে আসছে। পানি সমুদ্রে যাবার পথে মাটি ধুয়ে নিয়ে যাচ্ছে, কিন্তু তার অন্যান্য উপাদান থিতিয়ে সমুদ্রতলদেশে গিয়ে জমা হলেও লবণ পানিতে মিশ্রিত হয়ে থাকছে, তবে পানি যখন সূর্যের তাপে জলীয় বাস্পে পরিণত হচ্ছে তখন লবণ পরিত্যক্ত হয়ে থাকছে, ফলে সে বৃষ্টি থেকে সুপেয় পানি লাভ করছে। শুধু কি তা- ই?

অত্যন্ত বিস্ময়কর ব্যাপার যে, তার মধ্যে যৌন প্রেরণার সম্ভাবনা নিহিত রয়েছে যা যথাসময়ে বিকাশলাভ করছে। আর তাদেরকে নারী ও পুরুষরূপে সৃষ্টি করে তাদের এ চাহিদা পূরণের ব্যবস্থা করা হয়েছে। সে কি ভেবে দেখেছে যে, অন্ধ প্রকৃতির পক্ষে তার মধ্যে এরূপ প্রেরণা ও চাহিদা সৃষ্টি এবং তা পূরণের ব্যবস্থা রাখা সম্ভবপর নয়? আসলে এভাবে তাকে সৃষ্টির ধারাবাহিকতা রক্ষায় ভূমিকা পালনে বাধ্য করা হয়। তখন বুঝতে না পারলেও, পরে দেরীতে হলেও সে বুঝতে পারে যে, তার কাছ থেকে এ ভূমিকা আদায় করার লক্ষ্যেই নারীর মধ্যে পুরুষের প্রতি এবং পুরুষের মধ্যে নারীর প্রতি এহেন দুর্দমনীয় আকর্ষণ সৃষ্টি করা হয়েছে এবং এ ভূমিকা পালনের পুরস্কারস্বরূপই তাকে দাম্পত্য জীবনের অতুলনীয় আনন্দ দেয়ার ব্যবস্থা করা হয়েছে।

প্রকৃতিতে শুধু মানুষের অস্তিত্ব রক্ষা ও প্রয়োজন পূরণের ব্যবস্থা রাখা হয় নি, বরং প্রতিটি প্রাণশীল সৃষ্টিরই অস্তিত্বরক্ষা ও প্রয়োজন পূরণের দিকে দৃষ্টি রাখা হয়েছে। যেমন: যে সব বস্তু তাপমাত্রাভেদে কঠিন, তরল ও বায়বীয় এই তিন অবস্থা ধারণ করে তার সবগুলোরই কঠিন অবস্থায় আয়তনে হ্রাস পায়, ফলে আয়তন অনুপাতে তার ওযন বৃদ্ধি পায়, কিন্তু পানি এ নিয়মের একমাত্র ব্যতিক্রম; পানি যখন কঠিন অবস্থা ধারণ করে অর্থাৎ জমে বরফ হয়ে যায় তখন তার আয়তন হ্রাস না পেয়ে পানির তুলনায় বৃদ্ধি পায়। এ কারণে বরফ পানিতে ভাসে।

এরূপ কেন হয়? বরফ পানির চেয়ে আয়তনে কম ও ওযনে ভারী হলে ক্ষতির কী ছিল? হ্যা, তাহলে শীতে নদী ও সমুদ্রের উপরিভাগের পানি বরফ হয়ে তা পানিতে ডুবে তলদেশে চলে যেতো, ফলে তার নীচে চাপা পড়ে মাছসহ সকল পানির প্রাণী মরে যেতো। এই যে, ব্যতিক্রম, এটা কি অন্ধ প্রকৃতির কাজ, নাকি কোনো মহাজ্ঞানী স্রষ্টার সুবিবেচনা প্রসূত ব্যবস্থাপনা?

মানুষের মধ্যে ও প্রকৃতিতে নিহিত এ সব বিস্ময় সাম্প্রতিক আবিষ্কার, তাই এটা কি অধিকতর বিস্ময়কর নয় যে, এখন থেকে চৌদ্দ শতাব্দী পূর্বে নিরক্ষর নবী হযরত মুহাম্মাদ (ছ্বাঃ) তাঁর নিকট আল্লাহর পক্ষ থেকে নাযিলকৃত যে কিতাব (কোরআন মজীদ) পেশ করেন তাতে বলা হয়েছে : "আর ধরণীর বুকে এবং তোমাদের নিজেদের সত্তার ভিতরেও অকাট্য প্রত্যয়ী জ্ঞানীদের জন্যে (আল্লাহ্ তা'আলার অস্তিত্বের) নিদর্শনাদি রয়েছে; তোমরা কি তা দেখতে পাও না?"

সমগ্র সৃষ্টিলোকের সকল সৃষ্টি শুধু বিস্ময় আর বিস্ময়। অধিকতর বিস্ময়কর এ সবের পারস্পরিক পরিপূরকতা এবং প্রাকৃতিক বিধানসমূহের সুসমন্বয়। সর্বত্রই এক নিখুঁত পরিকল্পনার ছাপ বিদ্যমান। ক্ষুদ্রতম থেকে শুরু করে বৃহত্তম প্রাণশীল সৃষ্টিতে, বিশেষ করে মানুষের সত্তায়, চন্দ্র- সূর্য ও গ্রহ- নক্ষত্রাদির সৃষ্টি ও আবর্তনে, পৃথিবীর আহ্নিক গতি ও বার্ষিক গতিতে তথা সব কিছুতেই এক মহাজ্ঞানোচিত পরিকল্পনা ও নিখুঁত শৃঙ্খলা একজন মহা পরিকল্পনাকারী ও শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠাকারীর অস্তিত্বের কথা ঘোষণা করছে। তাই যে ব্যক্তি তার নিজের অস্তিত্ব ও এ বিশ্বলোকের অস্তিত্ব অনুভব করে তার পক্ষে তার নিজের ও এ বিশ্বলোকের সৃষ্টিকর্তার অস্তিত্ব অনুভব না করা একেবারেই অসম্ভব।

তবে সৃষ্টিকর্তার অস্তিত্ব অনুভব করা সত্ত্বেও কোনো বিশেষ কারণে কেউ তা অস্বীকার করতে পারে। অবশ্য বিজ্ঞানের সাম্প্রতিকতম আবিষ্কারের দৃষ্টিতে, তার এ স্ববিরোধী আচরণ অর্থাৎ তার জ্ঞানের সাথে তার মৌখিক দাবী ও আচরণের বৈপরীত্য তারই বস্তুগত সত্তায় - যার অস্তিত্ব সে অস্বীকার করে না - ডিএন্এ- র অভ্যন্তরে লিপিবদ্ধ হয়ে থাকছে।

বস্তুতঃ স্রষ্টাকে সে স্বীকার করুক বা অস্বীকারই করুক তাতে স্রষ্টার কোনোই লাভ- ক্ষতি নেই; বরং সর্বাবস্থায়ই স্রষ্টার চিরন্তন অস্তিত্ব ছিলো, আছে ও থাকবে, তাতে সন্দেহের বিন্দুমাত্র অবকাশ নেই। লাভ- ক্ষতি যা হবার তারই হবে। "অতএব, শিক্ষা গ্রহণ করো, হে দৃষ্টিমান লোকেরা!"

বিচারবুদ্ধির দৃষ্টিতে অপরিহার্য সত্তার গুণাবলী

মানুষের বিচারবুদ্ধি জীবন ও জগতের অন্তরালে এক অপরিহার্য অস্তিত্বের সন্ধান পায় যা থেকে সমস্ত রকমের সম্ভব- অস্তিত্ব অর্থাৎ বস্তুগত, সূক্ষ্ম ও অবস্তুগত অস্তিত্বসমূহ অস্তিত্ব লাভ করেছে। এখন প্রশ্ন হচ্ছে, মানুষের বিচারবুদ্ধি কি সে অপরিহার্য অস্তিত্বের সংজ্ঞা প্রদান করতে সক্ষম? মানুষের পক্ষে কি তাঁর অস্তিত্বের স্বরূপ উদঘাটন করা সম্ভব ?

এ প্রসঙ্গে প্রথমেই উল্লেখ করতে হয় যে, কোনো কিছু সম্পর্কে মানুষের জ্ঞানের তিনটি অবস্থা হতে পারে: পূর্ণাঙ্গ নির্ভুল জ্ঞান, মোটামুটি কিন্তু ভ্রান্তিমুক্ত জ্ঞান এবং ভ্রান্তিযুক্ত জ্ঞান। জীবন ও জগতের উৎস যে অপরিহার্য অস্তিত্ব তাঁকে পরিপূর্ণ অথচ নির্ভুলভাবে জানা 'ভিন্নতর তথা নিম্নতর প্রকৃতি ও বৈশিষ্ট্যের অধিকারী সম্ভব- অস্তিত্ব' মানুষের পক্ষে পুরোপুরি অসম্ভব। কোনো মানুষের গড়া একটি চেয়ার বা একটি টেবিল বা একটি ছুরি বা অন্য কোনো জিনিস ঐ মানুষের শারীরিক আকৃতি ও অভ্যন্তরীণ রহস্য, তার আত্মা, মন- মানস ও মেধা- প্রতিভা সম্পর্কে পুরোপুরি অবগত হতে সক্ষম - এরূপ দাবী যতোখানি অবাস্তব, মানুষ তার উৎস অপরিহার্য সত্তার স্বরূপ সম্পূর্ণরূপে উদঘাটন করতে সক্ষম বলে কেউ দাবী করলে এর চেয়ে লক্ষ গুণ বেশী অসম্ভব কিছু দাবী করা হবে। তবে বিচারবুদ্ধির পক্ষে অপরিহার্য সত্তা সম্পর্কে মোটামুটি কিন্তু ভ্রান্তিমুক্ত ধারণায় উপনীত হওয়া সম্ভব। উদাহরণস্বরূপ: একজন মানুষকে পুরোপুরি চেনার বা জানার দাবী করতে হলে তার বাহ্যিক চেহারা- ছুরত চেনা বা জানাই যথেষ্ট নয়, বরং তার শরীরের প্রতিটি অণু- পরমাণু, তার মেধা- প্রতিভা, মন- মানস, ঝোঁকপ্রবণতা, আত্মা ও ব্যক্তিত্ব ইত্যাদি সম্পর্কে পূর্ণাঙ্গ ধারণা থাকা অপরিহার্য। তবে আমরা যখন কাউকে তার চেহারার ভিত্তিতে চেনার দাবী করি তখন তা অসম্পূর্ণ হলেও ভ্রান্তিমুক্ত। কারণ, এর ভিত্তিতে আমরা তাকে শনাক্ত করতে ও তার নিকট উপনীত হতে পারি এবং তার চেহারার নির্ভুল ও নিখুঁত বর্ণনা দিতে পারি। যদিও এই

জানা বা চেনার দ্বারা তাকে পূর্ণরূপে জানার বা তার স্বরূপ উদঘাটনের দাবী করা যাবে না, তবে তার সাথে যোগাযোগের প্রয়োজন পূরণ করা সম্ভব হবে এবং আমরা ভুল ব্যক্তির কাছে গিয়ে উপস্থিত হবো না।

বিচারবুদ্ধির পক্ষে জীবন ও জগতের উৎস অপরিহার্য সত্তাকে এভাবে অর্থাৎ মোটামুটি অথচ নির্ভুলভাবে সংজ্ঞায়িত করা সম্ভব।

অপরিহার্য সত্তার সংজ্ঞায়নের পূর্বে একটি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের ওপর সামান্য আলোকপাত করা যরূরী বলে মনে হয়। কারণ, তা অপরিহার্য সত্তার সঠিক সংজ্ঞায়ন ও অনুধাবনে সহায়ক হবে। তা হচ্ছে সামগ্রিকভাবে অস্তিত্বের প্রকারভেদ ও পর্যায়ভেদ এবং অস্তিত্বের পর্যায়ভেদ প্রশ্নে দার্শনিকদের একটি ভ্রান্তি।

ধর্মানুসারী দার্শনিকগণ, বিশেষতঃ মুসলিম দার্শনিকগণ সামগ্রিকভাবে 'অস্তিত্ব' (وجود - Existence) - এর প্রাথমিক বিভাজন নির্দেশ করতে গিয়ে বলেছেনঅস্তিত্ব এক বিবেচনায় : দু'ধরনেরঅস্তিত্ব অপরিহার্য : (واجب الوجود- Essential Existence) ও সম্ভব অস্তিত্ব (ممکن الوجود - Possible Existence)। অন্য এক বিবেচনায়ও অস্তিত্ব দু'ধরনের; তবে এ বিবেচনা পূর্বোক্ত বিবেচনা থেকে সম্পূর্ণ স্বত । এ বিবেচনায়, যে কোনো অস্তিত্ব হয় অবস্তুগত (مجرد - Non-material), নয়তো বস্তুগত (مادّی - Material)। এই দ্বিতীয়োক্ত বিবেচনায় তাঁরা আল্লাহ্ তা'আলা, ফেরেশতা, রূহ্ ইত্যাদিকে অবস্তুগত অস্তিত্ব (وجود مجرد - Non-material Existence) এবং বস্তুজগত ও তার সকল উপকরণকে বস্তুগত অস্তিত্ব (وجود مادّی- Material Existence) রূপে গণ্য করেছেন। কিন্তু এ বিভাজন মৌলিকভাবেই ত্রুটিপূর্ণ। কারণ, এতে আল্লাহ্ তা'আলাকে এবং ফেরেশতা ও নাফস্কে অভিন্ন ধরনের অস্তিত্ব বলে গণ্য করা হয়েছে। যদিও এতে (আত্মা) - সন্দেহ নেই যে, আল্লাহ্ তা'আলা যেমন অবস্তুগত অস্তিত্ব তেমনি ফেরেশতা ও নাফস্ ইত্যাদিও অবস্তুগত অস্তিত্ব, কিন্তু এর চেয়ে অধিকতর গুরুত্বপূর্ণ হচ্ছে এই যে, আল্লাহ্ তা'আলা হচ্ছেন

অপরিহার্য অস্তিত্ব (واجب الوجود- Essential Existence), অন্যদিকে ফেরেশতা ও নাফস্ অবস্তুগত হলেও সম্ভব- অস্তিত্ব (ممكن الوجود- Possible Existence)। এমতাবস্থায় অস্তিত্ব বিভাজনের ক্ষেত্রে কেবল অবস্তুত্বের কারণে অপরিহার্য ও সম্ভব অস্তিত্বকে এক কাতারভুক্ত করা সঙ্গত নয়। তাই আমাদের মতে, অস্তিত্বের বিভাজন হওয়া উচিত এভাবে:

অস্তিত্ব এক বিবেচনায় দু'ধরনেরঅপরিহার্য অস্তিত্ব : (واجب الوجود - Essential Existence) ও সম্ভব অস্তিত্ব (ممكن الوجود- Possible Existence)। অপর এক বিবেচনায় অস্তিত্ব দু ধরনের : সম্ভব অস্তিত্বের সকল প্রকার সীমাবদ্ধতা থেকে মুক্ত অস্তিত্ব) পরম প্রমুক্ত অস্তিত্ব - وجود مجرد) এবং অ- প্রমুক্ত অস্তিত্ব (وجود غير مجرد)।

অতঃপর সম্ভব- অস্তিত্ব বা অ- প্রমুক্ত অস্তিত্ব দু'ধরনের: ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য অস্তিত্ব ও ইন্দ্রিয়াতীত অস্তিত্ব। ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য অস্তিত্ব দু'ধরনের: বস্তুগত অস্তিত্ব ও সূক্ষ্ম অস্তিত্ব এবং ইন্দ্রিয়াতীত অস্তিত্বও দু'ধরনের: আত্মিক অস্তিত্ব ও অ- আত্মিক অস্তিত্ব। এরপর অস্তিত্বকে নীচের দিকে আরো বিভিন্নভাবে ভাগ করা যেতে পারে। (তবে আমাদের বর্তমান আলোচনার জন্যে এ বিষয়ের ওপর এতোটুকু আলোকপাতই যথেষ্ট বলে মনে হয়।)

এবার আমরা মূল আলোচনায় ফিরে আসি।

অপরিহার্য সত্তা যেহেতু আমাদের অস্তিত্ব থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন ধরনের ও উচ্চতর অস্তিত্ব সেহেতু কেবল তাঁর গুণবৈশিষ্ট্যসমূহ চিহ্নিতকরণের মাধ্যমেই তাঁকে সংজ্ঞায়িত করা সম্ভব। এ সব গুণবৈশিষ্ট্যকে অবশ্যই এমন কতক ইতিবাচক গুণবৈশিষ্ট্য হতে হবে যা অপরিহার্য সত্তার জন্যে অপরিহার্য অর্থাৎ কোনো সত্তায় এ সব গুণবৈশিষ্ট্যের মধ্য থেকে একটি গুণও যদি অনুপস্থিত থাকে তাহলেও সে সত্তার পক্ষে অপরিহার্য সত্তা হওয়া সম্ভব নয়। সেই সাথে অপরিহার্য সত্তার জন্যে ঐ সব বৈশিষ্ট্য থেকে মুক্ত থাকা অপরিহার্য যা অপরিহার্য সত্তার জন্যে দুর্বলতা বা অসম্পূর্ণতা রূপে প্রতিভাত হয়।

এবার আমরা অপরিহার্য সত্তার জন্যে অপরিহার্য ও পরিহার্য বৈশিষ্ট্যসমূহ চিহ্নিত করার চেষ্টা করবো।

এক: তিনি অনাদি- অনন্ত ও কালোর্ধ সত্তা

অপরিহার্য সত্তা হচ্ছেন সকল প্রকার সম্ভব- অস্তিত্বের আদি উৎস। সম্ভব- অস্তিত্ব স্বীয় সৃষ্টি, স্থিতি ও ধ্বংসের জন্যে তাঁর ওপরই প্রত্যক্ষ- পরোক্ষ উভয়ভাবেই নির্ভরশীল। আর কাল বা সময় হচ্ছে সম্ভব- অস্তিত্বের বৈশিষ্ট্য। সম্ভব- অস্তিত্বের শুরু ও শেষ রয়েছে যা থেকে কালের ধারণা ও অনুভূতি সৃষ্টি হয়। কারণ ও ফলশ্রুতি বিধির আওতাধীন সম্ভব- অস্তিত্বের বিবর্তনধারাবাহিকতার আদিতম উৎস ও কারণ হচ্ছেন অপরিহার্য সত্তা। সুতরাং তিনি কোনো উৎস বা কারণ থেকে উদ্ভূত হতে পারেন না। অন্য কথায়, 'কারণ' ও 'উৎস' কথাগুলো তাঁর সত্তার জন্যে আদৌ প্রযোজ্য নয়। অতএব, তাঁর কোনো শুরু থাকতে পারে না, তেমনি তাঁর কোনো শেষও থাকতে পারে না। বরং তিনি 'শুরু' ও 'শেষ'- এর উর্ধে; 'শুরু' ও 'শেষ' কথাগুলো তাঁর জন্যে প্রাসঙ্গিক নয়। অর্থাৎ তিনি অনাদি ও অনন্ত বা কালোর্ধ সত্তা। যেহেতু অন্যান্য সৃষ্টির ন্যায় কালও তাঁরই সৃষ্টি - যদিও তা অবস্তুগত ও মাত্রাগত সৃষ্টি, এবং তিনি কালের গর্ভে অন্য সকল কিছুকে সৃষ্টি করেছেন, সেহেতু তাঁর জন্যে কাল প্রাসঙ্গিক নয়।

সৃষ্টিকুলের জন্যে প্রকৃত কাল হচ্ছে দু'টি: অতীত ও ভবিষ্যত; বর্তমান কাল হচ্ছে এ দুইয়ের মিলনবিন্দু - অপসৃয়মাণ মুহূর্ত মাত্র। সৃষ্টির এ বৈশিষ্ট্য তার দুর্বলতামাত্র; সে স্বীয় অতীতকে ধরে রাখতে অক্ষম বিধায় সে স্থিতিহীন। অন্যদিকে তার ভবিষ্যতও অনিশ্চিত এবং তা বর্তমানের ক্রান্তিবিন্দু অতিক্রম করে অতীতের গর্ভে হারিয়ে যায়। তাই অপরিহার্য সত্তার জন্যে অতীত ও ভবিষ্যৎ প্রযোজ্য হওয়ার ন্যায় দুর্বলতা থেকে মুক্ত থাকা অপরিহার্য। এ কারণে, আমরা যেহেতু কালের আওতাধীন এবং সব কিছুকেই কালের আওতায় চিন্তা করি সেহেতু আমরা যদি অপরিহার্য সত্তা সম্বন্ধে কালকে প্রাসঙ্গিক বিবেচনা করি তো কেবল বর্তমান কালকেই প্রাসঙ্গিক গণ্য করতে পারি। অর্থাৎ তিনি কালের উর্ধে এবং কালকে ধারণ করে আছেন; আমাদের নিকট যা অতীত ও ভবিষ্যৎ তা তাঁর নিকট সদা বর্তমান।

যেহেতু সৃষ্টিকুল কালের আওতাধীন সেহেতু কালোর্ধতার ধারণা সৃষ্টির নিকট গোলকধাঁধার মতো মনে হতে পারে। কিন্তু তা সত্ত্বেও বিচারবুদ্ধি অপরিহার্য সত্তাকে কালোর্ধ বা অনাদি- অনন্ত বলে গণ্য করতে বাধ্য। অপরিহার্য ও সম্ভব সত্তার মধ্যকার মৌলিক পার্থক্যের কারণেই সম্ভব- সত্তার দৃষ্টিতে অসম্ভব ও অবিশ্বাস্য প্রতিভাত হলেও অপরিহার্য সত্তার জন্যে অনাদি- অনন্ত হওয়া অপরিহার্য। অন্যথায় তাঁর পক্ষে অপরিহার্য সত্তা হওয়া সম্ভব নয়।

দুই: তিনি অসীম বা স্থানোর্ধ সত্তা

সসীমতা সৃষ্টি বা সম্ভব- সত্তার বৈশিষ্ট্য। তাই অপরিহার্য সত্তাকে অনিবার্যভাবেই তা থেকে মুক্ত থাকতে হবে। অতএব, বিচারবুদ্ধির রায় হচ্ছে এই যে, তিনি অসীম, অর্থাৎ তিনি স্থানগত যে কোনো সীমাবদ্ধতার উর্ধে; স্থানগত কোনো বৈশিষ্ট্যই তাঁর জন্যে প্রযোজ্য নয়। কেননা, সসীমতা বা সীমাবদ্ধতা হচ্ছে দুর্বলতা ও অপূর্ণতার পরিচায়ক। এমনকি সৃষ্টির ক্ষেত্রেও যে সৃষ্টির সীমাবদ্ধতা যত বেশী তাকে তত বেশী দুর্বল এবং যার সীমাবদ্ধতা যত কম তাকে তত কম দুর্বল বলে গণ্য করা হয়। এমতাবস্থায় অপরিহার্য সত্তাকে অবশ্যই এ অপূর্ণতা ও দুর্বলতার উর্ধে থাকতে হবে; এটাই তাঁর পূর্ণতা- গুণের দাবী।

অপরিহার্য সত্তাকে স্থানের আওতাভুক্ত মনে করা (তা সে স্থানের আওতা যতোই প্রশস্ত হোক না কেন) মানে তাঁকে সসীম গণ্য করা, আর তাঁকে সসীম গণ্য করা মানে তাঁকে স্থানের আওতাভুক্ত গণ্য করা, অথচ তিনি স্থানেরও সৃষ্টিকর্তা। তিনি স্থান ও কাল সৃষ্টি করেছেন এবং স্থান ও কাল রূপ ধারকের গর্ভে অন্য সবকিছুকে, বিশেষতঃ বস্তুনিচয়কে সৃষ্টি করেছেন। এমতাবস্থায় কী করে তিনি স্বীয় সৃষ্ট স্থানের আওতাভুক্ত হতে পারেন?

বলা বাহুল্য যে, এখানে স্থান মানে শুধু ভূপৃষ্ঠ বা অন্যান্য গ্রহ- নক্ষত্রাদির পৃষ্ঠ মাত্র নয়, বরং প্রচলিত অর্থে যা শূন্য বা মহাশূন্য তা- ও স্থানরূপে পরিগণিত। অর্থাৎ যেখানেই কোনো সৃষ্টির পক্ষে স্থানলাভ করা সম্ভব তা- ই স্থান। আর ‘স্থান’কে যে কোনো অর্থেই গ্রহণ করা হোক না কেন, ‘স্থান’মাত্রই অপরিহার্য সত্তার সৃষ্টি। নিঃসন্দেহে তিনি স্বীয় সৃষ্টির আওতায় সীমাবদ্ধ হতে পারেন না। সৃষ্টি তাঁকে ধারণ করতে পারে - তাঁর সম্পর্কে এটা ধারণাই করা চলে না।

এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, বিশ্বলোকের আদি উৎস অপরিহার্য সত্তা তথা সৃষ্টিকর্তা যে অপরিহার্যভাবেই অসীম - বিচারবুদ্ধির এ অনস্বীকার্য রায়কে স্বীকার করে নিয়েও অনেক লোক তাঁকে 'অসীম হওয়া সত্ত্বেও সসীমরূপে আত্মপ্রকাশকারী' বলে কল্পনা করতে পসন্দ করেন এবং 'সীমার মধ্যে অসীম তুমি' ও 'সৃষ্টির কল্যাণার্থে' যুগে যুগে সম্ভব সত্তা বা সৃষ্টিরূপে আবির্ভূত হন (সম্ভবামি যুগে যুগে) ইত্যাদি কাব্যমণ্ডিত ভাষায় স্বীয় দাবী উপস্থাপনের মাধ্যমে বিচারবুদ্ধির রায়ের অনিবার্য উপসংহারকে চাপা দেয়ার চেষ্টা করেন। কিন্তু প্রকৃত ব্যাপার হলো, অসীমের বৈশিষ্ট্যই এই যে, তাঁর পক্ষে সসীম হওয়া সম্ভব নয়; সসীম সৃষ্টিরূপে আত্মপ্রকাশ তো দূরের কথা।

অনেকে এ প্রসঙ্গে ভ্রমাত্মক টতর্কের (fallacy - مغالطة) আশ্রয় নিয়ে বলার চেষ্টা করেন যে, সর্বশক্তিমান সৃষ্টিকর্তার পক্ষে অসম্ভব বলে কিছুই নেই, অতএব, তাঁর পক্ষে সসীমরূপে আত্মপ্রকাশ করাও সম্ভব; অন্যথায় তিনি অক্ষম বলে প্রমাণিত হবেন এবং তা তাঁর অপূর্ণতার পরিচায়ক হবে। এ এক স্ববিরোধী উদ্ভট অপযুক্তি। কারণ, কারো দুর্বলতা ও অক্ষমতা তখনই প্রমাণিত হয় যখন একটি সম্ভব কাজ করতে সে অসমর্থ হয়; বিচারবুদ্ধির দৃষ্টিতে যে কাজটি মূলগতভাবেই অসম্ভব তা করতে না পারার কারণে কারো ওপরে অক্ষমতা আরোপ করা যায় না। অসীম সত্তা সৃষ্টিকর্তাকে সসীম সৃষ্টিতে পরিণত হতে হবে বাটির -এ হচ্ছে সোনার পাথর - একটি বাটি হয় সোনার ।মতোই অসম্ভব কিছু দাবী করাহবে, নয়তো পাথরের হবে, নয়তো সোনা ও পাথরের মিশ্রণের হবে; কিন্তু একই সাথে তা খাঁটি সোনারও হবে, আবার খাঁটি পাথরেরও হবে এটা তো সম্ভব নয়। আর যদি তর্কের খাতিরে ধরে নেয়া হয় যে -, কোনো না কোনোভাবে খাঁটি সোনার বাটি খাঁটি পাথরের বাটিতে পরিণত হতে সক্ষম তাহলেও মানতে হবে যে, যেই মুহূর্তে সোনা পাথরে পরিণত হবে ঠিক সেই মুহূর্ত থেকে আর সোনার বাটির অস্তিত্ব থাকবে না এবং এর বিপরীত ক্ষেত্রেও তাই। অতএব -, একই সাথে তা পুরোপুরি সোনার ও পুরোপুরি পাথরের হতে পারে না।

তেমনি যদি ধরে নেয়া হয় যে, অপরিহার্য সত্তা সৃষ্টিকর্তার পক্ষে সম্ভব- সত্তা সসীম সৃষ্টিতে পরিণত হওয়া সম্ভব তাহলে যে মুহূর্তে তিনি সসীম সৃষ্টিরূপ সম্ভব- সত্তায় পরিণত হবেন ঠিক সেই মুহূর্ত থেকে আর তিনি অসীম অপরিহার্য সত্তা সৃষ্টিকর্তা থাকছেন না। কিন্তু এ ক্ষেত্রে একটি বড় ধরনের সমস্যা হচ্ছে এই যে, যেহেতু সম্ভব- অস্তিত্ব সমূহ কেবল তাদের অস্তিত্বলাভের জন্যেই অপরিহার্য সত্তার ওপর নির্ভরশীল নয়, বরং অস্তিত্ব অব্যাহত রাখার জন্যেও তাঁর ওপর নির্ভরশীল, সেহেতু অপরিহার্য সত্তা সসীম সৃষ্টির রূপ ধারণ করলে তথা অপরিহার্যতা হারালে সাথে সাথে তার সৃষ্টিনিচয়ও অস্তিত্ব হারাতে বাধ্য।

বস্তুতঃ অসীমত্ব হচ্ছে পূর্ণতার পরিচায়ক এবং সসীমত্ব হচ্ছে অপূর্ণতার পরিচায়ক। তাই অত্যন্ত স্বাভাবিকভাবেই সসীমের মধ্যে অসীমতা তথা অপূর্ণের মধ্যে পূর্ণতার আকাঙ্ক্ষা বিদ্যমান। কিন্তু এর বিপরীতে অসীমের মধ্যে সসীম হওয়ার তথা পূর্ণের মধ্যে অপূর্ণ হওয়ার আকাঙ্ক্ষা বিদ্যমান থাকতে পারে না। অভাবহীন অসীম সত্তা কোন্ অভাব পূরণের জন্যে সসীম হতে চাইবেন? সৃষ্টির কল্যাণের জন্যে? সৃষ্টির কল্যাণের জন্যে তো তাঁর সৃষ্টির রূপ ধারণ করার প্রয়োজন নেই। তিনি তো সৃষ্টি থেকে দূরে নন, বরং তিনি সৃষ্টিকে ধারণ করে আছেন, অতএব, তিনি চাইলেই সৃষ্টিকে কল্যাণ পৌঁছাতে পারেন। তিনি কি সৃষ্টির সামনে আদর্শ উপস্থাপনের জন্যে সসীম সৃষ্টিরূপে আবির্ভূত হবেন? তার কোনো প্রয়োজন আছে কি? তিনি তো চাইলেই তাঁর কোনো সৃষ্টিকে অন্যান্য সৃষ্টির জন্যে আদর্শরূপে উপস্থাপন করতে সক্ষম। তাহলে তিনি নিজেকেই কেন আদর্শরূপে উপস্থাপন করবেন? যদি যুক্তির খাতিরে তা সম্ভব বলে ধরে নেই তথাপি তা হবে উদ্দেশ্যের বিপরীত। কারণ, স্রষ্টা কখনো সৃষ্টির জন্যে পরিপূর্ণভাবে অনুসরণীয় আদর্শ হতে পারেন না। কারণ, স্রষ্টার পক্ষে যা সম্ভব ও সহজ সৃষ্টির পক্ষে তা সম্ভব ও সহজ নয়। এ ক্ষেত্রে বরং বিপরীত ফল পাওয়া যাবে। অর্থাৎ সৃষ্টির এটাই মনে হতে বাধ্য যে, তিনি তো স্রষ্টা; তাঁর পক্ষে যা সম্ভব আমাদের পক্ষে কি তা সম্ভব? অতএব, যে ক্ষেত্রে তার পক্ষে স্রষ্টাকে অনুসরণ করা সম্ভব সে ক্ষেত্রেও অনুসরণীয় সত্তা সৃষ্টি না হয়ে স্রষ্টা হওয়ায় সে হতাশায় আক্রান্ত হয়ে তাঁকে

অনুসরণে অক্ষম হয়ে পড়বে অথবা, ক্ষেত্রবিশেষে, সে স্বেচ্ছায় এটাকে বাহানা হিসেবে গ্রহণ করবে।

অতএব, বিচারবুদ্ধি এ উপসংহারে উপনীত হতে বাধ্য যে, অপরিহার্য সত্তা কোনো স্থানবিশেষে অবস্থান, অধিষ্ঠান, অবতরণ বা অবতাররূপে জন্মগ্রহণ জনিত সসীমতার উর্ধে।

তিন: তিনি নিরাকার

অপরিহার্য সত্তা নিরাকার হতে বাধ্য। কারণ, আকার হচ্ছে সম্ভব সত্তার, বিশেষতঃ বস্তুগত সত্তার বৈশিষ্ট্য এবং সসীমতার পরিচায়ক। বরং আকারের জন্য সীমাবদ্ধতাই দায়ী। অন্যভাবে বলা যায় যে, আকারবিশিষ্ট হওয়া সসীমতার চেয়েও অধিকতর দুর্বলতার পরিচায়ক। অতএব, অসীম সত্তার কোনো আকার থাকা সম্ভব নয়। বরং তিনি আকারবিশিষ্ট হওয়ার ন্যায় দুর্বলতার উর্ধে। এ কারণে তিনি আকার ধারণ করার বা আকার ধারণের ইচ্ছাপোষণেরও উর্ধে। কারণ, অসীম সত্তা আকার ধারণ করতে পারেন না; আকার ধারণ করতে হলে তাঁকে অবশ্যই সসীম হতে হবে। আর অসীমত্ব পূর্ণতার ও সসীমত্ব অপূর্ণতার পরিচায়ক।

বলা বাহুল্য যে, পরম পূর্ণতার অধিকারী অপরিহার্য সত্তার কোনো অপূর্ণতা বা অভাব থাকতে পারে না যা পূরণের জন্যে তাঁকে আকার ধারণ করতে হবে। এ প্রসঙ্গে কেউ সৃষ্টির কল্যাণ বা শিক্ষার প্রসঙ্গ তুলতে পারেন। তবে তা যে, ভ্রান্ত তা ওপরে অপরিহার্য সত্তার অসীমত্ব সংক্রান্ত আলোচনায়ই প্রমাণিত হয়েছে।

অপরিহার্য সত্তার অনিবার্যভাবেই নিরাকার হওয়া থেকে এ-ও প্রমাণিত হয় যে, তাঁকে কোনোভাবেই দেখা সম্ভব নয়; না ইহকালে, না পরকালে। অবশ্য অনেক ক্ষেত্রে আত্মিকভাবে দেখার কথা বলা হয় যা অস্বীকার করার কোনো উপায় নেই। তবে আত্মিকভাবে দর্শনের মানে তাঁর অস্তিত্ব এমন অকাট্যভাবে উপলব্ধি করণ যাতে কোনোভাবেই বিন্দুমাত্র সংশয় প্রবেশের সুযোগ নেই; এর সাথে চাক্ষুষ দর্শনের কোনো সম্পর্ক নেই। ভীতি ও প্রশান্তির ন্যায় মানসিক অবস্থা এবং বিদ্যুতের ন্যায় প্রায় অবস্তুগত অস্তিত্বের ন্যায় পার্থিব জীবনের অনেক অভিজ্ঞতা ও

দৃষ্টান্ত থেকে বিষয়টি মোটামুটি বুঝা যেতে পারে, যদিও অপরিহার্য অস্তিত্বের আত্মিক উপলি অনুধাবনের জন্যে এ সব অভিজ্ঞতার দৃষ্টান্ত অত্যন্ত দুর্বল ও অপূর্ণ দৃষ্টান্ত।

চার: তিনি অবিভাজ্য ও অযৌগিক সত্তা

অপরিহার্য সত্তার জন্যে সকল বিবেচনায়ই এক ও একক হওয়া অপরিহার্য। অর্থাৎ তিনি অনিবার্যভাবেই অবিভাজ্য ও অযৌগিক সত্তা। কেননা, যৌগিকতা হচ্ছে সম্ভব- সত্তা বা সৃষ্ট- সত্তার, বিশেষতঃ বস্তুগত সত্তার বৈশিষ্ট্য। এ ধরনের যে কোনো সত্তা বিভিন্ন অংশের সমন্বয়ে গঠিত, তা সে অংশসমূহ বিভিন্ন অঙ্গপ্রত্যঙ্গই হোক (যেমন: মানুষের রয়েছে) অথবা প্রাথমিক মৌলিক উপাদানই হোক (যেমন: একটি পরমাণু ইলেকট্রন, প্রোটন ও নিউট্রনের সমন্বয়ে গঠিত)। আর যে কোনো অবস্থায়ই একটি যৌগিক সত্তার অস্তিত্ব তার উপাদানসমূহের ওপর নির্ভরশীল। এ সব উপাদান বিভাজিত বা বিশ্লিষ্ট হওয়ার ফলে ঐ সত্তার বিনাশ বা বিলুপ্তি ঘটে। অতএব, সন্দেহ নেই যে, বিভাজ্যতা বা যৌগিকতা সম্ভব- সত্তা বা সৃষ্টির দুর্বলতাবাচক বৈশিষ্ট্য। তাই অপরিহার্য সত্তার জন্য অবশ্যই এহেন দুর্বলতা থেকে মুক্ত থাকা অপরিহার্য। অর্থাৎ তিনি কোনোভাবেই কোনো যৌগিক উপাদানের সমন্বিত সমষ্টি নন। বরং প্রকৃত ব্যাপার হচ্ছে, ‘উপাদান’মাত্রই সম্ভব- সত্তারই বৈশিষ্ট্য। অতএব, অপরিহার্য সত্তার জন্যে উপাদানের ধারণা প্রযোজ্য হতে পারে না, তা বিভিন্ন উপাদানই হোক বা অভিন্ন উপাদানই হোক।

অপরিহার্য সত্তা শুধু যৌগিকতার বস্তুগত ধারণা থেকেই মুক্ত নন, বরং যৌগিকতার অবস্তুগত ধারণা থেকেও মুক্ত। যৌগিকতার অবস্তুগত বা বিচারবুদ্ধিগত ধারণাসমূহের মধ্যে অন্যতম হচ্ছে একই সত্তায় বিভিন্ন গুণের সমাহার। যেহেতু কোনো সৃষ্টির মধ্যে সম্ভাব্য গুণসমূহের সবগুলো বা কয়েকটি থাকতেও পারে বা নাঐ সৃষ্টি থেকে তার :ও থাকতে পারে। এমতাবস্থায় প্রথমত - গুণকে বা গুণসমূহকে আলাদা করে দেখা যায়, আবার তার বিভিন্ন গুণকেও পরস্পর আলাদা করে দেখা যায়। যেমনএকটি সদ্যজাত শিশু কোনো গুণের অধিকারী নয় :, কিন্তু পরে সে ক্রমান্বয়ে বিভিন্ন গুণের অধিকারী হয়। এমতাবস্থায় সে জ্ঞান, শক্তি, সাহস, ধৈর্য ইত্যাদি গুণাবলীর যে কোনোটির অধিকারী হতে পারে, আবার নাও হতে পারে। অতএব -, মানুষ ও

তার গুণাবলী এক নয় এবং তার গুণসমূহও পরস্পর অভিন্ন নয়। এমতাবস্থায় মানুষের মূল সত্তা /নাফস্ বা অহং - অবস্তুগত সত্তা)sel f) একটি যৌগিক সত্তা যা অবস্তুগত বিধায় এর যৌগিকতা বিচারবুদ্ধিগত যৌগিকতা (تركيب عقلى- abstract combination)। অপরিহার্য সত্তার জন্যে এ ধরনের যৌগিকতারও উর্ধে থাকা অপরিহার্য। কারণ, এ ধরনের যৌগিকতাও দুর্বলতার পরিচায়ক তথা সম্ভবসত্তার বৈশিষ্ট্য। অতএব -, অপরিহার্য সত্তার গুণাবলী তাঁর সত্তা থেকে স্বত কিছু নয়, তেমনি সে সব গুণাবলী পরস্পরও পৃথক নয়। বরং একদিকে যেমন তাঁর সকল গুণ প্রকৃত পক্ষে এক অভিন্ন গুণ, তেমনি তাঁর গুণ ও তাঁর সত্তা অভিন্ন। অন্য কথায়, তাঁর সত্তাই তাঁর গুণাবলী।

বিচারবুদ্ধিগত যৌগিকতার আরেকটি ধারণা হচ্ছে কোনো সত্তায় কোনো গুণের মাত্রাগত কম-বেশীর ধারণা। যেমন: কোনো মানুষের মধ্যে শক্তি, সাহস, জ্ঞান, ধৈর্য ইত্যাদি গুণ কম থাকতে পারে এবং তা ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধি পেতে পারে, তেমনি বেশী থেকে তা ক্রমান্বয়ে কমে যেতে পারে। এভাবে একই সত্তায় কোনো গুণের বিভিন্ন মাত্রা ধারণা করা যেতে পারে যার ফলে বিচারবুদ্ধি একটি গুণকে বস্তুগত অর্থে না হলেও মাত্রাগত অর্থে বিভিন্ন ইউনিটে বা পরিমাণে বিভক্ত করতে পারে। সে ক্ষেত্রে প্রতিটি গুণই কতক মাত্রাগত এককের সমষ্টি হয়ে দাঁড়ায়। অপরিহার্য সত্তার গুণাবলী যেহেতু অর্জিতও নয়, প্রাপ্তও নয়, বরং তাঁর সত্তার সাথে অভিন্ন তথা তাঁর চিরবিদ্যমান সত্তাই তাঁর গুণ, সেহেতু তাঁর গুণাবলীতে এ ধরনের মাত্রাগত এককের বিচারবুদ্ধিগত যৌগিকতাও ধারণা করা যেতে পারে না। বরং যৌগিকতার যত রকমের ধারণা করা যেতে পারে তিনি তার সবগুলো ধারণারই উর্ধে।

একই কারণে তাঁর সত্তা সব রকমের গতি, পরিবর্তন, বিবর্তন বা পূর্ণতাভিমুখিতারও উর্ধে। কেননা যা অযৌগ একক তাতে পরিবর্তন সম্ভব নয়, যা অসীম একক তাতে গতি সম্ভব নয় এবং যা পরম পূর্ণতার অধিকারী তার জন্যে পূর্ণতা- অভিমুখে অগ্রগামিতার প্রশ্নও উঠতে পারে না।

অপরিহার্য সত্তার সত্তা ও গুণাবলীর অভিন্নতার বিষয়টি অনেকের নিকট দুর্বোধ্য বলে মনে হতে পারে, তবে সৃষ্টিজগত থেকে প্রাপ্ত উদাহরণ থেকেই এ দুর্বোধ্যতা দূরীভূত হতে পারে। যেমন: আমাদের পঞ্চেন্দ্রিয় পাঁচটি গুণের পরিচায়ক; আমাদের দর্শনশক্তি, শ্রবণশক্তি, আঘ্রাণশক্তি, আস্বাদনশক্তি ও স্পর্শনশক্তি এ ইন্দ্রিয়নিচয়ের মধ্য দিয়ে প্রকাশ পায়। তাই আমরা একটি ইন্দ্রিয় হারিয়ে ফেললে এ সব শক্তি বা গুণের মধ্য থেকে সংশ্লিষ্ট শক্তি বা গুণটি হারিয়ে ফেলি। কিন্তু আসলে আমরা এ সব ইন্দ্রিয়ের মাধ্যমে আমাদের পারিপার্শ্বিক জগত সম্বন্ধে তথ্য সংগ্রহ করে বিচারবুদ্ধির বস্তুগত য রূপ মস্তিষ্কে প্রেরণ করি। কিন্তু কোনো কোনো প্রাণী তার একটি ইন্দ্রিয়ের দ্বারা মানুষের একাধিক ইন্দ্রিয়ের কাজ পুরো মাত্রায় সম্পাদন করে থাকে। যেমন: কেঁচোর শরীর একই সাথে দর্শন, শ্রবণ ও স্পর্শনেন্দ্রিয়ের কাজ সুচারুরূপে সম্পাদন করে। অন্যদিকে সাপ তার জিভ দিয়ে শুধু স্বাদগ্রহণের কাজই করে না, শ্রবণের কাজও করে থাকে। অতএব, এমন কোনো সৃষ্টি থাকাও বিচিত্র নয় যার একটিমাত্র ইন্দ্রিয় আমাদের পঞ্চেন্দ্রিয়ের দায়িত্ব হুবহু ও নিখুঁতভাবে পালন করে। এমতাবস্থায় এমন কোনো সৃষ্টি থাকাও অসম্ভব নয় যার গোটা শরীরই পঞ্চেন্দ্রিয় (যেমন: কেঁচোর গোটা শরীরই শ্রবণ, দর্শন ও স্পর্শনেন্দ্রিয়) অর্থাৎ তার সত্তা ও ইন্দ্রিয়নিচয় অভিন্ন।

এটা অবশ্য অপরিহার্য সত্তার সত্তা ও গুণাবলীর অভিন্নতা অনুধাবনের জন্যে একটি খুবই দুর্বল উপমা। কিন্তু এ থেকে বুঝতে অসুবিধা হয় না যে, অপরিহার্য সত্তার জন্যে তাঁর সত্তা ও গুণাবলী অভিন্ন হওয়া সম্ভব। আর যেহেতু সত্তা ও গুণাবলী অভিন্ন না হওয়া এবং পৃথক হওয়া দুর্বলতার পরিচায়ক সেহেতু অপরিহার্য সত্তার সত্তা ও গুণাবলী অভিন্ন হওয়া অপরিহার্য।

পাঁচ: তিনি অস্তিত্বদান- ক্ষমতার অধিকারী

যেহেতু সম্ভব- অস্তিত্বসমূহের অস্তিত্বলাভের আদিতম কারণ হচ্ছেন অপরিহার্য সত্তা এবং তিনি ব্যতীত সম্ভব- অস্তিত্বের জন্যে দ্বিতীয় কোনো আদি উৎস বা আদি কারণ চিন্তা করা সম্ভব নয়, সেহেতু অপরিহার্য সত্তার জন্যে সৃষ্টি করার গুণ বা ক্ষমতা তথা অস্তিত্বপ্রদান- ক্ষমতার অধিকারী হওয়া অপরিহার্য। এ ধরনের গুণ বা ক্ষমতার অধিকারী না হলে তিনি সম্ভব- অস্তিত্বকে অস্তিত্বদান

করতে পারতেন না। তবে অপরিহার্য অস্তিত্ব সম্ভব- অস্তিত্বের জন্যে শুধু আদি কারণই নন, বরং বর্তমান কারণও বটে। অর্থাৎ সম্ভব- অস্তিত্বের সৃষ্টিই শুধু নয়, বরং স্থিতিও অপরিহার্য সত্তার ওপর নির্ভরশীল।

বলা বাহুল্য যে, আমরা সৃষ্টিলোকের বিভিন্ন উপকরণের তথা বিভিন্ন সৃষ্টির অস্তিত্বলাভের পিছনে বিভিন্ন কারণ লক্ষ্য করি, তবে এ সব কারণও আদি কারণ বা অপরিহার্য সত্তা থেকে উৎসারিত। সৃষ্টিলোকে বিদ্যমান আমাদের প্রত্যক্ষকৃত কারণসমূহ ও আদি কারণ অপরিহার্য সত্তার মধ্যকার বৈশিষ্ট্যগত অন্যতম পার্থক্য এই যে, কোনো কোনো ক্ষেত্রে সম্ভব- অস্তিত্বের অস্তিত্বলাভের 'পূর্ণ কারণের' অন্তর্ভুক্ত উপাদানসমূহের মধ্য থেকে কোনো উপাদানের বিলুপ্তির পরেও সে কারণের ফলশ্রুতি ঐ সম্ভব- অস্তিত্বটি টিকে থাকে। যেমন: একটি গাছের অস্তিত্বলাভের জন্যে বীজ, বীজের প্রাণসম্ভাবনা, উপযুক্ত মাটি ও আবহাওয়া এবং বীজবপনকারীর অস্তিত্ব অপরিহার্য। বীজ বপন করার পর বীজবপনকারীর ও চারাগাছের জন্মের পর বীজের বিলুপ্তি বা বিনাশ ঘটলেও গাছ টিকে থাকতে পারে। অর্থাৎ গাছটির অস্তিত্বলাভের জন্যে বীজ ও বীজবপনকারীর অস্তিত্ব অপরিহার্য হলেও তার টিকে থাকার জন্যে এ দুই উপাদানের টিকে থাকা অপরিহার্য নয়। কিন্তু গাছটির জন্ম ও স্থিতির সকল কারণ বা উপাদানই প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে অপরিহার্য সত্তা থেকে অস্তিত্বলাভ করেছে। ফলে গাছটি তার জন্মের কারণসমূহের মধ্য থেকে যে ক'টির বা যেটির ওপরই টিকে থাকুক না কেন, কার্যতঃ সে সকল কারণের আদি কারণ অপরিহার্য সত্তার ওপর নির্ভর করেই টিকে আছে।

বস্তুতঃ গোটা সৃষ্টিলোকের অস্তিত্বদানকারী সত্তার জন্যে কতগুলো গুণের অধিকারী থাকা অপরিহার্য এবং এ কারণে আদি কারণ বা অপরিহার্য সত্তা অবশ্যই তার অধিকারী। এ সব গুণের মধ্যে একটি হচ্ছে এই যে, সম্ভব- অস্তিত্ব তথা সৃষ্টিলোকের মধ্যে যে সব পূর্ণতাবাচক বৈশিষ্ট্য রয়েছে তা অবশ্যই তাঁর মধ্যে থাকতে হবে। যেহেতু তিনি নিজে ছাড়া আর কোনো আদি উৎস নেই সেহেতু কোনো পূর্ণতাবাচক গুণের অধিকারী তিনি নিজে না হলে তাঁর সৃষ্টিকে সে গুণ প্রদান করতে পারেন না। অবশ্য তিনি এ সব গুণের পরিপূর্ণ ও পূর্ণ মাত্রায় অধিকারী, কিন্তু সৃষ্টি এ সব

গুণের বা এ সবের মধ্য থেকে একটি বা কয়েকটি গুণের অপূর্ণ অধিকারী। তাই তারা ঐ সব গুণে পূর্ণতা অর্জনের প্রয়াসী বা প্রত্যাশী। তবে এ ক্ষেত্রে কোনোরূপ শারীরিক বা বস্তুগত বৈশিষ্ট্যকে পূর্ণতাবাচক গুণ বলে গণ্য করা ঠিক হবে না। কারণ, শরীর ও বস্তুর অধিকারী হওয়া সীমাবদ্ধতাবাচক তথা অক্ষমতা ও অপূর্ণতা বাচক বৈশিষ্ট্য, সক্ষমতা ও পূর্ণতা বাচক বৈশিষ্ট্য নয়। তাই অপরিহার্য সত্তার জন্যে কোনোরূপ শারীরিক বা বস্তুগত 'পূর্ণতা' অচিন্ত্যনীয়।

অপরিহার্য সত্তার সৃষ্টিক্ষমতার আরেকটি অপরিহার্য বৈশিষ্ট্য হচ্ছে এই যে, তিনি অনস্তিত্ব থেকে অস্তিত্বের সূচনা করেন। কারণ, নিজের সৃষ্ট নয় এমন মওজূদ উপায়- উপাদানের দ্বারা সৃষ্টিকর্ম সম্পাদন করা সম্ভব- অস্তিত্বসমূহের মধ্যকার সৃজনীশক্তির অধিকারী প্রজাতি- সমূহের বৈশিষ্ট্য। যেহেতু সমস্ত সম্ভব- অস্তিত্বের আদিতম কারণ হচ্ছেন অপরিহার্য সত্তা সেহেতু তাঁর দ্বারা সৃষ্টিকর্মের সূচনাকালে কোনোরূপ সৃষ্টি- উপাদান মওজূদ থাকার প্রশ্নই ওঠে না। অতএব, নিঃসন্দেহে তিনি অনস্তিত্ব থেকে সম্ভব- অস্তিত্বের সৃষ্টির সূচনা করেন এবং এ কারণে তাঁর সমগ্র সৃষ্টিকর্মই মূলগতভাবে অনস্তিত্ব থেকে অস্তিত্বদান।

অবশ্য তাঁর সৃষ্টিকর্ম সম্পাদনের প্রক্রিয়া নির্ধারণের ব্যাপারে তিনি পুরোপুরি স্বাধীন অর্থাৎ সৃষ্টিকর্ম সম্পর্কিত তাঁর ইচ্ছা বা সিদ্ধান্তের মধ্যে সৃষ্টির প্রক্রিয়া এবং স্থান- কাল সবই শামিল থাকে। তিনি চাইলে কোনো কিছুকে মুহূর্তের মধ্যে সরাসরি সৃষ্টি করতে পারেন অর্থাৎ সরাসরি অনস্তিত্ব থেকে অস্তিত্বদান করতে পারেন, আবার চাইলে প্রাথমিক উপাদান ও প্রাকৃতিক বিধিবিধান সৃষ্টি করে এতদুভয়ের সমন্বয়ে বিশেষ স্থান ও কালে কোনো কিছু সৃষ্টির ইচ্ছা করতে পারেন।

বিচারবুদ্ধির পর্যবেক্ষণে ধরা পড়ে যে, এ সৃষ্টিজগতে প্রাকৃতিক বিধিবিধান কার্যকর রয়েছে এবং সে বিধিবিধানের অধীনে বিদ্যমান সৃষ্টিনিচয় পরিবর্তিত হয়ে নতুন নতুন সৃষ্টির উদ্ভব হচ্ছে। অতএব, সন্দেহ নেই যে, তিনি প্রাকৃতিক বিধিবিধান ও মৌলিক উপাদান সৃষ্টির মাধ্যমে একটি সৃষ্টিপ্রক্রিয়া চালু করেছেন। অন্যদিকে সীমাহীন সৃজনক্ষমতার অধিকারী অপরিহার্য সত্তা একবার আদি সৃষ্টি- উপাদান ও প্রাকৃতিক বিধিবিধান সৃষ্টির মাধ্যমে একটি সৃষ্টিপ্রক্রিয়ার সূচনা

করে গোটা সৃষ্টিকর্মকে স্বয়ংক্রিয় বা যা ি ক করে দিয়েছেন এবং তাঁর সৃষ্টিক্ষমতাকে আর ব্যবহার করছেন না, অন্য কথায়, সৃষ্টিকার্য থেকে অবসর নিয়েছেন - তাঁর সম্পর্কে এমনটা চিন্তাও করা যায় না। বরং এটাই স্বাভাবিক যে, সীমাহীন সৃজনক্ষমতার অধিকারী সত্তা প্রাকৃতিক বা যা ি ক সৃষ্টিপ্রক্রিয়ার প্রতিও দৃষ্টি রাখছেন এবং প্রয়োজনে এ প্রক্রিয়ায় হস্তক্ষেপও করছেন, অন্যদিকে তিনি অনবরত নব নব মৌলিক সৃষ্টিকর্ম সম্পাদনও অব্যাহত রেখেছেন যদিও আমরা সে সম্পর্কে অবহিত নই।

অপরিহার্য সত্তার সৃষ্টিগুণের বা সৃষ্টিক্ষমতার আরেকটি বৈশিষ্ট্য হচ্ছে এই যে, যেহেতু তিনি সৃষ্টির আদিতম কারণ এবং যে কোনো সৃষ্টির সকল কারণের মূল কারণ, সেহেতু যে কোনো সৃষ্টির স্থিতিও পুরোপুরিভাবে তাঁর ওপরই নির্ভরশীল।

এখানে আরেকটি কথা উল্লেখ না করলে নয়। তা হচ্ছে, অপরিহার্য সত্তার সৃষ্টিক্ষমতার অধিকারী হওয়ার মানে এ নয় যে, সৃষ্টিকর্ম সম্পাদন তাঁর জন্যে অপরিহার্য হবে। অর্থাৎ তিনি সৃষ্টি করতে বাধ্য নন। কারণ, সৃষ্টি করতে তিনি বাধ্য হলে সংশ্লিষ্ট সৃষ্টিকেও তাঁর পাশাপাশি অপরিহার্য সত্তায় পরিণত হতে হয়, আর তা একেবারেই অসম্ভব। বরং তাঁর সৃষ্টিক্ষমতার অধিকারী হওয়া মানে তিনি চাইলেই সৃষ্টি করতে পারেন, তবে সৃষ্টি করা তাঁর জন্যে অপরিহার্য নয়। অবশ্য তিনি এরূপ ক্ষমতার অধিকারী বিধায় এটাই স্বাভাবিক যে, তিনি সৃষ্টি করার জন্যে ইচ্ছা করবেন এবং তদনুযায়ী সৃষ্টি করবেন, আর প্রকৃত পক্ষেও তিনি ইচ্ছা করেছেন এবং সৃষ্টি করেছেন।

এখানে একটি দার্শনিক বিতর্ক দেখা দিতে পারে। তা হচ্ছে, অপরিহার্য সত্তা তো পরম পূর্ণতার অধিকারী; এমতাবস্থায় তাঁর সৃষ্টিকর্ম সম্পাদনের ইচ্ছা করা ও তা সম্পাদন করার কারণ কী? সৃজনক্ষমতা থাকলেই সৃষ্টি করতে হবে - এটা তো অপরিহার্য নয়! তিনি যখন সকল প্রকার অভাব ও প্রয়োজনের উর্ধে তখন তিনি সৃষ্টি করলেন কেন? বলা হতে পারে: যেহেতু তিনি সৃষ্টি করেছেন সেহেতু এর কারণ হয়তো এই যে, হয় তাঁর মধ্যে কোনো অভাববোধ আছে যা পূরণের জন্যে তিনি সৃষ্টি করেছেন, নয়তো তাঁর সৃষ্টিগুণ এমন যে, সৃষ্টিকর্ম সম্পাদন তার অনিবার্য দাবী, অতএব, তাঁর জন্যে সৃষ্টিকর্ম সম্পাদন না করা সম্ভব ছিল না।

এ কথার জবাব হচ্ছে এই যে, অপরিহার্য সত্তা ইতিবাচক সংখ্যা ও নেতিবাচক সংখ্যার মাঝামাঝি কোনো নিরপেক্ষ সংখ্যা তথা শূন্যের সাথে তুলনীয় নন। বরং অনস্তিত্ব ও অস্তিত্ব যথাক্রমে শূন্য ও ইতিবাচক সংখ্যার সাথে তুলনীয়। যেহেতু অপরিহার্য সত্তা অনিবার্যভাবেই আছেন এবং অস্তিত্বমাত্রই ইতিবাচক, সেহেতু অপরিহার্য সত্তা ইতিবাচক। তাই তাঁর নিজের জন্যে সৃষ্টিকর্ম সম্পাদনের কোনো প্রয়োজন না থাকা সত্ত্বেও এবং তিনি আদৌ কোনো সৃষ্টিকর্ম সম্পাদন না করার স্বাধীনতার অধিকারী হওয়া সত্ত্বেও স্বাধীনভাবেই তাঁর এ গুণের ইতিবাচক বহিঃপ্রকাশ স্বরূপ তিনি সৃষ্টিকর্ম সম্পাদনের ইচ্ছা করেছেন এবং এ সৃষ্টিলোককে সৃজন করেছেন ও পত্যক্ষ- পরোক্ষ উভয়ভাবে সৃষ্টিকর্ম অব্যাহত রেখেছেন। একই কারণে তিনি সৃষ্টিকুলের প্রয়োজনে যা কিছুকে চান স্থিতি বিধানের ইচ্ছা করছেন এবং স্থিতি প্রদান করছেন।

ছয় : **তিনি চিরজীবী**

যে সত্তা প্রকৃত সৃষ্টিক্ষমতার অধিকারী অর্থাৎ পূর্ব থেকে বিদ্যমান কোনো উপাদান ছাড়াই সৃষ্টি করতে সক্ষম সে সত্তা কখনোই নিষ্প্রাণ বা যা ি ক সত্তা হতে পারেন না। কারণ, সৃষ্টিক্ষমতা একমাত্র প্রাণশীল সত্তারই বৈশিষ্ট্য। অবশ্য বর্তমানে এমন ধরনের য তৈরী করাও সম্ভব হয়েছে যা কোনো প্রাণশীল পরিচালক ছাড়াই স্বয়ংক্রিয়ভাবে কাজ করতে এবং সৃজনশীলতার স্বাক্ষর রাখতে সক্ষম। কিন্তু যেহেতু য টি প্রাণশীল সত্তা কর্তৃক তৈরী এবং প্রাণশীল সত্তা কর্তৃক প্রদত্ত কর্মসূচী (programmeমাণ রাখতে পারছে সেহেতু এর বদৌলতেই সে তার সৃজনশীলতার প্র -(তার নির্মাতারই সৃজনক্ষমতার বহি :তার এ সৃজনক্ষমতা মূলত:প্রকাশ মাত্র।

বস্তুতঃ জীবন বা প্রাণশীলতা একটি পূর্ণতাবাচক গুণ নিষ্প্রাণ সত্তা যা থেকে পুরোপুরি বঞ্চিত। এ কারণে কোন নিষ্প্রাণ সত্তার পক্ষে কোনো প্রাণশীল সত্তা সৃষ্টি করা তো দূরের কথা, প্রকৃত অর্থে অন্য কোন নিষ্প্রাণ সত্তা সৃষ্টি করাও সম্ভব নয়। সুতরাং যিনি সৃষ্টির সূচনা করেছেন এবং বিশেষ করে কতক সৃষ্টিকে প্রাণময় করে সৃষ্টি করেছেন নিঃসন্দেহে তিনি প্রাণময় সত্তা।

অবশ্য কতক সৃষ্টিরও প্রাণ আছে, কিন্তু স্রষ্টার প্রাণময়তা ও সৃষ্টির প্রাণশীলতা পরস্পর তুলনীয় নয়, বরং উভয়ের মধ্যে একটি মৌলিক পার্থক্য রয়েছে। তা হচ্ছে, প্রাণশীল সৃষ্টিসত্তার প্রাণের

সূচনা ও সমাপ্তি আছে যা তার কালগত সীমাবদ্ধতার অনিবার্য দাবী। কিন্তু অপরিহার্য সত্তা যেহেতু কালগত সীমাবদ্ধতার উর্ধে সেহেতু তিনি চিরজীবী ও চিরস্থায়ী। তেমনি আমাদের অভিজ্ঞতার আওতাধীন প্রাণশীল সৃষ্টিপ্রজাতির ক্ষেত্রে আমরা যা দেখতে পাই তা হচ্ছে, এরূপ সৃষ্টি দেহ ও আত্মার সমন্বয়ে গঠিত এবং তার দেহ, প্রাণ, চেতনা ও ব্যক্তিসত্তা (نفس - self) এর অস্তিত্ব - পরস্পর সম্পর্কযুক্ত হলেও অভিন্ন নয়, বরং পরস্পর স্বত । বিশেষ করে তার দেহ তার সীমাবদ্ধতার তথা অপূর্ণতা ও দুর্বলতার পরিচায়ক। তেমনি প্রাণ, চেতনা ও ব্যক্তিসত্তার পারস্পরিক স্বাত ্য ও মাত্রাগত প্রাবল্য দুর্বলতাও তার অপূর্ণতা ও দুর্বলতার পরিচায়ক। -

অপরিহার্য সত্তার প্রাণময়তা অনিবার্যভাবেই এ ধরনের দুর্বলতার উর্ধে। অর্থাৎ একদিকে যেমন তিনি দেহের অধিকারী হবার উর্ধে, তেমনি তাঁর প্রাণ ও চেতনা এবং তাঁর সত্তা বা ব্যক্তিসত্তা অভিন্ন। যেহেতু অপরিহার্য অস্তিত্বের সত্তা ও গুণাবলী একটি অভিন্ন, একক ও অবিভাজ্য অস্তিত্ব সেহেতু তাঁর অন্যতম গুণ প্রাণময়তাও তাঁর সত্তা ব্যতীত অন্য কিছু নয়। তাই ‘তিনি জীবিত বা চিরজীবী’ না বলে ‘তিনিই জীবন’ বলাই শ্রেয়তর।

সাত : **তিনি চিরজ্ঞানময়**

অপরিহার্য সত্তার আরেকটি বৈশিষ্ট্য হচ্ছে তাঁর চির জ্ঞানময়তা। অর্থাৎ জ্ঞান তাঁর সত্তার সাথে অভিন্ন।

এ প্রসঙ্গে প্রশ্ন উঠতে পারে যে, যখন তিনি কিছুই সৃষ্টি করেন নি তখন তিনি কিসের জ্ঞান রাখতেন? অতএব, তিনি কীভাবে চির জ্ঞানময় হতে পারেন?

এ প্রশ্নের জবাব হচ্ছে এই যে, অপরিহার্য সত্তার অস্তিত্বের স্বরূপ সৃষ্টিকুলের জন্যে এমন এক রহস্যলোক যাকে জানা তাদের পক্ষে কখনোই সম্ভব নয়। কিন্তু নিঃসন্দেহে তিনি স্বয়ং স্বীয় সত্তার স্বরূপ ও গুণাবলী সম্বন্ধে সদা অবগত। অতএব, তিনি সদা জ্ঞানময়। যেহেতু তিনি স্বীয় সত্তার স্বরূপ ও গুণাবলী সম্পর্কে সদা জ্ঞানময় সেহেতু তিনি স্বীয় সৃষ্টিক্ষমতা এবং সম্ভাব্য সৃষ্টি ও সকল সম্ভব- সৃষ্টি সম্পর্কেও সদা অবগত। যেহেতু তিনি কালোর্ধ সত্তা সেহেতু তাঁর সৃষ্টিপরিকল্পনা ও সৃষ্টির সম্ভাব্য গতিবিধি তাঁর নিকট সদা বর্তমান, তাই তাঁর তা জানা না থাকার প্রশ্নই ওঠে না।

অবশ্য তাঁর জ্ঞানের স্বরূপ সম্বন্ধে ধারণা করা সৃষ্টির পক্ষে সম্ভব নয়। তবে বলা বাহুল্য যে, তাঁর জ্ঞান ও তাঁর সত্তা অভিন্ন ।

আট : তিনি সর্বশক্তিমান

শক্তি নিঃসন্দেহে একটি পূর্ণতাবাচক বৈশিষ্ট্য। অবশ্য শক্তি মানে শারীরিক বা বস্তুগত শক্তি গণ্য করলে তা শক্তি বটে তবে খুবই সীমিত ও দুর্বল শক্তি। শুধু তা- ই নয়, বরং বস্তুগত অঙ্গ- প্রত্যঙ্গ, হাতিয়ার ও অন্যান্য উপকরণের মধ্য দিয়ে প্রাণী প্রজাতির অবস্থাগত সীমিত শক্তির বহিঃপ্রকাশ ঘটে মাত্র যা অপরিহার্য সত্তার জন্যে দুর্বলতারূপে পরিগণিত হতে বাধ্য। বরং অপরিহার্য সত্তার শক্তি মানে কোনো কিছু করতে চাইলে বা বাস্তবায়ন করতে চাইলে তা করার সীমাহীন ও নিরঙ্কুশ ক্ষমতা। কারণ, এরূপ সক্ষমতা না থাকলে জ্ঞান ও সৃজনশীলতা সত্ত্বেও তাঁর পক্ষে স্বীয় ইচ্ছার বাস্তবায়ন সম্ভব হতো না। কিন্তু যেহেতু অপরিহার্য সত্তার যা ইচ্ছা তা- ই করার ক্ষমতা রয়েছে সেহেতু তিনি সর্বশক্তিমান। তবে সৃজনশীলতা ও সর্বশক্তিমানতার মধ্যে পার্থক্য এই যে, সর্বশক্তিমানতা- গুণের অধিকারী সত্তা শুধু সৃষ্টি ও স্থিতিদান ক্ষমতারই অধিকারী নন, বরং ধ্বংসক্ষমতারও অধিকারী। তবে এ ক্ষেত্রেও তাঁর গুণ তাঁর সত্তার সাথে অভিন্ন।

নয় : তিনি ইচ্ছাশক্তির অধিকারী

সৃজনী- সম্ভাবনা ও তা বাস্তবায়নের ক্ষমতা থাকাই সৃষ্টিকর্ম সম্পাদনের জন্যে যথেষ্ট নয়, বরং এ জন্য ইচ্ছাও থাকা চাই। যেহেতু সৃষ্টিলোক আছে সেহেতু নিঃসন্দেহে তা অপরিহার্য সত্তার ইচ্ছার প্রতিফলন। অতএব, তিনি যে ইচ্ছাশক্তির অধিকারী তা বলাই বাহুল্য। অবশ্য ইচ্ছাশক্তি এমন একটি গুণ যার মধ্যে পূর্ণ স্বাধীনতার ভাবধারা নিহিত রয়েছে। অর্থাৎ যিনি এ গুণের অধিকারী তিনি কোনো কিছু ইচ্ছা করতেও পারেন, না- ও করতে পারেন। এ- ও বলা বাহুল্য যে, অপরিহার্য সত্তার ক্ষেত্রে তাঁর সত্তা ও ইচ্ছাশক্তি অভিন্ন ।

আমাদের এ আলোচনার সংক্ষিপ্তসার হচ্ছে এই যে, অপরিহার্য সত্তা হচ্ছেন অনাদি- অনন্ত (কালোর্ধ), অসীম (স্থানোর্ধ), নিরাকার, অবিভাজ্য ও অযৌগ একক সত্তা; তিনি চিরঞ্জীব- চিরস্থায়ী, সদাজ্ঞানময়, সর্বশক্তিমান, সৃজনীসম্ভাবনাময় ও ইচ্ছাময়। অন্য কথায়, তিনিই জীবন, তিনিই

স্থায়িত্ব, তিনিই জ্ঞান, তিনিই শক্তি, তিনিই সৃজনী সম্ভাবনা, তিনিই ইচ্ছাশক্তি যিনি স্থান- কালের উর্ধে নিরাকার পরমপ্রমুক্ত একক সত্তা।

সৃষ্টির সাথে সম্পর্ক নির্দেশক গুণাবলী

অপরিহার্য সত্তা আরো কতক গুণ- বৈশিষ্ট্যের অধিকারী; বিচারবুদ্ধি সৃষ্টিকুলের সাথে অপরিহার্য সত্তার সম্পর্ক পর্যালোচনা করে এ সম্পর্কিত ধারণায় উপনীত হয়। অর্থাৎ তাঁর কতক সত্তাগত গুণ সৃষ্টিকুলের সাথে সম্পর্ক হিসেবে বিবেচিত হলে তখন তা নতুন রূপে প্রকাশলাভ করে ও নতুন নামে অভিহিত হয়। এসব গুণের মধ্যে রয়েছে :

এক : তিনি সৃষ্টিকর্তা

অপরিহার্য সত্তা সর্বাবস্থায়ই সৃজনীসম্ভাবনা ও তা রূপায়ণের শক্তির অধিকারী। কিন্তু তিনি তা রূপায়ণের ইচ্ছা না- ও করতে পারেন। তবে আমরা আমাদের নিজদের ও আমাদের জানা সৃষ্টিকুলের অস্তিত্ব থেকে বঝুতে পারি যে, তিনি সৃষ্টির ইচ্ছা করেছেন এবং সৃষ্টিলোককে অস্তিত্বদান করেছেন। তাই তিনি এ সৃষ্টিলোকের সৃষ্টিকর্তা।

কিন্তু সৃষ্টিকর্তা হিসেবে মানুষ ও অপরিহার্য সত্তার মধ্যে বিরাট মৌলিক পার্থক্য রয়েছে। এ সব পার্থক্যের মধ্যে একটি হচ্ছে এই যে, মানুষ যে কোনো সৃষ্টির জন্যেই সৃষ্টিলোকে মওজূদ উপাদানসমূহের সাহায্য নিতে বাধ্য। কিন্তু অপরিহার্য সত্তা শূন্য থেকে সৃষ্টি করেন বা সৃষ্টির প্রক্রিয়া নির্ধারণ করে দেন।

দ্বিতীয়তঃ সৃষ্টির পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়নে মানুষের আত্মিকমানসিক ও দৈহিক সত্তায় - আলোড়ন, গতি ও পরিবর্তন ঘটে। কিন্তু অপরিহার্য সত্তার ক্ষেত্রে এরূপ কিছু ঘটে না, বরং সৃষ্টি হচ্ছে তাঁর ইতিবাচক বৈশিষ্ট্য অর্থাৎ তাঁর সত্তার স্বাধীন ইচ্ছার ইতিবাচক বহিঃপ্রকাশ। একে চুম্বকের সাথে চৌম্বক ক্ষেত্রের সম্পর্কের অনুরূপ গণ্য করা যেতে পারে। তবে পার্থক্য এখানে যে, প্রাকৃতিক চুম্বকের চৌম্বক ক্ষেত্র অনিবার্য, কিন্তু অপরিহার্য সত্তার সৃষ্টিসমূহ অনিবার্য নয়, বরং তাঁর স্বাধীন ইচ্ছার অধীন। অবশ্য বৈদ্যুতিক চুম্বকের চৌম্বক ক্ষেত্র কখনো কখনো অনুপস্থিত থাকতে পারে, কিন্তু এমনটি কেবল তখনই ঘটতে পারে যখন স্বয়ং চুম্বকটি আর চুম্বক থাকে না, বরং সাধারণ লৌহন্ডে পরিণত হয়। অর্থাৎ চুম্বক ও চৌম্বক ক্ষেত্রের অস্তিত্ব ও অনস্তিত্ব

অনিবার্যরূপে অবিচ্ছেদ্যভাবে সম্পর্কযুক্ত। কিন্তু অপরিহার্য সত্তা সৃষ্টিকর্ম সম্পাদন করুন বা না- ই করুন উভয় অবস্থায়ই তিনি সৃজনশীলতার অধিকারী। তাঁর সৃজনী সম্ভাবনায় ও ক্ষমতায় কখনোই কোনোরূপ হ্রাস- বৃদ্ধি ঘটে না।

তৃতীয়তঃ কোনো মানুষের সৃষ্টির স্থিতি সংশ্লিষ্ট মানুষটির টিকে থাকার বা কেবল তার সেটিকে টিকিয়ে রাখার ইচ্ছার ওপর নির্ভরশীল নয়। কিন্তু অপরিহার্য সত্তার সৃষ্টিসমূহের টিকে থাকা তাঁর ইচ্ছার ওপরে নির্ভরশীল।

দুই : **তিনি ব্যবস্থাপক ও পরিচালক**

অপরিহার্য সত্তা সৃষ্টিনিচয়কে শুধু সৃষ্টিই করেন নি বা করছেন না, বরং তাদের সামগ্রিক ব্যবস্থাপনা ও পরিচালনা এবং প্রাণশীল ও প্রাণহীন নির্বিশেষে এ সৃষ্টিলোকের সকল সৃষ্টির প্রয়োজন পূরণের কাজও আঞ্জাম দিচ্ছেন। তবে এ ব্যবস্থাপনা ও পরিচালনায় তিনি মানুষের মতো কোনোরূপ দুর্বলতার মুখোমুখি হন না। মানুষ যেভাবে ব্যবস্থাপনা ও পরিচালনা করতে গিয়ে স্বয়ং শারীরিক ও মানসিক প্রতিক্রিয়ার সম্মুখীন হয় অপরিহার্য সত্তার ক্ষেত্রে তা প্রযোজ্য নয়। বরং তাঁর ইতিবাচক অস্তিত্বের বহিঃপ্রকাশরূপে যে নিখুঁত নিয়ম- শৃঙ্খলা ও ব্যবস্থাপনার প্রকাশ ঘটেছে তা তাঁরই ইচ্ছার বহিঃপ্রকাশ এবং তাঁরই ইচ্ছার ওপর নির্ভরশীল। এ অর্থেই তিনি গোটা সৃষ্টিলোকের ব্যবস্থাপক ও পরিচালক। সৃষ্টিজগতে বিদ্যমান প্রাকৃতিক বিধিবিধানসমূহ এ ব্যবস্থাপনারই অংশবিশেষ মাত্র। এছাড়া ইচ্ছাশক্তির অধিকারী সৃষ্টিসমূহের স্বাধীন ইচ্ছা আর কর্মতৎপরতাও এ ব্যবস্থাপনারই আওতাধীন। অধিকন্তু তিনি এদের স্বাধীন ইচ্ছা ও কর্মতৎপরতার প্রতি সদা দৃষ্টি রাখেন এবং গোটা সৃষ্টিলোকের ব্যবস্থাপনার স্বার্থে প্রয়োজন হলে তাতে সরাসরি হস্তক্ষেপ করেন।

তিন : **তিনি সর্বজ্ঞ**

অপরিহার্য সত্তা যে সৃষ্টিনিচয়কে অস্তিত্বদান করেছেন তার ভূত- ভবিষ্যত- বর্তমান সম্বন্ধে তিনি সদা অবগত এবং তা তাঁর নিকট সদা বর্তমান। কোনো সৃষ্টির কী প্রয়োজন হবে তা তিনি পূর্ব থেকেই অবগত। কারণ, সে সৃষ্টির সৃষ্টিপরিকল্পনা তো তিনিই করেছিলেন এবং সে পরিকল্পনা তৈরীর সময় তার প্রয়োজনও তিনিই নির্ধারণ করে দিয়েছিলেন। এ কারণে তিনি তার প্রয়োজন

পূরণের ব্যবস্থাও প্রকৃ তিতে তৈরী করে রেখেছেন। এভাবে গোটা সৃষ্টিলোকের জন্যে তিনি এক ইতিবাচক লক্ষ্যাভিসারিতার সুনিশ্চিত ব্যবস্থা করেছেন। তিনি সৃষ্টিকর্মের সূচনাকালেই গোটা সৃষ্টিলোকের জন্যে সামগ্রিকভাবে যে চূড়ান্ত লক্ষ্য নির্ধারণ করে দিয়েছেন এতদ্ব্যতীত সে লক্ষ্য পূরণের নিশ্চয়তা ছিল না। তাই তিনি শুধু সর্বজ্ঞই নন, বরং তিনি পরম জ্ঞানময় ও মহাপ্রজ্ঞাময় (হাকীম)ও বটে।

চার : তিনি পথপ্রদর্শন করেন ও বাণী পৌঁছে দেন

বিচারবুদ্ধি লক্ষ্য করে যে, অপরিহার্য সত্তা প্রতিটি প্রাণশীল সৃষ্টিপ্রজাতিকে তাদের জীবনপথে চলা ও জীবনলক্ষ্যে উপনীত হবার সুবিধার্থে সহজাত প্রবণতার মাধ্যমে ও বাণীর মাধ্যমে পথ প্রদর্শন করেছেন। উন্নততর প্রজাতিকে, বিশেষতঃ মানুষকে তিনি বাণী দিয়েছেন। এ বাণী কখনো বা প্রত্যক্ষ অনুভূতি (intuitionএর মাধ্যমে -(, কখনো বা বক্তব্যের মাধ্যমে দিয়েছেন। কখনো বা ভাব আকারে দিয়েছেন, কখনো বা ভাষার ছাঁচে ফেলে দিয়েছেন। কখনো অবস্তুগত বাণীবাহক সত্তার মাধ্যমে দিয়েছেন, কখনো সরাসরি দিয়েছেন। কখনো স্বপ্নে দিয়েছেন, কখনো জাগরণে দিয়েছেন। কখনো বায়ুমণ্ডলে শব্দতরঙ্গ সৃষ্টি করে দিয়েছেন -, কখনো শুধু সুনির্দিষ্ট শ্রোতার কর্ণকুহরে পৌঁছে দিয়েছেন তথা কেবল তারই কানের পর্দায় কম্পন সৃষ্টির মাধ্যমে তাকে এ বাণী শুনিয়েছেন।

মানবজাতির ইতিহাসে যুগে যুগে বহুসংখ্যক বিশিষ্ট মানুষ সৃষ্টিকর্তার কাছ থেকে কোনো না কোনো ধরনের বা একাধিক ধরনের বাণী লাভের দাবী করেছেন। এ সব দাবীকারীর মধ্যে অবশ্য কতক দাবীকারী মিথ্যা দাবী করেছিলো। তবে বিচারবুদ্ধি পরীক্ষানিরীক্ষা করে দেখেছে যে -, এদের মধ্যে অনেকের দাবী নিঃসন্দেহে সত্য ছিলো। উদাহরণস্বরূপ, যখন লেখাপড়া নাজানা - ও জ্ঞানার্জনের সুযোগ থেকে বঞ্চিত কোনো সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণিত সত্যবাদী ব্যক্তি মহাজ্ঞানময় বাণী উপস্থাপন করেন এবং দাবী করেন যে, এ বাণী তাঁর নিকট অপরিহার্য সত্তার নিকট থেকে পৌঁছানো হয়েছে তখন বিচারবুদ্ধির পক্ষে তাঁর সে দাবীকে সত্য বলে গ্রহণ করা

ব্যতীত গত্যন্তর থাকে না, বিশেষ করে বিচারবুদ্ধি যখন অপরিহার্য সত্তার পক্ষে তাঁর সৃষ্টির নিকট এভাবে বিশেষ বাণী পৌঁছানোকে অসম্ভব গণ্য করে না।

বলা বাহুল্য যে, এ বাণীসমূহ ওপরে বর্ণিত পন্থাসমূহেই প্রদান করা হয়েছে, মানুষের মতো মুখের বাকযে র দ্বারা কথা উচ্চারণ করে নয়। কারণ, অন্যের নিকট বক্তব্য ও বাণী পৌঁছানোর জন্যে মুখ ও বাকযে র মুখাপেক্ষী হওয়ার ন্যায় দুর্বলতা অপরিহার্য সত্তার থাকতে পারে না।

পাঁচ : তিনি সত্যবাদী

বিচারবুদ্ধি স্বীকার করে যে, মানুষ যে মিথ্যা বলে তা তার অপূর্ণতা ও অভাব জনিত দুর্বলতার কারণে, যদিও ব্যক্তিভেদে অভাবের অনুভূতির মধ্যে বিভিন্নতা রয়েছে। কিন্তু অপরিহার্য সত্তা সকল প্রকার অভাব- অভিযোগ ও অপূর্ণতার উর্ধে। অতএব, তিনি যে পথনির্দেশ দেন বা যে বাণী প্রদান করেন বা যে তথ্য প্রকাশ করেন তাতে মিথ্যা বা অসত্যের লেশমাত্র থাকতে পারে না। তাঁর প্রদত্ত পথনির্দেশে ও তথ্যে প্রকৃত অবস্থা বা সত্য বৈ প্রতিফলিত হয় না।

ছয় : তিনি দেখেন ও শোনেন

অপরিহার্য সত্তা সর্বাবস্থায়ই ও সর্বোত্তমরূপে তাঁর সৃষ্টিকুলকে দেখেন, তাদের কথা শোনেন ও তাদেরকে জানেন। তবে তাঁর দেখার জন্যে চোখের, শোনার জন্যে কানের ও জানার জন্যে তথ্যসংগ্রহ মাধ্যম (য পাতি ও প্রতিনিধিবর্গ) প্রয়োজন হয় না। কারণ, তিনি স্থান- কালের উর্ধে সর্বত্র ও সদা বিদ্যমান বিধায় সৃষ্টিকুলের ক্ষুদ্রতম সৃষ্টির ক্ষুদ্রতম গতিবিধি বা কর্মতৎপরতাও তাঁর নিকট সদাই স্বতঃপ্রকাশিত ও সদাসংরক্ষিত।

সাত : তিনি দয়ালু ও কঠোর

অপরিহার্য সত্তা সকল প্রয়োজনের উর্ধে হওয়া সত্ত্বেও এবং ইচ্ছা করলে তাঁর পক্ষে সৃষ্টি না করা সম্ভব হওয়া সত্ত্বেও তিনি ইতিবাচক ইচ্ছা দ্বারা এ সৃষ্টিলোককে সৃষ্টি করেছেন এবং সৃষ্টিকুলের পূর্ণতাবিধানে প্রয়োজনীয় সকল উপায়উপকরণ সরবরাহ করেছেন। এই অ -স্তিত্ব ও এতো সব উপায়ছিলো না। কারো অধিকার নয় উপকরণ কারো পাওনা -, তাই কার্যতঃ তা তাঁর অনুগ্রহ বৈ নয়। অন্যদিকে যারা এসব অনুগ্রহ গ্রহণ করে নি বা তা লাভের উপযোগী কাজ না করায় তথা

প্রয়োজনীয় প্রাকৃতিক শর্তাবলী পূরণ না করায় তা থেকে বঞ্চিত হয়েছে বা এ সব অনুগ্রহের অপচয় বা ভুল ব্যবহার করেছে স্বভাবতঃই তারা ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে বা হতে বাধ্য। অপরিহার্য সত্তা ও সৃষ্টির মধ্যকার সম্পর্কের ক্ষেত্রে এটাই হচ্ছে তাঁর কঠোরতা।

মানুষ যেভাবে কারো প্রতি দয়ায় চিত্তচাঞ্চল্য অনুভব করে ও কারো প্রতি ক্রোধে ক্ষিপ্ত হয়ে যায় অপরিহার্য সত্তার অনুগ্রহ ও কঠোরতা ত প নয়। বরং এর তুলনা আলো ও আঁধারের ন্যায়। যে আলোর সন্ধান করলো ও তা পেয়ে তার সহায়তায় স্বীয় লক্ষ্যপানে এগিয়ে গেলো সে সফল হলো। আর যে আলো পরিত্যাগ করে অন্ধকারে পথ চললো সে অন্ধকারে হাতড়ে মরলো ও বিপদাপদে নিপতিত হলো।

বস্তুতঃ মানুষের ভালো- মন্দ কাজকর্ম এবং তাঁর আদেশনিষেধ মানা বা না মানার ক্ষেত্রে তাঁর সন্তুষ্টি- অসন্তুষ্টি আমাদের সন্তুষ্টি- অসন্তুষ্টির মতো নয়। কেউ ভালো কাজ করলে বা আমাদের আদেশ পালন করলে স্বভাবতঃই আমরা অন্তরে খুশী হই এবং আমাদের চেহারায়, কাজে ও কথায় তার প্রকাশ ঘটে। অন্যদিকে কেউ মন্দ কাজ করলে বা আমাদের নিষেধাজ্ঞা অমান্য করলে বা আদিষ্ট কাজ না করলে আমাদের মধ্যে তার বিপরীত প্রতিক্রিয়া ঘটে তথা আমরা অসন্তুষ্ট বা ক্রুদ্ধ হই। অপরিহার্য সত্তার সন্তুষ্টি- অসন্তুষ্টি এ ধরনের নয়। বরং ভালো- মন্দ কাজকর্ম সম্পাদন এবং তাঁর আদেশ- নিষেধের অনুসরণ করা- না করার জন্য তিনি যে ইতিবাচক ও নেতিবাচক প্রতিক্রিয়া (পার্থিব ও পরকালীন উভয় জীবনের জন্যে) নির্ধারণ করে রেখেছেন তা- ই প্রতিফলিত হয় এবং এটাই তাঁর সন্তুষ্টি- অসন্তুষ্টির তাৎপর্য। এর তুলনা করা যায় কোনো কল্যাণকামী কর্তৃক দুষিত পানি পান না করার জন্যে প্রদত্ত উপদেশ মান্য ও অমান্য করার এবং অসুস্থ অবস্থায় ডাক্তারের নির্দেশিত ওষুধ সেবন করার ও না করার পরিণতির সাথে।

অবশ্য এর সামান্যতম ব্যতিক্রমও হবে না এমন নয়। কারণ, ইতিপূর্বে যেমন আভাস দেয়া হয়েছে, অস্তিত্বমাত্রই ইতিবাচক। সুতরাং অপরিহার্য অস্তিত্ব ইতিবাচক এবং তাঁর সৃষ্টিকর্মও ইতিবাচক। তাই এ ক্ষেত্রে যা িক হিসাব- নিকাশ ভিত্তিক প্রতিক্রিয়া অনিবার্য নয়। কারণ, এরূপ হলে সৃষ্টিজগৎ অস্তিত্বই লাভ করতো না। যেহেতু তিনি ইতিবাচক এবং তাঁর সৃষ্টিজগৎ ও

ইতিবাচক সেহেতু ইতিবাচক কর্মের ইতিবাচক প্রতিক্রিয়া ক্ষেত্রবিশেষে কমবেশী বৃদ্ধি পাওয়া এবং নেতিবাচক কর্মের নেতিবাচক প্রতিক্রিয়া কিছুটা হ্রাস পাওয়া খুবই স্বাভাবিক। এর বিপরীত ঘটা অসম্ভব। এটাই অপরিহার্য সত্তা ও তাঁর সৃষ্টিনিচয়ের মধ্যকার সম্পর্কের ক্ষেত্রে দয়া, অনুগ্রহ, ক্ষমা, প্রত্যাবর্তন (তাওবাহ) ইত্যাদি বিভিন্ন রূপে বহিঃপ্রকাশিত হয়।

অপরিহার্য সত্তার আরো কতক গুণ- বৈশিষ্ট্য স্বত ভাবে চিহ্নিত করে আলোচনা করা চলে। কিন্তু সে সব গুণ- বৈশিষ্ট্য কোনো না কোনোভাবে এখানে আলোচিত কোনো না কোনো গুণ- বৈশিষ্ট্যের আওতাভুক্ত বিবেচনা করা যেতে পারে।

অপরিহার্য সত্তার উলুহিয়্যাত্ বা উপাস্যতা

অপরিহার্য সত্তার অপর যে বৈশিষ্ট্যটি উল্লেখ না করলে নয় তা হচ্ছে সৃষ্টির নিকট থেকে তাঁর নিরঙ্কুশ আনুগত্য লাভের অধিকার যাকে স্রষ্টার দিক থেকে উলুহিয়্যাত্ বা উপাস্যতা এবং সৃষ্টির দিক থেকে 'উবুদিয়্যাত্ বা দাসত্ব বলা চলে।

বস্তুতঃ গোটা সৃষ্টিলোকই অপরিহার্য সত্তার ইচ্ছার বহিঃপ্রকাশ। মানুষ যে সব সৃষ্টিকর্ম সম্পাদন করে তাতে মানুষের ইচ্ছাশক্তি সে সৃষ্টিকর্মের কারণসমূহের মধ্যকার একটি কারণ মাত্র। কিন্তু গোটা সৃষ্টিলোকের সৃষ্টি, স্থিতি, বর্তমানতা ও প্রবহমানতার একমাত্র 'পূর্ণ কারণ' স্বয়ং অপরিহার্য সত্তা। তাই সে সত্তার মোকাবিলায় সৃষ্টিসত্তা কোনোরূপ স্বাধীনতা ও নিজস্বত্বই দাবী করতে পারে না। এমনকি তাকে কোনো স্বাধীনতা দেয়া হলেও তা- ও স্রষ্টার স্বাধীন ইচ্ছা ও সৃষ্টিপরিকল্পনার বহিঃপ্রকাশ বৈ নয়। এমতাবস্থায় গোটা সৃষ্টিলোকের সৃষ্টিনিচয়ের জন্যে তাঁর বরাবরে আত্মসমর্পিত ও অনুগত থাকা অপরিহার্য।

বলা বাহুল্য যে, স্বয়ংক্রিয়, ইচ্ছাশক্তিহীন ও স্রেফ সহজাত প্রবণতা চালিত সৃষ্টিসত্তায় সে আনুগত্য পূর্ণ মাত্রায় বিদ্যমান রয়েছে। এমতাবস্থায় স্বাধীন ইচ্ছাশক্তি ও বিচারবুদ্ধির অধিকারী সৃষ্টির জন্যে এহেন স্রষ্টার মোকাবিলায় অস্তিত্বহীন সমতুল্য স্বীয় অস্তিত্বের তুচ্ছতা অনুভব করে তাঁর আদেশ- নিষেধ ও পসন্দ- অপসন্দের বরাবরে স্বেচ্ছায় আত্মসমর্পণ ও তাঁর দাসত্ব বরণ করে নেয়া এবং মনে, মুখে, কাজেকর্মে, আচার- আচরণে ও বিধিবদ্ধ আনুষ্ঠানিকতার মধ্য দিয়ে তার প্রমাণ পেশ করা অপরিহার্য। এর ব্যতিক্রম হলে তার স্বাভাবিক ও প্রাকৃতিক পরিণতির জন্যে অপেক্ষা করা ছাড়া তার আর গত্যন্তর নেই।

বিচারবুদ্ধির দৃষ্টিতে অপরিহার্য সত্তার একত্ব

বিচারবুদ্ধির বিশ্লেষণের চূড়ান্ত রায় হচ্ছে এই যে, আমাদের এ বিশ্বজগৎ সহ যে কোনো মাত্রার সম্ভব সকল জগতের বস্তুগত ও অবস্তুগত নির্বিশেষে সকল প্রকার সম্ভব- অস্তিত্বের আদি উৎসকে অনিবার্যভাবেই সকল পূর্ণতার অধিকারী অপরিহার্য সত্তা হতে হবে। অনিবার্যভাবেই এ অপরিহার্য সত্তাকে হতে হবে সকল প্রকার অপূর্ণতা, অভাব, দুর্বলতা ও ঘাটতি থেকে পুরোপুরি মুক্ত, নচেৎ তাঁর পক্ষে অপরিহার্য সত্তা হওয়া সম্ভব নয়। এখন প্রশ্ন হচ্ছে, এ অপরিহার্য সত্তা কি একজন হতে বাধ্য, নাকি একাধিক হওয়া সম্ভব? এ ব্যাপারে বিচারবুদ্ধি কী বলে?

এ ব্যাপারে ধর্মসমূহের নিজস্ব দাবী ও বিশ্বাসের ওপর নির্ভর করতে গেলে অকাট্য সত্যে উপনীত হওয়া ও মতপার্থক্য নিরসন সম্ভব হবে না। তাই এ গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে মানদণ্ড হিসেবে সকলের জন্য যা সমান সেই বিচারবুদ্ধির দ্বারস্থ হওয়া ছাড়া গত্যন্তর নেই। অন্যদিকে মানুষের চিন্তা ও আচরণ নিয় ণে বিষয়টির অপরিসীম গুরুত্বের কারণে প্রশ্নটিকে অমীমাংসিতভাবেও ছেড়ে দেয়া যায় না।

আদি ঈশ্বর সৃষ্ট দেব- দেবীর ধারণা

এ প্রসঙ্গে প্রথমেই যে বিষয়টি স্মরণ করা যেতে পারে তা হচ্ছে এই যে, অংশীবাদী ধর্মগুলো বহু- ঈশ্বরবাদী যে সব মতামত উপস্থাপন করেছে তাতে সাধারণতঃ একজন আদি ঈশ্বর বা ঈশ্বরগণের ঈশ্বর (পরমেশ্বর) এবং তাঁর অধীনস্থ বা সহযোগী কতক ঈশ্বর বা দেব- দেবীর অস্তিত্ব দাবী করা হয়। কোনো কোনো মতে অবশ্য আদি ঈশ্বর বিভিন্ন সময় বিভিন্ন রূপ ধারণ করে ধরাধামে আবির্ভূত হয়েছেন বলে দাবী করা হয়।

আদি ঈশ্বরের অধীনস্থ বা তাঁর সহযোগী বহু ঈশ্বরের অস্তিত্ব সংক্রান্ত ধারণায় যে ধরনের সত্তার কথা বলা হয়, ঐ সব ধর্মমত অনুযায়ীই, সাধারণতঃ তারা আদি ঈশ্বরেরই সৃষ্টি। আর বলা বাহুল্য যে, সৃষ্টি কখনো অপরিহার্য সত্তা হতে পারে না।

সৃষ্টি যতো উন্নত মানেরই হোক, সৃষ্টি সৃষ্টিই; তার পক্ষে অনন্যমুখাপেক্ষী পর্যায়ের স্রষ্টায় পরিণত হওয়া বা এ পর্যায়ের অন্য কোনো গুণের অধিকারী হওয়া সম্ভব নয়। কেননা, সৃষ্ট সত্তা হবার কারণে অনিবার্যভাবেই তাকে তার স্রষ্টার মুখাপেক্ষী থাকতে হচ্ছে। অতএব, তাকে স্রষ্টার ক্ষমতায় অংশীদার গণ্য করা যায় না।

একাধিক অনাদি অপরিহার্য সত্তার ধারণা

অংশীবাদী ধারণার একটি রূপ এই যে, সত্তাগতভাবেই তথা অনাদি কাল থেকেই একাধিক অপরিহার্য সত্তার অস্তিত্ব রয়েছে।

কিন্তু বিচারবুদ্ধি এটা গ্রহণ করে না। কারণ, অপরিহার্য সত্তাকে অবশ্যই সকল পূর্ণতাবাচক গুণের পূর্ণ মাত্রায় অধিকারী হতে হবে। আর এ ধরনের পূর্ণ সত্তা একাধিক হতে পারে না। কারণ, যে সব সত্তা অপূর্ণ ও সসীম সে সব সত্তার মধ্যে অস্তিত্বগত পারস্পরিক স্বাত ্য থাকা অপরিহার্য, এর বিপরীতে নিরঙ্কুশ পূর্ণ সত্তাকে একাধিক কল্পনা করা হলে সে ক্ষেত্রে তাদের মধ্যে পারস্পরিক স্বাত ্য না-থাকা অপরিহার্য। কারণ, স্বাতে ্যর উৎসই হচ্ছে কারো মধ্যে পূর্ণতাবাচক গুণাবলীর কতক বা কোনোটি পুরোপুরি বা অংশতঃ না-থাকা - যা অন্যের মধ্যে রয়েছে। এর বিপরীতে নিরঙ্কুশ পূর্ণ সত্তা একাধিক হলে তাদের সকলেই হবে সকল দিক দিয়ে হুবহু অভিন্ন।

উদাহরণ স্বরূপ, সম্ভাব্য বৃহত্তম গোলকের চেয়ে বৃহত্তর কোনো গোলক যেমন অকল্পনীয় (কেননা, সে ক্ষেত্রে এই দ্বিতীয়োক্ত গোলকটিই হবে বৃহত্তম, প্রথমটি নয়), তেমনি বৃহত্তম দু'টি গোলকও অকল্পনীয়। কারণ, সে ক্ষেত্রে প্রথম গোলকের স্থানেই দ্বিতীয় গোলককে স্থান

গ্রহণ করতে হবে এবং প্রথম গোলকটির বিলুপ্তি বা ক্ষুদ্রতর গোলকে পরিণত হওয়া ছাড়া তা সম্ভব নয়। একইভাবে, অপরিহার্য সত্তার জন্যে অপরিহার্য সকল পূর্ণতাবাচক গুণাবলীর অধিকারী ও সকল দুর্বলতার উর্ধস্থিত পরম পূর্ণ সত্তা একাধিক হওয়া অকল্পনীয়।

এরপরও যদি তর্কের খাতিরে ধরে নেয়া হয় যে, এরূপ একাধিক পূর্ণ সত্তা রয়েছেন, সে ক্ষেত্রে সৃষ্টির নিকট তা অভিন্ন সত্তারূপে অনুভূত হতে বাধ্য, ঠিক যেভাবে একটি বৃত্তের ওপরে হুবহু আরেকটি বৃত্ত অঙ্কন করা হলে তা দর্শকের দৃষ্টিতে একটিমাত্র বৃত্তরূপে প্রতিভাত হতে বাধ্য।

তবে অংশীবাদীরা এ ধরনের কল্পিত ঐশ্বরিক সত্তাসমূহের ওপর সাধারণতঃ ভিন্ন ভিন্ন পূর্ণতাবাচক গুণ ও কর্মক্ষমতা আরোপ করে থাকে এবং ক্ষেত্রবিশেষে দু'টি সত্তার ওপর অভিন্ন গুণ ও কর্মক্ষমতা আরোপ করলেও তাতে মাত্রাগত পার্থক্য থাকে, অর্থাৎ কল্পিত কোনো ঐশ্বরিক সত্তার মধ্যে কোনো ঐশ্বরিক গুণের প্রাধান্য থাকে এবং অন্যান্য গুণ থাকে অপেক্ষাকৃত দুর্বল মাত্রায়। অনেক ক্ষেত্রে কল্পিত ঐশ্বরিক সত্তাগুলোর মধ্যকার একেকটি সত্তা স্বত এক বা একাধিক গুণের অধিকারী এবং অন্যান্য গুণ থেকে শূন্য বলে মনে করা হয়। এর মানে হচ্ছে, তাদের প্রত্যেকেই স্বীয় এক বা একাধিক পূর্ণতাবাচক গুণের অধিকারী হলেও অন্যান্য গুণের অধিকারী না হওয়ায় বা অন্যান্য গুণের ক্ষেত্রে পূর্ণতার অধিকারী না হওয়ায় ঐ সব ক্ষেত্রে তারা দুর্বল ও পরনির্ভরশীল। অতএব, এরূপ সত্তা অপরিহার্য সত্তা হতে পারে না।

একাধিক পূর্ণাঙ্গ ঐশ্বরিক সত্তার ধারণা

আরেকটি ধারণা হতে পারে এই যে, ঐশ্বরিক সত্তাগুলোর সকলেই পূর্ণাঙ্গ সত্তা। তবে তারা আপোসে তাদের নিজেদের মধ্যে কর্মক্ষেত্রসমূহ বণ্টন করে নিয়েছে।

কিন্তু এরূপ ধারণা গ্রহণযোগ্য হতে পারে না। কারণ, একে তো একাধিক নিরঙ্কুশ পূর্ণ সত্তার অস্তিত্ব অসম্ভব - যা আমরা ওপরে বৃহত্তম গোলকের উদাহরণ দ্বারা প্রমাণ করেছি, দ্বিতীয়তঃ তর্কের খাতিরে এরূপ সত্তার অস্তিত্ব মেনে নিলেও স্বীকার করতে হবে যে, সর্বশক্তিমান সত্তার অনিবার্য বৈশিষ্ট্য হচ্ছে, এককভাবে সার্বিক কর্তৃত্ব। এ ক্ষেত্রে অন্যের সাথে কর্ম ও কর্তৃত্ব

বণ্টনের জন্য তাদের কারো পক্ষেই প্রস্তুত থাকা সম্ভব হতে পারে না। বরং সে ক্ষেত্রে তাদের মধ্যে সংঘাত ও ক্ষমতার দ্বন্দ্ব অবশ্যম্ভাবী - যার পরিণতি হচ্ছে গোটা সৃষ্টিলোকে চরম বিশৃঙ্খলা ও ধ্বংস।

দাবী করা হতে পারে যে, প্রজ্ঞাময়তার কারণে ঐশ্বরিক সত্তাগুলো পারস্পরিক সংঘাতে লিপ্ত না হয়ে আপোসে কর্ম ও কর্তৃত্ব বণ্টন করে নিয়েছে। কিন্তু কথিত এ প্রজ্ঞাময়তা হচ্ছে মানবিক প্রজ্ঞাময়তা। মানুষের জ্ঞান ও শক্তি- ক্ষমতা সীমাবদ্ধ বিধায় তাদের প্রজ্ঞা অনন্যোপায় অবস্থার প্রেক্ষিতে তাদেরকে এরূপ আপোসমূলক সিদ্ধান্ত গ্রহণের অনু লে পথনির্দেশ প্রদান করে। এমনকি মানবিক প্রজ্ঞাময়তা আপোসের কর্মনীতি নির্দেশ করলেও তার মনস্তাত্ত্বিক প্রবণতা সর্বময় ও সর্বব্যাপক সার্বভৌম ক্ষমতার দিকে। তবে এ প্রবণতা চরিতার্থ করার প্রচেষ্টা ঝুঁকিবহুল বলেই (যা তাদের দুর্বলতার পরিচায়ক) তারা তা থেকে বিরত থাকে। কিন্তু কখনো ঝুঁকিমুক্ততা অনুভূত হলে অতঃপর তা চরিতার্থ করার প্রচেষ্টা থেকে আর তারা বিরত থাকে না। এমতাবস্থায় ‘সর্বশক্তিমান’ সত্তার পক্ষে আপোসের প্রশ্নই ওঠে না। আর আপোস করার মানে হচ্ছে সংশ্লিষ্ট সত্তা সর্বশক্তিমান নয় এবং সর্বশক্তিমান না হলে সে পরম পূর্ণ সত্তা হতে পারে না। কারণ, সে ক্ষেত্রে সে কমপক্ষে এই একটি গুণের বিচারে অপূর্ণ। অতএব, সে অপরিহার্য সত্তা হতে পারে না।

এ ক্ষেত্রে আরেকটি বড় সমস্যা হচ্ছে বিভিন্ন কর্মের ও কর্মক্ষেত্রের পরস্পর- সম্পৃক্ততা। সৃষ্টি, লালন- পালন ও পরিচালনা এবং ধ্বংস ও মৃত্যু যদি বিভিন্ন ঐশ্বরিক সত্তার মধ্যে বণ্টিত হয় সে ক্ষেত্রে স্রষ্টার কর্মের ওপর অন্যদের কর্ম নির্ভরশীল হবে। স্রষ্টা সত্তা যদি সৃষ্টি না করার সিদ্ধান্ত নেয় সে ক্ষেত্রে অন্যরা অকেজো হয়ে পড়তে বাধ্য। কারণ, লালন- পালন, পরিচালনা, মৃত্যুদান ও ধ্বংসসাধন করা বা না- করার সিদ্ধান্তগ্রহণ কেবল তখনি অর্থবহ হতে পারে যখন স্রষ্টাসত্তা কোনো কিছুকে বা কাউকে সৃষ্টি করবে। স্রষ্টাসত্তা সৃষ্টি না করলে অন্যদের ইচ্ছা- অনিচ্ছার কোনো তাৎপর্য থাকে না। অতএব, এহেন সত্তা অপরিহার্য সত্তা হতে পারে না। অন্যদিকে যার কেবল সৃষ্টির ক্ষমতা আছে এবং পরিচালনা ও প্রতিপালনের ক্ষমতা নেই, নিদেন

পক্ষে মৃত্যুদান ও ধ্বংসসাধনের ক্ষমতা নেই, সে- ও অক্ষম ও অপূর্ণ বৈ নয়। অতএব, সে- ও অপরিহার্য সত্তা হতে পারে না।

অবতারবাদের ধারণা

অংশীবাদীদের আরেকটি ধারণা অবতারবাদের ধারণা। অর্থাৎ সর্বশক্তিমান ও সকল পূর্ণতার অধিকারী একমেবাদ্বিতীয়ম ঐশ্বরিক সত্তা তাঁর সৃষ্টির, বিশেষ করে মানুষের কল্যাণার্থে যুগে যুগে সৃষ্টির আকারে, বিশেষতঃ মানুষরূপে আবির্ভূত হন। এরূপ আবির্ভূত সত্তা হচ্ছেন ঈশ্বরের অবতার বা ছদ্মবেশী ঈশ্বর। এ মতে যে ধরনের ঐশ্বরিক সত্তার কথা বলা হয়েছে সে ধরনের সত্তাও অপরিহার্য সত্তা হতে পারে না। কারণ, অসীম কখনোই সসীম রূপ ধারণ করতে পারে না। অন্যদিকে সসীম মানেই অপূর্ণতা।

আমরা ইতিপূর্বেও যেমন উল্লেখ করেছি, সৃষ্টির কল্যাণের জন্য অসীম ও অশরীরী ঐশ্বরিক সত্তার অর্থাৎ অপরিহার্য অস্তিত্বের সসীম হবার ও শরীরী হবার প্রয়োজন নেই। এ ক্ষেত্রে তাঁর পক্ষ থেকে এক বা একাধিক আদর্শ ও অনুকরণযোগ্য সৃষ্টি উপস্থাপনই যথেষ্ট। কারণ, সৃষ্টি ও স্রষ্টার সত্তাগত ধরন (category) ই আলাদা। তাই সৃষ্টির পূর্ণতা মানে স্রষ্টায় বা ঈশ্বরে পরিণত হওয়া নয়; তা সম্ভবও নয়। অতএব, তার সামনে আদর্শ সৃষ্টি উপস্থাপনের জন্য এক বা একাধিক বিশেষ সৃষ্টি প্রয়োজন; স্বয়ং ঈশ্বরের জন্য সৃষ্টিএবং তা সম্ভবও) রূপ ধারণের প্রয়োজন নেই - নয়, কারণ, রূপ পরিবর্তনের মাধ্যমে সসীম হওয়া মানে তার স্রষ্টা ও ঐশ্বরিক সত্তা থেকে সৃষ্টিসত্তায় অধঃপতন ।(যার পর আর সে ঈশ্বর থাকে না -

বরং সর্বশক্তিমান স্রষ্টার পক্ষে অনুসরণীয় আদর্শ সৃষ্টি উপস্থাপন করা সম্ভব। এটা সম্ভব না হলে তা তার অপূর্ণতা ও অক্ষমতার পরিচায়ক এবং সে ক্ষেত্রে সে অপরিহার্য সত্তা হতে পারে না।

অবতারবাদ প্রমাণ করার জন্য অনেক সময় হাস্যস্কর ট যুক্তির অবতারণা করা হয়। বলা হয়, ঈশ্বর সব কিছু করতে সক্ষম, অতএব, তিনি সৃষ্টিরূপে আত্মপ্রকাশ করতেও সক্ষম; তিনি এটা পারেন না বললে তাঁকে অক্ষম মনে করা হয়।

এ ধরনের বক্তব্য যুক্তিবিজ্ঞানের দৃষ্টিতে প্রত্যাখ্যাত অযৌক্তিক টতার্কিক বক্তব্য বৈ নয়। কারণ, ‘সক্ষমতা’ ও ‘অক্ষমতা’ কেবল সে কাজের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য যা সম্পাদন করা বিচারবুদ্ধির দৃষ্টিতে সম্ভব। তেমনি অস্তিত্ব বলতে কেবল তা- ই বুঝায় যার অস্তিত্বলাভ সম্ভব; যার অস্তিত্বলাভই অসম্ভব তেমন কিছুকে অস্তিত্বদান করতে পারা বা না- পারা কোনোটারই প্রশ্ন আসে না। বরং যা কিছু সংঘটিত হওয়া বা অস্তিত্বলাভ করা সম্ভব শুধু তা নিয়েই আলোচনা করা যেতে পারে যে, তা কি স্বতঃই অপরিহার্য অস্তিত্ব, নাকি সম্ভব অস্তিত্ব তথা অস্তিত্বলাভের জন্যে প্রয়োজনীয় শর্তাবলী পূরণ হলে অস্তিত্বলাভ করে?

একটি বস্তু খাঁটি সোনার হতে পারে, খাঁটি রৌপ্যের হতে পারে অথবা স্বর্ণ- রৌপ্যের মিশ্রণেও তৈরী হতে পারে। কিন্তু একই সাথে তা পুরোপুরি খাঁটি স্বর্ণের হবে, আবার খাঁটি রৌপ্যেরও হবে - এটা হতে পারে না। অন্যদিকে তা যদি স্বর্ণ ও রৌপ্যের সংমিশ্রণ হয়ে থাকে তাহলে তাতে শতকরা যতো ভাগ রৌপ্য রয়েছে স্বর্ণ হিসেবে তা শতকরা ততো ভাগ অ- খাঁটি বা নিম্ন মানের স্বর্ণ। তেমনি রৌপ্য হওয়ার দৃষ্টিতে তা সাধারণ রৌপ্যের চেয়ে ততোখানি উন্নততর যতোখানি তাতে স্বর্ণ রয়েছে; কিন্তু তাতে স্বর্ণের ভাগ থাকলেও রৌপ্য স্বর্ণ হয়ে যায় নি। অন্যদিকে যা খাঁটি স্বর্ণ তা স্বর্ণ হবার পাশাপাশি একই সাথে খাঁটি রৌপ্য হতে না পারায় তা এতে ব্যবহৃত স্বর্ণের জন্য ত্রুটি বা অসম্পূর্ণতা হিসেবে পরিগণিত হয় না।

তেমনি অপরিহার্য সত্তা ও সম্ভব সত্তা অস্তিত্বের প্রাথমিক ও মৌল বিভাজনের বিচারেই পরস্পর স্বত এবং যে কোনো সম্ভব সত্তাই স্বীয় অস্তিত্বলাভ ও অস্তিত্ব অব্যাহত রাখার জন্য অপরিহার্য সত্তার ওপর নির্ভরশীল। এমতাবস্থায় কোনোভাবেই অপরিহার্য সত্তার পক্ষে সম্ভব সত্তায় পরিণত হওয়া এবং সম্ভব সত্তার পক্ষে অপরিহার্য সত্তায় পরিণত হওয়া সম্ভব নয়। অতএব, অপরিহার্য সত্তার পক্ষে সসীম সৃষ্টি তথা অবতারে রূপান্তরিত হতে না পারা তাঁর অক্ষমতার পরিচায়ক নয়।

তর্কের খাতিরে যদি অবতারবাদের ধারণাকে সম্ভব বলে ধরে নেয়া হয়, তো সে ক্ষেত্রে দু’টি সমস্যার উদ্ভব ঘটতে বাধ্য। প্রথমতঃ কোনো সৃষ্টি, যেমন: মনুষ্যগর্ভে জন্মগ্রহণকারী কোনো সৃষ্টি যতোই অলৌকিক কর্ম সম্পাদন করুক না কেন, সে যে স্বয়ং ঈশ্বর অর্থাৎ ঈশ্বরই যে

মনুষ্যসন্তানরূপে আবির্ভূত হয়েছেন - অনেকের মনেই এ মর্মে প্রত্যয় সৃষ্টি হবে না। কারণ, অবতার না হয়েও অনেকের পক্ষে অলৌকিক কর্ম সম্পাদন করা সম্ভব, যেমন: জাদুকর বা বস্তুবিজ্ঞানে ব্যাপক ও সুগভীর জ্ঞানের অধিকারী ব্যক্তি।

এ ক্ষেত্রে অলৌকিকত্বের মাত্রা, ব্যাপকতা বা গভীরতা কোনো ব্যাপার নয়। কারণ, অনেক জাদুকর বা অনেক বিজ্ঞানীর মধ্যে অবশ্যই কেউ না কেউ অন্যদের তুলনায় শ্রেষ্ঠতর হবেই। এমতাবস্থায় ঈশ্বরকে অবতাররূপে আবির্ভূত হতে হলে এমনভাবে হওয়া উচিত যাতে প্রত্যেকের মনেই তাঁর ঈশ্বর হওয়া সম্পর্কে দৃঢ় প্রত্যয়ের সৃষ্টি হয় (অতঃপর কার্যতঃ কেউ তাঁকে মেনে নিক বা না- ই মেনে নিক)।

কিন্তু অবতারবাদী ধারণানুযায়ী ঈশ্বর যেভাবে অবতার হিসেবে আবির্ভূত হন তাতে বিচারবুদ্ধি এ ধরনের প্রত্যয়ের অধিকারী হতে পারে না। কারণ, মনুষ্যগর্ভে (বা অন্য কোনো প্রাণীর গর্ভে) জন্মগ্রহণজনিত সীমাবদ্ধতাই মানুষের মনে তার ঈশ্বরত্বের দাবী সম্পর্কে অবিশ্বাস সৃষ্টি করে। এমতাবস্থায় অবতারবাদের আসল উদ্দেশ্যই ব্যর্থ হয়ে যায়। অর্থাৎ যে মানবকুলের শিক্ষার উদ্দেশ্যে তার অবতাররূপে আবির্ভাব সেই মানবকুলের পক্ষে তাকে অবতাররূপে গণ্য করা ও তার কাছ থেকে শিক্ষা গ্রহণ করা অসম্ভব হয়ে পড়ে।

দ্বিতীয়তঃ মানুষের জন্য কেবল একজন আদর্শ মানুষই অনুকরণীয় আদর্শ হতে পারেন, স্বয়ং ঈশ্বর নন। তাই অবতার কর্তৃক মানুষকে সুপথে আনা তো দূরের কথা, বরং এ মতবাদ মানুষের কুপথের ওপর অব্যাহত থাকার কারণস্বরূপ হয়ে থাকে। কারণ, সে ক্ষেত্রে মানুষ এ মর্মে যুক্তি খুঁজে পায় যে, সমস্ত রকমের কুপ্রবৃত্তি, কামনা- বাসনা, লোভ- লালসা ও দুর্বলতা থেকে মুক্ত স্বয়ং ঈশ্বরের পক্ষে যেভাবে পাপাচার ও অন্যায় থেকে দূরে থাকা সম্ভব, আমাদের মতো কুপ্রবৃত্তি, কামনা- বাসনা, লোভ- লালসা ও দুর্বলতার অধিকারী সৃষ্টির পক্ষে কি তা সম্ভব? নিঃসন্দেহে সুস্থ বিচারবুদ্ধি তার এ যুক্তিকে গ্রহণ করে। ফলে অবতারবাদী ধারণা মানুষের সুপথে আসার কারণ তো হয়ই না, বরং তার পথভ্রষ্টতার কারণ হয়ে থাকে। যুগে যুগে যেখানেই অবতারবাদী ধারণা বিস্তার লাভ করেছে সেখানেই এমনটিই ঘটতে দেখা গেছে।

ঈশ্বরের গুণাবলীর স্বতন্ত্র ঐশ্বরিক সত্তার ধারণা

অংশীবাদীদের আরেকটি ধারণা হচ্ছে সৃষ্টিকর্তা বা ঈশ্বরের বিভিন্ন গুণকে স্বত ব্যক্তিসত্তা তথা স্বত ঐশ্বরিক সত্তা রূপে গণ্য করা (ও তদনুযায়ী আরাধনা করা)। এটাও এক বিচারবুদ্ধিপ্রত্যাখ্যাত ধারণা। কারণ, এক ব্যক্তি বহু গুণের অধিকারী হতে পারেন, কিন্তু তাই বলে তাঁকে বহু ব্যক্তি হিসেবে বিবেচনা করা যেতে পারে না। অবশ্য ব্যক্তিকে তার নামের পরিবর্তে বিভিন্ন গুণের ভিত্তিতে সম্বোধন করা যেতে পারে, কিন্তু তা কখনোই এমনভাবে হওয়া উচিত নয় যা থেকে বিভিন্ন স্বত ব্যক্তিত্বের ধারণা জন্ম নিতে পারে।

অবশ্য মানুষের বেলায় ব্যক্তির সত্তা ও গুণাবলী অবিভাজ্য নয়। এক ব্যক্তি জ্ঞানী, তবে তাকে জ্ঞানহীনরূপেও ধারণা করা যেতে পারে। যিনি একজন পিতা তাঁকে নিঃসন্তানরূপেও কল্পনা করা চলে। কিন্তু অপরিহার্য সত্তার সত্তা ও গুণাবলী অবিভাজ্য ও অযৌগ। অপরিহার্য সত্তার জন্য যে সব পূর্ণতাবাচক গুণ পূর্ণ মাত্রায় থাকা অপরিহার্য তার কোনোটি বাদ দিয়ে তাঁকে চিন্তাও করা যায় না। কারণ, তার একটিও বাদ দিলে বা একটি গুণের মাত্রা পূর্ণতম- এর চেয়ে সামান্যও কম হলে তিনি আর অপরিহার্য সত্তারূপে গণ্য হতে পারেন না। এমনকি চৈন্তিকভাবেও তাঁর সত্তা ও গুণাবলীকে বিচ্ছিন্নভাবে চিন্তা করা যায় না। অতএব, তাঁর যে কোনো গুণের প্রতিই মনোযোগ দেয়া হোক না কেন, তাঁকে অভিন্ন সত্তা হিসেবেই গণ্য করতে হবে।

যেহেতু অপরিহার্য অস্তিত্বের সত্তা ও গুণাবলী অবিভাজ্য, সেহেতু তাঁর বিভিন্ন গুণের বিভিন্ন দেবতা বা অবতার রূপে আত্মপ্রকাশ করাও অসম্ভব। কারণ, তা করতে হলে তাঁর গুণাবলীকে তাঁর সত্তা থেকে বিচ্ছিন্ন করতে হবে। কিন্তু তাঁর সত্তা ও গুণাবলী অভিন্ন অর্থাৎ স্বয়ং সত্তাই গুণ এবং গুণই সত্তা বিধায় এরূপ বিচ্ছিন্নতা অসম্ভব। অবশ্য বিভিন্ন সৃষ্টির মধ্যে তিনি তাঁর বিভিন্ন গুণের 'প্রভাব' প্রতিফলিত করতে পারেন এবং তা ঐ ক্ষেত্রে অন্যান্য সৃষ্টির জন্য অনুসরণযোগ্য আদর্শ হিসেবে গণ্য হতে পারে। কিন্তু অপরিহার্য সত্তা হচ্ছেন স্বয়ং গুণ (কারণ, তাঁর সত্তা ও গুণ

অভিন্ন);   তিনি গুণান্বিত নন। এমতাবস্থায় গুণান্বিত সত্তার মধ্যে গুণের বহিঃপ্রকাশ যতো উচ্চ মাত্রায়ই সংঘটিত হোক না কেন,   সে ক্ষেত্রে ঐ সম্ভব সত্তাকে অপরিহার্য সত্তার গুণবিশেষ বলে গণ্য করা যেতে পারে না।

ঈশ্বরের গুণাবলীর দেবমূর্তি নির্মাণ

এ ক্ষেত্রে অপরিহার্য সত্তার বিভিন্ন গুণের বহিঃপ্রকাশরূপে বিভিন্ন দেবমূর্তি রচনা অধিকতর অযৌক্তিক কাজ। কারণ, প্রথমতঃ অপরিহার্য ও অশরীরী অসীম সত্তার জন্যে কোনো সসীম ও শরীরী রূপ কল্পনা করা মানে তাঁর স্বরূপ সম্বন্ধে মিথ্যা রচনা। কারণ, তিনি দর্শনযোগ্য শরীরী সত্তা নন, এমতাবস্থায় তাঁর জন্যে প্রতীক রচনা মানে মিথ্যা রচনা। প্রতীক কখনো প্রকৃত নয়। তথাপি সীমিত সম্ভব সত্তার ক্ষেত্রে প্রতীক বা রূপক প্রকৃত সত্তা সম্পর্কে কিছুটা ধারণা দিতে সক্ষম, কিন্তু অপরিহার্য অসীম সত্তার ক্ষেত্রে তা সম্ভব নয়।

কোনো ব্যক্তির মূর্তি তৈরী করা হলে সে মূর্তি ঐ ব্যক্তি নয়, তবে তা ঐ ব্যক্তি সম্পর্কে একটা বাহ্যিক ধারণা দিতে সক্ষম। ফলে পরে ঐ ব্যক্তিকে দেখতে গেলে কারো পক্ষে বুঝতে পারা সম্ভব যে, এ হচ্ছে সেই ব্যক্তি যার মূর্তি সে ইতিপূর্বে দেখেছে। কিন্তু যে অসীম সত্তাকে চক্ষু ধারণ করতে পারে না তাঁর মূর্তি রচনা কেবল বিভ্রান্তই করতে পারে। কারণ, তা দর্শকের মন- মগযে এক সসীম ও দর্শনযোগ্য স্রষ্টার মিথ্যা ধারণাকেই তৈরী করে দেয়।

অন্যদিকে কোনো ব্যক্তির বিভিন্ন গুণের সাথে বিভিন্ন ব্যক্তির পরিচিতির কারণে তারা ঐ ব্যক্তির অভিন্ন মূর্তি বা ছবিকেই নিজ নিজ পরিচিত ব্যক্তি মনে করতে পারে। এতে ব্যক্তির পরিচিতি বিভিন্ন ব্যক্তির কাছে অসম্পূর্ণ হলেও তার ব্যক্তিক রূপ তথা মূর্তি বা ছবি তাদের কাছে অভিন্ন। যেমন: একই ছবির ব্যক্তি কারো কাছে কবি ওমর খৈয়াম হতে পারেন, আবার কারো কাছে জোতির্বিজ্ঞানী ওমর খৈয়াম হতে পারেন। এ ক্ষেত্রে দুই ব্যক্তিরই জানা অসম্পূর্ণ ও খণ্ডিত হলেও তারা যে ওমর খৈয়াম সম্পর্কে জেনেছে তাতে সন্দেহ নেই। কিন্তু দুই ব্যক্তির কাছে যদি দুই স্বত ব্যক্তির ছবি ওমর খৈয়াম হিসেবে বিবেচিত হয় তাহলে তা যে মিথ্যার ওপর প্রতিষ্ঠিত তাতে সন্দেহের অবকাশ নেই। যেমন, ধরুন, কবি ওমর খৈয়ামের নাক লম্বা, কিন্তু ওমর খৈয়াম নামে একজন বিজ্ঞানী আছেন যার নাক থ্যাবড়া। এ ক্ষেত্রে দর্শক কখনোই তাদেরকে এক ব্যক্তি বলে মনে করবে না। এরপর যদি তাদের নামও আলাদা হয়, যেমন: একজনকে কবি ওমর

এবং আরেক জনকে বিজ্ঞানী খৈয়াম বলা হয়, সে ক্ষেত্রে কারো পক্ষেই এ দু'জনকে এক ব্যক্তি মনে করা সম্ভব হবে না।

এ কারণেই অপরিহার্য সত্তার বিভিন্ন গুণবাচক নামের বিপরীতে ভিন্ন ভিন্ন চেহারা ও আকৃতির দেবমূর্তি রচনার ফলে কার্যতঃ বিভিন্ন গুণের অধিকারী কতগুলো স্বত সত্তার ধারণাই মানুষের মন-মগযে স্থান লাভ করে। আর তা শুধু শরীরীকরণ বা সসীমকরণের দিক থেকেই নয়, স্বত ীকরণের দিক থেকেও অপরিহার্য সত্তার সাথে সম্পর্কহীন। তাই তা অপরিহার্য সত্তার প্রতিনিধিত্বস্থানীয় হতে পারে না।

দ্বি- ঈশ্বরবাদী ধারণা

অপরিহার্য সত্তা সম্পর্কে অংশীবাদী ধারণাসমূহের মধ্যে আরেকটি ধারণা হচ্ছে কল্যাণের ঈশ্বর ও অকল্যাণের ঈশ্বর সংক্রান্ত ধারণা।

আমরা আগেই আলোচনা করে এ উপসংহারে উপনীত হয়েছি যে, অপরিহার্য সত্তা তাঁর সংজ্ঞা ও পূর্ণতার বিচারে একাধিক হতে পারেন না। এমতাবস্থায় তথাকথিত অকল্যাণের ঈশ্বর অপরিহার্য সত্তা হতে পারে না। কারণ, স্বয়ং ‘অস্তিত্ব’ (সম্ভব ও অপরিহার্য নির্বিশেষে) হচ্ছে ইতিবাচক। প্রকৃত পক্ষে নেতিবাচক বলতে কিছু নেই; ইতিবাচকতার অনুপস্থিতি বা ঘাটতিই হচ্ছে নেতিবাচকতা। অর্থাৎ নেতিবাচকতা অস্তিত্ব নয়, অনস্তিত্ব। এমতাবস্থায় পূর্ণতাবাচক ইতিবাচক গুণাবলীর পূর্ণতম মাত্রার অধিকারী সত্তাই হচ্ছেন অপরিহার্য সত্তা। অতএব, এমন সত্তায় কোনো পূর্ণতাবাচক গুণের অনুপস্থিতি বা ঘাটতি বা কোনোরূপ অকল্যাণ থাকতে পারে না।

অন্যদিকে কোনো সত্তার মধ্যে কোনো অকল্যাণের চরমতম রূপ প্রত্যক্ষ করা গেলে বুঝতে হবে যে, ঐ সত্তা পূর্ণতাবাচক কোনো কোনো বা কতক বা সকল গুণ থেকে শূন্য। এমতাবস্থায় সে সত্তার পক্ষে অপরিহার্য সত্তা হবার তথা ঈশ্বর হবার প্রশ্নই ওঠে না। অতএব, অকল্যাণের ঈশ্বর বলে কিছু থাকতে পারে না। এরূপ অকল্যাণের নায়ককে ঈশ্বর গণ্য করা ও তার আরাধনা করার পরিণতি হচ্ছে অকল্যাণ লাভ করা ও অকল্যাণকারীতে পরিণত হওয়া। কারণ, যে সত্তা কল্যাণগুণশূন্য সে কল্যাণগুণকে বিনষ্ট করে দিতে বাধ্য। তার কাছে অকল্যাণ থেকে মুক্তি প্রার্থনা করে লাভ নেই। কারণ, এরূপ প্রার্থনার ফলে তার মধ্যে দয়ার উদ্রেক হবে এবং সে দয়া করে অকল্যাণ থেকে রেহাই দেবে - এটা সম্ভব নয়। তার মধ্যে দয়ারূপ কল্যাণগুণের অস্তিত্ব নেই বলেই তো সে এরূপ অকল্যাণকর হয়েছে এবং অকল্যাণ ছড়িয়ে দেয়ার কাজে ব্যস্ত রয়েছে। এরূপ অকল্যাণকর (অর্থাৎ কল্যাণগুণহীন) সত্তা থেকে থাকলে সে অবশ্যই অপরিহার্য সত্তা নয়। বরং সে সম্ভব সত্তা মাত্র। অতএব, সে ঈশ্বর হতে পারে না। এমতাবস্থায় তার অকল্যাণ থেকে বাঁচার জন্যে সকল কল্যাণের উৎস অপরিহার্য সত্তার সাথেই সম্পৃক্ত হতে হবে। নিঃসন্দেহে তিনি

অকল্যাণ থেকে রক্ষা করতে সক্ষম। আর রক্ষাকামীকে রক্ষায় অসমর্থ হলে তিনি হবেন অসম্পূর্ণ ও অক্ষম। ফলে তিনি অপরিহার্য সত্তা হতে পারেন না। তবে তিনি অকল্যাণ থেকে রক্ষা করবেন কি না তা স্বত ব্যাপার। কারণ, এ ব্যাপারে তিনি পুরোপুরি স্বাধীন। তবে তিনি ‘পারবেন কি না’ তাঁর সম্পর্কে এরূপ প্রশ্ন তোলার অবকাশ নেই।

ত্রিত্ববাদী ধারণা

অপরিহার্য সত্তা সম্পর্কে অংশীবাদীদের আরেকটি ধারণা হচ্ছে পিতা, পুত্র ও আত্মা সংক্রান্ত ধারণা। বিচারবুদ্ধির বিচারে এ ধারণাটি সর্বাধিক দুর্বল। কারণ, কখনো বলা হয় যে, পবিত্র পিতা, পবিত্র পুত্র ও পবিত্র আত্মা স্বত , আবার কখনো বলা হয় অভিন্ন। কখনো তিনকে সমপর্যায়ভুক্ত গণ্য করা হয়, কখনোবা অপর দু'জনকে পবিত্র পিতার সৃষ্টিরূপে গণ্য করা হয়।

বস্তুতঃ এ মতটি একটি গোলকধাঁধা সৃষ্টিকারী কুসংস্কারাচ্ছন্ন অন্ধ বিশ্বাসের ওপর ভিত্তিশীল, কোনোরূপ প্রকৃত দার্শনিকতার ওপর ভিত্তিশীল নয়। কারণ, অপরিহার্য সত্তাকে অনিবার্যভাবেই সত্তা ও গুণের দিক থেকে অভিন্ন ও অবিভাজ্য হতে হবে। অন্যথায় সে হবে অসম্পূর্ণ ও নির্ভরশীল সত্তা। এমনকি তাকে বিভিন্ন অংশে বিভক্ত করে চিন্তা করলে সে ক্ষেত্রে সে তার অংশসমূহের ওপর এবং তার অংশসমূহ পরস্পরের ওপর নির্ভরশীল হবে। এরূপ নির্ভরশীল সত্তা অপরিহার্য সত্তা হতে পারে না। অতএব, তিনে এক এবং এক তিন হতে পারে না। আর পবিত্র পুত্র ও পবিত্র আত্মা যদি পবিত্র পিতার সৃষ্টি হয়ে থাকে তো সে ক্ষেত্রে এতদুভয় হবে সম্ভব সত্তা। আর সম্ভব সত্তা অপরিহার্য সত্তা নয়।

অপরিহার্য সত্তা সকল প্রকার অপূর্ণতা ও অভাব- অভিযোগ থেকে মুক্ত। অতএব, তিনি সন্তান, স্ত্রী ও পরিবারের প্রয়োজনীয়তা থেকে মুক্ত। বিশেষ করে কোনো সম্ভব সত্তাকে তাঁর পক্ষে পুত্র হিসেবে পরিগ্রহণ করা সম্ভব নয়।

মানুষের মধ্যে যে সন্তান লাভের সহজাত আকাঙ্ক্ষা বিদ্যমান তার জন্য দায়ী তার বিভিন্ন ধরনের অপূর্ণতা ও সীমাবদ্ধতা। সন্তানের মাধ্যমে তার এ অপূর্ণতা ও সীমাবদ্ধতা আংশিক হলেও পূরণ হয় এবং এ কারণেই সে সন্তানের প্রয়োজন অনুভব করে। যেহেতু পরম প্রমুক্ত ও সকল পূর্ণতার পূর্ণ মাত্রায় অধিকারী অপরিহার্য সত্তার কোনোরূপ অপূর্ণতা ও সীমাবদ্ধতা নেই সেহেতু তিনি সন্তান জন্মদানের বা পরিগ্রহণের প্রবণতা থেকে মুক্ত হতে বাধ্য।

অন্যদিকে যে কোনো প্রজাতির সন্তান সমপ্রজাতির হয়ে থাকে। সৃষ্টি ও স্রষ্টার মধ্যকার ব্যবধান দুই প্রজাতির মধ্যকার ব্যবধানের তুলনায় কোটি কোটি গুণ বেশী। কোনো মানুষ যদি একটি প্রস্তরকণা বা একটি মৃত পোকাকে হাতে তুলে নেয় এবং বলে যে, আমি এটাকে পুত্ররূপে পরিগ্রহণ করলাম, তাহলে তা যতোখানি পাগলামি হবে, অপরিহার্য সত্তা সর্বস্রষ্টা কর্তৃক কোনো সৃষ্টিকে - তা সে সৃষ্টি যতো উন্নত মানের ও যতখানি পূর্ণতার অধিকারীই হোক না কেন - পুত্ররূপে পরিগ্রহণের ধারণা পোষণ মানে তাঁর ওপর এর চেয়ে কোটি কোটি গুণে বেশী মাত্রার পাগলামি আরোপ বৈ নয়।

আর পুত্রকে যদি সৃষ্টিসত্তা গণ্য না করে অপরিহার্য সত্তারূপে গণ্য করা হয় সে ক্ষেত্রে তা এক অপ্রকৃত ও অসম্ভব দাবী বৈ নয়। কারণ, অপরিহার্য সত্তা সকল প্রকার পূর্ণতাবাচক গুণের পূর্ণতম মাত্রার অধিকারী হতে বাধ্য। অতএব, এরূপ সত্তা একাধিক হতে পারে না। এমনকি তর্কের খাতিরে যদি একাধিক হওয়াকে সম্ভবও গণ্য করা হয়, তো সে ক্ষেত্রে সমমর্যাদাসম্পন্ন দুই অপরিহার্য সত্তার একজনকে পিতা ও অপর জনকে পুত্র গণ্য করা যেতে পারে না। কারণ, একজনকে পিতা ও অপর জনকে পুত্র গণ্য করার পর আর তাদের সমমর্যাদা থাকে না। এমতাবস্থায় যার মর্যাদা হ্রাস পায় (পুত্র) তাকে অপরিহার্য সত্তারূপে গণ্য করা চলে না।

এ প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যেতে পারে যে, কোনো সৃষ্টির ব্যতিক্রমধর্মী সৃষ্টি ও গুণবৈশিষ্ট্যের কারণেও তাকে অপরিহার্য সত্তার সন্তান রূপে গণ্য করা যেতে পারে না। বস্তুতঃ মানুষের কাছে যা বিস্ময়কর ও ব্যতিক্রমধর্মী, সর্বশক্তিমান অপরিহার্য সত্তার কাছে তা একটি অতি সাধারণ ব্যাপার মাত্র। অবশ্য তিনি কোনো নিয়মকে সৃষ্টিলোকে কতটা কার্যকর রাখবেন তা তাঁর ইচ্ছার ব্যাপার। যদি বিস্ময়কর কিছু থেকে থাকে তো সে বিস্ময় শুধু পিতা বা মাতা বিহনে কোনো মানুষকে সৃষ্টি করা নয়, বরং পিতা- মাতা উভয় বিহনে প্রথম মানুষের সৃষ্টি। বরং এর চেয়েও বিস্ময়কর হচ্ছে শূন্য থেকে এ সৃষ্টিকর্মের সূচনাকরণ বা সৃষ্টিলোকের আদি উপকরণাদির সৃষ্টিকরণ।

বর্তমানে বস্তুবিজ্ঞানীরা যে স্টিফেন হকিংএর মত গ্রহণ করে নিয়ে বলছেন যে -, একটি আদি কণিকা (primary particle) থেকে গোটা বিশ্বজগত সৃষ্টি হয়েছে, যদি সে ধারণাই সঠিক হয়ে থাকে তো বিবর্তনপ্রক্রিয়ায় সমগ্র বস্তুজগত এবং বিবর্তন ও বৈপ্লবিক প্রক্রিয়ার সমন্বয়ে প্রাণীজগতের সৃষ্টির চেয়েও কোটি কোটি গুণে বিস্ময়কর হচ্ছে শূন্য থেকে সেই আদি কণিকার সৃষ্টি। অতএব, কোনো মানুষের জন্ম বিস্ময়কর হলেই তাকে ঈশ্বরের পুত্র মনে করার যৌক্তিকতা নেই।

এ প্রসঙ্গে আরো উল্লেখ করতে হয় যে, সাম্প্রতিককালে আবিষ্কৃত ক্লোনিং পদ্ধতি পিতা ছাড়া শুধু মাতা থেকে সন্তান জন্মদানের সম্ভাবনা প্রমাণিত করেছে। এমতাবস্থায় পিতা ছাড়া শুধু মাতা থেকে জন্মগ্রহণের সাথে ঐশ্বরিকতার অধিকারী হওয়ার কোনোই সম্পর্ক নেই।

কোরআন মজীদের সাক্ষ্যের ভিত্তিতে মুসলমানদের কাছে হযরত ঈসা (আঃ)- এর পিতাবিহীন জন্ম ও তাঁর মাতার চারিত্রিক পবিত্রতা একটি বিতর্কাতীত বিষয়। কোরআন মজীদের বর্ণনা অনুযায়ী আল্লাহর পক্ষ থেকে একজন ফেরেশতা এসে হযরত মারইয়াম (আঃ)কে তাঁর গর্ভে একজন নেককার সন্তান জন্মগ্রহণের ঐশী সিদ্ধান্তের সুসংবাদ প্রদান করেন।

সর্বশক্তিমান স্রষ্টা ক্লোনিং বা ফেরেশতার মুখাপেক্ষী নন। তিনি যা চান তা- ই করতে পারেন এবং যেভাবে চান সেভাবেই করতে পারেন। তাই মুসলমানদের কাছে এই প্রক্রিয়াগত বিষয়টি সুস্পষ্টভাবে প্রমাণিত হওয়া বা না হওয়ায় কিছু আসে যায় না। সর্বাবস্থায়ই তাদের কাছে হযরত ঈসা (আঃ)- এর পিতা ব্যতীতই নিষ্পাপ মাতার গর্ভে জন্মগ্রহণের বিষয়টি অকাট্য সত্য। কিন্তু এ ধরনের ব্যতিক্রমী জন্মের কারণে তাঁকে খোদার পুত্র গণ্য করার যৌক্তিকতা নেই। কারণ, একই সূত্র (কোরআন মজীদ) তাঁকে মানুষ, আল্লাহর বান্দাহ্ (দাস) ও আল্লাহর নবী বলে জানিয়েছে।

অবশ্য কোরআন মজীদের ভাষ্য অনুযায়ী তৎকালীন বনি ইসরাঈলের নিকটও প্রকৃত সত্য অজানা ছিলো না। কারণ, হযরত ঈসা (আঃ) জন্মের পর মাতৃক্রোড়ে থেকেই কথা বলেন এবং নিজেকে আল্লাহর নবী বলে ঘোষণা করেন। কিন্তু এ ব্যাপারে কোরআন মজীদ ছাড়া আর কোনো

প্রমাণ্য দলীল নেই। ইয়াহূদীরা জেনেশুনে স্বেচ্ছায় সত্য গোপন করেছে এবং হযরত ঈসা (আঃ)-এর জন্ম সম্পর্কে মিথ্যা অপবাদ দিয়েছে। এ অপবাদ খণ্ডনের ক্ষেত্রে ইনজীলের বর্তমান সংস্করণসমূহ থেকে কোনোভাবে উপকৃত হওয়া সম্ভব নয়। কারণ, বর্তমানে ইনজীল নামে যা চালু আছে তা হচ্ছে প্রকৃত ইনজীলের (আংশিক) বাণী, হযরত ঈসা (আঃ)- এর কথা ও জীবনকাহিনী এবং সংশ্লিষ্ট লেখকদের বক্তব্যের সংমিশ্রণ। কেউ যদি রাসূলে আকরাম হযরত মুহাম্মাদ (ছ্বাঃ)- এর জীবনীগ্রন্থ রচনা করেন এবং তাতে তাঁর কিছু কথা (হাদীছে ক্বাওলী) ও কোরআন মজীদের কতক আয়াত উদ্ধৃত করেন, যেমন: যদি বলেন যে, 'এ ঘটনা প্রসঙ্গে আয়াত নাযিল হলো যে, . . . ', তাহলে কেবল ঐ গ্রন্থের সাথেই বর্তমানে প্রচলিত ইনজীলের বাকবিন্যাসের বা রচনারীতির তুলনা করা চলে। তদুপরি ইনজীলের রয়েছে ডজন ডজন সংস্করণ যা প্রমাণ করে যে, এ গ্রন্থ তার মূল রূপে বিদ্যমান নেই, বরং বিকৃত হয়ে গেছে।

এতদসত্ত্বেও প্রচলিত ইনজীলকে তর্কের খাতিরে প্রামাণ্য বলে ধরে নিলেও তা ইয়াহূদীদের দেয়া অপবাদ খণ্ডনের ক্ষেত্রে তা কাজে আসবে না। কারণ, প্রথমে প্রমাণ করতে হবে যে, হযরত ঈসা (আঃ) নবী ছিলেন। কেবল এর পরই তাঁর ওপর নাযিলকৃত আসমানী কিতাব ইনজীল (যদি প্রমাণ করা যায় যে, তা অবিকৃতভাবে বর্তমান আছে) দলীল হিসেবে গ্রহণযোগ্য হতে পারে। যে ব্যক্তিকে হযরত ঈসা (আঃ)- এর নবুওয়াত (খৃস্টানদের দাবী অনুযায়ী খোদার পুত্র হওয়ার বিষয়টি) মেনে নেয়ার জন্য দাও'আত দেয়া হবে তার কাছে পূর্ব থেকেই ইনজীলের কোনো মূল্য থাকতে পারে না। তার কাছে ইনজীলের মূল্য হবে হযরত ঈসা (আঃ)কে নবী হিসেবে গণ্য করার পর।

অতএব, হযরত ঈসা (আঃ)- এর প্রতি কাউকে দাও'আত দিতে হলে তা দিতে হবে বিচারবুদ্ধির ভিত্তিতে। এ ক্ষেত্রে তাঁর প্রতি দাও'আত দেয়ার জন্য কোরআন মজীদই হচ্ছে একমাত্র দলীল। কিন্তু যারা কোরআন মজীদকে ঐশী কিতাব হিসেবে জানে না তাদের পক্ষে হযরত ঈসা (আঃ) সম্পর্কে কোরআন মজীদের দলীল থেকে সাহায্য গ্রহণ করা সম্ভব নয়। সুতরাং যারা কোরআন মজীদের ঐশিতা সম্বন্ধে নিশ্চিত নয় তাদের কাছে হযরত ঈসা (আঃ)- এর খোদার পুত্র অথবা নবী

বলে পরিগণিত হওয়া তো দূরের কথা, তাঁর জন্মের বিষয়টিই সংশয়াচ্ছন্নরূপে গণ্য হতে বাধ্য। এমতাবস্থায় এহেন ব্যক্তিকে খোদার পুত্র বলে দাবী করা কেবল বিচারবুদ্ধি বর্জনকারী কুসংস্কারাচ্ছন্ন অন্ধ দাবীদারদের পক্ষেই সম্ভব।

দেবদেবীদের ঈশ্বরের কর্মগত অংশীদার হওয়ার ধারণা

অংশীবাদী ধ্যানধারণাসমূহের মধ্যে সব শেষে যেটির ওপর আলোকপাত করতে হয় তা হচ্ছে, দেব- দেবীরা সত্তাগতভাবে ঈশ্বরের অংশীদার নয়, বরং কর্মগত দিক থেকে তাঁর অংশীদার; তারা ঈশ্বরের বিশেষ ধরনের উন্নততম সৃষ্টি এবং স্বয়ং ঈশ্বরের পক্ষ থেকে তাদের ওপর সৃষ্টিকর্ম ও সৃষ্টিলোকের পরিচালনার বিভিন্ন দায়িত্ব অর্পণ করা হয়েছে।

এ প্রসঙ্গে বলতে হয় যে, অপরিহার্য সত্তা যদি একটি বিশেষ ধরনের বা প্রজাতির সৃষ্টিকে সৃষ্টি করেন এবং তাদের মাধ্যমে অন্যান্য সৃষ্টিকে সৃষ্টি করতে ও সৃষ্টিজগতের পরিচালনা ব্যবস্থা চালাতে চান, তাতে আপত্তির কিছু নেই; এটা তিনি করতেই পারেন। কিন্তু সে ক্ষেত্রে কথিত সৃষ্টি সর্বশক্তিমান অপরিহার্য সত্তার ইচ্ছার বাইরে চলার স্বাধীনতা পাবে - এটা সম্ভব নয়। এরূপ সৃষ্টি সৃষ্টিকর্তার পূর্ণ অনুগত ও সুশৃঙ্খল হতে বাধ্য। এমতাবস্থায় তারা স্বাধীন এক্তিয়ার সম্পন্ন মানুষের চেয়ে উন্নততর হতে পারে না। অতএব, মানুষ তাদের কাছে নত হতে বা তাদের উপাসনা করতে পারে না।

আমরা যদি মেনে নেই যে, সৃষ্টিকর্তার পক্ষ থেকে সৃষ্টিলোকের কাজকর্ম পরিচালনার জন্য এ ধরনের কোনো বিশেষ সৃষ্টির ওপরে দায়িত্ব অর্পণ করা হয়েছে তাহলেও, এমনকি অপরিহার্য সত্তার সাথে সম্পর্ক প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রেও মানুষের জন্য তাদের কাছ থেকে সাহায্য গ্রহণ করা অপরিহার্য নয়। কারণ, অপরিহার্য সত্তা অনিবার্যভাবেই সকল স্থান ও কালকে আয়ত্ত করে আছেন। অতএব, তিনি সর্বত্র ও সর্বদা বিরাজমান এবং প্রতিটি সৃষ্টিরই নিকটতম অবস্থানে অবস্থান করছেন। কোনো সময় ও কোনো স্থানই তাঁর অস্তিত্ব থেকে শূন্য নয়। অন্য কথায় বলা

যেতে পারে যে, গোটা সৃষ্টিলোক তাঁর ইচ্ছাশক্তিতেই অবস্থান করছে, কারণ, ইতিপূর্বেই আমরা প্রমাণ করেছি যে, সৃষ্টিকুল কেবল তাদের অস্তিত্বলাভের জন্যই অপরিহার্য সত্তার ওপর নির্ভরশীল নয়, বরং তাদের স্থিতি বা টিকে থাকার জন্যও প্রতি মুহূর্তেই তাঁর ওপর নির্ভরশীল। অতএব, তাঁর ও সৃষ্টির মধ্যে কোনোরূপ স্থানিক ও কালিক দূরত্ব নেই। সুতরাং মানুষের আবেদন-নিবেদন তাঁর কাছে পেশ করা অন্য যে কারো কাছে পেশ করার চেয়ে সহজতর। এমতাবস্থায়, সৃষ্টিকর্তার সাথে সম্পর্ক প্রতিষ্ঠা ও রক্ষার জন্য অন্য কোনো সৃষ্টির নিকট (এবং সম্ভবতঃ তার নিজের চেয়ে নিমড়বতর সৃষ্টির নিকট) মাথা নত করা নির্বুদ্ধিতার পরিচায়ক বৈ নয়। কোনো মহাবিজ্ঞানী ও মহাশক্তিধর সম্রাটের কোনো প্রজা যদি তাঁর দরবারে গিয়ে তাঁর সামনে হাযির থেকে তাঁকে কুর্নিশ করা ও তাঁর কাছে আবেদন পেশের পরিবর্তে তাঁর দিকে পিঠ দিয়ে, সেখানে ঘুরে বেড়ানো কোনো কম্পিউটার-চালিত রোবটকে কুর্নিশ করে তার প্রশংসাগীতি গাইতে শুরু করে, সে ক্ষেত্রে তাকে ঐ রোবট তো কোনো উপকার করতে পারবেই না, বরং এতে সম্রাটের ক্রোধের উদ্রেক হওয়া এবং লোকটিকে দরবার থেকে বের করে দেয়ার জন্য রোবটদের প্রতি নির্দেশদানের সম্ভাবনা প্রায় সুনিশ্চিত। একজন বিজ্ঞানী-সম্রাটের সাথে আচরণের ব্যাপারটা যদি এ ধরনের হয়, তো সে ক্ষেত্রে সর্বশক্তিমান অপরিহার্য সত্তার সাথে সম্পর্কের ক্ষেত্রে এ ধরনের নির্বুদ্ধিতার পরিণাম অধিকতর মারাত্মক হতে বাধ্য। অতএব, দেখা যাচ্ছে, বিচারবুদ্ধি অপরিহার্য সত্তার সাথে কোনো ধরনের অংশীবাদিতাকেই সম্ভব ও সঠিক বলে গণ্য করে না। কেবল অজ্ঞতা, অন্ধত্ব ও অসচেতনতাই অপরিহার্য সত্তার নিরঙ্কুশ একত্ব প্রত্যাখ্যান ও অংশীবাদকে গ্রহণ করতে পারে।

বিচারবুদ্ধির দৃষ্টিতে সৃষ্টি ও ব্যবস্থাপনার প্রক্রিয়া

মানবমনে চিরন্তন প্রশ্ন: সকল অস্তিত্বের উৎস মহান সৃষ্টিকর্তা পরম জ্ঞানময় অপরিহার্য সত্তা কেন সৃষ্টিকর্মের সূচনা করলেন এবং তা কীভাবে করলেন? কীভাবে তিনি এতো সব অকল্পনীয় সূক্ষ্মতম সৃষ্টি থেকে শুরু করে অকল্পনীয় বিশাল সৃষ্টিনিচয়কে অস্তিত্ব দান করলেন এবং কীভাবে এর ব্যবস্থাপনা ও পরিচালনা করছেন? বিষয়টি কি এরূপ যে, তিনি সৃষ্টিপ্রক্রিয়ার সূচনা করে দিয়েছেন, অতঃপর সব কিছু স্বয়ংক্রিয়ভাবে চলছে এবং তাঁর আর কিছুই করার নেই? নাকি এরূপ কোনো স্বয়ংক্রিয়তার স্থান নেই, বরং প্রতি মুহূর্তে প্রতিটি সৃষ্টিই তাঁর প্রত্যক্ষ ভূমিকার দ্বারা অস্তিত্ব লাভ করছে ও সামনে এগিয়ে চলছে? বিচারবুদ্ধি এ ক্ষেত্রে আমাদেরকে কী বলে?

সৃষ্টিকর্ম স্রষ্টাগুণের স্বতঃস্ফূর্ত বহিঃপ্রকাশ

প্রথমেই প্রশ্ন জাগে, তিনি কেন সৃষ্টিকর্মের সূচনা করলেন? পরম প্রমুক্ত অপরিহার্য সত্তা তো সকল অপূর্ণতা ও সকল প্রয়োজন থেকে মুক্ত, তাহলে তিনি সৃষ্টির সূচনা করলেন কেন?

বিচারবুদ্ধি এ ক্ষেত্রে সহজেই যে উপসংহারে উপনীত হয় তা হচ্ছে, অনস্তিত্ব যেমন নেতিবাচক, তেমনি অস্তিত্ব হচ্ছে ইতিবাচক। পরম প্রমুক্ত অপরিহার্য সত্তা সতত বিদ্যমান ও চিরন্তন অস্তিত্বের অধিকারী। অতএব, তিনি ইতিবাচকতা ও নেতিবাচকতার মধ্যবর্তী 'নিরপেক্ষতা'- রূপ কোনো কাল্পনিক বৈশিষ্ট্যের অধিকারী নন। বরং তিনি ইতিবাচক, আর সৃষ্টিকর্ম সম্পাদনও একটি ইতিবাচক বৈশিষ্ট্য। আর যেহেতু তিনি সকল প্রকার ইতিবাচক গুণবৈশিষ্ট্যের পূর্ণতম মাত্রার অধিকারী, সেহেতু তিনি সৃষ্টিক্ষমতারও অধিকারী। অতএব, তাঁর এ সৃষ্টিক্ষমতার ইতিবাচক বহিঃপ্রকাশ ঘটবে - এটাই তো স্বাভাবিক। তাই সৃষ্টিকর্ম তাঁর জন্য কোনো প্রয়োজন নয়, বরং তাঁর সৃষ্টিক্ষমতার স্বতঃস্ফূর্ত বহিঃপ্রকাশ।

স্বতঃস্ফূর্ততা মানে স্বয়ংক্রিয়তা নয়

অপরিহার্য সত্তার সৃষ্টিকর্ম তাঁর স্রষ্টাক্ষমতার স্বতঃস্ফূর্ত বহিঃপ্রকাশ, কিন্তু এই স্বতঃস্ফূর্ততা মানে স্বয়ংক্রিয়তা হতে পারে না। কারণ, সৃষ্টিলোকের অস্তিত্বলাভ ও তা অব্যাহত থাকা এবং তার এগিয়ে চলাকে স্বয়ংক্রিয় গণ্য করার মানে হচ্ছে বিষয়টি সৃষ্টিকর্তার ইচ্ছা- অনিচ্ছার তথা নিয় ণের বাইরে থাকা। এরূপ ধারণা মানে কার্যতঃ তাঁর প্রতি যা কিতা তথা প্রকারান্তরে এক ধরনের অক্ষমতা আরোপ বৈ নয়। কিন্তু তিনি যে কোনো ধরনের অক্ষমতা থেকে প্রমুক্ত। তাই বিচারবুদ্ধির রায় হচ্ছে এই যে, সৃষ্টিলোক সর্বাবস্থায়ই তাঁর ইচ্ছাশক্তির আওতাধীন।

তিনি প্রাকৃতিক বিধানের স্রষ্টা

অনেকের ধারণা হচ্ছে এই যে, পরম প্রমুক্ত সৃষ্টিকর্তা ছোট- বড় প্রতিটি সম্ভব- অস্তিত্বের সৃষ্টি, স্থিতি ও সামনে এগিয়ে চলা সম্পর্কে প্রতি মুহূর্তে সিদ্ধান্ত নেন। কিন্তু এরূপ ধারণা তাঁর মহাবিজ্ঞানময়তার বৈশিষ্ট্যের সাথে মোটেই সামঞ্জস্যশীল নয়। কারণ, বিচারবুদ্ধি লক্ষ্য করে যে, অধিকতর মর্যাদাবান কর্তা সব কাজ নিজে করতে সক্ষম হলেও সব কিছু নিজেই করেন না। উদাহরণস্বরূপ, এক ব্যক্তি তার শারীরিক শক্তি দ্বারা কোনো কাজ সম্পাদন করে এবং অপর এক ব্যক্তি একটি য তৈরী করে ও তা চালানোর জন্য চালক নিয়োগ করে একই কাজ সেই য র সাহায্যে সম্পাদন করে। এ ক্ষেত্রে আমরা দ্বিতীয়োক্ত ব্যক্তিকে অধিকতর মর্যাদাবান কর্তা হিসেবে গণ্য করে থাকি।

সুতরাং মহাজ্ঞানময় অপরিহার্য সত্তার জন্য সামঞ্জস্যশীল হচ্ছে এটাই যে, তিনি সৃষ্টিকরণ এবং সৃষ্টির স্থিতি ও এগিয়ে চলার জন্য নিয়মাবলী বেঁধে দেবেন, আর সব কিছু তদনুযায়ী চলতে থাকবে। আমরা আমাদের অভিজ্ঞতায় এ ধরনের নিয়মাবলী প্রত্যক্ষ করি যেগুলোকে আমরা প্রাকৃতিক বিধান বলে থাকি।

তিনি স্বাধীন সৃষ্টির কাজে হস্তক্ষেপ করেন

আমরা লক্ষ্য করছি যে মহাজ্ঞানময় সৃষ্টিকর্তা তাঁর সৃষ্টিকুলের জন্য অনতিক্রম্য প্রাকৃতিক নিয়মাবলীর আওতায় তাঁর কতক সৃষ্টিকে কতক ব্যাপারে স্বাধীনতা দিয়েছেন। অর্থাৎ সৃষ্টি ও তার এগিয়ে চলার ক্ষেত্রে তিনি নিজে যেমন স্বয়ংক্রিয়তার উর্ধে তেমনি তিনি তাঁর সকল সৃষ্টিকে সকল ক্ষেত্রে প্রাকৃতিক বিধানের শৃঙ্খলে বেঁধে স্বয়ংক্রিয়তার অধীন করে দেন নি। সেহেতু যে সব সৃষ্টিকে তিনি কতক ব্যাপারে স্বাধীনতা দিয়েছেন তারা কীভাবে এ স্বাধীনতাকে কাজে লাগায় সে ব্যাপারে তিনি দৃষ্টি রাখবেন এবং যেখানেই সৃষ্টির ব্যক্তিক বা সামষ্টিক স্বার্থে বা গোটা সৃষ্টিলোকের সৃষ্টি- উদ্দেশ্যের বাস্তবায়নের স্বার্থে হস্তক্ষেপের প্রয়োজন হবে সেখানে তিনি হস্তক্ষেপ করবেন - এটাই স্বাভাবিক।

আর এটা সুস্পষ্ট যে, সৃষ্টির প্রতি দৃষ্টি রাখা ও প্রয়োজনবোধে হস্তক্ষেপ তাঁর নিজের প্রয়োজনে নয়, বরং সৃষ্টিরই প্রয়োজনে। যেহেতু তিনি সৃষ্টিকে অস্তিত্বদান করেছেন সেহেতু সৃষ্টির প্রয়োজনে ইতিবাচক হস্তক্ষেপ করবেন - এটাই তাঁর সৃষ্টিক্ষমতার দাবী এবং এ দাবী পূরণে কার্পণ্য করার মতো দুর্বলতা থেকে তিনি প্রমুক্ত।

অনবরত নব নব সৃষ্টি

যেহেতু অপরিহার্য সত্তার সৃষ্টিক্ষমতা অসীম, সেহেতু কতক সৃষ্টিকে (তার সংখ্যা যত ট্রিলিয়ন ট্রিলিয়নই হোক না কেন) অস্তিত্বদান বা অস্তিত্বে আনয়নের প্রক্রিয়ার সূচনা করে দেয়ার পর তিনি আরো নতুন নতুন ধরনের সৃষ্টিকে অস্তিত্বদানের প্রক্রিয়ার সূচনা করা থেকে বিরত থাকতে পারেন না। কারণ, সে ক্ষেত্রে তা হবে তাঁর স্রষ্টাক্ষমতা কার্যতঃ স্থগিত হয়ে যাওয়ার সমতুল্য। বরং তিনি সদাসর্বদাই নতুন নতুন ধরনের সৃষ্টিকে অস্তিত্বদান ও নতুন নতুন ধরনের সৃষ্টিপ্রক্রিয়ার সূচনা করবেন এটাই তাঁর অসীম সৃষ্টিক্ষমতার স্বতঃস্ফূর্ত বহিঃপ্রকাশের দাবী। তবে বলা বাহুল্য যে,

এটা তাঁর জন্য অনিবার্য বা অপরিহার্য হতে পারে না। বরং এটা সম্পূর্ণরূপেই তাঁর ইচ্ছাশক্তির অধীন, আর তাঁর ইচ্ছাশক্তি তাঁর ইতিবাচক গুণাবলীরই অন্যতম।

তাহলে বিচারবুদ্ধির দৃষ্টিতে আমরা অপরিহার্য সত্তা কর্তৃক সৃষ্টি ও ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত কয়েকটি সত্যে উপনীত হতে পারি। এ সত্যগুলো হচ্ছে:

তিনি অসীম সৃষ্টিক্ষমতার অধিকারী এবং অনবরত সৃষ্টি করে চলেছেন।

সৃষ্টিকর্ম তাঁর সৃষ্টিক্ষমতার স্বতঃস্ফূর্ত ইতিবাচক বহিঃপ্রকাশ, কিন্তু এ স্বতঃস্ফূর্ততা মানে স্বয়ংক্রিয়তা নয় এবং তিনি এরূপ সৃষ্টি ও ব্যবস্থাপনা সম্পাদনে বাধ্য নন।

তিনি সৃষ্টিসমূহের সূচনা করেছেন এবং তার স্থিতি ও অগ্রগতির জন্য নিয়মাবলী (প্রাকৃতিক বিধিবিধান) বেঁধে দিয়েছেন। সব কিছু এ নিয়মের আওতায় চলছে।

তাঁরই নির্ধারিত প্রাকৃতিক বিধিবিধানের আওতায় তিনি কতক সৃষ্টিকে কিছুটা স্বাধীনতা দিয়েছেন এবং তাদের কর্মের প্রতি সর্বদা দৃষ্টি রাখেন ও তাদেরই প্রয়োজনে অনেক সময় তাদের কাজে হস্তক্ষেপ করেন।

সৃষ্টির কাজে স্রষ্টার হস্তক্ষেপের প্রয়োজনীয়তা

এখানে স্বাধীন ইচ্ছাশক্তির অধিকারী সৃষ্টির কাজে তাদেরই প্রয়োজনে সৃষ্টিকর্তার পক্ষ থেকে হস্তক্ষেপকরণ সম্পর্কে কিছুটা আলোকপাত করা প্রয়োজন বলে মনে হয়। কারণ, প্রশ্ন উঠতে পারে যে, পরম জ্ঞানময় সৃষ্টিকর্তা তো সৃষ্টিকর্ম সম্পাদনের সিদ্ধান্ত গ্রহণকালেই তাঁর প্রতিটি সৃষ্টির অনাগত ভবিষ্যৎ প্রয়োজন সম্পর্কে জানেন এবং সে প্রয়োজন পূরণের উপযোগী করে প্রাকৃতিক বিধিবিধান প্রণয়ন করেই সৃষ্টির সূচনা করেন। এমতাবস্থায় কী করে নতুন প্রয়োজন দেখা দিতে পারে - যা পূরণের লক্ষ্যে তাঁকে সৃষ্টির কাজে হস্তক্ষেপ করতে হবে?

বিচারবুদ্ধির সামান্য প্রয়োগ করলেই আমরা এ প্রশ্নের জবাব পেতে পারি। আমরা বিচারবুদ্ধির দ্বারা বুঝতে পারি যে, এ সৃষ্টিলোকের সৃষ্টিনিচয় গুণগতভাবে বিভিন্ন পর্যায়ে বিভক্ত। আমাদের পর্যবেক্ষণ ক্ষমতার আওতাধীন সৃষ্টিনিচয়ের মধ্যে কোনো কোনো সৃষ্টি প্রাকৃতিক নিয়মের কঠিন

নিগড়ে বাঁধা বলে আমাদের কাছে প্রতীয়মান হয় - যা যা কি প্রক্রিয়ায় এগিয়ে চলেছে এবং যার কোনোরূপ স্বাধীন ইচ্ছাশক্তি ও কর্মশক্তি নেই। কিন্তু অপর কতক সৃষ্টি স্বাধীন ইচ্ছাশক্তির অধিকারী। এ সব সৃষ্টির মধ্যে বিভিন্ন প্রজাতির ইচ্ছাশক্তি ও স্বাধীনতার মাত্রা ও পর্যায়ের ক্ষেত্রে পারস্পরিক পার্থক্য রয়েছে।

স্রষ্টার পক্ষ থেকে তাদেরকে ইচ্ছাশক্তি ও স্বাধীনতা প্রদানের মানেই হচ্ছে সৃষ্টিকর্তা তাদের ভবিষ্যতকে, সরাসরিই হোক বা প্রাকৃতিক বিধিবিধানের দ্বারাই হোক, শতকরা একশ' ভাগ অপরিবর্তনীয় করে বেঁধে দেন নি এবং স্রষ্টা তাদের জন্য যা করা ও যেমনটি হওয়া পসন্দ করেন তেমনটি হওয়া ও তা করার জন্য তাদেরকে বাধ্য করেন না। তিনি তাদেরকে কতক প্রাকৃতিক বিধিবিধানের বিরুদ্ধে (যেমন: সহজাত প্রবণতার বিরুদ্ধে) বিদ্রোহ করার ক্ষমতা ও সুযোগ দিয়েছেন। এমনকি তারা চাইলে স্রষ্টার পসন্দ-অপসন্দের বিরুদ্ধাচরণ করতে পারবে; তিনি তাদেরকে সে সুযোগও দিয়েছেন, যদিও বিচারবুদ্ধির দৃষ্টিতে এটা সুনিশ্চিত যে, তিনি পসন্দ করেন না যে, তারা এমনটি করুক। অর্থাৎ কতক সৃষ্টিকে তিনি যে ইচ্ছাশক্তি ও স্বাধীনতা দিয়েছেন তার দাবী মিটাতে গিয়ে তিনি তাদেরকে তাঁর পসন্দনীয় কাজ সম্পাদনে ও তাঁর অপসন্দনীয় কাজ সম্পাদন থেকে বিরত থাকতে বাধ্য করেন না।

বলা বাহুল্য যে, ইচ্ছাশক্তি ও স্বাধীনতার অধিকারী এই সৃষ্টিনিচয় প্রকৃতিক বিধিবিধানে পরিবর্তন ঘটাতে সক্ষম না হলেও প্রাকৃতিক বিধিবিধানের স্বেচ্ছাচারী প্রয়োগ করতে পারে - যার পরিণতিতে সৃষ্টিলোকের গতিধারায় কমবেশী নেতিবাচক প্রভাব বিস্তার লাভ করে। ক্ষেত্রবিশেষে এ নেতিবাচক প্রভাব এতোখানি হতে পারে যে, তা সৃষ্টিলোকের শৃঙ্খলা ও লক্ষ্যকে ব্যাহত করতে পারে বা অন্য সৃষ্টির স্বাভাবিক দাবীকে নস্যাৎ করতে পারে। এমতাবস্থায় সামগ্রিকভাবে সৃষ্টিলোকের বা তার অংশবিশেষের দাবী মিটাতে গিয়ে বা সৃষ্টিলোককে তার চূড়ান্ত লক্ষ্যে পৌঁছানোর স্বার্থে তিনি ঐ সব সৃষ্টির কর্মক্ষেত্রে ইতিবাচক হস্তক্ষেপ করবেন এটাই বিচারবুদ্ধির দাবী।

সৃষ্টিকর্তার জ্ঞান ও স্বাধীন সৃষ্টির ভবিষ্যৎ

এখানে একটি প্রশ্ন উঠতে পারে যে, অপরিহার্য সত্তা চিরজ্ঞানময় সৃষ্টিকর্তা যেহেতু অতীত ও ভবিষ্যৎ সব কিছু জানেন সেহেতু তিনি কথিত স্বাধীন সৃষ্টির ভবিষ্যৎ সম্পর্কেও জানেন। আর তিনি যা জানেন তার অন্যথা হতে পারে না। এমনকি স্রষ্টা যদি কখনো কোনো সুনির্দিষ্ট সৃষ্টিসত্তার কোনো বিশেষ কাজে হস্তক্ষেপ করেন, তো নিঃসন্দেহে তা- ও তিনি আগে থেকেই জানতেন যে, তিনি তার ঐ কাজে হস্তক্ষেপ করবেন। অতএব, তা অনিবার্য ছিলো। ফলে এখানে স্বাধীনতার কোনো স্থান নেই।

এ বিষয়টি তাক্বদীর (تقدير) বা ভাগ্যনির্ধারণ বিষয়ক আলোচনার অন্তর্ভুক্ত যা একটি বিস্তারিত আলোচনার বিষয় এবং যে আলোচনা কেবল বিচারবুদ্ধির ভিত্তিতে করা সম্ভব নয়।[৩] তবে এখানে বিচারবুদ্ধি ভিত্তিক আলোচনায় আমরা সংক্ষেপে এর কয়েকটি দিকের ওপরে আলোকপাত করতে পারি। প্রথমতঃ আমরা আমাদের বিচারবুদ্ধি দ্বারা অনুভব করি যে, আমরা জড় পদার্থ থেকে স্বত এবং প্রাণশীল সৃষ্টি হওয়ার কারণে আমাদের ইচ্ছাশক্তি ও স্বাধীনতা রয়েছে। দ্বিতীয়তঃ আমরা লক্ষ্য করি যে, মানুষের ইচ্ছাশক্তি ও স্বাধীনতা প্রাণীর ইচ্ছাশক্তি ও স্বাধীনতার চেয়ে অনেক বেশী শক্তিশালী যে কারণে অন্যান্য প্রাণীর ব্যতিক্রমে মানুষ তার সহজাত প্রবণতার বিরুদ্ধেও বিদ্রোহ করতে পারে। যেমন: চরম ক্ষুধার্ত অবস্থায়ও এবং তার সামনে সুস্বাদু খাবার থাকা সত্ত্বেও ও তা খাওয়ার পথে কোনোরূপ বাধা না থাকা সত্ত্বেও সে তা খাওয়া থেকে বিরত থাকতে পারে।

এখন প্রশ্ন হচ্ছে, কারো ভবিষ্যৎ সম্পর্কে ভবিষ্যৎ- জ্ঞানের অধিকারী অপরিহার্য সত্তার জানা থাকার মানেই তো অনিবার্য হয়ে যাওয়া, এমতাবস্থায় ইচ্ছাশক্তি ও স্বাধীনতার কী মানে হতে পারে?

এ প্রশ্নের জবাব হচ্ছে, সৃষ্টিকর্তার সৃষ্টি- ইচ্ছা বা নির্ধারণ বা ভবিষ্যৎ- জ্ঞান মানে এরূপ হওয়া অপরিহার্য নয় যে, অনন্ত ভবিষ্যতের ছোট- বড় প্রতিটি বিষয় তাতে 'অনিবার্য' রূপে থাকবেই। কারণ, তাহলে এর অর্থ দাঁড়ায় তাঁর অনাদিকালীন প্রথম ইচ্ছাকরণের পর সব কিছু স্বয়ংক্রিয়ভাবে হতেই থাকবে; অতঃপর আর তাঁর ইচ্ছা করার মতো বা করণীয় বলতে কিছুই থাকবে না। এরূপ হলে স্বয়ং তাঁর ইচ্ছাশক্তি, সৃষ্টিক্ষমতা ও স্বাধীনতা অনিবার্যতার শিকারে পরিণত হবে - যা থেকে তিনি উর্ধে। বরং তাঁর ইচ্ছা ও সৃষ্টিসিদ্ধান্তের মধ্যে প্রত্যক্ষ কর্ম ও সৃষ্টি, প্রাকৃতিক বিধিবিধান সৃষ্টি, প্রাকৃতিক বিধানের আওতায় যা কি কার্যক্রম, ইচ্ছাশক্তিসম্পন্ন সৃষ্টির মাধ্যমে পরোক্ষ কর্ম ও সৃষ্টি, তাঁর চিরন্তন নির্ধারণ এবং তাঁর উপস্থিত নিয় ণ সবই অন্তর্ভুক্ত রাখতে তিনি সক্ষম। আর ভবিষ্যৎ- জানা সম্পর্কে বলতে হয় যে, তিনি সৃষ্টির ভবিষ্যৎকে অংশতঃ অনিবার্য করে দিতে পারেন, অংশতঃ শর্তাধীন করে দিতে পারেন (যেমন: সে এরূপ করলে তার ফলে এই হবে, আর ঐরূপ করলে তার ফলে ঐ হবে) ও অংশতঃ পুরোপুরি অনির্ধারিত রেখে দিতে পারেন এবং সংশ্লিষ্ট সৃষ্টির ভবিষ্যৎ তাঁর জ্ঞানে এভাবেই অন্তর্ভুক্ত থাকবে - এটাই স্বাভাবিক।

বিষয়টি আরো কিছুটা সহজভাবে বুঝার জন্য বলা যেতে পারে যে, যেহেতু স্রষ্টা তাঁর সৃষ্টির পুরো ভবিষ্যতের দিক মনোযোগ দিলে তা অনিবার্য হয়ে যায় সেহেতু তিনি সংশ্লিষ্ট সৃষ্টির স্বাধীন ক্ষেত্রটির ভবিষ্যতের প্রতি মনোযোগ দেয়া থেকে বিরত থাকেন এবং এভাবে তার স্বাধীনতা নিশ্চিত করেন।[৪]

স্রষ্টার কর্মের সাথে কালের সম্পর্ক

আমরা যখন বলি যে, পরম জ্ঞানময় অপরিহার্য সত্তা সব সময় সৃষ্টি ও পরিচালনা করে চলেছেন তখন এ প্রসঙ্গে একটি কালগত প্রশ্ন উঠতে পারে। কারণ, 'সব সময়' মানে অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যৎ। কিন্তু অনাদি ও অনন্ত অপরিহার্য সত্তা কালের উর্ধে। অর্থাৎ তাঁর জন্য কাল প্রযোজ্য নয়। তাই প্রশ্ন উঠতে পারে যে, এমতাবস্থায় তিনি ছিলেন, আছেন ও থাকবেন অথবা তিনি সৃষ্টির সূচনা করেছেন, এখনো সৃষ্টি ও পরিচালনা করছেন এবং ভবিষ্যতেও করবেন - এ জাতীয় কথা দ্বারা কি তাঁর সম্পর্কে কালগত সীমাবদ্ধতা আরোপ করা হয় না?

এর জবাব হচ্ছে, প্রকৃত পক্ষে এ জাতীয় ক্রিয়ার ব্যবহার করা হয় সৃষ্টির কালগত সীমাবদ্ধতার কারণে। যেহেতু সৃষ্টিসমূহ কালের গর্ভে অস্তিত্ব লাভ করে ও এগিয়ে চলে সেহেতু কালভিত্তিক ক্রিয়াপদ ব্যবহার ব্যতিরেকে কোনো কার্য সৃষ্টিকুলের জন্য অনুধাবনযোগ্য নয়।

বস্তুতঃ কাল ও স্থান হচ্ছে এক ব্যাপকতর সৃষ্টি - যার গর্ভে সকল সৃষ্টিকে সৃষ্টি ও অগ্রগতি প্রদান করা হয়েছে। তবে এই স্থান ও কালের আপেক্ষিকতা রয়েছে - যা বর্তমান যুগের বিজ্ঞান, বিশেষতঃ কোয়ান্টাম পদার্থবিজ্ঞান স্বীকার করছে। এই আপেক্ষিকতা বস্তুগত ও অবস্তুগত অনেক কিছুর সাথে সংশ্লিষ্ট। অতএব, সামগ্রিকভাবে কাল- কে কোনো একটি সুনির্দিষ্ট মানদণ্ডে এবং স্থানকেও কোনো একটি সুনির্দিষ্ট মানদণ্ডে পরিমাপ করা সম্ভব বলে মনে করা উচিত হবে না।

অতএব, প্রকৃত ব্যাপার হচ্ছে এই যে, একটি সুনির্দিষ্ট মানদণ্ডের দৃষ্টিতে বা বিচারে কালের ও স্থানের যে ধারণা আমরা লাভ করি তার গর্ভে বিভিন্ন মানদণ্ডের অনেক কাল ও স্থান রয়েছে। আবার এ বৃহৎ কাল ও স্থানের ন্যায় অনেকগুলো বৃহৎ কাল ও স্থান একটি বৃহত্তর কাল ও স্থানের গর্ভে রয়েছে। এভাবে শেষ পর্যন্ত একটি সর্বব্যাপক কাল ও স্থান রয়েছে - অপরিহার্য সত্তা যাকে সৃষ্টি করে সকল সৃষ্টিকে তার গর্ভে স্থান দিয়েছেন। বলা বাহুল্য যে, নিম্নতর কাল ও স্থান দ্বারা উর্ধতর কাল ও স্থান প্রভাবিত হয় না। অতএব, উচ্চতর কাল ও স্থানের আওতাভুক্ত পর্যবেক্ষক নিম্নতর কাল ও স্থানকে পর্যবেক্ষণ করলে তার দ্বারা নিজে প্রভাবিত হয় না। এভাবে শেষ পর্যন্ত

সর্বব্যাপক স্থান- কালেরও উর্ধে যে সত্তা তিনি সকল কাল ও স্থানেরই পর্যবেক্ষক, কিন্তু কোনো কাল ও স্থানই তাঁর ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়।

সৃষ্টিসত্তার অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ দু'টি মাত্রা (Dimension) হচ্ছে কাল ও স্থান। কালের স্বরূপ ও আপেক্ষিকতা অনুধাবন অত্যন্ত দুরূহ ব্যাপার এবং এ কারণে এর আপেক্ষিকতা সম্পর্কে অভিজ্ঞতাজাত উদাহণ দেয়াও প্রায় অসম্ভব। কারণ, অনেকে কর্তাভেদে অভিন্ন কালের বিভিন্ন অনুভূতি ও বিভিন্ন কর্মের (Object) ওপর অভিন্ন কালের বিভিন্ন প্রভাবকে কালের আপেক্ষিকতার প্রমাণ হিসেবে গণ্য করলেও প্রকৃত পক্ষে কালের 'অনুভূতির' ও 'প্রভাবের' আপেক্ষিকতা কালের আপেক্ষিকতা প্রমাণ করতে সক্ষম নয়। তবে স্থানের আপেক্ষিকতা বোধগম্য বিষয় বটে।

বিষয়টিকে অপেক্ষাকৃত সহজবোধগম্য করার জন্য একটি উদাহরণ দেয়া যেতে পারে। বলা বাহুল্য যে, অপরিহার্য সত্তা স্রষ্টা, তাঁর বৈশিষ্ট্য ও তাঁর কাজ অনুধাবনের জন্য সৃষ্টি সম্পর্কিত উদাহরণ হচ্ছে দুর্বল উদাহরণ - যাতে প্রকৃত সত্য প্রতিফলিত হয় না, তবে প্রকৃত সত্যের কাছাকাছি পৌঁছা যায় ও মোটামুটি ধারণা লাভ করা যায়। এ কারণেই কেবল বিষয়টিকে সহজবোধগম্য করার লক্ষ্যে আমরা এ ধরনের দুর্বল উদাহরণের আশ্রয় নিতে পারি।

কাল ও স্থানের সাথে অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত একটি বিষয় হচ্ছে গতি। তাই এই গতি থেকেই বিষয়টি মোটামুটি বুঝা যেতে পারে। কাল ও স্থানের আওতাধীন প্রতিটি সৃষ্টিই কোনো না কোনোভাবে গতিশীল অবস্থায় রয়েছে। তবে প্রকৃত ব্যাপার হলো এ সৃষ্টিলোকে বহু ধরনের গতি রয়েছে। কিন্তু সকল গতি সকল সৃষ্টির ওপর প্রভাব বিস্তার করে না। যেমন: পরমাণুর অভ্যন্তরে প্রচণ্ড গতি রয়েছে, কিন্তু এ গতি অণুর গতিকে প্রভাবিত করে না। আবার স্বয়ং অণু গতিশীল, কিন্তু বহু অণু সমন্বয়ে গঠিত কোনো বস্তুর গতিকে অণুর গতি প্রভাবিত করতে পারে না।

এবার আরেকটি সহজবোধ্য দৃষ্টান্তে আসা যাক। একটি লোক একটি চলমান জাহাযের ডেকের ওপর একদিক থেকে আরেক দিকে হেঁটে যাচ্ছে, আর তার গায়ের ওপর, ধরুন, তার পিঠের ওপর, একটি পিঁপড়া একদিক থেকে আরেক দিকে হেঁটে যাচ্ছে।

এখানে পিঁপড়ার গতি দ্বারা লোকটির গতি প্রভাবিত হচ্ছে না, কিন্তু লোকটির হাঁটার কারণে পিঁপড়াটি দু'টি গতির অধিকারী হচ্ছে। অন্যদিকে জাহাযটি গতিশীল, ফলে পিঁপড়ার তিনটি, লোকটির দু'টি ও জাহাযের একটি গতি রয়েছে। এভাবে পৃথিবী, সৌরলোক, ছায়াপথ ও অসংখ্য ছায়াপথ সম্বলিত বৃহত্তর জগৎ এবং তদুর্ধ জগৎসমূহের গতি বিবেচনায় আনলে গতির সংখ্যা নিম্নতর পর্যায়ে ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধি পেতে থাকবে এবং উর্ধতর পর্যায়ে ক্রমান্বয়ে হ্রাস পেতে থাকবে। অতঃপর আমরা উপনীত হবো গোটা সৃষ্টিলোকরূপ এককের স্রষ্টার কাছে যিনি গতির সম্পূর্ণ উর্ধে।

উপরোক্ত উদাহরণ থেকে যে কোনো সৃষ্টির গতির ও সেই সাথে স্থানগত অবস্থানের বহুত্ব ও আপেক্ষিকতা প্রমাণিত হয়।

একইভাবে তিনি কাল ও স্থানেরও উর্ধে। কিন্তু তিনি কাল, স্থান ও গতির প্রকৃত পক্ষে এ তিনটি] সৃষ্টির তিনটি মাত্রাহচ্ছে একটি অভিন্ন (Dimension) মাত্রস্রষ্টা ও পর্যবেক্ষক। এমতাবস্থায় [সৃষ্টি ও পরিচালনার তিনটি কাল হচ্ছে সৃষ্টির অবস্থান থেকে উদ্ভূত, স্রষ্টার অবস্থান থেকে নয়। কারণ, তাঁর জন্য কাল বলতে কিছু নেই। বরং তাঁর কাছে সব কিছু সদা বর্তমান। আমরা :বস্তুত] আমাদের জন্য তিনটি কালের প্রবক্তা হলেও প্রকৃত পক্ষে সৃষ্টির কাল মাত্র দু'টি অতীত - ও ভবিষ্যৎ; সৃষ্টির জন্য বর্তমান মানে হচ্ছে অতীত ও ভবিষ্যতের দুই প্রান্তিক কালবিন্দুর - [মিলনস্থল মাত্র। আর স্রষ্টা কালোর্ধ বিধায় সদা বর্তমান।

অপরিহার্য সত্তার সৃষ্টিকরণের তাৎপর্য

ওপরের আলোচনা থেকে এ বিষয়টিও সুস্পষ্ট হয়ে যায় যে, অপরিহার্য সত্তার সৃষ্টিকরণরূপ কর্মের তাৎপর্য হচ্ছে তাঁর সৃষ্টিক্ষমতা ও সৃষ্টি- ইচ্ছার সাথে (যা তাঁর সত্তা থেকে স্বত কোনো গুণ নয়, বরং তাঁর সত্তাই) সৃষ্টির সম্পর্ক, যা সৃষ্টির কালগত বৈশিষ্ট্যের বিচারে অতীত ও ভবিষ্যৎ বলে প্রতিভাত হয়। তেমনি সৃষ্টির সাথে সম্পর্কের কারণেও কখনো তা প্রাকৃতিক বিধানরূপে, কখনো অবিলম্বে কার্যকরযোগ্য ইচ্ছারূপে, কখনো বিলম্বে কার্যকরযোগ্য ইচ্ছারূপে, কখনো

বিলম্বে কার্যকরযোগ্য সিদ্ধান্তরূপে, কখনো প্রাকৃতিক বিধানে হস্তক্ষেপরূপে, কখনো কতক সৃষ্টির ইচ্ছাশক্তি ও স্বাধীনতা রূপে এবং কখনো ইচ্ছাশক্তি ও স্বাধীনতার অধিকারী সৃষ্টির কর্মে হস্তক্ষেপরূপে প্রতিভাত হয়।

অন্যদিকে যা কিছুকে আমরা প্রাকৃতিক নিয়মের ব্যতিক্রম বলে মনে করি তা- ও ব্যতিক্রম নয়। বরং তা- ও স্রষ্টা কর্তৃক নির্ধারিত ভিন্ন এক ধরনের বিধান বটে, যদিও তা সচরাচর আমাদের অভিজ্ঞতার বাইরে থেকে যায় বিধায় আমাদের জ্ঞান তার স্বরূপ ধরতে পারে না। অন্যথায় মহাবিজ্ঞানময় অপরিহার্য সত্তার সৃষ্টিকরণ ও পরিচালনা ব্যবস্থায় ইতিবাচক নিয়মাবলী বহির্ভূত কোনো কিছু বিচারবুদ্ধির কাছে বোধগম্য হতে পারে না।

সৃষ্টিলোকে 'অবাঞ্ছিত' উপাদানসমূহের অস্তিত্বের তাৎপর্য

এ জগতের বুকে যা কিছু বিরাজমান মানুষ সে সবের মধ্য থেকে কোনো কোনো জিনিসকে তার নিজের জন্য কল্যাণকর দেখতে পায় এবং কোনো কোনো জিনিসকে অকল্যাণকর দেখতে পায়। সৃষ্টিপ্রকৃতিতে বিরাজমান প্রাণীকুল, প্রাণহীন বস্তু ও প্রাকৃতিক কারণ বা বিধিবিধান সমূহের কতককে মানুষ নিজের জন্য ক্ষতিকর, বিপ নক, এমনকি প্রাণঘাতী রূপে দেখতে পায়। বিভিন্ন ধরনের রোগব্যাধি ও প্রাকৃতিক দুর্যোগের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করে তাকে টিকে থাকতে হয়। এ সব সংগ্রামে কখনো তার জয় হয়, কখনো পরাজয় ঘটে, এমনকি অনেক সময় তাকে মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়তে হয়।

অবশ্য স্বয়ং মানুষও মানুষের জন্য অনেক অনাকাঙ্ক্ষিত অবস্থা সৃষ্টির কারণ হয়ে থাকে। যেমন: অনেক রোগব্যাধি বংশানুক্রমে পরবর্তী বংশধরদের মধ্যে প্রবাহিত হয়। পিতা- মাতার সৌভাগ্য বা দুর্ভাগ্য থেকে সন্তান- সন্ততিও সৌভাগ্য বা দুর্ভাগ্যের অধিকারী হয়। আবার মানুষ মানুষের ওপর যুলুম- অত্যাচার করে।

প্রাকৃতিক ও মানবিক নির্বিশেষে সমস্ত রকমের অবাঞ্ছিত ও অনাকাঙ্ক্ষিত কার্যকারণ ও অবস্থা দর্শনে মানুষের মনে সততই এ প্রশ্ন জাগ্রত হয় যে, কেন এ সব কিছু আছে বা হচ্ছে? সৃষ্টিকর্তা তাঁর সৃষ্টিতে এ সব অবাঞ্ছিত উপাদান, কারণ ও পরিস্থিতি রেখেছেন কী উদ্দেশ্যে?

এ ধরনের প্রশ্ন থেকে মানুষের মনে বিভিন্ন ধরনের সংশয় জন্ম নেয়। কারো মনে হয়, এসব 'অসামঞ্জস্যের' কারণ হয়তো এই যে, বিশ্বজগতের পিছনে আদৌ কোনো মহাজ্ঞানময় স্রষ্টার অস্তিত্ব নেই, তাই ইচ্ছাশক্তিহীন অন্ধ প্রকৃতির অন্ধ খেয়ালখুশীর পরিণতিতে এ সব কিছু ঘটছে। অন্যদিকে যারা সৃষ্টিপ্রকৃতি নিয়ে গভীরভাবে চিন্তা করে এবং সৃষ্টিপ্রকৃতির পিছনে একজন মহাজ্ঞানময় স্রষ্টা ও পরিচালকের অস্তিত্ব অনুভব করে তাদের মধ্যেও অনেকে কথিত

অসামঞ্জস্যসমূহ লক্ষ্য করে এ উপসংহারে উপনীত হয় যে, সৃষ্টিকর্তা কেবল তাঁর সৃষ্টিকরণজনিত ‘আনন্দের’ (!?) জন্যই সব কিছু সৃষ্টি করেছেন; এর পিছনে কোনো সুনির্দিষ্ট লক্ষ্য নেই এবং সৃষ্টির ভালো- মন্দ ও সুখ- দুঃখ তাঁর নিকট কোনো বিবেচ্য বিষয় নয়। মানুষের মনে এ সব সংশয়ের উদয় হয় অপরিহার্য সত্তা মহান সৃষ্টিকর্তার সঠিক পরিচয় এবং সৃষ্টিজগৎ ও তার অস্তিত্বের পিছনে নিহিত লক্ষ্য সম্বন্ধে সঠিক ধারণার অভাব থেকে।

সৃষ্টিকর্তা খামখেয়ালিপনা ও উদাসীনতা থেকে প্রমুক্ত

ইতিপূর্বে যেমন উল্লেখ করা হয়েছে, কারণ ও ফলশ্রুতি বিধির অধীন পরিবর্তনশীল এ সৃষ্টিজগৎ এমন একজন সৃষ্টিকর্তা দাবী করে যিনি সকল প্রকার পূর্ণতাবাচক গুণের অধিকারী এবং সকল প্রকার অপূর্ণতা থেকে মুক্ত। অতএব, নিঃসন্দেহে তিনি মহাজ্ঞানময়, আর জ্ঞানময়তার দাবী হচ্ছে উদ্দেশ্যহীন কিছু না করা। খামখেয়ালিপনা ও উদাসীনতা জ্ঞানময়তা ও পূর্ণতার সাথে খাপ খায় না। আর যেহেতু তিনি সব রকমের অভাব ও প্রয়োজন থেকে মুক্ত, অতএব, তাঁর আনন্দ লাভের প্রয়োজন নেই। তাই তিনি আনন্দ লাভের জন্য অথবা উদ্দেশ্যহীনভাবে ক্রীড়াচ্ছলে সৃষ্টি করবেন - এ কথা তাঁর সম্পর্কে কল্পনাও করা যায় না। অতএব, তিনি এমন কিছু করতে পারেন না যার পিছনে কোনো মহান উদ্দেশ্য নিহিত নেই বা চূড়ান্ত বিচারে যাতে সৃষ্টির জন্য কল্যাণ নিহিত নেই।

সকল সৃষ্টি অভিন্ন সৃষ্টিসত্তার অংশ

সৃষ্টিজগতে মানুষ যা কিছু অবাঞ্ছিত দেখতে পায় তার স্বরূপ অনুধাবন করতে হলে কয়েকটি বিষয়কে পটভূমি হিসেবে মনে রাখতে হবে। প্রথমতঃ সৃষ্টিলোকের প্রতিটি সৃষ্টিকে আপতঃদৃষ্টিতে পরস্পর বিচ্ছিন্ন, স্বত সৃষ্টি এবং স্বত উদ্দেশ্য ও লক্ষ্যের অধিকারী বলে মনে হলেও প্রকৃত পক্ষে তা নয়। প্রতিটি সৃষ্টি ব্যক্তিক দৃষ্টিকোণ থেকে স্বত ও নিজস্ব লক্ষ্য- উদ্দেশ্যের অধিকারী

হওয়ার পাশাপাশি সমগ্র সৃষ্টিলোকের একটি অংশ হিসেবে তার ভিন্নতর একটি অবস্থান ও ভূমিকা রয়েছে।

গোটা সৃষ্টিলোক অভিন্ন লক্ষ্যাভিসারী

ওপরে যেমন আভাস দেয়া হয়েছে, গভীর পর্যালোচনার মাধ্যমে বিচারবুদ্ধি এ সত্যে উপনীত হয় যে, আসলে সমগ্র সৃষ্টিলোক অসংখ্য স্বত সত্তার সমষ্টি হওয়ার পাশাপাশি সামগ্রিকভাবে একটি স্বত বৃহত্তর সত্তা। আর এ কারণে প্রতিটি সৃষ্টির নিজস্ব লক্ষ্যের পাশাপাশি স্বভাবতঃই গোটা সৃষ্টিলোকের একটি স্বত বৃহত্তর লক্ষ্য রয়েছে। এ লক্ষ্য বাস্তবায়নে সহযোগিতা করা প্রতিটি সৃষ্টির দায়িত্ব; তাকে এ জন্যই সৃষ্টি করা হয়েছে এবং জেনে হোক বা না জেনে হোক, সে এ উদ্দেশ্য বাস্তবায়নেই নিয়োজিত রয়েছে। অতএব, সমগ্র সৃষ্টিলোকের চূড়ান্ত লক্ষ্য বাস্তবায়নে তার যে ভূমিকা তা-ই তার মুখ্য ভূমিকা। সুতরাং এ ভূমিকা পালন করতে গিয়ে তার ব্যষ্টিক লক্ষ্য-উদ্দেশ্য বা স্বার্থ উৎসর্গ করা অপরিহার্য হয়ে পড়তে পারে এবং অপরিহার্য হয়ে পড়লে তাকে তা-ই করতে হবে। কারণ, এ বৃহত্তর লক্ষ্য বাস্তবায়নে ভূমিকা পালনেই তার অস্তিত্বের সার্থকতা নিহিত।

এ প্রসঙ্গে মানবদেহের উপমা দেয়া যেতে পারে। অসংখ্য লোহিত কণিকা, শ্বেত কণিকা, মাংসকোষ ও অন্যান্য উপাদানে মানবদেহ গঠিত। এমনকি রোগব্যাধির আক্রমণ বা দুর্ঘটনা সংঘটিত না হলেও মানুষের স্বাভাবিক কর্মতৎপরতার কারণেই তার দেহের বহু লোহিত কণিকা, শ্বেত কণিকা ও মাংসকোষ প্রতিনিয়ত ধ্বংস হয়ে যাচ্ছে। অন্যদিকে নতুন নতুন লোহিত কণিকা, শ্বেত কণিকা ও মাংসকোষ সৃষ্টি হচ্ছে। এমতাবস্থায় ধ্বংসপ্রাপ্ত লোহিত কণিকা, শ্বেত কণিকা ও মাংসকোষের ধ্বংস হওয়ার বিষয়টিকে অন্যায় বা অবিচার মনে করা সম্ভব নয়। কারণ, এ সব লোহিত কণিকা, শ্বেত কণিকা ও মাংসকোষের অস্তিত্ব মানুষেরই প্রয়োজনে। আর স্বীয় প্রয়োজন পূরণের লক্ষ্যে পরিচালিত মানুষের কর্মতৎপরতার অনিবার্য দাবী হচ্ছে এ সব লোহিত কণিকা, শ্বেত কণিকা ও মাংসকোষের কতকের ধ্বংসপ্রাপ্তি।

এখানে অনুধাবনযোগ্য দ্বিতীয় বিষয়টি হচ্ছে এই যে, সৃষ্টিলোকের প্রাকৃতিক বিধানসমূহ পরস্পর সম্পর্কযুক্ত এবং এ সব বিধানের ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার ফলে সৃষ্টিলোকে বিবর্তন সংঘটিত

হচ্ছে যা সৃষ্টিলোককে ক্রমান্বয়ে পূর্ণ থেকে পূর্ণতর অবস্থার দিকে এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছে। আর মানুষ ও অন্যান্য প্রাণী যেহেতু এ প্রাকৃতিক জগতেই বসবাস করছে, সেহেতু এ থেকে তাদের ওপর ইতিবাচক ও নেতিবাচক উভয় ধরনের প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হতে বাধ্য। এমতাবস্থায় সৃষ্টিলোকের চূড়ান্ত লক্ষ্যের জন্য অপরিহার্য প্রাকৃতিক বিধিবিধান ও তার ফলাফল সম্পর্কে আপত্তির কোনো যুক্তিসঙ্গত কারণ নেই।

অনুধাবনযোগ্য তৃতীয় বিষয়টি হচ্ছে, প্রাণীকুলের, বিশেষতঃ মানুষের স্বাধীনতা। সৃষ্টিলোকের প্রাকৃতিক বিধিবিধানের প্রতিক্রিয়া প্রাণহীন বস্তুনিচয়ের ওপর যা- ই হোক না কেন, সে ব্যাপারে প্রাণহীন বস্তুর ক্ষেত্রে ন্যায়- অন্যায়ের প্রশ্ন তোলা যায় না। কারণ, বোধশূন্য বস্তুর লাভ- ক্ষতির প্রশ্নই ওঠে না। এ প্রশ্ন কেবল প্রাণশীল সৃষ্টির ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য। বস্তুতঃ প্রাকৃতিক কার্যকারণের প্রতিক্রিয়া কেবল প্রাণশীল সৃষ্টির জন্যই কল্যাণকর বা অকল্যাণকর হয়ে থাকে। অবশ্য প্রাণীকুল, বিশেষতঃ মানুষ সহজাত বা অর্জিত জ্ঞানের সহায়তায় প্রকৃতির অনেক ‘অবাঞ্ছিত’ প্রতিক্রিয়া থেকে নিজেকে রক্ষা করতে পারে। কিন্তু কারো জন্য অন্য প্রাণী বা অন্য মানুষের পক্ষ থেকে যে ক্ষতিকারকতা উদ্ভূত হয় তা সব সময় সুনির্দিষ্ট প্রাকৃতিক নিয়মের অনুবর্তী নয় এবং এ ধরনের ক্ষতিকারকতাই বিড়ম্বনার উৎস। সৃষ্টিকর্তার সৃষ্টির কল্যাণময় লক্ষ্য থাকা সম্বন্ধে যাদের মনে সংশয় সৃষ্টি হয়েছে তাদের সংশয়ের মূল কারণ এই প্রাণশীল সৃষ্টির ক্ষতিকারকতা। তাদের কথা হচ্ছে, এ সব অকল্যাণকর প্রাণশীল সৃষ্টির অথবা কোনো সৃষ্টির মধ্যকার অকল্যাণকর দিকের (যদিও কল্যাণের পাশাপাশি) কী প্রয়োজন ছিলো?

প্রাণীকুলের স্বার্থসংঘাত স্বাধীনতার অনিবার্য দাবী

এ প্রশ্নের জবাব পেতে কয়েকটি বিষয়ের প্রতি দৃষ্টি দিতে হবে। প্রথমতঃ প্রাণীকুল, বিশেষ করে মানুষের, প্রাণী বা মানুষ হবার অনিবার্য দাবী হচ্ছে, তার অস্তিত্বরক্ষা ও বিকাশের স্বার্থে তার কিছুটা স্বাধীনতা চাই। কম হোক বা বেশীই হোক, তৎপরতার স্বাধীনতা না থাকলে সে প্রাণী হিসেবেই পরিগণিত হতো না। আর স্বাধীনতার দাবী হচ্ছে, একদিকে বিভিন্ন প্রাণীর মধ্যে,

অন্যদিকে প্রাণী ও মানুষের মধ্যে এবং মানুষের পরস্পরের মধ্যে সংঘাত সৃষ্টি হতে পারে। এ সংঘাতের প্রতিক্রিয়াও চূড়ান্ত পরিণতিতে সৃষ্টিলোকের চূড়ান্ত লক্ষ্যে উপনীত হবার পথে সহায়ক।

‘অবাঞ্ছিত’ প্রতিক্রিয়া মানুষের উন্নতির কারণ

বস্তুতঃ মানব প্রজাতির অভিজ্ঞতা প্রমাণ করেছে, প্রাকৃতিক, প্রাণীজ ও মানব- জাত ‘অবাঞ্ছিত’ প্রতিক্রিয়া অসংখ্য বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারের কারণ হিসেবে ভূমিকা পালন করেছে। মানুষ এ সব প্রতিক্রিয়া থেকে বাঁচার পথ খুঁজতে গিয়ে চিন্তা- গবেষণা করেছে এবং এমন সব বিস্ময়কর আবিষ্কার- উদ্ভাবন করেছে যা মানবসভ্যতার সৃষ্টি করেছে এবং তাকে এগিয়ে নিয়েছে। আর সৃষ্টিলোকের চূড়ান্ত লক্ষ্যের বাস্তবায়নের জন্য যে সব ঘটনা সংঘটিত হওয়া প্রয়োজন তার মধ্যে অন্যতম হচ্ছে শ্রেষ্ঠতম সৃষ্টি মানুষ সৃষ্টিলোকে নিহিত সকল প্রাকৃতিক বিধিবিধান উদঘাটন করবে ও নিজেদের কল্যাণের জন্য তা কাজে লাগাবে। কিন্তু কথিত অবাঞ্ছিত প্রতিক্রিয়াসমূহ না থাকলে মানুষ আবিষ্কার- উদ্ভাবনে অনুপ্রাণিত হতো না।

অবশ্য প্রাকৃতিক জগতে, বিশেষতঃ প্রাণীজগতে এমন অনেক উপায়- উপকরণ পরিলক্ষিত হয় যার মধ্যে দৃশ্যতঃ অকল্যাণ ছাড়া কোনোরূপ কল্যাণ নিহিত নেই। মানুষ মনে করে, এ সব সৃষ্টি না থাকলেই বা কী অসুবিধা ছিলো?

আসলে বাহ্যতঃ অকল্যাণকর হিসেবে পরিদৃষ্ট সৃষ্টিসমূহের মধ্যেও যে কল্যাণ নিহিত নেই এরূপ মনে করা ঠিক নয়। কারণ, ইতিমধ্যেই বিভিন্ন বাহ্যিক ক্ষতিকর উপাদান বা প্রাণী থেকে এমন সব কল্যাণকর উপাদান আবিষ্কৃত হয়েছে যা মানুষ পূর্বে কল্পনাও করতে পারতো না। উদাহরণ স্বরূপ, সাপের ন্যায় মারাত্মক প্রাণঘাতী প্রাণীর বিষ মানুষের বিরাট কল্যাণ সাধনে ব্যবহৃত হচ্ছে এবং অনেক ক্ষেত্রে সম ওযনের স্বর্ণের তুলনায় বিষের দাম কয়েক গুণ বেশী দেখা যায়।

ক্ষতিকারকতা আপেক্ষিক

এমতাবস্থায় এ ব্যাপারে সন্দেহের অবকাশ নেই যে, সৃষ্টিকুলের সকল সৃষ্টির মধ্যেই কল্যাণকারিতা রয়েছে। এ ক্ষেত্রে বাহ্যতঃ ক্ষতিকারক যা পরিলক্ষিত হয় তার ক্ষতিকারকতাও আপেক্ষিক। প্রথমতঃ অনেক প্রাণীর ক্ষতিকারকতা তাদের আত্মরক্ষার স্বার্থে অপরিহার্য। যেমন:

সাপের বিষ এবং বাঘ ও সিংহের দন্ত- নখর তাদের আত্মরক্ষার জন্য যরূরী। দ্বিতীয়তঃ এক সৃষ্টির ক্ষতিকারকতা কেবল অন্য সৃষ্টির সংস্পর্শেই অর্থাৎ পারস্পরিক সংঘাতের পরিস্থিতিতেই প্রকাশ পায়। অন্যথায় প্রতিটি সৃষ্টিই তার তার নিজস্ব অবস্থানে সুন্দর। একটি সাপকে বা একটি সিংহকে তাদের নিজস্ব অবস্থানে রেখে পর্যবেক্ষণ করলে তার সৌন্দর্য ও তার সৃষ্টিতে সৃষ্টিকর্তার চমৎকার সৃষ্টিকুশলতাই ধরা পড়বে। তেমনি একটি কাঁটাগাছকে তার নিজস্ব অবস্থানে রেখে দেখলে তাকেও সুন্দর ও সুকৌশল সৃষ্টি রূপে দেখা যাবে।

এরপর আসে মানুষের মধ্যকার অবাঞ্ছিত দিকসমূহের কথা। ইতিপূর্বেই আমরা উল্লেখ করেছি যে, প্রাণীকুল, বিশেষতঃ মানুষ কমবেশী স্বাধীনতার অধিকারী। আর এদের স্বাধীনতার মধ্যে পারস্পরিক সংঘাতও অনিবার্য।

ইতিবাচক বৈশিষ্ট্যের নেতিবাচক ব্যবহার

প্রাণী হিসেবে অপরিহার্য স্বাধীনতার অতিরিক্ত মানুষের রয়েছে আরেক ধরনের স্বাধীনতা যাকে স্বাধীন ইচ্ছাশক্তি নামে অভিহিত করা যায়। অর্থাৎ তার ইচ্ছাশক্তি অন্যান্য প্রাণীর ইচ্ছাশক্তির ন্যায় শুধু সহজাত প্রবণতা তথা আত্মরক্ষার তাগিদ থেকেই উদ্ভূত নয়, বরং সৃষ্টির সেরা হিসেবে তার মধ্যে রয়েছে ধরণীর বুকে স্বীয় নেতৃত্ব, কর্তৃত্ব, আধিপত্য, শ্রেষ্ঠত্ব ও মালিকানা প্রতিষ্ঠার প্রবণতা। এ প্রবণতা থেকে উদ্ভূত বিশেষ ধরনের ইচ্ছা ও তা বাস্তবায়নের প্রচেষ্টা চালানো তার অন্যতম বৈশিষ্ট্য।

মানুষের এ বিশেষ ইচ্ছাশক্তি ও ক্ষমতা খারাপ কিছু তো নয়ই, বরং এ হচ্ছে তার এক বিরাট ইতিবাচক বৈশিষ্ট্য। কিন্তু এ বৈশিষ্ট্যকে ইতিবাচকভাবে ব্যবহার না করে নেতিবাচকভাবে ব্যবহার করার ফলে অবাঞ্ছিত অবস্থার সৃষ্টি হচ্ছে। এ ক্ষতিকারকতা রোধ করতে হলে হয় তাকে এ ক্ষমতা থেকে বঞ্চিত করতে হতো, অথবা এ ক্ষমতার অপব্যবহারপ্রবণতা থেকে তাকে মুক্ত রাখতে হতো। কিন্তু তাহলে তার পরিণতি কী হতো?

প্রাণী হিসেবে প্রদত্ত স্বাধীনতার পাশাপাশি মানুষকে প্রদত্ত স্বাধীন ইচ্ছাশক্তি তাকে দেয়া না হলে মানুষ মানুষ হতো না; স্রেফ একটি উন্নত স্তরের প্রাণীপ্রজাতি হতো। সে ক্ষেত্রে তার দ্বারা জ্ঞান-বিজ্ঞানের বিকাশ ও সভ্যতার সৃষ্টি হতো না। অন্যদিকে তাকে সৃজনক্ষমতা প্রদান করার পাশাপাশি তার অপব্যবহার করার ক্ষমতা বিলুপ্ত করে দেয়া হলে কার্যতঃ সে ফেরেশতার কাছাকাছি কোনো প্রাণীতে পরিণত হতো, মানুষ হতো না এবং মানুষের মধ্যে সৃষ্টিকর্তার সকল গুণের (সীমিত মাত্রায় হলেও) যে সমাহার দেখা যাচ্ছে তথা সে যেভাবে সৃষ্টিকর্তার প্রতিচ্ছবি বা প্রতিনিধি রূপে আবির্ভূত হয়েছে তার মধ্যে এ বৈশিষ্ট্যের পরিপূর্ণ প্রকাশ ঘটতো না। অন্য কথায়, তার মধ্যে সৃষ্টিকর্তার সৃষ্টিক্ষমতার যে সর্বোচ্চ বহিঃপ্রকাশ ঘটেছে তা ঘটতো না। কারণ, সৃষ্টিকর্তার সৃষ্টিক্ষমতার সর্বোচ্চ বহিঃপ্রকাশ মানে হচ্ছে তাঁর গুণাবলীর অনুরূপ গুণাবলী সম্পন্ন সৃষ্টির উদ্ভব ঘটানো, যদিও সৃষ্টি ও সসীম হবার কারণে এ সৃষ্টির মধ্যে তাঁর সে গুণাবলীর বহিঃপ্রকাশ ঘটবে সীমিত পরিমাণে। সে সীমা কতখানি তা বড় কথা নয়, তবে সৃষ্টির মাঝে স্রষ্টার গুণাবলী সর্বোচ্চ যে মাত্রায় দেয়া সম্ভব তিনি তাকে তা সে মাত্রায়ই প্রদান করবেন এটাই স্বাভাবিক, অন্যথায় এ সৃষ্টি না সর্বোত্তম হবে, না তাঁর প্রতিচ্ছবি বা প্রতিনিধি হবে।

মানুষকে সৃষ্টিকর্তার সকল গুণ সম্ভব সর্বোচ্চ মাত্রায় প্রদানের মানেই হচ্ছে তাকে শুধু সৃষ্টির ক্ষমতাই দেয়া হবে না, বরং ধ্বংসের ক্ষমতাও দেয়া হবে, যদিও উভয়ই সীমিত পরিমাণে; এ সীমা কতোখানি তা বড় কথা নয়, তবে সম্ভব সর্বোচ্চ মাত্রায় হওয়াই স্বাভাবিক। আর এ ধরনের গুণাবলীর অধিকারী হওয়ার মানেই হচ্ছে মানুষ সৃষ্টিলোকের ওপর স্বাধীনভাবে তার ইচ্ছার বাস্তবায়ন ঘটাবে। এ ক্ষেত্রে তার ইচ্ছাকে শুধু কল্যাণ- ইচ্ছার মধ্যে সীমাবদ্ধ করে দেয়া হলে বা অকল্যাণ- ইচ্ছা দেয়া সত্ত্বেও তার বাস্তবায়ন অসম্ভব করে দেয়া হলে তার মানে হতো তার স্বাধীনতাকে প্রায় বিলুপ্ত করে দেয়া তথা তাকে 'সম্ভব সর্বোচ্চ মাত্রায়' স্রষ্টার 'সকল গুণ' না দেয়া। আর তাহলে সে সৃষ্টিকর্তার 'সম্ভব সর্বোচ্চ মাত্রার বহিঃপ্রকাশ' বা তাঁর 'সম্ভব সর্বোচ্চ মাত্রার প্রতিনিধি' হতো না। সে অবস্থায় সৃষ্টিকর্তার গুণাবলী বহুলাংশে অপ্রকাশিত থেকে যেতো।

মূলতঃ প্রতিনিধিত্বের শর্তই হচ্ছে প্রতিনিধিকে পূর্ণ স্বাধীনতা দিতে হবে। তাকে প্রদত্ত এ স্বাধীনতাকে নিয় ণ করবে দু'টি জিনিস: প্রথমতঃ প্রাকৃতিক বিধিবিধান, দ্বিতীয়তঃ নৈতিক বিধিবিধান তথা ঔচিত্য- অনৌচিত্যবোধ। মানুষের ইচ্ছা ও শক্তির নিয় ণকারী এ দু'টি জিনিস। প্রাকৃতিক বিধিবিধানকে লঙ্ঘন করার সাধ্য মানুষের নেই। (অবশ্য অজ্ঞাত কোনো প্রাকৃতিক বিধান আবিষ্কার করে তার প্রয়োগের মাধ্যমে পূর্ব থেকে জ্ঞাত প্রাকৃতিক বিধিবিধানের বাধ্যবাধকতা থেকে মুক্তিলাভ সম্ভব হতে পারে। এরূপ হলে প্রকৃত পক্ষে তাকে প্রাকৃতিক বিধানের লঙ্ঘন বলে গণ্য করা চলে না।) কিন্তু নৈতিক বিধিবিধান লঙ্ঘনের সুযোগ তার রয়েছে। তবে যে মানুষ স্বীয় স্বরূপ তথা সে যে মহান সৃষ্টিকর্তার প্রতিনিধিত্ব করছে - এ সত্য যথাযথভাবে উদঘাটন করতে সক্ষম হয়েছে তার পক্ষে নৈতিক বিধান লঙ্ঘন করা সম্ভব নয়। যে সৃষ্টি প্রকৃতই সৃষ্টিকর্তার প্রতিনিধি সে জ্ঞানের আলোয় এতোখানি উদ্ভাসিত যে, নৈতিক বিধান লঙ্ঘনের বর্তমান (ইহজাগতিক) ও ভবিষ্যৎ (পরজাগতিক) প্রতিক্রিয়া তার সামনে দিবালোকের ন্যায় সুস্পষ্ট থাকে। ফলে স্বাধীনতা থাকা সত্ত্বেও তার পক্ষে নৈতিক বিধান লঙ্ঘন করা সম্ভব নয়।

পিতামাতার কারণে সন্তানের দুর্ভাগ্য কেন?

সবশেষে আরো একটি প্রশ্নের জবাব দেয়া প্রয়োজন বলে মনে হয়। তা হচ্ছে, অনেক ক্ষেত্রেই পিতামাতার সৌভাগ্য বা দুর্ভাগ্যের পরিণামে সন্তান সৌভাগ্য বা দুর্ভাগ্যের অধিকারী হয়। ধনীর সন্তান ধনী, গরীবের সন্তান গরীব হয়। অনেক ক্ষেত্রেই কঠিন রোগগ্রস্ত পিতা বা মাতার সন্তান জন্মগতভাবে রোগগ্রস্ত হয়ে থাকে। প্রশ্ন হচ্ছে, এ ক্ষেত্রে একজনের কর্মফল আরেক জন ভোগ করবে কেন?

আসলে কয়েকটি বিষয়ে সচেতনতার অভাব থেকে এ প্রশ্নের উদয় হয়েছে। এ ব্যাপারে প্রথমেই প্রশ্ন জাগে, সুখ- দুঃখের স্বরূপ কি মানুষ উদঘাটন করতে পেরেছে? সুখ- দুঃখ ও সৌভাগ্য- দুর্ভাগ্য প্রতিটি মানুষের বর্তমান, অতীত ও সম্ভাব্য বা প্রার্থিত ভবিষ্যৎ অবস্থার মধ্যে তুলনার ওপর নির্ভরশীল। প্রকৃত পক্ষে বিষয়টি আপেক্ষিক। সে কী আছে, কী চায় এবং কী হলো - এ তিনের সমন্বয় হচ্ছে তার সৌভাগ্য বা দুর্ভাগ্য নির্ণয়ের প্রকৃত মানদণ্ড।

তাই প্রশ্ন করতে হয়, জন্মগতভাবে বাঞ্ছিত বৈশিষ্ট্যাবলীর অধিকারী তথা সুন্দর, স্বাস্থ্যবান, শক্তিশালী, শক্তিক্ষমতার অধিকারী ও প্রভূত ধনসম্পদের মালিক মাত্রই কি ভাগ্যবান? তাদের প্রত্যেকেই কি সুখী? তাদের সকলেই কি শান্তির অধিকারী?

নিঃসন্দেহে উপরোক্ত প্রশ্নগুলোর ক্ষেত্রে একই শ্রেণীর সকলের জবাব এক নয়।

তেমনি জন্মগতভাবে অবাঞ্ছিত বৈশিষ্ট্যাবলীর অধিকারী তথা অসুন্দর, স্বাস্থ্যহীন, দুর্বল, শক্তিক্ষমতাহীন ও দরিদ্র বস্তিবাসীমাত্রই কি দুঃখী? এ প্রশ্নের জবাবও একই শ্রেণীর সকল বস্তিবাসীর ক্ষেত্রে অভিন্ন নয়। আর এদের মধ্যে যদি কেউ নিজেকে দুঃখী বলে অনুভব না করে তাহলে তাকে ভাগ্যহীন বলা চলে কি?

অনুরূপভাবে একই ব্যক্তির সকল সময়ের অবস্থা এক নয়। একই ধনী ব্যক্তি যেমন কখনো সুখী, কখনো অসুখী, তেমনি একই বস্তিবাসী ব্যক্তি কখনো সুখী, কখনো অসুখী।

সুখ-দুঃখ ও সৌভাগ্য-দুর্ভাগ্যের বাহ্যিক ও পার্থিব মানদণ্ড যদি চূড়ান্ত হতো তাহলে রাজপুত্র স্বেচ্ছায় সিংহাসন ত্যাগ করে ফকীর-দরবেশ হয়ে যেতো না, ধনী যাত্রীর ভুল করে ফেলে যাওয়া লক্ষ টাকা গরীব রিকশাওয়ালা ফেরত দিতে যেতো না, দেশ বা ধর্মের জন্য বা মানবতার জন্য কেউ প্রাণ উৎসর্গ করতো না।

এখানে মনে রাখার দ্বিতীয় বিষয়টি হচ্ছে এই যে, প্রতিটি ব্যক্তি যেমন একেকটি একক সত্তা তেমনি সে তার পরিবার, সমাজ, দেশ ও বিশ্বের এবং সর্বোপরি গোটা সৃষ্টিলোকের সত্তারও অবিচ্ছেদ্য অংশবিশেষ বটে।

সন্তান নিঃসন্দেহে পিতামাতার সত্তার অংশবিশেষ এবং পিতামাতাও সন্তানের সত্তার অংশবিশেষ। এভাবে পরস্পরের সত্তার অংশবিশেষ হওয়ার কারণেই তারা শারীরিকভাবে পরস্পর স্বাধীন সত্তা হওয়া সত্ত্বেও পরস্পরের সুখ-দুঃখ, ভালো-মন্দ ও সৌভাগ্য-দুর্ভাগ্য দ্বারা পারস্পরিকভাবে প্রভাবিত হয়ে থাকে। এ কারণেই পিতামাতার সন্তান-জন্মলাভপূর্ব অবস্থার দ্বারা সন্তানের প্রভাবিত হওয়ার মধ্যেই তাদের পারস্পরিক প্রভাব সীমাবদ্ধ নয়, বরং সন্তানের জন্মপরবর্তী-কালীন পারস্পরিক সৌভাগ্য-দুর্ভাগ্যও তাদেরকে পারস্পরিকভাবে স্পর্শ করে। অনেক সময় সন্তানের দুর্ভাগ্য স্বয়ং সন্তানের তুলনায় পিতামাতার জন্য অধিকতর য ণাদায়ক হয়ে থাকে।

একটি জন্মান্ধ শিশু পার্থিব জগতের সৌন্দর্য কী জানে না এবং তা তাকে হাজারো ব্যাখ্যা দিয়েও বুঝানো সম্ভব নয়। তাই পার্থিব জগতের সৌন্দর্য দেখতে না পারার কারণে তার তেমন কোনো দুঃখ হবার কথা নয়, কিন্তু সন্তানের জন্মান্ধতার কষ্ট এমনই য ণাদায়ক হয় যে, অনেক সময় পিতামাতা সন্তানের অন্ধত্ব দেখার আগে নিজেদের মৃত্যু হলো না কেন - এ মর্মে আফসোস করে থাকে।

বিষয়টি একই দেহের বিভিন্ন অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের মধ্যকার সম্পর্কের সাথে তুলনীয়। একই দেহের কোনো অঙ্গ রোগাক্রান্ত হলে তা দ্বারা সুস্থ অঙ্গও প্রভাবিত হয়। এ ক্ষেত্রে যে অঙ্গের সাথে যে অঙ্গের দূরত্বগত বা কর্মগত নৈকট্য বেশী সে সব অঙ্গ পরস্পর অধিকতর প্রভাবিত হয়। তেমনি

সমাজ, দেশ ও বিশ্বের সামগ্রিক পরস্থিতির ভালো- মন্দ দ্বারা ব্যক্তি প্রভাবিত হয়, কারণ, সে সমাজ, দেশ ও বিশ্বের অংশ।

চিকিৎসাযোগ্য নয় এমন কোনো ব্যাধি কোনো ব্যক্তি বিদেশ থেকে নিয়ে এলে এবং তা সমাজে সংক্রামিত হলে তাতে একজন সুস্থ মানুষের আক্রান্ত হওয়ার এবং তা থেকে আদৌ সুস্থ না হওয়ার আশঙ্কা থেকে যায়। পিতামাতার সাথে সন্তানের সম্পর্কও তেমনি। সন্তানের জন্মগ্রহণপূর্ব তথা মাতৃগর্ভে থাকাকালীন অবস্থায় এ সম্পর্ক ঘনিষ্ঠতম থাকে বিধায় সন্তানের মধ্যে পিতামাতার ভালোমন্দ বৈশিষ্ট্য স্থানান্তরিত হওয়ার সম্ভাবনা থাকে সবচেয়ে বেশী। পিতার দেহের প্রাণবীজ থেকে মাতৃগর্ভে সন্তানের সূচনা হয় এবং মাতৃদেহের উপাদানে পরিপুষ্ট হয়ে সে একটি পরিপূর্ণ শিশুরূপে ভূমিষ্ঠ হয়। ফলে পিতামাতার বৈশিষ্ট্য তার মধ্যে সর্বাধিক মাত্রায় স্থানান্তরিত হওয়াটাই স্বাভাবিক।

এ বিষয়টিকে গাছের বীজ থেকে গাছ হওয়ার সাথে তুলনা করা যায়। টক আমের আঁটি থেকে টক আমের গাছই হবে, মিষ্টি আমের গাছ হবে না। অন্যদিকে যে মাটিতে এ আঁটি বপন করা হয়েছে তার প্রভাবও গাছ ও তার ফলে বিস্তার লাভ করবে। বলা হয়, ছাতকের কমলার বীজ দার্জিলিং- এ লাগালে তাতে ছাতকের কমলা পাওয়া যাবে না, তেমনি হুবহু দার্জিলিং- এর কমলাও পাওয়া যাবে না, বরং ছাতক ও দার্জিলিং উভয় জাতের কমলাগাছের কমলা থেকে তার বৈশিষ্ট্য কিছুটা স্বত হবে। এর বিপরীত করা হলেও তার ফল হবে প্রায় অনুরূপ। তবে বীজ থেকে চারা গজানোর পর সে চারা তুলে নিয়ে তৃতীয় কোন জায়গায় লাগালে এর বৈশিষ্ট্য হবে আরো ভিন্ন ধরনের। অর্থাৎ সে ক্ষেত্রে বীজ, জন্মকালীন পরিপুষ্টি ও জন্মপরবর্তী পরিপুষ্টি তিনটিই প্রভাবশালী হবে এবং মিশ্র ফলাফল প্রদান করবে।

তেমনি পোকায় ধরা, ত্রুটিপূর্ণ ও দুর্বল বীজ থেকে সৃষ্ট গাছ এবং দূষিত মাটিতে বপনকৃত ভালো বীজ থেকে সৃষ্ট গাছও নেতিবাচক বৈশিষ্ট্যের অধিকারী হবে - এটাই স্বাভাবিক।

মানুষের বেলায়, একই প্রাকৃতিক নিয়ম অনুযায়ী সন্তানের মধ্যে পিতা ও মাতার কাছ থেকে জন্মসূত্রে প্রাপ্ত প্রভাবের পাশাপাশি জন্মপরবর্তী পরিবেশ ও শিক্ষাও প্রভাবশালী হয়ে থাকে। তবে

মানুষ তার বিচারবুদ্ধির পরিপক্বতায় উপনীত হবার পর স্বীয় চেষ্টা- সাধনা ও সংগ্রাম- সাধনার মাধ্যমে জন্ম, পরিবেশ ও শিক্ষা থেকে প্রাপ্ত অবাঞ্ছিত প্রভাব শারীরিক ও পার্থিব ক্ষেত্রে কিছুটা হলেও এবং নৈতিক ক্ষেত্রে পুরোপুরি কাটিয়ে উঠতে পারে।

তৃতীয়তঃ সৃষ্টির সাফল্য ও ব্যর্থতার মানদণ্ড হচ্ছে সে জন্মগতভাবে যে সম্ভাবনা নিয়ে এসেছে তার বিকাশ ও পূর্ণতায় উপনীত হওয়া বা না- হওয়াতে, অন্যের অনুরূপ হওয়া বা না- হওয়াতে নয়। বিড়ালের জন্য পরিপূর্ণ বিড়াল হওয়াতেই সার্থকতা, বাঘ হতে না পারা তার জন্য ব্যর্থতা নয়। একই প্রজাতির বিভিন্ন সদস্যের ক্ষেত্রেও তা- ই। অন্যদিকে মানুষ ও অন্যান্য প্রাণীর মধ্যে মূল পার্থক্য তার বিচারবুদ্ধি ও ঐশী গুণাবলী, অতএব, তার সাফল্য ও ব্যর্থতার মানদণ্ড হচ্ছে এ গুণাবলীর বিকাশ ও ব্যবহার। এতে যে সফল, সে- ই প্রকৃত সফল এবং এতে যে ব্যর্থ সে- ই প্রকৃত ব্যর্থ।

অন্যদিকে পার্থিব ও অপার্থিব মিলিয়ে ব্যক্তির আশা- আকাঙ্ক্ষা ব্যক্তিতে ব্যক্তিতে স্বত । তাই দেখা যায় যে, এক ব্যক্তি যা পাওয়ার জন্য লালায়িত এবং না পাওয়ার দুঃখে বুক ফেটে মারা যাবার উপক্রম, আরেক ব্যক্তি তা- ই অবজ্ঞাভরে পরিহার করছে। অতএব, সাফল্য- ব্যর্থতার অন্যতম ‘ব্যক্তিগত’ মানদণ্ড এই আশা- আকাঙ্ক্ষও বটে, তবে কারো ব্যক্তিগত মানদণ্ড প্রকৃত বিচারে যথার্থ হতে পারে এবং কারো মানদণ্ড অযথার্থও হতে পারে। এ মানদণ্ডের যথার্থতা- অযথার্থতা নির্ণীত হবে অপার্থিব মানবিক মানদণ্ডের সাথে তুলনা করে। কারণ, এটাই মানুষ ও অন্যান্য প্রাণীর মাঝে পার্থক্য নির্দেশ করে।

মানুষ অভিজ্ঞতা থেকে জানতে পারছে যে, বস্তুজগতের সাফল্য ও ব্যর্থতা এবং সৌভাগ্য ও দুর্ভাগ্য একদিকে যেমন বিভিন্ন প্রাকৃতিক, অপ্রাকৃতিক ও মানবিক কারণের দ্বারা নিয় িত, তেমনি মরণশীল মানুষের জন্য তা খুবই অস্থায়ী। অন্যদিকে মানুষ অবস্তুগত যা কিছু অর্জন করে তা বস্তুজগতের কারণাদির প্রভাবে তার হাতছাড়া হয় না এবং তা চিরস্থায়ী। তাই তার উচিত মানবিক ও আত্মিক সম্পদ অর্জনকেই সাফল্য ও ব্যর্থতার মানদণ্ড হিসেবে গণ্য করা এবং পার্থিব জীবন ও উপায়- উপকরণকে এ লক্ষ্যে উপনীত হবার মাধ্যমরূপে ব্যবহার করা।

মোদ্দা কথা, সৃষ্টিলোকে যা কিছু অবাঞ্ছিত উপাদান ও কারণ বলে মনে হয় তা মোটেই অযথা, বা অবাঞ্ছিত, বা অকল্যাণকর নয়। বরং সামগ্রিক ও চূড়ান্ত বিচারে সব কিছুতেই কল্যাণ নিহিত রয়েছে।

'আমি কেন তুমি হলাম না?! '

এ প্রসঙ্গে আনুষঙ্গিক হিসেবে আরো একটি বিষয়ের ওপরে সংক্ষেপে হলেও আলোকপাত করা প্রয়োজন বলে মনে হয়। তা হচ্ছে, অনেক সময় অপূর্ণতার বিরুদ্ধে অভিযোগ তুলতে দেখা যায়। যেমন: বলা হয়, সৃষ্টিকর্তা অমুককে বিকলাঙ্গ করে সৃষ্টি করলেন কেন? আমি কেন সুন্দর চেহারার অধিকারী হলাম না? তিনি কেন আমাকে ধনীর ঘরে পাঠালেন না অর্থাৎ আমি কেন ধনীর সন্তান হলাম না? আমার মেধা- প্রতিভা অমুকের তুলনায় কম হলো কেন? এ পরিবারে জন্ম নেয়ার কারণেই আমি দুর্ভাগ্যের শিকার হয়েছি। ইত্যাদি।

এসব অভিযোগের জবাবে যা বলতে হয় তা হচ্ছে, সৃষ্টিপ্রকৃতিতে অপূর্ণতা বলতে স্বত কিছু নেই, বরং পূর্ণতার অভাব বা ঘাটতিই অপূর্ণতা। আর পূর্ণতার অভাব বা ঘাটতি সৃষ্টিজগতের কার্যকারণ থেকেই উদ্ভূত হয়; সৃষ্টিকর্তা পরিকল্পিতভাবে কারো মধ্যে ঘাটতি সৃষ্টি করে দেন না বা কাউকে পূর্ণতা থেকে বঞ্চিত করেন না। বিশেষ করে মানুষের ক্ষেত্রে এই অপূর্ণতা বা ঘাটতি অজ্ঞতা বা ভুল পদক্ষেপ থেকে উদ্ভূত হয়।

ওপরে যেমন উল্লেখ করা হয়েছে, কোনো বীজে ত্রুটি থাকলে বা ত্রুটিপূর্ণ মাটিতে বীজ বপন করা হলে অথবা পরিবেশগত অবনতি ঘটলে একটি বীজ থেকে ত্রুটিপূর্ণ গাছ জন্ম নিতে পারে এবং তা স্বাভাবিক পরিবৃদ্ধি থেকে বঞ্চিত হতে পারে ও স্বাভাবিক ফল প্রদানে অসমর্থ হতে পারে। অনুরূপভাবে পিতার দেহ থেকে বিচ্ছিন্ন প্রাণবীজে বা মাতার ডিম্বে বা শরীরে ত্রুটি থাকলে অথবা পারিপার্শ্বিক ত্রুটির কারণে (যেমন: হিরোসিমা ও নাগাসাকিতে পরমাণু বোমা নিক্ষেপ-পরবর্তীকালে সেখানকার বেঁচে থাকা বাসিন্দাদের মধ্যে ঘটেছে) বিকলাঙ্গ সন্তান জন্ম নিতে পারে। অতএব, এ জন্য সৃষ্টিকর্তাকে দোষারোপ করা ঠিক নয়।

সুন্দর চেহারার অধিকারী বা ধনীর সন্তান হওয়ার বিষয়টিও অনুরূপ। বিষয়টি নিম্নোক্ত উদাহরণের সাহায্যে অপেক্ষাকৃত সহজে বুঝা যেতে পারে।

‘ক’- এর যে প্রাণবীজ ‘খ’- এর গর্ভে মানবশিশুতে পরিণত হয়েছে তা- ই ‘গ’রূপে জন্মগ্রহণ করেছে এবং উক্ত প্রাণবীজ ও গর্ভধারিনীর গর্ভকালীন অবস্থার ফলে যে ধরনের শিশু তৈরী হওয়া সম্ভব ‘গ’ সে শিশুরূপেই ভূমিষ্ঠ হয়েছে। যে সময়ে ‘ক’- এর ‘গ’- বীজ দ্বারা ‘খ’- এর গর্ভসঞ্চার হয়ে ‘গ’- এর ভ্রূণ তৈরী হয়েছে সে সময় তা না হয়ে অন্য সময় হলে ‘ক’- এর অন্য কোনো বীজ দ্বারা ‘খ’- এর গর্ভসঞ্চার হলে তাতে ‘গ’- এর জন্ম হতো না, বরং ‘ঘ’- এর জন্ম হতো এবং হয়তোবা বীজ অথবা গর্ভকালীন অবস্থার পার্থক্যের কারণে ‘ঘ’ সুন্দর চেহারা নিয়ে জন্মগ্রহণ করতো। অর্থাৎ ‘গ’- এর পক্ষে যা হওয়া সম্ভব ছিলো সে তা- ই হয়েছে, ‘গ’- এর পক্ষে ‘ঘ’ হওয়া সম্ভব ছিলো না, কারণ উভয়ই স্বত ।

ওপরের উদাহরণের ‘গ’- এর পক্ষে ধনীর সন্তান বা নামীদামী লোকের সন্তান হওয়ার বিষয়টিও অনুরূপ, বরং এর অসম্ভাব্যতা অধিকতর সুস্পষ্ট। কারণ, দরিদ্র ‘ক’- এর ‘গ’- প্রাণবীজ থেকে ‘গ’- এর জন্ম হয়েছে এবং ধনী ‘ঙ’- এর ‘চ’- প্রাণবীজ থেকে ‘চ’- এর জন্ম হয়েছে। এখন ‘গ’- এর পক্ষে কী করে ‘চ’ হওয়া বা ‘ঙ’- এর সন্তান হওয়া সম্ভব হতো?

অনুরূপভাবে ‘ক’- এর প্রাণবীজ দ্বারা ‘খ’- এর পরিবর্তে ‘ছ’ গর্ভবতী হলে সে সন্তান ‘গ’ হতো না। এমনকি যদি ধরে নেয়া হয় যে, ‘ক’- এর ‘গ’- প্রাণবীজ থেকেই ‘ছ’ গর্ভবতী হয়েছে তথাপি সে সন্তান ‘গ’ হতো না। কারণ, বৃক্ষের বৈশিষ্ট্য বিনির্মাণে বীজের ভূমিকা মুখ্য হলেও মাটির ভূমিকা উপেক্ষণীয় নয়, যে কারণে ছাতকের কমলার বীজ দার্জিলিং- এ লাগালে তাতে না ছাতকের কমলা হয়, না দার্জিলিং- এর, বরং তৃতীয় ধরনের কমলা হয়ে থাকে। অতএব, ‘গ’- প্রাণবীজ থেকে ‘খ’- এর পরিবর্তে ‘ছ’- এর গর্ভে সন্তান হলে সে বর্তমান ‘গ’ থেকে ভিন্ন এক ব্যক্তিরূপে জন্ম নিতো, এমনকি তার নাম ‘গ’ রাখা হলেও।

আর ‘খ’- এর গর্ভে ‘ক’- এর ‘গ’- প্রাণবীজের পরিবর্তে ‘জ’- এর কোনো প্রাণবীজ থেকে গর্ভসঞ্চার হলে তা থেকে ‘গ’- এর জন্মগ্রহণের তো দূরতম সম্ভাবনাও থাকে না। কারণ,

সন্তানের ব্যক্তিসত্তা নির্ধারণের মূল উপাদান হচ্ছে প্রাণবীজ; ল্যাংরা আমের বীজ থেকে ল্যাংরা আম এবং ফজলী আমের বীজ থেকে ফজলী আম জন্ম নেবে; মাটির অভিন্নতা একটিকে আরেকটিতে পরিবর্তিত করে দেয় না, যদিও মাটির পরিবর্তনে একই বীজের গাছের বৈশিষ্ট্যে অনেকখানি পার্থক্য হয়ে থাকে।

তাহলে দেখা যাচ্ছে, যারা অসুন্দর, হীনস্বাস্থ্য, দুর্বল, বিকলাঙ্গ, ক্ষমতাহীন বা নিঃস্ব হিসেবে জন্মগ্রহণ করেছে তাদের পক্ষে অন্য কেউ হয়ে জন্মগ্রহণ করা সম্ভব ছিলো না। অবশ্য তার জন্ম না হওয়া সম্ভব ছিলো, (কারণ, সে একজন সম্ভব অস্তিত্ব)। কিন্তু বিষয়টি তার পিতামাতার ওপর নির্ভরশীল এবং তার জন্মের জন্য তার পিতামাতার দায়িত্বহীন ইচ্ছা অথবা দায়িত্বহীন ইচ্ছা না থাকা সাপেক্ষে অজ্ঞতাই দায়ী।

আর ক্ষেত্রবিশেষে (যেমন: বিকলাঙ্গতা বা জন্মগত ব্যাধির ক্ষেত্রে) এ ধরনের সন্তানের জন্মগ্রহণের কারণে স্বয়ং সন্তানটির মনঃকষ্টের পরিমাণের চেয়ে তার পিতামাত্রার মনঃকষ্টের পরিমাণ অনেক গুণে বেশী হয়ে থাকে এবং ক্ষেত্রবিশেষে (যেমন: দারিদ্র্য ও অসৌন্দর্যের ক্ষেত্রে) সন্তানটি তার জন্মগ্রহণকে সম্ভাব্য জন্ম না নেয়ার ওপর অগ্রাধিকার দিয়ে থাকে। কোনো দরিদ্রসন্তানকে যদি জানানো হয় যে, দারিদ্র্যজনিত কারণে তার পিতামাতাকে কেউ এ সন্তানটি গর্ভে থাকাকালে গর্ভপাত ঘটানোর পরামর্শ দিয়েছিলো তখন ঐ পরামর্শদাতার প্রতি সন্তানটি সন্তুষ্ট হয়, নাকি অসন্তুষ্ট হয় তা লক্ষণীয়। নিঃসন্দেহে সে তার জন্ম না নেয়ার কথাটি কিছুতেই মেনে নিতে পারে না।

বিচারবুদ্ধির দৃষ্টিতে স্রষ্টা ও সৃষ্টির সম্পর্ক

স্রষ্টা হচ্ছেন অপরিহার্য সত্তা এবং সৃষ্টিনিচয় সম্ভব সত্তা। সৃষ্টির সূচনাকারী অর্থাৎ অপরিহার্য সত্তা প্রথম বার[৫] যখন সৃষ্টি করেন তা অবশ্যই শূন্য থেকে অর্থাৎ কোনোরূপ উপাদান ব্যতিরেকেই করেছেন। আর পূর্ব থেকে কোনো উপাদান বিদ্যমান থাকার মানে সে উপাদানকেও অপরিহার্য সত্তা হতে হবে - যা সম্ভব নয়। কারণ, অপরিহার্য সত্তার জন্য সকল পূর্ণতার অধিকারী এবং পরিবর্তনশীলতার উর্ধে হওয়া অপরিহার্য।

সৃষ্টি স্রষ্টার অংশ নয়

শূন্য থেকে অর্থাৎ উপাদান ছাড়াই কীভাবে সৃষ্টির সূচনা সম্ভব - এটা অনেকের নিকট বোধগম্য নয়। তাই অনেকে সৃষ্টিকে স্রষ্টার অংশ বলে মনে করে। কিন্তু এরূপ ধারণা বিচারবুদ্ধির নিকট গ্রহণযোগ্য নয়। কারণ, সে ক্ষেত্রে স্রষ্টাকে যৌগিক সত্তা বলে গণ্য করতে হয় এবং যৌগিক সত্তা পরম পূর্ণতার অধিকারী বা অপরিহার্য সত্তা হতে পারে না। কারণ, যৌগিক সত্তা তার অংশসমূহের ওপর নির্ভরশীল। তাছাড়া সদা পরিবর্তনশীলতাই প্রমাণ করে যে, সৃষ্টিনিচয় পরম পূর্ণতা ও অপরিহার্যতা গুণ থেকে শূন্য। তাই তর্কের খাতিরে কেউ স্রষ্টার যৌগিকত্বের সম্ভাবনাকে মেনে নিলে বলতে হয় যে, এ ধরনের পরিবর্তনশীল ও ধ্বংসোপযোগী অংশের অধিকারী সত্তা চিরন্তন ও অপরিহার্য সত্তা হতে পারে না।

স্রষ্টার মোকাবিলায় সৃষ্টির স্বরূপ বুঝাতে গিয়ে অনেকে পানি ও তরঙ্গের উপমা দিয়েছেন। অর্থাৎ যা সত্য তা হচ্ছে পানি, তরঙ্গ বলে কিছু নেই; পানিতে আলোড়ন থেকে তরঙ্গরূপ 'আপেক্ষিক অস্তিত্ব' রূপ লাভ করে।

এ উপমা দ্বারা বিষয়টির অবোধগম্যতা কিছুটা হ্রাস পেলেও এ হচ্ছে এক 'দুর্বল' উপমা। বস্তুতঃ অস্তিত্ব হিসেবে স্রষ্টা ও সৃষ্টির মধ্যে এমন সীমাহীন পার্থক্য রয়েছে যে, সৃষ্টিলোকের কোনো উপমা দ্বারা স্রষ্টাকে এবং স্রষ্টা ও সৃষ্টির মধ্যকার সম্পর্ককে বুঝানো সম্ভব নয়। তবে সম্ভবতঃ

'মানুষ ও মানুষের কল্পনা'র উপমা স্রষ্টা ও সৃষ্টির মধ্যকার সম্পর্ক বুঝাবার জন্য অধিকতর সহায়ক হতে পারে, যদিও তা- ও এক দুর্বল উপমা।

আমরা যখন কোনো কিছুর কল্পনা করি, কল্পনায় কিছু তৈরী করি বা কল্পনায় কোনো গল্প রচনা করি, তখন তার সাথে আমাদের যে সম্পর্ক অস্তিত্ব লাভ করে সৃষ্টিলোকের সাথে স্রষ্টার সম্পর্ককে ত প গণ্য করা যায়।

আমরা কল্পনায় যা তৈরী করি তা- ও কিন্তু সত্য - কল্পনার সত্য, যদিও বস্তুজাগতিক সত্য নয়। তবে আমরা যখন কল্পনায় কিছু তৈরী করি তখন তাতে বস্তুগত উপাদান ছাড়া বাস্তব জগতের সব কিছুই থাকে। তাতে রং, রস, বর্ণ, গন্ধ, স্বাদ, দৈর্ঘ্য- প্রস্থ- বেধ, গতি, ছন্দ, সুর, কথা, হাসি- কান্না, আলো, আঁধারী, জন্ম, মৃত্যু, প্রবৃদ্ধি, ধ্বংস তথা সব কিছুই থাকে, শুধু বস্তু থাকে না। আমরা তা কোনোরূপ বস্তুগত উপাদান ব্যবহার না করেই অর্থাৎ শূন্য থেকেই সৃষ্টি করি। যাদের কল্পনাশক্তি যথেষ্ট শক্তিশালী তারা তাদের কল্পনার কাহিনীর সৃষ্টিসমূহকে যতোক্ষণ ইচ্ছা টিকিয়ে ও গতিশীল রাখতে সক্ষম।

কল্পনার সৃষ্টি কিন্তু মিথ্যা নয়, সত্য। কল্পনার সৃষ্টিকে ঐ অর্থে মিথ্যা মনে করা হয় যে, তা বাস্তব সৃষ্টি নয়। অর্থাৎ কল্পনাকে বাস্তব মনে করা হলে বা দাবী করা হলে তা হবে মিথ্যা, কিন্তু তা কল্পনার সৃষ্টি হিসেবে সত্য।

কল্পনাকারী ও কল্পিত সৃষ্টির মধ্যে যে সম্পর্ক অপরিহার্য সত্তা ও সৃষ্টিলোকের মধ্যকার সম্পর্ককে ত প মনে করা যেতে পারে। কল্পনাকারী ও কল্পিত সৃষ্টির মধ্যে যে সত্তাগত পার্থক্য বিরাজমান, অপরিহার্য সত্তা ও সৃষ্টিলোকের মধ্যে ত প সত্তাগত পার্থক্য বিদ্যমান।

আগেই বলেছি, এ- ও এক দুর্বল উপমা। কারণ, মানুষের কল্পনা ও অপরিহার্য সত্তার সৃষ্টিকর্মের মধ্যে কতক গুণগত পার্থক্য রয়েছে। এ ক্ষেত্রে সবচেয়ে বড় গুণগত পার্থক্য এই যে, আমরা যখন কল্পনা করি তখন আমাদের মস্তিষ্কের মধ্যে এক ধরনের আলোড়ন সৃষ্টি হয়। কিন্তু অপরিহার্য সত্তার জন্যে মস্তিষ্ক ও তাতে আলোড়ন সৃষ্টি হওয়ার ধারণা অবান্তর। বরং সৃষ্টি হচ্ছে তাঁর সৃষ্টিক্ষমতার বহিঃপ্রকাশ ও ইচ্ছাশক্তির অবদান।

এ ক্ষেত্রে আরেকটি পার্থক্য হচ্ছে আমাদের কল্পনাশক্তির সৃজন ও সংরক্ষণ ক্ষমতার সীমাবদ্ধতা। আমরা একই সময় একাধিক বিষয় কল্পনা করতে বা একাধিক কল্পনাকে সক্রিয় ধরে রাখতে পারি না এবং অনেক কল্পনাকে সুনিয়ি তভাবে এগিয়ে নিতে পারি না। এছাড়া আমরা কল্পিত বিষয়কে হুবহু পুনঃকল্পনা করতে পারি না, বরং তা কমবেশী পরিবর্তিত হয়ে যায় (অবশ্য সম্ভবতঃ মানুষের শরীরের 'জিন্'- এর মধ্যে তা জেনেটিক কোড্ আকারে হুবহু লিপিবদ্ধ থাকে)। কিন্তু পরম সৃজনক্ষমতা ও ইচ্ছাশক্তির অধিকারী অপরিহার্য সত্তা অবশ্যই এ সব দুর্বলতা ও সীমাবদ্ধতা থেকে প্রমুক্ত।

আমাদের কল্পনারূপ সৃষ্টিকর্ম এবং অপরিহার্য সত্তা কর্তৃক সৃষ্টিকর্মের সূচনা ও তা অব্যাহত রাখার মধ্যে আরেকটি বড় ধরনের পার্থক্য এই যে, আমাদের কল্পনা আমাদের পূর্বাহ্নিক অভিজ্ঞতা দ্বারা প্রভাবিত। আমরা আমাদের ইন্দ্রিয়নিচয় দ্বারা যে অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করেছি, বিচারবুদ্ধির সাহায্যে তাতে পরিবর্তন সাধন করে আমরা কল্পনার জগতে নতুন কিছু সৃষ্টি করি। এমনকি আমাদের কল্পনার যে সব বিষয় বাস্তব জগতে কখনোই ছিলো না তা- ও বাস্তব অভিজ্ঞতা দ্বারা প্রভাবিত। উদাহরণ স্বরূপ: আমরা যে পঙ্খীরাজ ঘোড়া কল্পনা করেছি তাতে দ্রুতগামী ঘোড়ার সাথে পাখীর পাখার সংযোগ সাধন করে স্থলে ও অন্তরীক্ষে দ্রুততম গতিতে চলনক্ষম প্রাণী কল্পনা করেছি। কিন্তু অপরিহার্য সত্তা যখন সৃষ্টির সূচনা করেন তখন তা শূন্য থেকে করেন, অতএব, তা মানবকল্পনার ন্যায় কোনো পূর্ব- অভিজ্ঞতা দ্বারা প্রভাবিত হওয়ার প্রশ্নই ওঠে না। তেমনি পরবর্তী কালে তিনি নতুন নতুন যা কিছুই সৃষ্টি করেন তা প্রথম বারের মতো সৃষ্টি করেন বিধায় তা কোনো কিছু দ্বারা অনুপ্রাণিত হবার ধারণা অবান্তর।

স্রষ্টার বাইরে সৃষ্টির অস্তিত্ব নেই

এখানে প্রসঙ্গতঃ বলে রাখা প্রয়োজন যে, আমরা বাস্তব জগতে যা কিছু সৃষ্টি করি সে ক্ষেত্রে আসলে আমরা সৃষ্টি করি না, সৃষ্টিকর্তার সৃষ্টিতে রূপান্তর ঘটাই মাত্র। আমাদের বাস্তব সৃজনক্ষমতার প্রয়োগের বা সৃষ্টিকর্ম সম্পাদনের স্বরূপ হচ্ছে এই যে, আমরা যা কল্পনা করি তার ভিত্তিতে বাস্তব জগতে বিরাজমান সৃষ্টিতে রূপান্তর ঘটিয়ে তার (কল্পনার) অনুরূপ করি মাত্র। কিন্তু প্রকৃত সৃষ্টি তা-ই যা বিদ্যমান উপাদান ছাড়াই সৃষ্টি করা হয় অর্থাৎ শূন্য থেকে সৃষ্টি করা হয়। অতএব, আমরা যা কল্পনা করি তা-ই আমাদের প্রকৃত সৃষ্টি। এরূপ সৃষ্টি তার অস্তিত্বলাভ, স্থিতি, ধারাবাহিকতা রক্ষা, বিনাশ ও পুনঃপ্রত্যাবর্তনের জন্য তার স্রষ্টার (কল্পনাকারীর) ওপর নির্ভরশীল। স্রষ্টার অস্তিত্বের বাইরে তার স্বাধীন অস্তিত্ব অকল্পনীয়।

এ থেকে আমরা এ উপসংহারে উপনীত হতে পারি যে, সৃষ্টিমাত্রই তার অস্তিত্বলাভ, স্থিতি, ধারাবাহিকতা রক্ষা, বিনাশ ও পুনঃপ্রত্যাবর্তনের জন্য স্বীয় স্রষ্টার ওপর নির্ভরশীল। স্রষ্টার অস্তিত্বের বাইরে তার কোনো অস্তিত্ব নেই, যদিও সে স্রষ্টার অংশ নয়। পরম স্রষ্টা অপরিহার্য সত্তার সাথে তাঁর সৃষ্ট সৃষ্টিলোকের সম্পর্কও এ ধরনেরই।

পরম স্রষ্টার সৃষ্টিবৈচিত্র্য

যে স্রষ্টা সীমাহীন জ্ঞান, ইচ্ছাশক্তি ও সৃজনক্ষমতার অধিকারী সে পরম স্রষ্টার সৃষ্টি শুধু সংখ্যাগত দিক থেকে নয়, বরং গুণগত ও মাত্রাগত দিক থেকেও এতো বেশী ও এতো বৈচিত্র্যপূর্ণ হওয়াই স্বাভাবিক যা আমাদের সীমিত কল্পনাশক্তি দ্বারা কল্পনা করাও সম্ভব নয়।

ইতিপূর্বে আমরা অস্তিত্বের দার্শনিক বিভাজনের কথা উল্লেখ করেছি এবং সে ক্ষেত্রে প্রচলিত দার্শনিক বিভাজন থেকে কিছুটা (কিন্তু অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ) ভিন্নমত পোষণ করে এভাবে বিভাজন করেছি: অস্তিত্ব দু'রকম: অপরিহার্য ও সম্ভব; সম্ভব অস্তিত্ব হয় অবস্তুগত, নয়তো প্রায় বস্তুগত, নয়তো বস্তুগত। এখানে আরো অনেক বিভাগ চিন্তা করা যায়। যেমন: বস্তুগত সৃষ্টি

দু'রকমের: জড় ও প্রাণশীল। প্রাণশীল সৃষ্টি দু'রকম: বদ্ধ ও মুক্ত। উদ্ভিদ হচ্ছে বদ্ধ এবং অন্যান্য প্রাণশীল সৃষ্টি মুক্ত। মুক্ত প্রাণশীল সৃষ্টি হয় স্বাধীন বিচরণক্ষমতাহীন (যেমন: লোহিত কণিকা, শ্বেত কণিকা ও রোগজীবাণু), নয়তো স্বাধীন বিচরণক্ষমতা সম্পন্ন। শেষোক্ত গোষ্ঠী হয় পুরোপুরি সহজাত প্রবৃত্তি চালিত (যেমন: মশা-মাছি), নয়তো বুদ্ধিমান। বুদ্ধিমান প্রাণী হয় বিচারবুদ্ধি ও কল্পনাশক্তির অধিকারী (মানুষ), নয়তো এ ক্ষমতার অধিকারী নয়।

অবস্তুগত ও প্রায় বস্তুগত সৃষ্টির মধ্যেও নিঃসন্দেহে বহুবিধ বিভাজন সম্ভব - যে সম্পর্কে আমাদের ধারণা খুবই সীমিত। এরূপ সৃষ্টি ব্যক্তিসত্তাসম্পন্ন ও ব্যক্তিসত্তাবিহীন হতে পারে। আবার জ্যামিতিক সত্যগুলো অর্থাৎ দ্বিমাত্রিক, একমাত্রিক ও শূন্যমাত্রিক অস্তিত্ব, গাণিতিক সংখ্যা, তরঙ্গ, চৌম্বক ক্ষেত্র, মানবমস্তিষ্কের কল্পিত সৃষ্টি, সুর, সৌন্দর্য ইত্যাদি অবস্তুগত সত্যকে কোন্ পর্যায়ে ফেলা যায় সে সম্পর্কে সিদ্ধান্ত গ্রহণ অত্যন্ত দুরূহ ব্যাপার।

এ তো গেলো এমন সৃষ্টির কথা যা কম বেশী আমাদের বিচারবুদ্ধির ধারণক্ষমতার -আওতাভুক্ত। এর বাইরে আরো বিভিন্ন মাত্রার (Dimension) কতো রকম সৃষ্টি রয়েছে তা আমাদের পক্ষে চিন্তা করাও সম্ভব নয়।

বন্দিত্ব নাকি স্বাধীনতা?

পরম স্রষ্টা যেমন বস্তুগত, অবস্তুগত, প্রায় বস্তুগত ও প্রাণশীল সৃষ্টিনিচয় সৃষ্টি করেছেন, তেমনি সৃষ্টি করেছেন প্রাকৃতিক বিধিবিধান। তিনি মাধ্যাকর্ষণ ও মহাকর্ষণ শক্তি এবং মৌলিক ও যৌগিক সৃষ্টিসমূহের জন্য সুনির্দিষ্ট গঠন-ফর্মুলা নির্ধারণ করে দিয়েছেন। এভাবে তিনি তাঁর সৃষ্টিজগৎকে সুনিয়ি ত ও সুশৃঙ্খল করেছেন। এছাড়া তিনি প্রাণশীল সৃষ্টির জন্য সহজাত প্রবণতা সৃষ্টি করেছেন এবং কতক সৃষ্টিকে বুদ্ধিমত্তা দিয়েছেন ও জ্ঞানার্জনের যোগ্যতা দিয়েছেন। তিনি কতক প্রাণশীল সৃষ্টিকে বিচরণের স্বাধীনতা ও ইচ্ছাশক্তি দিয়েছেন এবং মানুষকে দিয়েছেন সর্বোচ্চ স্বাধীনতা, এমনকি প্রাকৃতিক বিধান ও সহজাত প্রবণতার বিরোধিতা বা তার বিরুদ্ধে

বিদ্রোহ করার স্বাধীনতা। ফলে প্রাকৃতিক বিধিবিধান ও সহজাত প্রবণতা দ্বারা অন্যান্য প্রাণীর স্বাধীনতা যতোখানি নিয়ন্ত্রিত হচ্ছে, মানুষের স্বাধীনতা ততোখানি নিয়ন্ত্রিত হচ্ছে না।

কিন্তু মানুষের স্বাধীনতার স্বরূপ নিয়ে অনেকে বিতর্কে লিপ্ত হয়েছেন। কেউ কেউ মানুষকে নিরঙ্কুশ স্বাধীন বলে দাবী করেছেন, কেউ কেউ তাকে স্রষ্টার ইচ্ছার ক্রীড়নক গণ্য করেছেন এবং তার স্বাধীনতাকে পুরোপুরি অস্বীকার করেছেন। একদল বলছেন, আমরা যখন প্রাকৃতিক বিধিবিধানের সীমাবদ্ধতা ব্যতিরেকে মানবিক ক্ষেত্রে বাধ্যবাধকতা অনুভব করি না, বরং স্বাধীনতা অনুভব করি, তখন আমরা পুরোপুরি স্বাধীন। অপর দল বলছেন, সৃষ্টিপ্রকৃতির নিখুঁত শৃঙ্খলার মধ্যে স্বাধীনতার অবকাশ থাকতে পারে না। বরং আমরা রেকর্ডকৃত কার্টুন-চলচ্চিত্র প্রদর্শনের ন্যায় পূর্বসম্পাদিত ভূমিকার পর্দায় নিক্ষিপ্ত দৃশ্যসম বৈ নই; আগামীতে আমি কোন্ ভূমিকায় আবির্ভূত হবো তা না জানলেও এতে সন্দেহ নেই যে, পূর্বে নির্ধারিত করে রাখা দৃশ্যে ও ভূমিকায়ই আবির্ভূত হবো। তাঁরা আরো বলেন যে, ভবিষ্যৎদ্রষ্টা সৃষ্টিকর্তা তো জানেনই ভবিষ্যতে আমার ভূমিকা কী হবে, অতএব, আমার পক্ষে তার অন্যথা করা সম্ভব নয়।

এ দুই মতের ধারকরা দুই প্রান্তিকতায় পৌঁছে গেছেন; একদেশদর্শিতার কারণে তাঁরা ভারসাম্য হারিয়ে ফেলেছেন।

বাস্তবে আমরা কী অনুভব করি? আমরা একদিকে যেমন স্বাধীনতা অনুভব করি, অন্যদিকে সীমাবদ্ধতাও অনুভব করি; স্বাধীনতা ও সীমাবদ্ধতা কোনোটিই নিরঙ্কুশভাবে অনুভব করি না।

বিশেষ করে যারা স্বাধীনতার ধারণা প্রত্যাখ্যান করেছেন তাঁরা এমন দাবীও করে থাকেন যে, আমরা যে স্বাধীনতা অনুভব করছি, আসলে আমাদেরকে এরূপ অনুভব করতে বাধ্য করা হচ্ছে। তাঁদের এ ধারণা এ কারণে গ্রহণযোগ্য নয় যে, মানুষের যদি স্বাধীনতা না-ই থাকবে অথচ তাকে স্বাধীনতা অনুভব করতে বাধ্য করা হবে, তাহলে তা হবে এক ধরনের অন্যায় ও প্রতারণা। কিন্তু পরম পূর্ণতার অধিকারী স্রষ্টা তাঁর সৃষ্টির সাথে অন্যায় ও প্রতারণার আশ্রয় নেবেন এরূপ দুর্বলতা থেকে তিনি প্রমুক্ত।

অন্যদিকে স্বাধীনতার অনুভূতি যেমন অকাট্য ও সর্বজনীন, স্বাধীন অনুভব করতে 'বাধ্য করার' অনুভূতি ত প সর্বজনীন নয়। অর্থাৎ যারা মনে করছেন যে, আসলে আমরা স্বাধীন নই, তাঁরাও নিজেদেরকে স্বাধীন অনুভব করছেন, তবে কোনো কোনো যুক্তির ভিত্তিতে স্বীয় অনুভূতির বিপরীতে ধারণা করছেন যে, আমরা যা অনুভব করছি তা ঠিক নয়, বরং আমাদেরকে এরূপ অনুভব করতে বাধ্য করা হয়েছে। এ দাবী হচ্ছে বাস্তব অনুভূতির বিপরীত জ্ঞানগত বিতর্কের দাবী মাত্র এবং তার উৎস হচ্ছে 'ধারণা'। অতএব, এ ধারণা যেমন সর্বজনীন নয়, তেমনি তা অকাট্যও নয়। আর ধারণাজাত বিতর্কিত দাবীর ভিত্তিতে সর্বজনীন অকাট্য অনুভূতির সত্যতায় সন্দেহ পোষণ করা চলে না।

যারা স্বাধীনতার অনুভূতিকে অস্বীকার করেন তাঁদের একটি যুক্তি হচ্ছে এই যে, এটা সৃষ্টিজগতের শৃঙ্খলার জন্য ঝুঁকিপূর্ণ। কিন্তু ঝুকিপূর্ণ হলেও স্বাধীন এক্তিয়ার সম্পন্ন সৃষ্টির অস্তিত্ব তার সৃষ্টিকর্তার সৃষ্টিক্ষমতার ব্যাপকতাই প্রমাণ করে, যার অনুপস্থিতিতে তাঁর সৃষ্টিক্ষমতা অপেক্ষাকৃত সীমিত প্রতিভাত হতো।

মানুষের স্বাধীনতার অনুভূতি অস্বীকারকারীদের আরেকটি যুক্তি হচ্ছে সৃষ্টিকর্তার ভবিষ্যৎ জ্ঞানের যুক্তি। [এ প্রসঙ্গে ইতিপূর্বে বিচারবুদ্ধির দৃষ্টিতে সৃষ্টি ও ব্যবস্থাপনার প্রক্রিয়া শিরোনামে কিছুটা সংক্ষেপে আলোচনা করা হয়েছে।] এর জবাবে বলতে হয় যে, আমরা সৃষ্টিকর্তার ভবিষ্যৎ জ্ঞানের স্বরূপ অবগত নই। অতএব, সে যুক্তিতে আমরা আমাদের অনুভূত স্বাধীনতাকে অস্বীকার করতে পারি না।

আমরা সৃষ্টিকর্তার জ্ঞানের স্বরূপ অনুধাবনে অক্ষম, তবে এর কয়েকটি দিক আমাদের বিচারবুদ্ধির নিকট অকাট্যভাবে প্রতিভাত। যেহেতু সৃষ্টিকর্তার সৃষ্টিকার্যক্রম মানে হচ্ছে তাঁর ইচ্ছার বাস্তবায়ন এবং তিনি যা ইচ্ছা করেন তা সংশ্লিষ্ট স্থান, কাল, পাত্রপাত্রী, অবস্থা, কারণ ও প্রক্রিয়া সহ অনিবার্য হয়ে যায়, সেহেতু তিনি যদি 'সমগ্র ভবিষ্যত'কে একবারে ইচ্ছা করেন তাহলে তা স্বয়ংক্রিয়ভাবে ঘটা অনিবার্য হয়ে যায়। তাহলে অতঃপর আর তাঁর কিছুই করার থাকে না এবং তাঁর অন্য সমস্ত গুণ প্রয়োগ হারিয়ে ফেলে। কারণ, তিনি যা ইচ্ছা করে রেখেছেন তার

বাইরে 'নতুন' কিছুই তিনি করবেন না। কিন্তু বিচারবুদ্ধি সৃষ্টিকর্তার সীমাহীন সৃষ্টিক্ষমতার ও সীমাহীন মাত্রার অন্যান্য গুণের প্রয়োগ হারিয়ে ফেলার ধারণা গ্রহণ করে না। কারণ, তা তাঁর এ সব গুণ ও ক্ষমতার ওপর সীমাবদ্ধতা আরোপ করে। অতএব, সৃষ্টিক্ষমতা সহ তাঁর সকল গুণের অনবরত কার্যকরিতা অনস্বীকার্য বিষয়। এমতাবস্থায় এমন অসংখ্য ক্ষেত্র থাকতে হবে যে বিষয়ে তিনি ইতিবাচক বা নেতিবাচক কোনো ধরনেরই ইচ্ছা করেন নি, যে সব ক্ষেত্র ভবিষ্যতে তাঁর ইচ্ছা করা বা না-করার জন্য উন্মুক্ত থাকবে। এই ক্ষেত্রসমূহেরই একটি হতে পারে সৃষ্টির স্বাধীনতার আওতাভুক্ত ভবিষ্যৎ ক্ষেত্র। অর্থাৎ কতক ক্ষেত্রে সৃষ্টি ভবিষ্যতে কী করবে সে ব্যাপারে স্রষ্টা কোনো কিছু ইচ্ছা করা থেকে বা সেদিকে মনোযোগ (توجه) প্রদান করা থেকে বিরত থাকতে পারেন। কারণ, তিনি সেদিকে মনোযোগ প্রদান করলে তিনি যেভাবে মনোযোগ প্রদান করবেন সেভাবে তা ঘটা অনিবার্য হয়ে যাবে। বলা বাহুল্য যে, সমগ্র ভবিষ্যতের প্রতি মনোযোগ প্রদান করতে সক্ষম হওয়া সত্ত্বেও তিনি এভাবে কতক ক্ষেত্রকে মনোযোগের বাইরে রাখতে এবং সৃষ্টির জন্য স্বাধীনতার একটি ক্ষেত্র নিশ্চিত করতে পুরোপুরি সক্ষম।

দ্বিতীয়তঃ সৃষ্টিকর্তা যেমন কতক বিষয় সরাসরি বা কারণ ও ফলশ্রুতি বিধির দ্বারা স্থির করে দিয়েছেন তেমনি কতক বিষয় স্থির করে না দিয়ে শর্তাধীন করে দিতে পারেন, যেমন: অমুক ব্যক্তি এ কাজ করলে ফল এই হবে এবং তা না করলে বা তার পরিবর্তে অমুক কাজ করলে ফল ঐ রকম হবে। অতঃপর ব্যক্তি স্বাধীন ইচ্ছা দ্বারা যা করবে তার ফলটি অকাট্য হয়ে যাবে এবং তার বিকল্প সম্ভাবনাটি বিলুপ্ত হয়ে যাবে। কারণ, সম্ভব অস্তিত্ব (সৃষ্টি ও কাজ উভয়ই) অস্তিত্বলাভ করার ক্ষেত্রে নিয়ম হচ্ছে এই যে, তা অস্তিত্বলাভের পূর্ণ কারণ ঘটলে তার অস্তিত্বলাভ অনিবার্য হয়ে যায় এবং পূর্ণ কারণ না ঘটা পর্যন্ত তার অস্তিত্বলাভ অসম্ভব থাকে। এরূপ 'শর্তাধীন' স্থিরকরণ সৃষ্টিকর্তার সৃজনক্ষমতার বৈচিত্র্যেরই পরিচায়ক।

তৃতীয়তঃ ক্ষেত্রবিশেষে স্বাধীন সৃষ্টির অতীত কার্যকলাপ ও প্রাকৃতিক বিধিবিধানের দ্বারা তার ভবিষ্যৎ এমনভাবেও নির্ধারিত হয়ে যেতে পারে যে, সে ক্ষেত্রে দ্বৈত সম্ভাবনার সুযোগ না-ও থাকতে পারে। অর্থাৎ সৃষ্টি আগে যে স্বাধীনতার অধিকারী ছিলো তা বিলুপ্ত বা সঙ্কুচিত হয়ে যেতে

পারে। এরূপ ক্ষেত্রে স্রষ্টা নিশ্চিত জানেন যে, ঐ ব্যক্তি এ কাজ করবে ও তার ফল এরূপ হবে; এর অন্যথা হবে না। কিন্তু স্রষ্টার এ ভবিষ্যৎজ্ঞানের কারণে এ কথা বলা চলে না যে, স্রষ্টা তাকে এ কাজে বাধ্য করেছেন। একজন শিক্ষক যদি একজন ছাত্র সম্পর্কে নিশ্চিত জানেন যে, সে পরীক্ষায় অকৃতকার্য হবে, তো এ কারণে বলা চলে না যে, শিক্ষকের ঐ ছাত্র সংক্রান্ত ভবিষ্যৎজ্ঞানের কারণেই এ ছাত্রটি অকৃতকার্য হয়েছে।

অবশ্য আগেও যেমন বলা হয়েছে, মানুষের এ স্বাধীনতা নিরঙ্কুশ নয়। প্রাকৃতিক বিধিবিধানের কথা বাদ দিলেও পারিবারিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও মানব- জাত অন্যান্য কার্যকারণ তার এ স্বাধীনতাকে সীমিত করে ফেলে, কিন্তু তার স্বাধীনতাকে পুরোপুরি হরণ করতে পারে না। শেষ পর্যন্ত তার জন্য স্বাধীনতার ক্ষেত্র কমবেশী থেকেই যায়। এমনকি মানুষ যখন অনন্যোপায় হয়ে আত্মহত্যা করে তখনো কার্যতঃ সে তার স্বাধীন এখ্‌তিয়ারকেই কাজে লাগায়।

এখন প্রশ্ন হচ্ছে, মানুষের স্বাধীনতার নিয় ণ কি কেবল প্রাকৃতিক ও মানব- জাত কার্যকারণের ওপর ছেড়ে দেয়া হয়েছে? এখানে পরম জ্ঞানী স্রষ্টার কি করণীয় কিছু নেই? অন্য কথায়, তিনি কি সৃষ্টির কার্যক্রমে আদৌ হস্তক্ষেপ করবেন না? বিচারবুদ্ধি এ ব্যাপারে কী বলে?

বস্তুতঃ স্বাধীনতা হচ্ছে পরম পূর্ণতার অধিকারী অপরিহার্য সত্তার বৈশিষ্ট্য। সেই স্বাধীনতা তিনি তাঁর সসীম অপূর্ণ সৃষ্টি মানুষকে প্রদান করেছেন। যদিও এ স্বাধীনতা ব্যবহারের জন্য মানুষকে বিচারবুদ্ধি দেয়া হয়েছে, তথাপি দুর্বল ও অপূর্ণ হবার কারণেই এ স্বাধীনতা ব্যবহার করতে গিয়ে তার ভুল হবার আশঙ্কা থেকেই যায়। তাই বিচারবুদ্ধির দাবী হচ্ছে, ক্ষেত্রবিশেষে, বিশেষ করে সমগ্র সৃষ্টিলোক বা মানবপ্রজাতির স্বার্থে অপরিহার্য হলে, তেমনি মানুষ তাঁর কাছে সাহায্য চাইলে ও তাঁর বিবেচনায় সে সাহায্য পাওয়ার উপযুক্ত হলে তিনি সৃষ্টির স্বাধীন কর্মক্ষেত্রে হস্তক্ষেপ করবেন। (তবে এটা করা তাঁর জন্য অপরিহার্য গণ্য করা যায় না এবং সর্বাবস্থায়ই তিনি হস্তক্ষেপ বা সাহায্য করবেন এটাও ভাবা যায় না। কারণ, তাহলে সৃষ্টির স্বাধীনতা অর্থহীন হয়ে যাবে।)

বিষয়টি কয়েকটি উপমার সাহায্যে সহজে বুঝা যেতে পারে।

প্রথম উপমা: একজন পিতা তাঁর শিশু সন্তানকে খেলার জন্য একটি বল দিলেন, সাথে সাথে তিনি তাকে নদীর কিনারে গিয়ে খেলতে নিষেধ করলেন। কিন্তু শিশুটি নদীর কিনারে গিয়ে খেলতে লাগলো। কারণ, তার পিতা তাকে নদীর কিনারে গিয়ে খেলতে নিষেধ করলেও তার সেখানে যাওয়া ও খেলার পথ রুদ্ধ করেন নি; ধরুন, পিতা তাকে শিকল দিয়ে বেঁধে রাখতে পারতেন, কিন্তু তিনি তা করেন নি। এমতাবস্থায় খেলার সময় শিশুটির বলটি ছিটকে নদীতে পড়ে গেলো। এখন পিতা কী করবেন? এ অবস্থায় শিশুটি পিতাকে বলটি তুলে দিতে বলতে পারে, বা না- ও বলতে পারে। উভয় অবস্থায়ই পিতা চাইলে বলটি তুলে দিতে পারেন, বা তা তুলে আনার আগেই অনেক দূরে চলে যাওয়ায় তিনি তাকে আরেকটি নতুন বল কিনে দিতে পারেন ও আগেকার ঘটনার পুনরাবৃত্তির ব্যাপারে কঠোরভাবে সতর্ক করে দিতে পারেন। অবশ্য তিনি চাইলে কোনো কারণে বলটি তুলে দেয়ার চেষ্টা না- ও করতে পারেন বা নতুন বল কিনে দেয়া থেকেও বিরত থাকতে পারেন। তবে সাধারণতঃ তিনি প্রথম বারের ক্ষেত্রে বা শিশুর বয়স ও আরো কিছু বিষয় বিবেচনা করে বলটি তুলে দেন বা নতুন একটি বল কিনে দেন।

অথবা ধরুন, একটি বাড়ীর চতুর্দিকে পানিভর্তি গভীর খাদ; পিতা শিশুকে খাদে নামতে, এমনকি তার কাছে যেতেও নিষেধ করলেন, বললেন: ‘খাদে নামলে বা তাতে পড়ে গেলে ডুবে মরবে।’ কিন্তু শিশু শিশু হওয়ার কারণেই পিতার কথার গুরুত্ব বুঝলো না এবং খেলতে খেলতে খাদের কিনারে গিয়ে অসাবধানতাবশতঃ বা পা পিছলে তাতে পড়ে গেলো অথবা কৌতুহলবশে তাতে নেমে গেলো এবং ফলে সে পানিতে ডুবে গেলো। এ অবস্থায় পিতা খাদে নেমে তাকে তুলে আনলেন, ফলে সে বেঁচে গেলো, কিন্তু নাকে, কানে ও পেটে দুর্গন্ধযুক্ত পচা পানি ঢুকে যাওয়ায় সে শুধু তাৎক্ষণিক কষ্ট আর ভোগান্তির শিকারই হলো না, বরং অসুস্থ হয়ে পড়লো।

আবার এমনও হতে পারে যে, খাদটি এতোই গভীর ছিলো যে, তার তলদেশ থেকে তুলে আনতে আনতে সে মারা গেলো। হতে পারে যে, খাদটি খুব বেশী গভীর না হলেও খাদের পানি খুব বেশী দূষিত থাকায় ঐ বিষাক্ত পানি পেটে যাবার কারণেই সে মারা গেলো অথবা মারা না গেলেও সে কঠিন রোগে আক্রান্ত হলো এবং তার জীবনীশক্তি হ্রাস পেলো।

ক্ষেত্রবিশেষে খাদের মধ্যে কাঁটা বা ভাঙ্গা কাঁচ থাকতে পারে যার ফলে সে মারাত্মকভাবে আহত হতে পারে এবং বেঁচে গেলেও বিকলাঙ্গ হয়ে যেতে পারে। অবশ্য সে কষ্ট ও ভোগান্তির শিকার বা অসুস্থ বা বিকলাঙ্গ হওয়ায় অথবা মারা যাওয়ায় এ ঘটনাটা অন্য শিশুদের জন্য শিক্ষণীয় হলো।

আবার এমনও হতে পারে যে, শিশুটি এক পা খাদে ফেলতে উদ্যত হওয়ার সাথে সাথেই, অথবা এমনকি খাদের কিনারে যেতেই বাবা তাকে ধরে ফেললো ও সেখান থেকে দূরে সরিয়ে আনলো এবং এভাবে ধরে নিয়ে আসার কাজটা প্রহারসমেতও হতে পারে যাতে সে ভবিষ্যতে এ কাজের পুনরাবৃত্তি করা থেকে বিরত থাকে।

অথবা মনে করুন, কোনো জাহাযের সারেং যাত্রীদেরকে ডেকের কিনারে যেতে নিষেধ করলেন এবং বলে দিলেন যে, পানিতে হাঙ্গর ও কুমীর আছে। কিন্তু কতক যাত্রী তাঁর কথা শুনলো না। তারা ডেকের কিনারে গিয়ে দাঁড়ালো এবং তাদের মধ্য থেকে কেউ কেউ পানিতে পড়ে গেলো, আর ডুবুরী নেমে উদ্ধার করার আগেই তাদেরকে কুমীর এসে টেনে নিয়ে গেলো বা হাঙ্গর এসে ছিন্নভিন্ন করে ফেললো।

অথবা সাঁতার জানা এক ব্যক্তি প্রয়োজনের তাগিদে সাঁতরে নদী পাড়ি দিলো, কিন্তু কিনার থেকে পাঁচ, সাত বা দশ হাত দূরে পৌঁছতেই সাঁতরাবার শক্তি হারিয়ে ফেললো। তখন সে সাহায্য চাইতে বা না চাইতেই কিনারে থাকা লোকদের মধ্য থেকে কেউ নদীতে ঝাঁপিয়ে পড়ে তাকে তীরে তুলে আনলো। কিন্তু অপর এক ব্যক্তি ভালো সাঁতার না জানা সত্ত্বেও অন্যদের নিষেধ উপেক্ষা করে অহঙ্কার অথবা বোকামি বশতঃ এক মাইল প্রশস্ত নদী পাড়ি দিতে গিয়ে সিকি বা অর্ধ বা পৌনে এক মাইল পৌঁছার পর সাঁতরাবার শক্তি হারিয়ে ফেললো এবং লোকদের কাছে সাহায্য চাইলো, কিন্তু কেউ তাকে সাহায্য করতে গেলো না, কারণ, সে অন্যদের সদুপদেশ না শুনে নিজের জন্য বিপদ ডেকে এনেছে। তাই কেউ তাকে সাহায্যের হক্বদার মনে করে নি, অথবা সাহায্য পৌঁছার আগেই তার মারা যাওয়া নিশ্চিত জেনে তাকে উদ্ধারের চেষ্টা অর্থহীন মনে করে তারা তাকে উদ্ধারের চেষ্টা থেকে বিরত থাকলো। অবশ্য ক্ষেত্রবিশেষে তার কাছাকাছি কোনো নৌকা বা স্পীড- বোট থাকলে তিরস্কার করেও তাকে দয়া দেখাতে পারে। তেমনি সে যদি

নদীর তীরের খুবই কাছাকাছি এসে যায়, ধরুন বিশ গজের মধ্যে এসে যায়, সে ক্ষেত্রে তার হঠকারিতা বা বোকামির জন্য তিরস্কার করলেও কেউ দয়া করে তাকে তীরে তুলে আনতে পারে। অবশ্য মানুষের আচরণে আমরা দেখতে পাই যে, অন্যদের পক্ষ থেকে উচ্চারিত সতর্কবাণী ও কৃত কল্যাণকামনা উপেক্ষা করে অথবা নির্বুদ্ধিতাবশতঃ যারা নিজেদেরকে বিপদে নিক্ষেপ করে তাদের সকলের ক্ষেত্রে বা একই ব্যক্তির ক্ষেত্রে প্রতি বারই কেউ সাহায্যের জন্য এগিয়ে আসে না। কারণ, সে ক্ষেত্রে সতর্কবাণী ও কল্যাণকামনা উপেক্ষা করে নিজেকে বিপদে নিক্ষেপ করতে কেউই দ্বিধা করতো না এবং এর ফলে সতর্কবাণী ও কল্যাণকামনা অর্থহীন হয়ে যেতো। অবশ্য সাহায্য চেয়ে ফরিয়াদ করলে সাহায্য লাভের সম্ভাবনা বেশী থাকে, তবে তা- ও নিশ্চিত নয়।

মোদ্দা কথা, সৃষ্টিকর্তা তাঁর এ দুর্বল সৃষ্টিকে স্বাধীনতা দেয়ার পর নিরঙ্কুশভাবে তার নিজের ওপর ছেড়ে দেবেন এবং তার প্রতি দৃষ্টি রাখবেন না ও তার কাজে ইতিবাচক হস্তক্ষেপ করবেন না - বিচারবুদ্ধি এটা মানতে পারে না। বিশেষ করে মানবপ্রকৃতি তার নিয় ণবহির্ভূত কঠিন সঙ্কটময় মুহূর্তে অন্তরের অন্তঃস্থল থেকে সৃষ্টিকর্তার নিকট আশ্রয় ও সাহায্য কামনা করে। এমতাবস্থায় তার প্রত্যাশা ও প্রার্থনা যদি অন্যায়, অযৌক্তিক বা অবাস্তব না হয় তাহলে সৃষ্টিকর্তা তাকে সাহায্য করবেন এটাই স্বাভাবিক। তাই বলে সর্বাবস্থায়ই তিনি তাকে সাহায্য করবেন বা তার এক্তিয়ারাধীন কাজে হস্তক্ষেপ করবেনই এমনটি মনে করাও ঠিক হবে না। কারণ, তিনি সাহায্য বা হস্তক্ষেপ করতে বাধ্য নন। তিনি যদি সাহায্য বা হস্তক্ষেপ করেন, তো সেটা সৃষ্টির অধিকার নয়, বরং তাঁর অনুগ্রহ।

অন্যদিকে কোনো মানুষের বা কোনো মানবগোষ্ঠীর স্বাধীনতার অপব্যবহারমূলক নেতিবাচক পদক্ষেপের উদ্যোগ যদি সমগ্র সৃষ্টিলোক বা পৃথিবী বা মানবপ্রজাতির জন্য এমনই ধ্বংসাত্মক হয় যার ফলে সৃষ্টির লক্ষ্য ব্যর্থ হয়ে যাবার আশঙ্কা থাকে, সে ক্ষেত্রে বিচারবুদ্ধির দাবী এটাই যে, সৃষ্টিকর্তা সেখানে হস্তক্ষেপ করবেন এবং ধ্বংসকামী ঐ ব্যক্তি বা গোষ্ঠীর নেতিবাচক উদ্যোগকে বানচাল করে দেবেন।

এ প্রসঙ্গে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, যেহেতু সৃষ্টিকর্তা ইতিবাচক, সেহেতু সৃষ্টির কাজে তাঁর হস্তক্ষেপও সর্বাবস্থায়ই ইতিবাচক হবে, কখনোই নেতিবাচক হবে না - এটাই বিচারবুদ্ধির দাবী। অবশ্য ক্ষেত্রবিশেষে সৃষ্টিকর্তার কোনো কোনো হস্তক্ষেপ আপতঃদৃষ্টিতে নেতিবাচক বলে মনে হতে পারে, কিন্তু পিতা কর্তৃক তার দুষ্ট শিশুকে প্রহার করার ন্যায় অথবা চিকিৎসক কর্তৃক কারো শরীরের পচনধরা অঙ্গ কেটে ফেলার ন্যায় উদ্দেশ্য ও পরিণামফলের বিচারে তাঁর সে 'দৃশ্যতঃ নেতিবাচক' হস্তক্ষেপ অবশ্যই ইতিবাচক।

মানুষের জন্য সৃষ্টিকর্তার পথনির্দেশ

সৃষ্টিকর্তা বস্তুদেহধারী প্রাণী প্রজাতিসমূহের মধ্যে এক ধরনের সহজাত জ্ঞান প্রদান করেছেন যা তাদেরকে স্বীয় স্বাধীনতাকে সুনিয়ি ত করার ও তা থেকে সর্বোচ্চ কল্যাণ হাসিলের কাজে সাহায্য করে। অবশ্য ক্ষেত্রবিশেষে এক প্রাণীর কল্যাণ অন্য কোনো প্রাণীর জন্য ক্ষতির কারণ রূপে দেখা দিতে পারে। কারণ ও ফলশ্রুতি বিধির জগতে এটাই স্বাভাবিক। কিন্তু আমরা বিচারবুদ্ধির দ্বারা দেখতে পাই যে, প্রতিটি প্রাণীপ্রজাতির মধ্যে নিহিত সহজাত জ্ঞান ও প্রবণতা তার নিজের জন্য অবশ্যই কল্যাণকর।

এখানে একটা উদাহরণ দেয়া যেতে পারে: একটি খরগোশের শরীর এমনভাবে তৈরী করা হয়েছে যে, তার জন্য খাদ্য হিসেবে ঘাস ও তরিতরকারী উপযোগী, মাছ- মাংস উপযোগী নয়। তাই খরগোশের মাঝে ঘাস ও তরিতরকারী খাওয়ার আগ্রহ সৃষ্টি হয়, মাছ- মাংস খাওয়ার আগ্রহ সৃষ্টি হয় না। তাই খাওয়ার জন্য ঘাস ও তরিতরকারী পাওয়া না গেলেও এবং ঐ অবস্থায় ছোট ছোট পাখী তার সামনে চরে বেড়ালেও সে পাখী খাওয়ার আগ্রহ অনুভব করে না। অন্যদিকে একটি নেকড়ের শরীর এমনভাবে তৈরী হয়েছে যে, তার জন্য খাদ্য হিসেবে মাংস উপযোগী। তাই সে খরগোশ বা খেক শিয়াল বা এরূপ অন্য কোনো দুর্বল প্রাণীকে হত্যা করে ভক্ষণ করে। এভাবে দেখা যায় যে, প্রাণীকুলের সহজাত প্রবণতা তার অস্তিত্বরক্ষা ও বিকাশের জন্য অপরিহার্য, যদিও কারো অস্তিত্বরক্ষার সহজাত প্রবণতা অন্য কারো জন্য বিনাশের কারণ হয়ে দেখা দিতে পারে।

অস্তিত্বরক্ষা ও বিকাশ- বিস্তারের জন্য প্রয়োজনীয় ক্ষুধা- তৃষ্ণা, যৌন কামনা ও এ ধরনের অন্যান্য সহজাত প্রবণতা মানুষের মধ্যেও রয়েছে। সৃষ্টিপ্রকৃতিতে নিহিত এ ধরনের সহজাত প্রবণতা যে সৃষ্টিকর্তার পক্ষ থেকেই প্রদত্ত এ ব্যাপারে সন্দেহের অবকাশ নেই। আমরা দেখতে পাই, সৃষ্টির মধ্যে এসব প্রবণতা যেমন নিহিত রয়েছে তেমনি তা পূরণের ব্যবস্থাও সৃষ্টিজগতে

রাখা হয়েছে। প্রাণীকুলের মধ্যে এমন কোনো সহজাত প্রয়োজন দেখা যায় না যা পূরণের ব্যবস্থা প্রকৃতিতে নিহিত রাখা হয় নি।

কিন্তু মানুষের মধ্যে আরো এক ধরনের সহজাত জ্ঞান রয়েছে। তা হচ্ছে ভালো- মন্দ, উচিত- অনুচিত ও কর্তব্য- অকর্তব্য সংক্রান্ত ধারণা। স্থান- কাল, জাতি- ধর্ম- বর্ণ- গোত্র ও শিক্ষিত- অশিক্ষিত নির্বিশেষে সুস্থ বিচারবুদ্ধিসম্পন্ন মানুষের নিকট কতগুলো কাজ ভালো ও কতগুলো কাজ মন্দ বলে পরিগণিত। যেমন: সত্য কথা বলা, পরোপকার করা, পিতামাতা ও বড়দের প্রতি সম্মান প্রদর্শন, ছোটদের প্রতি স্নেহ প্রদর্শন ইত্যাদি কতক কাজ অস্তিক- নাস্তিক নির্বিশেষে সকলের নিকটই ভালো বলে পরিগণিত হয় এবং মিথ্যাচার, চুরি, ধোঁকা- প্রতারণা, নিরীহ মানুষকে হত্যা করা, দুর্বলদের ওপর যুলুম করা, বিশ্বাসঘাতকতা ইত্যাদি কতক কাজ সকলের নিকটই খারাপ, ঘৃণ্য ও পরিত্যাজ্য বলে পরিগণিত।

এমনকি যারা ভালো কাজগুলো সম্পাদন করে না তারাও সে সব কাজের ভালো হওয়ার কথা স্বীকার করে। তেমনি যে ব্যক্তি কোনো মন্দ কাজ সম্পাদন করে সে তার কাজের সপক্ষে কোনো না কোনো যুক্তি দাঁড় করালেও মূলতঃ কাজটি যে মন্দ তা সে স্বীকার করে। উদাহরণস্বরূপ, যে সেনাপতি স্বয়ং আনুগত্য- শপথ ভঙ্গ করে তথা বিশ্বাসঘাতকতা করে রাজা বা সরকারের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে ক্ষমতা দখল করেছে বা দখল করার চেষ্টা করছে সে- ও তার প্রতি আনুগত্য প্রকাশ করে শপথ গ্রহণকারী তার কোনো অনুগত সৈনিক শপথ ভঙ্গ করলে বা তার সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করলে তাকে ক্ষমার অযোগ্য অপরাধ বলে গণ্য করে। একইভাবে চোর বা ডাকাতের দলের কোনো সদস্য চুরি বা ডাকাতি করে আনা মাল থেকে চুপে চুপে কিছু সরিয়ে ফেললে তথা চুরি করলে বা সহযোগীর কাছ থেকে কোনো কিছু ছিনিয়ে নিলে সে কাজকে ঘৃণা করে ও অপরাধ বলে গণ্য করে।

যেহেতু ন্যায়- অন্যায় ও ভালো- মন্দের এ অনুভূতি কোনোরূপ শিক্ষার ওপর নির্ভরশীল নয়, সেহেতু তা যে সহজাত অর্থাৎ সৃষ্টিকর্তা মানুষের সৃষ্টিপ্রকৃতিতে এ পথনির্দেশ নিহিত রেখেছেন তাতে কোনোরূপ সন্দেহের অবকাশ নেই।

এ তো গেলো সর্বজনীন পথনির্দেশের কথা। এমনকি মানুষ ব্যক্তিগতভাবেও পথনির্দেশ লাভ করে থাকে। অনেক সময় মানুষ কোনো কাজ করা- নাকরার ফলাফল সম্বন্ধে নিশ্চিত হতে পারে না। কারণ ও ফলশ্রুতি বিধির আওতাধীন এ জগতে অনেক সময় সে সঠিক সিদ্ধান্তে উপনীত হতে পারে না যে, কাজটি তার জন্য কল্যাণ বয়ে আনবে, নাকি অকল্যাণ। এরূপ অবস্থায় অনেক ক্ষেত্রে এমনও হতে দেখা যায় যে, সে যখন অনেক চিন্তা- ভাবনা ও বিচার- বিশ্লেষণ করেও কোনো উপসংহারে পৌঁছতে না পেরে ক্লান্ত- শ্রান্ত ও হতাশ হয়ে পড়েছে তখন সহসাই, দৃশ্যতঃ কোনোরূপ কারণ ছাড়াই, তার মন দৃঢ়তা সহকারে কোনো একদিকে ঝুঁকে পড়ে এবং কোনোরূপ দ্বিধাদ্বন্দ্ব ছাড়াই কাজটির শুভ বা অশুভ পরিণতি সম্বন্ধে তার অন্তরে প্রত্যয় সৃষ্টি হয়ে যায়। অতঃপর সে কাজটি সম্পাদন করে সত্যিই সুফল লাভ করে, অথবা সে তার অন্তরে জাগ্রত এ অবস্থার ভিত্তিতে যে কাজটি পরিত্যাগ করেছে সেই একই কাজ অন্য কেউ করে এমনভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে যা থেকে সুস্পষ্ট যে, সে এ কাজটি করলে সে- ও অনুরূপভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হতো। এ থেকে প্রমাণিত হয় যে, কাজটি করা না- করা সম্বন্ধে সৃষ্টিকর্তাই তাকে পথনির্দেশ দিয়েছিলেন। এভাবে মানুষ সামান্য চিন্তা করলেই বুঝতে পারে যে, সে শুধু তার সৃষ্টি ও অস্তিত্বরক্ষার জন্যই সৃষ্টিকর্তার মুখাপেক্ষী নয়, বরং মানুষ হিসেবে তার যে স্বাধীন চিন্তা ও কর্মের ক্ষেত্র রয়েছে সেখানেও সে সৃষ্টিকর্তার পথনির্দেশের আওতাধীন। অর্থাৎ সব সময় ও সর্বাবস্থায়ই তার ও সৃষ্টিকর্তার মধ্যে একটি ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক রয়েছে।

বিচারবুদ্ধির দৃষ্টিতে মৃত্যুপারের জীবন

মানুষের সামনে বিরাজমান একটি বড় ধরনের জীবনজিজ্ঞাসা হচ্ছে এই যে, মৃত্যুতেই কি প্রাণশীল সৃষ্টির জীবনের সমাপ্তি, নাকি মৃত্যুর পরেও কোনো ধরনের জীবনের অস্তিত্ব রয়েছে?
এ হচ্ছে এমন একটি অতি গুরুত্বপূর্ণ জিজ্ঞাসা যার অভ্রান্ত জবাব না পাওয়া পর্যন্ত কোনো সুস্থ বিচারবুদ্ধি সম্পন্ন মানুষ শান্ত হয়ে বসে থাকতে পারে না।

মানুষ হচ্ছে জ্ঞানপিপাসু সৃষ্টি। তাই কোনো প্রশ্নের জবাব উদঘাটন না করে প্রশ্নটিকে পাশে সরিয়ে রেখে নিশ্চিন্ত থাকা তার পক্ষে সম্ভব নয়। কিন্তু প্রশ্নটি যদি নেহায়েত জ্ঞানগত অর্থাৎ তথ্য সংক্রান্ত না হয়ে তার নিজের ভালো- মন্দের সাথে জড়িত হয় তাহলে তার জবাব খুঁজে পাওয়া তার জন্য একান্তই অপরিহার্য হয়ে ওঠে।

মৃত্যুর পরে কোনো জীবন থাকা- নাথাকার ওপর মানুষের জীবনের কর্মনীতি বহুলাংশে নির্ভর করে। বিশেষ করে সে জীবনপথে চলতে গিয়ে এমন অনেক পরিস্থিতির মুখোমুখি হয় যখন তার শরীরের চাহিদা ও বিচারবুদ্ধির রায় পরস্পর বিপরীত দিকে ধাবিত হয়। সে যখন অত্যন্ত ক্ষুধার্ত অবস্থায় অন্যের মালিকানাধীন প্রহরাবিহীন ফল- বাগানের পাশ দিয়ে অতিক্রম করে তখন পাকা ফল দেখে তার ক্ষুন্নিবৃত্তির খুবই ইচ্ছা হয়। কিন্তু তার বিচারবুদ্ধি বলে, চুরি করা অন্যায়; চুরি করো না। এমতাবস্থায়, মৃত্যুর পরে যদি আর কোনো জীবন না থাকে তাহলে কেবল অন্যায় বলেই চুরি থেকে বিরত থাকা এবং ক্ষুধার কষ্ট সহ্য করার কোনো অর্থ হয় না। শুধু তা- ই নয়, বরং এরূপ অবস্থায় ন্যায়- অন্যায় সংক্রান্ত ধারণা ও নৈতিক বোধ অর্থহীন বলে মনে হবে। তাই সে অবলীলাক্রমে অন্যের বাগানের ফল বিনানুমতিতে ভক্ষণ করে ক্ষুন্নিবৃত্তি করবে। এ অবস্থায় পারিপার্শ্বিকতা থেকে বিপদাশঙ্কা না থাকলে কোনো নৈতিক বোধই তাকে এ কাজ থেকে বিরত রাখতে পারবে না।

কিন্তু যে ব্যক্তি মনে করে যে, মৃত্যুতেই জীবনের সমাপ্তি নয়, বরং মৃত্যু হচ্ছে জীবনেরই ধারাবাহিকতার একটি অধ্যায়ের সমাপ্তি ও অপর একটি অধ্যায়ের সূচনা, সে অবশ্যই পার্থিব জীবনের কাজকর্মের মৃত্যুপরবর্তী জীবনে শুভাশুভ প্রতিক্রিয়ার সম্ভাবনার কারণে সতর্কতার কর্মনীতি অনুসরণ করবে। অর্থাৎ সে তার বিচারবুদ্ধির ন্যায়- অন্যায় সংক্রান্ত রায়ের অনুসরণ করবে, এতে তার যতোই না কষ্ট হোক। বিষয়টি চরম পিপাসার্ত অবস্থায়, বিষমেশানো বলে জানা থাকা, এমনকি বিষমেশানো হবার সন্দেহযুক্ত পানি বর্জনের সাথে তুলনীয়।

মৃত্যুর ওপারে জীবন আছে কিনা এ প্রশ্নের জবাব প্রথমতঃ এই ন্যায়- অন্যায় ও নৈতিকতা বোধের মধ্যেই নিহিত দেখতে পাওয়া যায়। মৃত্যুতেই জীবনের সমাপ্তি ঘটলে ন্যায়- অন্যায় ও নৈতিকতার বোধ একটি অর্থহীন বিষয়ে পরিণত হয়। শুধু তা- ই নয়, এরূপ হলে এ জীবন ও জগতের পিছনে কোনো সৃষ্টিকর্তা আছেন কিনা তার জবাব সন্ধানও অর্থহীন ও অযথা কাজে পরিণত হতে বাধ্য। কারণ, সৃষ্টিকর্তা যদি থাকেনও, যেহেতু এ পার্থিব জীবনে সরাসরি তাঁর নিকট জবাবদিহি করতে হচ্ছে না, এমতাবস্থায় যদি মৃত্যুতেই জীবনের শেষ হয়ে যায় এবং মৃত্যুর পরে সৃষ্টিকর্তার নিকট জবাবদিহি করার সম্ভাবনা না থাকে তাহলে সৃষ্টিকর্তার অস্তিত্ব থাকা- নাথাকায় কোনোই পার্থক্য ঘটে না।

এরূপ হলে অর্থাৎ মৃত্যুর ওপারে কোনো জীবন না থাকলে এ জীবনে নীতি- নৈতিকতা ও বিবেকবোধ অনুসরণের কোনো প্রয়োজনই থাকে না, বরং এ জীবনে নিরাপত্তা ও সতর্কতার নীতি অনুসরণই যথেষ্ট। অর্থাৎ মানুষ কেবল এ জন্য চুরি থেকে বিরত থাকবে যে, চুরি করলে এবং সংশ্লিষ্ট জিনিসের মালিক তা জানতে পারলে তার সাথে সংঘাত হবে এবং পারস্পরিক স্বার্থে সহযোগিতার নীতি অনুসরণে অন্যরাও মালিকের পাশে এসে দাঁড়াবে ও চোরকে শাস্তি দেবে। কিন্তু তার বিচারবুদ্ধি চুরিকে অন্যায় বলবে না এবং চুরি প্রকাশ পেলে সে বি ত বা ল া বোধ করবে না। বরং বি তবোধ করা ও ল া পাওয়ার ন্যায় চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যগুলোই তার মধ্য থেকে উঠে যাবে। এমতাবস্থায় ঝুঁকি না থাকলে স্বীয় প্রয়োজন পূরণের লক্ষ্যে, শুধু প্রয়োজন পূরণের

লক্ষ্যে কেন, বরং অপরিহার্য প্রয়োজন না থাকলেও কেবল অতিরিক্ত আরাম- আয়েশ লাভ ও অনেক বেশী ধন- সম্পদের মালিক হবার জন্যে, সে অবশ্যই চুরি করবে।

কিন্তু আমরা দেখতে পাই, বিচারবুদ্ধি চুরিকে অন্যায় বলে রায় দেয় এবং চুরি প্রকাশ পেলে, এমনকি শাস্তির ঝুঁকি না থাকলেও মানুষ ল া পায় ও বি ত বোধ করে। অন্যদিকে আমরা দেখতে পাই, বিচারবুদ্ধি যতো কাজকে অন্যায় বলে রায় দেয় তার সবগুলোর প্রতিফল পার্থিব জীবনে প্রকাশ পায় না এবং যেগুলোর প্রতিফল প্রকাশ পায় তা- ও সাধারণতঃ পূর্ণ মাত্রায় প্রকাশ পায় না। তেমনি বিচারবুদ্ধি যতো কাজকে ভালো ও উচিত বলে রায় দেয় পার্থিব জীবনে তার সবগুলোর প্রতিফল প্রকাশ পায় না এবং যে সব কাজের প্রতিফল প্রকাশ পায় তা- ও সাধারণতঃ পূর্ণ মাত্রায় প্রকাশ পায় না। এমতাবস্থায় এটাই মানবমনের আকাঙ্ক্ষা তথা মানবপ্রকৃতির দাবী যে, এ পার্থিব জীবনে না হলেও, মৃত্যুর পরে হলেও ন্যায়- অন্যায় ও ভালো- মন্দের শুভাশুভ প্রতিফল প্রকাশিত হোক।

মৃত্যুর পরে যদি কোনো জীবন না- ই থাকবে তাহলে মানুষের মধ্যে ভালো- মন্দ ও ন্যায়- অন্যায়ের অনুভূতি না থাকাই উচিত ছিলো, অথবা এরূপ অনুভূতি থাকার পাশাপাশি এ পার্থিব জীবনে তার পূর্ণ প্রতিফল প্রকাশ পাওয়ার নিশ্চয়তা থাকা উচিত ছিলো। কিন্তু বাস্তবে যখন এর কোনোটাই হয় নি তখন মৃত্যুর পরে ন্যায়- অন্যায় ও ভালো- মন্দের শুভাশুভ প্রতিফল প্রকাশ পাওয়া অপরিহার্য। যদি তা না হয়, তাহলে বলতে হবে যে, স্রষ্টা তাঁর সৃষ্টির প্রতি অন্যায় করেছেন বা তার সাথে প্রতারণা করেছেন অথবা তিনি বুঝতে পারেন নি যে, তিনি তাঁর সৃষ্টির মধ্যে কী ধরনের অনুভূতি দিয়েছেন ও সৃষ্টির সহজাত অনুভূতির দাবী পূরণের জন্য কী করা উচিত ছিলো।

বলা বাহুল্য যে, কোনো স্রষ্টার মধ্যে এরূপ বৈশিষ্ট্য থাকা মানে হচ্ছে সে স্রষ্টা দুর্বল ও অপূর্ণ। পরম পূর্ণতার অধিকারী অপরিহার্য সত্তা এ ধরনের দুর্বলতা ও অপূর্ণতা থেকে প্রমুক্ত। অতএব, এতে সন্দেহের অবকাশ নেই যে, ভালো- মন্দ ও ন্যায়- অন্যায়ের অনুভূতি এবং পার্থিব জীবনে এর ফলাফল পুরোপুরি প্রকাশ না পাওয়ার অনিবার্য দাবী হচ্ছে, মৃত্যুর পরে এ পার্থিব জগতে

অপ্রকাশিত ফলাফল প্রকাশ পাওয়া ও অপূর্ণভাবে প্রকাশিত ফলাফল পরিপূর্ণরূপে প্রকাশ পাওয়া।

মৃত্যুতেই প্রাণশীল সৃষ্টির অস্তিত্বের সমাপ্তি ঘটা অপরিহার্য সত্তা সৃষ্টিকর্তার প্রজ্ঞা ও শক্তির দাবীর বরখেলাফ। কোনো সৃষ্টির সূচনা করে তাকে পূর্ণতায় উপনীত না করে মাঝপথে সমাপ্ত করা খেয়ালী, অজ্ঞ বা অক্ষম স্রষ্টার বৈশিষ্ট্য; পরম পূর্ণতার অধিকারী অপরিহার্য সত্তা এ ধরনের দুর্বলতা থেকে মুক্ত।

মানুষ ও অন্যান্য প্রাণশীল সৃষ্টিকে কেন সৃষ্টি করা হয়েছে? আমরা দেখি, মানুষ জন্মগ্রহণ করে, লালিত- পালিত হয়, বড় হয়, জ্ঞানার্জন করে, খানাপিনা করে, বিশ্রাম করে, নিদ্রা যায়, ধরণীর বুকে বিভিন্ন ধরনের কাজকর্ম করে, পরোপকার করে ইত্যাদি। কিন্তু এখানে অনেক নেতিবাচক দিক আছে। এখানে আছে ঝগড়া- ফাসাদ, যুদ্ধ- বিগ্রহ, চুরি- ডাকাতি, অন্য অনেক ধরনের অন্যায়- অপরাধ। এছাড়া আছে প্রাকৃতিক বিপর্যয়, আছে দুঃখ- কষ্ট ও লাঞ্ছনা- গঞ্জনা। তার অনেক আশা- আকাঙ্ক্ষা অপূর্ণ থেকে যায়, অনেক ভালো কাজ পুরস্কারবিহীন থেকে যায়। তারপর একদিন মৃত্যু এসে তাকে গ্রাস করে। প্রশ্ন হচ্ছে, কেন তাকে সৃষ্টি করা হলো? কেবল খাওয়া- পরা, প্রজনন ও একদিন মরে যাওয়া - এ জন্য কি? তাকে সৃষ্টির পিছনে কি কোনো মহৎ উদ্দেশ্য নেই? তাহলে তাকে যে দুঃখ- কষ্ট ও অন্যায়- অত্যাচারের মুখোমুখি করা হলো তার উদ্দেশ্য কী? পরম পূর্ণতার অধিকারী স্রষ্টা এরূপ অযৌক্তিক কাজ করতে পারেন কি?

আমরা অবশ্য মৃত্যুর ওপারে কী আছে তা জানি না। অর্থাৎ আমাদের অভিজ্ঞতা বা বিচারবুদ্ধি আমাদেরকে এ ব্যাপারে নিশ্চিত জ্ঞান দিতে সক্ষম নয়। কারণ, আমাদের যাত্রা একমুখী। আমরা যারা মাতৃগর্ভ থেকে ভূমিষ্ঠ হয়ে পার্থিব জীবনে রয়েছি তারা যেমন আর মাতৃগর্ভে ফিরে যেতে পারছি না, তেমনি যারা মৃত্যুবরণ করেছে তাদের কেউ ফিরে এসে বলতে পারছে না মৃত্যুর ওপারে কী আছে বা আদৌ কিছু আছে কিনা।

এ যেন পার্থিব জীবন সম্পর্কে মাতৃগর্ভস্থ ভ্রুণের ধারণা। ধরুন, কোনো মাতৃগর্ভে একবারে কয়েকটি ভ্রুণের সৃষ্টি হলো এবং তাদের বিকাশ হতে থাকলো। এক সময় একটি পূর্ণ বিকশিত ভ্রুণ বা শিশু মাতৃগর্ভ থেকে বেরিয়ে গেলো, আর ফিরলো না। দু'ঘণ্টা পর আরো একটি ভ্রুণ বা শিশু বেরিয়ে গেলো; সে- ও ফিরলো না। তখন সেখানে অবস্থানরত অপর একটি বা দু'টি ভ্রুণ এ সিদ্ধান্তে উপনীত হলো: "আমরা এখানে অস্তিত্বলাভ করি, পুষ্টি লাভ করি, বিকাশপ্রাপ্ত হই, তারপর এখান থেকে বেরিয়ে যাই এবং আর ফিরে আসি না; সুতরাং এটাই সত্য যে, এখান থেকে বেরিয়ে যাওয়ার মধ্য দিয়েই আমাদের অস্তিত্বের সমাপ্তি।"

মৃত্যুতে আমাদের অস্তিত্বের সমাপ্তি বলে ধারণা করা ভ্রুণের কল্পিত ধারণার সমতুল্য - যা নেহায়েতই হাস্যকর।

মাতৃগর্ভ থেকে বেরিয়ে আসাতেই যদি ভ্রুণের অস্তিত্বের সমাপ্তি ঘটতো তাহলে ভ্রুণের জীবন অর্থাৎ তার অস্তিত্বলাভ ও বিকাশ এবং মাতৃগর্ভ থেকে বেরিয়ে আসা পর্যন্তকার জীবন হতো যেমন অসম্পূর্ণ জীবন, তেমনি তা হতো অর্থহীন। পরম প্রজ্ঞাময় স্রষ্টা অর্থহীন অসম্পূর্ণ জীবন সৃষ্টি করবেন এটা ভাবাও যায় না। পার্থিব জীবনের পর মৃত্যুতে জীবনের সমাপ্তি হলে তা- ও অনুরূপ। বরং তা শুধু অর্থহীন নয়, অন্যায় বলেও মনে হয়। কারণ, একটি মানুষ কারণ ও ফলশ্রুতি বিধির এ দুনিয়ায় বহু ঘাত- প্রতিঘাতের মধ্য দিয়ে পথ চলে যখন পঞ্চাশ, ষাট বা একশ' বছরের জীবনে বেশ কিছুটা শিক্ষা গ্রহণ করেছে ও অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করেছে তখন মৃত্যু এসে তাকে গ্রাস করে নিলো এবং তার অস্তিত্বকে নিশ্চিহ্ন করে দিলো। বিচারবুদ্ধি এ নিশ্চিহ্নতাকে কিছুতেই মেনে নিতে পারে না। এটা খুবই অন্যায় হবে যদি না মৃত্যুর পরেও জীবনের ধারাবাহিকতা অব্যাহত থাকে, ঠিক যেভাবে ভ্রুণের মাতৃগর্ভ থেকে বেরিয়ে আসার পরেও জীবনের ধারাবাহিকতা অব্যাহত থাকে।

তাছাড়া মানুষের সত্তার ভিতরেই জীবন বিলুপ্ত না হওয়ার ও অব্যাহত থাকার কামনা নিহিত রয়েছে। এ কামনা সর্বজনীন। মানুষের সৃষ্টিপ্রকৃতিতে যতো রকমের সহজাত কামনা- বাসনা ও চাহিদা রয়েছে তার সব কিছুই পূরণের ব্যবস্থা রয়েছে। তার ক্ষুধার জন্য খাদ্য, তৃষ্ণার জন্য

পানি, দেখার জন্য সুন্দর ও মনোরম দৃশ্যাবলী, শোনার জন্য সুমিষ্ট ধ্বনি ও সুর, ঘ্রাণ নেয়ার জন্য সুগন্ধি, স্বাদ গ্রহণের জন্য সুস্বাদু উপাদান, স্পর্শ করার জন্য মোলায়েম বা আরামদায়ক বস্তু - সবই মওজূদ রয়েছে। তার মধ্যে সহজাতভাবে যতো কিছুর আশা- আকাঙ্ক্ষা ও কামনা- বাসনা আছে তার সব কিছুই পূরণের নিশ্চিত ব্যবস্থা রয়েছে। জন্মের পর বয়সের একটি সুনির্দিষ্ট স্তরে এসে পুরুষ নারীসংসর্গ কামনা করে এবং নারী পুরুষসংসর্গ কামনা করে। মহান স্রষ্টা মানুষের মধ্যে এ ধরনের কামনা সৃষ্টি করেছেন এবং তা পূরণেরও ব্যবস্থা রেখেছেন।

এ থেকে বিচারবুদ্ধি এ উপসংহারে উপনীত হয় যে, কোনো আশা- আকাঙ্ক্ষা বা কামনা- বাসনা পূরণের ব্যবস্থা না রাখলে সৃষ্টিকর্তা সে আশা- আকাঙ্ক্ষা বা কামনা- বাসনা সৃষ্টিই করতেন না। বলা বাহুল্য যে, মানবপ্রকৃতিতে নিহিত আশা- আকাঙ্ক্ষা ও কামনা- বাসনা সমূহের মধ্যে সর্বাধিক প্রবল হচ্ছে জীবন অব্যাহত রাখার আকাঙ্ক্ষা। এ আকাঙ্ক্ষা যদি অপূর্ণ থাকবে, তাহলে কেন তার মধ্যে এ আকাঙ্ক্ষা দেয়া হলো? এরূপ হলে তা বড়ই অন্যায় হবে - যা পরম পূর্ণতার অধিকারী স্রষ্টার জন্য কল্পনাও করা যায় না।

বাস্তবেও দেখা যায়, যারা মৃত্যুতেই জীবনের সমাপ্তি বলে মনে করে তারা চরম হতাশার শিকার হয়। তাদের কাছে জীবনটা অর্থহীন বলে মনে হয়। এমনকি এ হতাশা অনেককে আত্মহত্যায় প্ররোচিত করে। কারণ, মৃত্যুতেই যে জীবনের সমাপ্তি সে জীবনকে বাঁচিয়ে রেখে লাভ কী? বিলুপ্তিই যদি জীবনের পরিণতি হয়, তো খাওয়া- পরা, ভোগ- আনন্দের জন্য জীবন অব্যাহত রাখার সার্থকতা কী?

জীবনে সুখ, আনন্দ ও ভোগ যেমন আছে, তেমনি আছে দুঃখ- কষ্ট, ব্যথা- বেদনা, অশান্তি, ঝুঁকি, নিরাপত্তাহীনতা। সামান্য ভোগ- আনন্দ লাভের জন্য এতো সব ঝক্কি পোহানোর কি কোনো মানে হয়? কোনো কঠিন পরিস্থিতির কারণে নয়, কেবল এ ধরনের দৃষ্টিভঙ্গি পোষণের কারণেও অনেকে আত্মহত্যা করে। এমনকি অনেক ক্ষেত্রে ঝুঁকিবিহীন জীবনের অধিকারী লোকেরাও মৃত্যুতে জীবনের বিলুপ্তি গণ্য করায় জীবনকে অর্থহীন ও উদ্দেশ্যবিহীন অনুভব করে চরম হতাশার শিকার হয়ে আত্মহত্যার আশ্রয় নিয়ে থাকে।

বলা বাহুল্য যে, এ ধরনের আত্মহত্যাও এটাই প্রমাণ করে যে, মানবপ্রকৃতিতে জীবন অব্যাহত থাকার আকাঙ্ক্ষা বিদ্যমান। কিন্তু ভ্রান্ত শিক্ষার ফলে তার মনে মৃত্যুতে জীবনের বিলুপ্তির ধারণা গড়ে ওঠায় সে তার প্রকৃতিতে নিহিত আকাঙ্ক্ষা পূরণের পথ রুদ্ধ দেখতে পেয়ে হতাশার শিকার হয়ে আত্মহত্যা করে।

অতএব, মানবপ্রকৃতিতে নিহিত জীবনের ধারাবাহিকতার আকাঙ্ক্ষার দাবী হচ্ছে এই যে, সৃষ্টিকর্তা যখন মানুষের মাঝে এরূপ আকাঙ্ক্ষা সৃষ্টি করেছেন তখন তিনি তা অবশ্যই পূরণ করবেন।

মানবপ্রকৃতিতে নিহিত ন্যায়নীতির অনুভূতি এবং ন্যায়বিচারের আকাঙ্ক্ষাও মৃত্যুর পরে জীবন অব্যাহত থাকার দাবীদার।

মানুষের প্রকৃতি একদিকে যেমন কোনো রকম যুলুম- অত্যাচারের শিকার হওয়া পসন্দ করে না, তেমনি ভালো কাজ ও ত্যাগ স্বীকারের বিনিময়ে শুভ প্রতিদান কামনা করে। কিন্তু কারণ ও ফলশ্রুতি বিধির আওতাধীন পার্থিব জগতে সব সময় তার প্রতিফলন ঘটে না। এখানে মানুষ তার স্বাধীনতার অপব্যবহার করে অন্যের ওপর যুলুম- অত্যাচার করে, কিন্তু প্রতিটি ক্ষেত্রেই যালেম শাস্তির সম্মুখীন হয় না। ফলে মযলূম সব সময়ই যালেমের শাস্তি কামনা করতে থাকে। অন্যদিকে অনেক সময় ভালো কাজ ও ত্যাগ স্বীকারের বিনিময়ে শুভ ফল পাওয়া তো দূরের কথা, উল্টো লাঞ্ছনা- গঞ্জনার শিকার হতে হয়।

যুলুম- অত্যাচার শাস্তিবিহীন চলে যাবে এবং ভালো কাজ পুরস্কারবিহীন থেকে যাবে - মানুষের মন এটা মানতে পারে না। সে এ কামনাই করে যে, সৃষ্টিকর্তা যেন ঘটনাবলীকে নিয় ণ করে এমন এক দিকে প্রবাহিত করেন যার ফলে বিলম্বে হলেও সে যেন তার ভালো কাজের শুভ প্রতিদান পায় এবং যালেম তার যুলুমের শাস্তি ভোগ করে; সে তো প্রতিশোধ নিতে পারলো না, সৃষ্টিকর্তা যেন তার পক্ষ থেকে প্রতিশোধ গ্রহণ করেন। কিন্তু এ আশায় আশায় তার দিন কেটে যায়, তারপর এক সময় যালেম স্বাভাবিক মৃত্যু বরণ করে দুনিয়া থেকে বিদায় নেয়। তখন সে (মযলূম) কামনা করে, দুনিয়ার বুকে তো যালেমের শাস্তি হলো না, মৃত্যুতে যেন তার অস্তিত্বের

সমাপ্তি না ঘটে; মৃত্যুর পরে আরেক জগতে হলেও যেন সৃষ্টিকর্তা তাকে শাস্তি দেন। তেমনি যে ব্যক্তি ভালো কাজের শুভ প্রতিদান পাবার আগেই মৃত্যু এসে তাকে গ্রাস করছে, সে কামনা করে, মৃত্যুর পরে অন্য জগতে হলেও সৃষ্টিকর্তা যেন তাকে শুভ প্রতিদান প্রদান করেন। সৃষ্টিকর্তা তো সহজেই তা করতে পারেন; তাহলে কেন করবেন না? অবশ্যই করবেন - এটাই তার বিচারবুদ্ধিজাত প্রত্যয়।

অন্যায়ের শাস্তি ও ভালো কাজের পুরষ্কারের সুশৃঙ্খল ব্যবস্থার দৃষ্টান্ত স্বয়ং মানুষের সত্তার মধ্যেও নিহিত রয়েছে। মানুষ কোনো ভালো কাজ সম্পাদন করতে পারলে, বাইরে সে জন্য প্রশংসা ও পুরষ্কার না পেলেও, সে তার অন্তরে এক ধরনের অনাবিল আনন্দ, পরিতৃপ্তি ও প্রশান্তি অনুভব করে।

অন্যদিকে অনেক ক্ষেত্রেই অপরাধ করার পর মানুষ আত্মগ্লানি অনুভব করে, যদি না তার মানবিক সত্তা পুরোপুরি বিকৃত হয়ে পশুসত্তায় বা তার চেয়েও নিকৃষ্টতর সত্তায় পরিণত হয়ে থাকে। ক্ষেত্রবিশেষে তার আত্মগ্লানির য ণা এমন এক পর্যায়ে উপনীত হয় যে, সে তা থেকে বাঁচার জন্য আত্মহত্যা করে।

আমরা লক্ষ্য করি যে, প্রাকৃতিক বিধিবিধান (যেমন, স্বাস্থ্যবিধি) ও সহজাত নৈতিক বিধান লজ্ঘন ও মেনে চলার কারণে মানুষের ক্ষুদ্র দেহের ব্যবস্থাপনার মধ্যেও এক ধরনের শাস্তি ও পুরস্কারের নিখুঁত ব্যবস্থা রয়েছে। এমতাবস্থায় গোটা সৃষ্টিলোকের বিশাল ব্যবস্থাপনায় শাস্তি ও পুরস্কারের একটি নিখুঁত ব্যবস্থা থাকবে না - এটা কী করে সম্ভব? কারণ, মানুষের সত্তায় শাস্তি ও পুরষ্কারের এক নিখুঁত ব্যবস্থা আছে বটে, তবে তাতে মানুষের ন্যায়বিচারের দাবী পুরোপুরি পূরণ হচ্ছে না।

মানুষ দেহ ও আত্মার সমন্বিত রূপ। মানুষ ভালো- মন্দ যে কাজ করে তাতে তার দেহ ও আত্মা বা ব্যক্তিসত্তা উভয়ই জড়িত। পার্থিব জীবনে মানুষ যে শাস্তি ও পুরষ্কার লাভ করে তা তার দেহ ও আত্মা উভয়ই ভোগ করে থাকে। তাই মযলূম ব্যক্তি দেহ ও মনে যে যুলুমের শিকার হয়েছে, তার প্রতিদানে যালেমের পার্থিব জীবনের মানসিক অশান্তিরূপ শাস্তিতে সে সন্তুষ্ট নয়। বিশেষ

করে, পার্থিব জগতের আদালতে যখন কোনো যালেমের শাস্তি হয় তখন তা শারীরিক ও মানসিক উভয়ভাবেই হয়ে থাকে। এমতাবস্থায় তার ওপর যে ব্যক্তি যুলুম করেছে তার শাস্তি শারীরিকভাবে না হলে, কেবল মানসিক বা আত্মিকভাবে হলে মযলূম ব্যক্তি অনুভব করবে যে, তাকে বঞ্চিত করা হয়েছে। বিশেষ করে যালেম সত্যি সত্যিই মানসিক শাস্তি ভোগ করছে কি না সে ব্যাপারে নিশ্চিত হওয়া মযলূমের পক্ষে সম্ভব নয়। কেবল শারীরিক শাস্তি দেখেই তার পক্ষে বুঝতে পারা সম্ভব যে, যালেম মানসিক শাস্তিও ভোগ করছে। তাই পার্থিব জীবনে যালেমের শারীরিক শাস্তি না হলে মৃত্যুর পরে অন্য কোনো জগতে তার শারীরিক শাস্তি হোক - মযলূম এটাই কামনা করে।

ভালো কাজের পুরষ্কারের ক্ষেত্রেও মানুষের কামনা একই ধরনের। ভালো কাজ সম্পাদনকারীদের মধ্য থেকে কেউ কেউ যেখানে মানসিক পরিতৃপ্তি ছাড়াও পার্থিব শুভ ফলও পেয়েছে - যে শুভ ফল তাদের জন্য শারীরিক আনন্দ ছাড়াও আরো এক দফা মানসিক পরিতৃপ্তি নিয়ে এসেছে, সে ক্ষেত্রে যে ব্যক্তি ভালো কাজ সম্পাদন করে কেবল মানসিক পরিতৃপ্তি পেয়েছে, পার্থিব পুরষ্কার ও ত নিত শারীরিক- মানসিক পরিতৃপ্তি পায় নি, সে নিজেকে বঞ্চিত অনুভব করতে বাধ্য। সে অবশ্যই চায়, মৃত্যুর পরে অন্য জগতে হলেও, তার এ বঞ্চনার প্রতিকার হোক।

এছাড়া পার্থিব জগতের শাস্তি ও পুরষ্কার শতকরা একশ' ভাগ যথাযথ হওয়া সম্ভব নয়। যে ব্যক্তি একশ' জন লোককে হত্যা করেছে তাকে দুনিয়ার আদালত মাত্র একবারই মৃত্যুদণ্ড দিতে পারবে। তাই ভালো ও মন্দ কাজের 'যথাযথ প্রতিদান' দেয়ার জন্যও আরেকটি জগত থাকা অপরিহার্য।

মানুষের সহজাত প্রবণতাসমূহের অন্যতম হচ্ছে জানার প্রবণতা, সত্য উদঘাটনের প্রবণতা, জীবন ও জগতের ছোট- বড় সকল রহস্যের দ্বারোদঘাটনের আকাঙ্ক্ষা। এ আকাঙ্ক্ষা দৈহিক ভোগ- আকাঙ্ক্ষার চেয়েও তী ও শক্তিশালী। কিন্তু পার্থিব জগতে তার এ আকাঙ্ক্ষা বেশীর ভাগই অপূর্ণ থেকে যায়। সে চায়, সমস্ত সত্য তার নিকট প্রকাশিত হোক, সব কিছুর ওপর থেকে

রহস্যের পর্দা অপসারিত হয়ে যাক। কিন্তু তা হয় না। এ কারণে তার অস্থিরতা, আফসোস ও মনঃপীড়ার অন্ত নেই।

এছাড়া জীবন ও জগতের অনেক বিষয় সম্বন্ধে মানুষের কাছে পরস্পর বিরোধী ধারণা আসে। তাই সে জানতে চায়, কোনটি সত্য? নাকি এর কোনোটিই সত্য নয়, বরং তৃতীয় কোনো কিছু সত্য যা সকলের কাছেই অজ্ঞাত? তার মাঝে মাঝে সন্দেহ হয়, তার বন্ধু, স্বামী বা স্ত্রী তার সাথে কপটতা বা বিশ্বাসঘাতকতা করছে না তো? সারাটি জীবন অভিনয় করে কাটিয়ে দেয় নি তো? আহা! অমুকের অন্তরের অবস্থাটি যদি নির্ভুলভাবে পর্যবেক্ষণ করা যেতো! আপাততঃ যে সব সত্য অপ্রকাশিত বা সন্দেহের আবরণে আবৃত রয়েছে তা কি কোনোদিন প্রকাশিত হবে না? সৃষ্টিকর্তা কি তার এ পিপাসার নিবৃত্তি করবেন না? দৈহিক পিপাসা নিবৃত্তির ব্যবস্থা তো রয়েছে; এ জ্ঞানপিপাসার নিবৃত্তি কি কখনোই হবে না?

মানবমনের আকাঙ্ক্ষা, এ জীবনে তো বিতর্কের ফয়সালা হলো না; মৃত্যুর পরে হলেও যেন এর ফয়সালা হয় এবং সে সঠিক বিষয়টি জানতে পারে। এ জীবনে জ্ঞানপিপাসার নিবৃত্তি হলো না; মৃত্যুর পরে হলেও যেন এর নিবৃত্তি হয়। পরম ক্ষমতাবান স্রষ্টা তো তা করতে সক্ষম; তাহলে কেন তিনি তা করবেন না? অবশ্যই করবেন। নইলে তিনি মানবপ্রকৃতিতে এ সীমাহীন জ্ঞানপিপাসা দিলেন কেন? এমন দুর্বার পিপাসা, যার চাপ সহ্য করা বড়ই কঠিন; নিঃসন্দেহে তিনি তার নিবৃত্তি ঘটাবেন, নইলে এ পিপাসা দিয়ে তিনি মানুষকে কষ্ট দিতেন না।

পরকালীন জীবন সম্ভব কি?

আমাদের আলোচনা থেকে সুস্পষ্ট যে, মানবপ্রকৃতির জোরালো দাবী হচ্ছে, মৃত্যুর পর আরেকটি জীবন থাকা উচিত যেখানে পার্থিব জীবনের ভালো- মন্দের প্রতিদান দেয়া হবে এবং পার্থিব জীবনে প্রাপ্ত অসম্পূর্ণ প্রতিদানকে সম্পূর্ণ করা হবে। সর্বোপরি, মানুষ তার অস্তিত্বের ধারাবাহিকতা কামনা করে, সে তার বিলুপ্তিকে মোটেই পসন্দ করে না। অতএব, মৃত্যুর পরে আরেকটি জীবন থাকা অপরিহার্য।

কিন্তু প্রশ্ন হচ্ছে, এ ধরনের জীবন সম্ভব কি? এ ব্যাপারে বিচারবুদ্ধির রায় হচ্ছে, তা অবশ্যই সম্ভব। কারণ, প্রথম বার সৃষ্টির তুলনায় ধ্বংসপ্রাপ্ত সৃষ্টিকে পূর্বাবস্থায় ফিরিয়ে আনা বা নতুন করে সৃষ্টি করা অপেক্ষাকৃত সহজতর। অতএব, যে পরম ক্ষমতাবান সৃষ্টিকর্তা সব কিছুকে সৃষ্টি করেছেন তাঁর পক্ষে সৃষ্টিপ্রকৃতিতে তাঁরই দেয়া দাবী পূরণ করা তথা মানুষকে মৃত্যুর পরে নতুন করে জীবনদান খুবই সহজসাধ্য।

এ প্রসঙ্গে স্মরণ রাখা প্রয়োজন যে, মানুষ হচ্ছে শরীর ও ব্যক্তিসত্তা (নাফস্)- এর সমন্বিত রূপ। বিচারবুদ্ধির পর্যবেক্ষণ হচ্ছে এই যে, মানুষের ব্যক্তিসত্তা শরীরকে আশ্রয় করে অবস্থান করলেও সে শরীর নয়, স্বত । স্বত হবার কারণেই ব্যক্তিসত্তা শরীরের বা তার ইন্দ্রিয়- নিচয়ের মুখাপেক্ষী না হয়েও স্বাধীনভাবে কাজ করতে পারে।

মানুষ পঞ্চেন্দ্রিয়ের সাহায্য ছাড়াই চিন্তা ও কল্পনা করে থাকে। এছাড়া ‘প্রায় মৃত্যুর অভিজ্ঞতা’ (এনডিই)- এর অনেক বর্ণনা থেকেও মানুষের ব্যক্তিসত্তার শরীরনিরপেক্ষ ক্ষমতার ধারণা পাওয়া যায়। প্রায় মৃত্যুর অভিজ্ঞতা বর্ণনাকারীরা সংজ্ঞাহীন অবস্থায় থাকাকালে অপার্থিব জগতের অভিজ্ঞতা লাভ করেছে বলে দাবী করে সে অভিজ্ঞতার যে সব বর্ণনা উপস্থাপন করেছে তাতে অতিরঞ্জন থাকার সম্ভাবনা স্বীকার করে নিলেও সংজ্ঞাহীন অবস্থায় তাদের ওপর পরিচালিত অস্ত্রোপচার সংশ্লিষ্ট ঘটনাবলী সম্পর্কে কোনো কোনো রোগী সংজ্ঞাপ্রাপ্তির পরে যেভাবে বিস্তারিত ও নিখুঁত বর্ণনা দিয়েছে তা অবিশ্বাস্যভাবে বিস্ময়কর হলেও প্রত্যখ্যান করার উপায় নেই। এ

ধরনের ঘটনা এটাই প্রমাণ করে যে, মানুষের ব্যক্তিসত্তা শরীরের পুরোপুরি অকেজো অবস্থায়ও স্বাধীনভাবে কাজ করতে পারে।

এ থেকে প্রমাণিত হয় যে, মানুষের যখন মৃত্যু হয় তখন তার শরীরই অকেজো হয়ে পড়ে, তার ব্যক্তিসত্তা ধ্বংসপ্রাপ্ত হয় না। অর্থাৎ তার ব্যক্তিসত্তার মৃত্যু নেই। এমতাবস্থায় মৃত্যুপরবর্তীকালে ব্যক্তিকে পুনর্জীবন দানের বিষয়টি খুবই সহজবোধগম্য হয়ে যায়। তাই মানুষের সৃষ্টিপ্রকৃতির দাবী হওয়া সত্ত্বেও সৃষ্টিকর্তা তাদেরকে পুনরু ীবিত করবেন না - এটা হতেই পারে না।

মৃতদের শরীর সাধারণতঃ বিক্ষিপ্ত হয়ে যায়। অধিকাংশ মানুষের শরীরই পচে- গলে মাটিতে মিশে যায়। ক্ষেত্রবিশেষে অনেকের শরীর পানিতে গলে যায় বা মাছের পেটে যায়, বা হিংস্র প্রাণী খেয়ে ফেলে। এমতাবস্থায় প্রশ্ন উঠতে পারে যে, বিক্ষিপ্ত শরীরকে কীভাবে পুনঃসংযোজিত করে জীবিত করা হবে? নাকি তাকে নতুন শরীর দেয়া হবে? নতুন শরীর দেয়া হলে তখন কি তাকে অভিন্ন ব্যক্তি বলা যাবে? যদি অভিন্ন ব্যক্তি না হয় তাহলে তার জন্য পার্থিব জীবনের কর্মের বিনিময়ে শাস্তি বা পুরস্কার দেয়া কি ঠিক হবে?

এ প্রশ্নের সর্বপ্রথম নীতিগত জবাব হচ্ছে, সর্বশক্তিমান স্রষ্টার পক্ষে একটি শরীরের বিক্ষিপ্ত উপাদানগুলোকে একত্রিত করা মোটেই কঠিন নয়। তবে ব্যক্তিকে যদি নতুন শরীর দেয়া হয় তাহলেও ব্যক্তির ব্যক্তিসত্তা অভিন্নই থেকে যায়।

আধুনিক শরীর বিজ্ঞানের সাক্ষ্য অনুযায়ী প্রতিটি প্রাণশীল সৃষ্টির শরীর অহরহ পরিবর্তিত হয়ে চলেছে। প্রতিনিয়তই একজন মানুষের শরীরের বহু কোষ ক্ষয় হয়ে যাচ্ছে এবং তদস্থলে নতুন নতুন কোষ তৈরী হচ্ছে। এভাবে কয়েক বছরের ব্যবধানে তার গোটা শরীরের সকল কোষই পরিবর্তিত হয়ে যায়। এতদসত্ত্বেও আমরা তাকে অভিন্ন ব্যক্তি বলে দাবী করি এবং সে নিজেও তা- ই মেনে নেয়। যে ব্যক্তি বিশ বছর পূর্বে কোনো অপরাধ করেছে বিশ বছর পর ধরা পড়লে সে বলে না, “আমি বিশ বছর আগে অপরাধ সংগঠনকারী সেই ব্যক্তি নই; সে ব্যক্তির মাংসপেশীর একটি কোষও আমার শরীরে নেই; সম্পূর্ণ নতুন কোষে গড়া শরীরের কারণে আমি

সম্পূর্ণ নতুন মানুষ।” যেহেতু শরীর নয়, ব্যক্তিসত্তাই আসল ব্যক্তি এবং শরীর হচ্ছে ‘ঐ ব্যক্তির’ শরীর, এমতাবস্থায় সৃষ্টিকর্তা যদি লোকদেরকে নতুন শরীর দিয়ে পুনরু ীবিত করেন তাহলেও তা অন্যায় হওয়া তো দূরের কথা, অযৌক্তিকও হবে না।

তবে সীমাহীন জ্ঞান ও শক্তি- ক্ষমতার অধিকারী সৃষ্টিকর্তা কোনো ব্যক্তির মৃত্যুকালীন সর্বশেষ শরীরের সকল বিক্ষিপ্ত অণু- পরমাণুকে একত্রিত করতে চাইলে তা- ও মোটেই কঠিন হতে পারে না। কারণ, আধুনিক বিজ্ঞান প্রমাণ করেছে যে, একজন মানুষের (বা একটি প্রাণীর) শরীরের সকল কোষের জেনেটিক কোড অভিন্ন এবং প্রতিটি প্রাণীর জেনেটিক কোড স্বত । এমতাবস্থায় যতো দূরে ও যেভাবেই বিক্ষিপ্ত থাকুক না কেন, অভিন্ন জেনেটিক কোডের উপাদানগুলোকে একত্রিত করা মহাবিজ্ঞানময় সৃষ্টিকর্তার পক্ষে মোটেই কঠিন নয়।

দু’টি সংশয়ের নিরসন

এ প্রসঙ্গে দু’টি সন্দেহ উদ্রেককারী প্রশ্নের জবাব দেয়া প্রয়োজন মনে করি। প্রথম প্রশ্ন এই যে, বিভিন্ন কারণে কিছু সংখ্যক মানুষের মৃতদেহ বা তার কোষসমূহ বা কোষসমূহের অংশবিশেষ আপাততঃ অক্ষত থাকলেও তা অনাগত হাজার হাজার বা লক্ষ লক্ষ বছরে পুরোপুরি বিক্ষিপ্ত হয়ে যাবার খুবই সম্ভাবনা রয়েছে। এমনকি তা যদি না- ও হয় তথাপি বেশীর ভাগ মানুষের শরীরের কোষসমূহ যে বিক্ষিপ্ত হয়ে মাটি ও পানিতে মিশে যাবে তাতে কোনোই সন্দেহ নেই। অর্থাৎ সেগুলো আর কোষ আকারে থাকছে না, বরং বিভিন্ন রাসায়নিক উপাদানে পরিণত হয়ে যাচ্ছে। এমতাবস্থায় তা প্রকৃতিতে বিরাজমান অনুরূপ উপাদানসমূহের সাথে একাকার হয়ে যাবে। তাহলে কী করে ব্যক্তির দেহের উপাদানগুলোকে স্বত ভাবে চিহ্নিত করে একত্র করা সম্ভব হবে?

এ প্রশ্ন যারা তুলছে তাদের জেনেটিক বিজ্ঞান সম্বন্ধে ধারণা স্বচ্ছ নয়। কারণ, মানুষের জীবন ও পূর্বপুরুষের ইতিহাস যে ক্ষুদ্র এককে লিপিবদ্ধ রয়েছে তা কোষ নয়, বরং কোষের মধ্যকার ক্ষুদ্রতর একক। এ একক কী?

বিজ্ঞান উদঘাটন করেছে, প্রতিটি মানবকোষে রয়েছে ৪৬টি ক্রোমোজম; এর মধ্যে ২৩টিতে মাতা ও তার পূর্বপুরুষদের এবং ২৩টিতে পিতা ও তার পূর্বপুরুষদের, আর সবগুলোতেই তার নিজের জীবনেতিহাস জিনের সাহায্যে লিপিবদ্ধ রয়েছে। প্রতিটি কোষে জিনের মোট সংখ্যা এক লাখ - যা ডিএনএ সমূহের মধ্যে বিন্যস্ত রয়েছে এবং ডিএনএ সমূহ ক্রোমোজমের মধ্যে বিন্যস্ত রয়েছে। দু'জন মানুষের কোষই শুধু বিভিন্ন নয়, বরং ক্রোমোজম, ডিএনএ ও জিন পর্যন্ত বিভিন্ন। এমনকি দুই যমজের ক্রোমোজমে সর্বাধিক মিল থাকলেও ভ্রূণ অবস্থা থেকেই কিছু না কিছু পার্থক্য থাকেই, অতঃপর, বিশেষ করে ভূমিষ্ঠ হবার পর থেকে এ পার্থক্য বৃদ্ধি পেতে থাকে। অতএব, কোষ বিক্ষিপ্ত হয়ে দু'জন মানুষের জিন পরস্পর মিশ্রিত হয়ে গেলেও তা অভিন্ন হয়ে যায় না, বরং পার্থক্য থেকেই যায়।

এ হচ্ছে এ পর্যন্ত আবিষ্কৃত বৈজ্ঞানিক তথ্য। কিন্তু অসম্ভব নয় যে, এর চেয়েও ক্ষুদ্রতর অংশে, এমনকি প্রতিটি পরমাণুতে এবং তার উপাদান ইলেকট্রন, প্রোটোন ও পজিট্রনে পর্যন্ত প্রতিটি ব্যক্তির স্বত বৈশিষ্ট্য সংরক্ষিত রয়েছে যা বিজ্ঞান এখনো আবিষ্কার করতে পারে নি; হয়তো ভবিষ্যতে আবিষ্কার করতে সক্ষম হবে। অতএব, অসীম ক্ষমতাবান স্রষ্টার পক্ষে অভিন্ন কোড (বৈশিষ্ট্য)-এর কারণে শুধু কমান্ডের সাহায্যে এক ব্যক্তির শরীরের বিক্ষিপ্ত হয়ে যাওয়া পরমাণুগুলোকে পুনঃসংযোজিত করা মোটেই কঠিন হতে পারে না।

দ্বিতীয় প্রশ্ন হচ্ছে, কোনো মানুষকে বাঘে বা কুমীরে খেয়ে ফেললে তার শরীর বাঘ বা কুমীরের শরীরে পরিণত হয়ে যায়। এমতাবস্থায় একই সাথে তার শরীরের উপাদানগুলো বাঘ বা কুমীর এবং মানুষের শরীর হিসেবে পুনর্গঠিত হবে কীভাবে? শুধু তা-ই নয়, বাঘ বা কুমীরে না খেলেও মানুষের শরীর যখন মাটি হয়ে যায় তখন তার উপাদানসমূহ উদ্ভিদ কর্তৃক শোষিত হয়। অতঃপর উদ্ভিদ বা তার ফল, ফুল ও পাতা মানুষ ও পশুপাখী কর্তৃক ভক্ষিত হয় এবং এরপর পুনরায় মানুষ পশুপাখীকেও ভক্ষণ করে। ফলে এক মানুষের শরীরের উপাদানসমূহ অন্য মানুষদের শরীরের উপাদানে পরিণত হয়। এমতাবস্থায় ঐ উপাদানগুলোকে কার শরীরের উপাদানরূপে পুনঃসংযোজিত করা হবে?

এ প্রশ্নটিরও বৈজ্ঞানিক ভিত্তি খুবই দুর্বল। কারণ, মানুষ বা অন্য কোনো প্রাণী যখন খাদ্য গ্রহণ করে তখন ঐ খাদ্যবস্তুর পুরোটাই তার শরীরে পরিণত হয় না। বরং এ থেকে সে বিভিন্ন ধরনের এসিড ও আমিষ জাতীয় উপাদান গ্রহণ করে। মানবদেহের একটি কোষে এক লাখ জিন থাকে এবং জৈব রাসায়নিক উপাদান থাকে তিনশ' কোটি। এমতাবস্থায় বাঘ মানুষকে খেয়ে ফেললে মানুষের জিনগুলো তার শরীরে থেকে যায় না বা উদ্ভিদ যখন মাটি থেকে খাদ্য গ্রহণ করে তখন প্রাণীদেহের জিনগুলো তাতে আত্মস্থ হয়ে যায় না। কারণ, তাহলে সকল প্রাণী ও উদ্ভিদের জিন- কোড এলোমেলো হয়ে যেতো। বরং মানুষ, অন্যান্য প্রাণী ও উদ্ভিদ যখন খাদ্য গ্রহণ করে তখন প্রকৃত পক্ষে তা থেকে কেবল বিভিন্ন ধরনের এসিড ও আমিষ জাতীয় উপাদান আত্মস্থ করে স্বীয় শরীরের কোষসমূহকে শক্তিশালী করে, যার ফলে বিভাজনের মাধ্যমে নতুন নতুন কোষের সৃষ্টি হয় এবং সেগুলো প্রতিনিয়ত বিনষ্ট হয়ে যাওয়া কোষগুলোর স্থান পূরণ করে; খাদ্যের কোষগুলো খাদ্যগ্রহীতার শরীরের কোষে পরিণত হয় না। অর্থাৎ খাদ্যের ভিতরকার জিনগুলো মাটিতেই থেকে যায় বা ফিরে যায়।

অতএব, সন্দেহ নেই যে, মৃত ব্যক্তির জিনগুলো বা অন্ততঃ তার অংশবিশেষ স্বত ভাবে প্রকৃতিতে থেকে যাবেই।

এ প্রসঙ্গে আরো উল্লেখ্য যে, কোনো ব্যক্তির শরীর পুনর্গঠনের জন্য তার শরীরের উপাদানসমূহের অংশবিশেষই যথেষ্ট। কারণ, কোনো প্রাণীর শরীরেই সব সময় মোট বস্তুর পরিমাণ সমান থাকে না। অসুস্থতা ও সুস্থতার অবস্থায় শরীরে মোট বস্তুর পরিমাণে বিরাট পার্থক্য ঘটে। প্রাণীদেহের একটি বৈশিষ্ট্য হচ্ছে এই যে, শরীরে বাইরের যে সব উপাদান শোষিত হয় তা বিদ্যমান কোষের পুষ্টিসাধন করে এবং বিভাজন প্রক্রিয়ায় নতুন কোষের সৃষ্টি করে। আর রেকর্ড থেকে রেকর্ডে কপি করার ন্যায় নতুন কোষে পুরনো কোষের সমস্ত তথ্য লিপিবদ্ধ হয়ে যায়। ফলে ব্যক্তির ব্যক্তিসত্তায় কোনোরূপ পরিবর্তন ঘটে না। (আর মৃত্যুর আগে প্রাণীর শরীর থেকে যে সব কোষ বিচ্ছিন্ন হয়ে যায় তার জিনে তার ঐ সময় পর্যন্তকার ইতিহাস লিপিবদ্ধ থাকে,

যদিও ব্যক্তির মৃত্যুর সময়কার কোষের জিনগুলোই গুরুত্বপূর্ণ, কারণ তাতে তার পুরো ইতিহাস লিপিবদ্ধ থাকে।)

এ থেকে সুস্পষ্ট যে, কোনো মানুষের শরীরের পুনঃসৃষ্টির জন্য তার একটিমাত্র কোষের উপাদানসমূহ সংগ্রহ করাই যথেষ্ট। কারণ, একটি কোষে পুষ্টি সংযোজন করে নতুন নতুন কোষ সৃষ্টি করে পুরো শরীরটাই গঠন করা যেতে পারে এবং তা করা ও চোখের পলকের মধ্যে সম্পাদন করা সর্বশক্তিমান স্রষ্টার পক্ষে খুবই সহজ। তবে সর্বময় ক্ষমতাবান সৃষ্টিকর্তা চাইলে কোনো ব্যক্তির মৃত্যুকালীন শরীরের সকল উপাদান একত্রিতকরণও তাঁর জন্য মোটেই কঠিন কাজ নয়।

শাস্তি ও পুরষ্কারঃ শারীরিক, না মানসিক?

আমরা ইতিপূর্বে উল্লেখ করেছি যে, মানবপ্রকৃতি স্বীয় ভালো কাজের উত্তম প্রতিদান ও যালেমের যুলুমের শাস্তি শারীরিকভাবেই দাবী করে - যা একই সাথে মানসিকও বটে, শুধু শারীরিকভাবে নয়।

এছাড়াও আরো দু'টি কারণ রয়েছে যা শারীরিক পুনরু ীবন দাবী করে। প্রথমতঃ মানুষের মধ্যে বিভিন্ন ধরনের লোক আছে যাদের সকলের মানসিক গঠন এক প্রকৃতির নয়। যদিও এমন কতক লোকও আছেন যাদের নিকট শারীরিক শাস্তি ও পুরষ্কারের তেমন গুরুত্ব নেই, মানসিক শাস্তি ও পুরষ্কারই মুখ্য। এর বিপরীতে এমন কতক লোক আছে যাদের কাছে শারীরিক শাস্তি ও পুরষ্কারই মুখ্য, মানসিক শাস্তি ও পুরষ্কারের কোনো মূল্য নেই। আর অবশিষ্ট বেশীর ভাগ মানুষের নিকটই শারীরিক ও মানসিক উভয় ধরনের শাস্তি ও পুরষ্কারই গুরুত্বপূর্ণ। এমতাবস্থায় সকল মানুষের প্রকৃতির দাবী পূরণের জন্য শারীরিকভাবে পুনরুত্থান অপরিহার্য।

দ্বিতীয়তঃ পার্থিব জীবনে কোনো মানুষই শারীরিক দিক থেকে পরিপূর্ণ পূর্ণতার অধিকারী ছিলো না বা নয়। এ পূর্ণতার তিনটি দিক রয়েছে : বস্তুগত বা কাঠামোগত দিক, বাহ্যিক ও অভ্যন্তরীণ গুণ- বৈশিষ্ট্যগত দিক এবং স্থায়িত্ব। মানুষ মাত্রই এ তিন দিক থেকেই শারীরিক পূর্ণতার আকাঙ্ক্ষী। এ পূর্ণতার অভাবে সে পার্থিব জীবনে প্রাপ্ত ভোগোপকরণও যথাযথ ও পরিপূর্ণরূপে ভোগ করতে পারে না। এ কারণে সে অতৃপ্ত থাকে ও মনঃকষ্টের শিকার হয়। সে চায়, তার এ অপূর্ণতা না থাকুক, যাতে সে ভোগের সব উপকরণকে স্থায়ীভাবে ও পূর্ণ মাত্রায় ভোগ করতে পারে। তাই সে নিখুঁত অক্ষয় শরীর সহ অনন্ত জীবনের দাবীদার এবং সৃষ্টিকর্তার পক্ষে তার এ দাবী পূরণ করা খুবই সহজসাধ্য।

তবে বলা বাহুল্য যে, যারা দুনিয়ার জীবনে অন্যায়- অপরাধে লিপ্ত হয়েছে, যুলুম- অত্যাচার করেছে, নিজেদের মানবিক ব্যক্তিসত্তাকে কলঙ্কিত ও বিকৃত করেছে, তাদেরকে অবশ্যই এ সব কারণে শাস্তি ভোগ করতে হবে। এমতাবস্থায় তাদের পক্ষে কাঠামোগত এবং বাহ্যিক ও

অভ্যন্তরীণ গুণ-বৈশিষ্ট্যগত শারীরিক পূর্ণতা সহ স্বীয় অপূর্ণ আশা-আকাঙ্ক্ষা পূরণের সুযোগ পাওয়ার প্রশ্নই ওঠে না। কারণ, শারীরিক-মানসিক পূর্ণতা ও শারীরিক-মানসিক ভোগোপকরণের পরিপূর্ণ তৃপ্তি হচ্ছে সৃষ্টিকর্তা প্রদত্ত পুরস্কার ও অনুগ্রহ - যা শাস্তির বিপরীত মেরুতে অবস্থান করে। তবে অপরাধীদের জন্যে একটি পূর্ণতার অধিকারী হওয়া স্বাভাবিক, বরং অপরিহার্য। তা হচ্ছে, তাদেরকে অনন্ত শাস্তি ভোগ করানোর লক্ষ্যে অনন্ত জীবনের ও স্থায়ী দেহের অধিকারী করা হবে।

যাদের অপরাধ এমনই যে, কোনোভাবেই তাদেরকে একটি মেয়াদের জন্য শাস্তিদানের পর মুক্তি দেয়া সঙ্গত নয় তাদের জন্য অনন্ত শাস্তির ব্যবস্থা থাকাই বিচারবুদ্ধির দাবী। আর অনন্ত শাস্তির জন্য প্রয়োজন অনন্ত জীবন ও শরীরের স্থায়িত্ব। অবশ্য যাদের অপরাধ অপেক্ষাকৃত কম এবং একই সাথে তাদের ভালো কাজও রয়েছে এমন লোকদের জন্য মেয়াদী শাস্তি শেষে কোনো না কোনো স্তরের ভোগোপকরণসহ অনন্ত জীবন হওয়াই স্বাভাবিক।

অপরাধীদের শাস্তির বিষয়টিকে লোহার তৈরী উপকরণাদির সাথে তুলনা করা যেতে পারে। যে সব লৌহজাত উপকরণে খুবই সামান্য মরিচা পড়ে তা শিরীষ কাগজ বা রেত্ দিয়ে ঘষে পরিষ্কার ও ঝকঝকে তকতকে করা যায়। কিন্তু যে সব উপকরণে বেশী মরিচা পড়ে তা আগুনে পোড়াতে হয় ও এরপর হাতুড়ি দিয়ে পিটিয়ে কার্যোপযোগী করতে হয়। কিন্তু যে উপকরণের পুরোটাই মরিচায় পরিণত হয় তা আগুনে পোড়ানোর পর আর সেখান থেকে কিছুই ফেরত আসে না, বরং তার পুরোটাই চূর্ণবিচূর্ণ হয়ে আগুনের ভিতরই পড়ে থাকে।

পরকালীন হিসাব-নিকাশ

যিনি প্রথম বার সৃষ্টি করেছেন তাঁর পক্ষে পুনর্বার সৃষ্টি করা যে খুবই সহজ - এ সহজ বিষয়টি বুঝতে না পারা কোনো সুস্থ বিচারবুদ্ধি সম্পন্ন লোকের পক্ষেই সম্ভব নয়। কিন্তু পরকালীন হিসাব-নিকাশ অর্থাৎ বিচারের বিষয়টি সম্পর্কে অনেকের মনেই প্রশ্ন সৃষ্টি হতে দেখা যায়।

অবশ্য এ ব্যাপারে কারো মনেই বিন্দুমাত্র সংশয় থাকার কারণ নেই যে, সকল কাল-কে আয়ত্তকারী কালোর্ধ অপরিহার্য সত্তা অবশ্যই সব কিছু দেখেন, শোনেন ও জানেন। অতএব, কোনো অপরাধীর অপরাধ সম্বন্ধে তাঁর নির্ভুল ও নিখুঁতভাবে এবং পরিপূর্ণরূপে জানা থাকার ব্যাপারে সন্দেহের অবকাশ নেই। সুতরাং তিনি যে যথার্থভাবেই অপরাধী ও অপরাধ চিহ্নিত করে যথাযথ শাস্তি দিতে সক্ষম তা অকাট্য সত্য। কিন্তু আমরা পার্থিব জগতের আদালতে দেখতে পাই যে, সাধারণতঃ অপরাধী তার অপরাধ স্বীকার করে না, বরং নিজেকে নিরপরাধ বলে দাবী করে। তাই অপরাধীকে শাস্তি দেয়ার জন্য অকাট্য দলীল ও সাক্ষ্য-প্রমাণ প্রয়োজন হয়। এমনকি এর পরেও অপরাধী দাবী করে যে, তার বিরুদ্ধে যে সব দলীলপ্রমাণ হাযির করা হয়েছে তা মিথ্যা ও জাল এবং তার বিরুদ্ধে ষড়যমূলকভাবে মিথ্যা সাক্ষ্য দেয়ানো হয়েছে। আর অপরাধী শুধু অভিযোগকারী, তাকে সহায়তা-দানকারী আইনজীবী ও সাক্ষীদেরকেই ষড়যের জন্যে দোষারোপ করে না, ক্ষেত্রবিশেষে বিচারককে, এমনকি তার নিজের আইনজীবীকেও দোষারোপ করে। (আর দুনিয়ার বিচারব্যবস্থায় বাস্তবেও অনেক সময় এমনটি ঘটে থাকে।) এমতাবস্থায় অপরাধী পরকালীন আদালতেও যে একইভাবে নিজেকে নিরপরাধ বলে দাবী করবে না তার নিশ্চয়তা কোথায়?

এ কারণে পরকালীন আদালতে অপরাধীর অপরাধ এমনভাবে প্রমাণিত হওয়া বাঞ্ছনীয় যাতে সে তা অস্বীকার করতে না পারে। ফটোগ্রাফি ও চলচ্চিত্র বা ভিডিও আবিষ্কারের পর এ প্রশ্নের মোটামুটি উত্তর পাওয়া যায়। কারণ, সবাই জানে যে, ফটো ও প্রামাণ্য ভিডিও চলচ্চিত্র মিথ্যা বলে না। মানুষ যখন ফটোগ্রাফি ও চলচ্চিত্র আবিষ্কার করতে পেরেছে তখন সর্বশক্তিমান সৃষ্টিকর্তার পক্ষে মানুষের সমস্ত কাজকর্ম কোনো এক ধরনের, হয়তো ভিন্ন মাত্রার, ফটো ও চলচ্চিত্র আকারে ধরে রাখা ও শেষ বিচারের সময় তা প্রদর্শন করা খুবই সহজসাধ্য ব্যাপার। (অবশ্য বর্তমানে ফটো ও চলচ্চিত্রে পরিবর্তন সাধন অর্থাৎ সংশোধন ও পুনঃসংযোজন করা সম্ভবপর হচ্ছে, তবে এরূপ কাজ করা হলে তা সূক্ষ্ম পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে, বিশেষতঃ উন্নত প্রযুক্তির যের সাহায্যে চিহ্নিত করা সম্ভব।)

কিন্তু জেনেটিক বিজ্ঞানের সর্বশেষ আবিষ্কার-উদ্ভাবন এমনই বিস্ময়কর যে, তার তুলনায় ফটোগ্রাফি ও চলচ্চিত্র খুবই তুচ্ছ ব্যাপার। বিজ্ঞানীরা পরীক্ষা-নিরীক্ষা ও গবেষণার মাধ্যমে উদঘাটন করেছেন যে, মানুষের (এবং অন্যান্য প্রাণীরও) শরীরের মাংসপেশীর প্রতিটি কোষের 'জিন্'-এর মধ্যে তার নিজের ও তার পূর্বপুরুষদের সারা জীবনের পুরো ইতিহাস সঙ্কেত আকারে লিপিবদ্ধ রয়েছে। অর্থাৎ কোষটিকে যখন শরীর থেকে বিচ্ছিন্ন করা হয় (বা ব্যক্তির মৃত্যু ঘটে) তার পূর্ব পর্যন্ত ব্যক্তিটির জীবনের পুরো ইতিহাস, ভূমিষ্ঠ হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত তার মায়ের জীবনের ও মাতৃগর্ভে পিতার প্রাণবীজ প্রবেশের পূর্ব পর্যন্ত পিতার জীবনের ইতিহাস এবং এভাবে দাদা-দাদী ও নানা-নানীর, তাদের দাদা-দাদী ও নানা-নানীর জীবনেতিহাস, এভাবে অতীতে যেতে যেতে প্রথম মানুষ পর্যন্ত পূর্ববর্তীদের ইতিহাস জেনেটিক কোড আকারে লিপিবদ্ধ আছে। অবশ্য বিজ্ঞানীরা বর্তমানে জেনেটিক পরীক্ষা (ডিএনএ-টেস্ট) করে মানুষের জীবনেতিহাসের কেবল বড় বড় বৈশিষ্ট্যগুলো বের করতে সক্ষম হচ্ছেন। অর্থাৎ তাঁরা ডিএনএ পরীক্ষা করে বলে দিচ্ছেন সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি হত্যা করেছে কিনা, ব্যভিচার করেছে কিনা, ধর্ষণ করেছে কিনা, কখনো মদ খেয়েছে কিনা ইত্যাদি।

মানবদেহের কোষে যখন কোড্ আকারে বড় বড় ঘটনাগুলো লিখিত পাওয়া যাচ্ছে তখন এতে সন্দেহ নেই যে, তাতে ছোট-বড় সমস্ত ঘটনাই লিপিবদ্ধ আছে। তার জীবনের ও তার পূর্ববর্তীদের (পিতামাতা, দাদা-দাদী, নানা-নানী ... দের) জীবনের ছোটবড় সমস্ত ঘটনাই তাতে লিপিবদ্ধ রয়েছে। হয়তো বিজ্ঞানের উন্নতির ধারাবাহিকতায় ভবিষ্যতে এমন সব য পাতি আবিষ্কৃত হবে যা দ্বারা খুটিনাটি সমস্ত ঘটনাই কথা সহ সচিত্রভাবেই উদ্ধার করা সম্ভব হবে। কারণ, ছবি ও কথাকে কোড্ আকারে রেকর্ড করা ও পুনরায় কোড্ থেকে ছবি ও কথা আকারে প্রস্ফুটন অসম্ভব কিছু নয়। তার প্রমাণ, এক সময় চলচ্চিত্র রেকর্ডিং দীর্ঘ সেলুলয়েড্ ফিতার ওপরে ধারাবাহিকভাবে অসংখ্য ছোট ছোট ফটো তুলে করা হলেও বর্তমানে মেমোরি বিশিষ্ট ডিজিট্যাল ফটোগ্রাফিক ও ভিডিও ক্যামেরায় চিত্র তুলতে কোনো ফিল্ম বা সেলুলয়েড্ ফিতা

ব্যবহার করতে হয় না। বরং লেখা, ছবি ও কথা সবই কোড আকারে লিপিবদ্ধ হয় এবং প্রয়োজন হলেই পুনরায় যে কোনো সময়ে তাকে লেখা, ছবি ও কথা আকারে প্রস্ফুটন করা হয়।

জেনেটিক বিজ্ঞানের আবিষ্কার থেকে এটাই সুস্পষ্ট হয়ে যাচ্ছে যে, বিজ্ঞানীদের দ্বারা স্টিল্-ফটোগ্রাফিক, ভিডিও ও ডিজিট্যাল ক্যামেরা আবিষ্কার এবং তা দিয়ে ছবি ও শব্দ রেকর্ডিং- এর প্রচলন করার কোটি কোটি বছর পূর্বেই সৃষ্টিকর্তা জীব সৃষ্টির সূচনাতেই প্রতিটি জীবের প্রতিটি কোষের মধ্যে উন্নততর গুপ্ত ডিজিট্যাল রেকর্ডিং- এর ব্যবস্থা করে রেখেছেন যাতে বিজ্ঞানীদের আবিষ্কৃত ডিজিট্যাল ভিডিও ক্যামেরার মতো কেবল কথা ও বাহ্যিক চিত্রই রেকর্ড হচ্ছে না, বরং অভ্যন্তরীণ অর্থাৎ চৈন্তিক ও চারিত্রিক অবস্থাও রেকর্ড হয়ে যাচ্ছে।

এ প্রসঙ্গে আরো উল্লেখ্য যে, প্রাণীর মৃত্যু ঘটলেও তার জিনের মধ্যে রেকর্ডকৃত তথ্য মুছে যায় না। এমনকি যে ব্যক্তি হাজার হাজার বছর আগে মারা গেছে তার চুল বা নখের একটি ক্ষুদ্র কণা পেলে তা পরীক্ষা করেও বিজ্ঞানীরা বলে দিতে পারেন যে, ঐ ব্যক্তি কেমন ছিলো - চুরি করেছিলো কিনা, খুন করেছিলো কিনা, ব্যভিচার করেছিলো কিনা; আমিষভোজী ছিলো, নাকি নিরামিষ- ভোজী ছিলো; সে কি বিবাহিত পিতামাতার সন্তান ছিলো, নাকি ব্যভিচারের ফসল ছিলো ইত্যাদি।

অতএব, এতে সন্দেহের অবকাশ নেই যে, প্রাণীর জীবকোষ পচে- গলে বা পুড়ে দৃশ্যতঃ নিশ্চিহ্ন হয়ে গেলেও, তার দেহের বিক্ষিপ্ত ও বিশ্লিষ্ট উপাদানগুলো যেখানে যে অবস্থায়ই থাকুক না কেন, তাতে তার পূর্ববর্তীদের জীবনেতিহাস সহ তার নিজের পুরো জীবনেতিহাস লিপিবদ্ধ রয়েছে।

শুধু তা- ই নয়, বরং সর্বশেষ আবিষ্কার- উদ্ভাবন থেকে প্রতীয়মান হয় যে, যেখানেই যে ঘটনা সংঘটিত হয় তার পারিপার্শ্বিকতায় অবস্থিত সকল বস্তুতে, এমনকি পারিপার্শ্বিক ধুলিকণায়ও তা লিপিবদ্ধ হয়ে যায়। সুতরাং কোনো অপরাধীর পক্ষেই যে পরকালীন আদালতে স্বীয় অপরাধ অস্বীকার করা সম্ভব হবে না

মানুষ বিশেষ পথনির্দেশের মুখাপেক্ষী

আমরা জানি যে, মানুষ অন্যান্য প্রাণী প্রজাতির ন্যায় বেঁচে থাকা ও বিকাশের জন্য স্রষ্টা প্রদত্ত সহজাত পথনির্দেশের অধিকারী। এছাড়াও ভালো- মন্দ ও ন্যায়- অন্যায়ের জ্ঞানও সে সহজাত পথনির্দেশের মাধ্যমে পেয়ে থাকে। কিন্তু মানুষ ও অন্যান্য প্রাণীপ্রজাতির মধ্যকার একটি মৌলিক পার্থক্য এই যে, তার জন্য পথনির্দেশের ক্ষেত্র ও প্রয়োজন অনেক বেশী, কিন্তু সে অনুপাতে তার প্রাপ্ত সহজাত পথনির্দেশের পরিমাণ ও মাত্রা অপেক্ষাকৃত কম। তবে সহজাত পথনির্দেশ বিহীন এই ক্ষেত্রগুলোতে পথনির্দেশ গ্রহণের জন্য তার মধ্যে বিরাট সম্ভাবনা নিহিত রাখা হয়েছে। উদাহরণস্বরূপ, বাবুই পাখীর আশ্রয়ের জন্য যে ধরনের গৃহের (বাসার) প্রয়োজন সহজাতভাবেই সে তা তৈরীর জ্ঞানের অধিকারী। এ ক্ষেত্রে কোনো বাবুই পাখীই ব্যতিক্রম নয়। কিন্তু মানবসন্তান সহজাতভাবে এরূপ বা অন্য কোনো ধরনের একটি শিল্পগুণ সমৃদ্ধ বাসগৃহ তৈরীর সহজাত জ্ঞানের অধিকারী নয়। তবে তার মধ্যে বিভিন্ন ও বিচিত্র ধরনের গৃহ নির্মাণের কৌশল আয়ত্ত করার সম্ভাবনা (প্রতিভা) নিহিত রয়েছে। সে গৃহনির্মাণের কৌশল শিক্ষা করে এবং বিচিত্র ধরনের গৃহ তৈরী করে; বাবুই পাখীর মতো শুধু এক ধরনের গৃহ নির্মাণ করে না। অন্যদিকে গৃহনির্মাণ জ্ঞানের ক্ষেত্রে সব বাবুই পাখী অভিন্ন হলেও এ ক্ষেত্রে সকল মানুষ সমান নয়। বিভিন্ন মানুষ বিভিন্ন ধরনের গৃহ নির্মাণ করতে সক্ষম; সকলে সকল ধরনের গৃহ নির্মাণ করতে সক্ষম নয়। অন্যান্য শিল্প ও জ্ঞান- বিজ্ঞানের ক্ষেত্রেও একই কথা।

এখানে প্রণিধানযোগ্য বিষয় এই যে, মানুষ তার মধ্যে নিহিত সম্ভাবনাকে কাজে লাগিয়ে বিভিন্ন শিল্প ও জ্ঞান- বিজ্ঞান শিক্ষা করে এবং আগ্রহ, ঝোঁকপ্রবণতা, মনোযোগ, নিষ্ঠা ও সুযোগ- সুবিধার পার্থক্যের কারণে এ ক্ষেত্রে বিভিন্ন লোকের মধ্যে পার্থক্য ঘটে থাকে। কিন্তু একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় এই যে, যে কোনো শিল্প বা জ্ঞানের প্রথম উদ্ভাবক অন্য কোনো মানুষের কাছ

থেকে তা শিখে নি। তাহলে সে তা পেলো কোথায়? এ ক্ষেত্রে সে দু'টি সূত্র থেকে তা পেতে পারে: হয় বিচারবুদ্ধি প্রয়োগ করে চিন্তাগবেষণার মাধ্যমে, নয়তো সৃষ্টিকর্তার পক্ষ থেকে প্রদত্ত পথনির্দেশের মাধ্যমে। দ্বিতীয়োক্ত ক্ষেত্রে অনেক সময় সে বুঝতেও পারে না যে, সে সৃষ্টিকর্তার নিকট থেকে পথনির্দেশ পাচ্ছে।

মানব জাতির অনেক গুরুত্বপূর্ণ জ্ঞান ও আবিষ্কার- উদ্ভাবনের সূচনার ইতিহাস হচ্ছে এরূপ যে, ব্যক্তি তা স্বে দেখেছে অথবা সহসাই তার মনে বিষয়টি খেলে গেছে - যার পিছনে কোনো পার্থিব কারণ খুঁজে পাওয়া যায় না। এমতাবস্থায় তা যে সৃষ্টিকর্তার পথনির্দেশ তাতে কোনোই সন্দেহ নেই।

এ ক্ষেত্রে লক্ষণীয় বিষয় এই যে, এ ধরনের পথনির্দেশ সকল মানুষের কাছে আসে না। একেকটি বিষয়ের পথনির্দেশ একজন বা দু'জন লাভ করেন এবং তারা তা অন্যদের মাঝে ছড়িয়ে দেন। এভাবে গোটা মানবজাতি তা থেকে উপকৃত হতে পারে।

বস্তুতঃ একেকটি বিষয়বস্তুর বিশেষ বৈশিষ্ট্যের কারণেই এরূপ ঘটে থাকে। অর্থাৎ প্রতিটি মানুষের নিকট এ ধরনের পথনির্দেশ আসা যরূরী নয়; একজনের কাছে আসা এবং অন্যদের তার কাছ থেকে শিখে নেয়াই যথেষ্ট। অন্যথায় প্রতিটি মানুষকে এ ধরনের পথনির্দেশ দেয়া হলে প্রথম মানুষ থেকে শুরু করে অনাগত ভবিষ্যতের শেষ মানুষটি পর্যন্ত প্রত্যেকের নিকটই 'সকল' জ্ঞান- বিজ্ঞান ও আবিষ্কার- উদ্ভাবনের পথনির্দেশ আসতে হতো। তাহলে আর একে জ্ঞান- বিজ্ঞান বা আবিষ্কার- উদ্ভাবন বলা যেতো না, বরং বলতে হতো সহজাত জ্ঞান। সে ক্ষেত্রে মানবজাতির সদস্যদের মধ্যে জ্ঞানসাধনা ও অধ্যবসায় বলতে কিছু থাকতো না; তাদের কাজের মধ্যে তেমন কোনো বৈচিত্র্যও থাকতো না। তাদের ও অন্যান্য প্রাণীর মধ্যে তেমন কোনো গুণগত পার্থক্য থাকতো না। কারণ, সে ক্ষেত্রে, বিশেষ অর্থে মানুষ যে স্বাধীনতার অধিকারী, তার তা থাকতো না। তার স্বাধীনতা হতো পশুপাখীর স্বাধীনতার সমতুল্য। সে পরিণত হতো জৈবিক যে । এ অবস্থায় মেধা- প্রতিভা, জ্ঞান, জ্ঞানের বিকাশ, জ্ঞানচর্চা, অধ্যবসায় ইত্যাদি বলতে কোনো কিছুর অস্তিত্ব থাকতো না।

উপরোক্ত আলোচনা থেকে আমরা এ উপসংহারে উপনীত হতে পারি যে, মানবপ্রজাতি যে সর্বজনীন সহজাত পথনির্দেশের অধিকারী তার বাইরে মানবজীবনের এমন সব ক্ষেত্র রয়েছে যা খুবই গুরুত্বপূর্ণ এবং যে জন্য পথনির্দেশের প্রয়োজন রয়েছে। তবে এ পথনির্দেশ সর্বজনীন হওয়া প্রয়োজন বা বাঞ্ছনীয় নয়। বরং এটাই স্বাভাবিক যে, কিছু লোক এ ধরনের পথনির্দেশ লাভ করবেন এবং অন্যদেরকে তা পৌঁছে দেবেন বা শিক্ষা দেবেন।

মানুষের জন্য এ ধরনের বিশেষ পথনির্দেশের প্রয়োজন কেবল শিল্প, বস্তুবিজ্ঞান ও তদসংক্রান্ত আবিষ্কার- উদ্ভাবনের মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়। বরং সামাজিক, রাজনৈতিক ও নৈতিক ক্ষেত্রে এর অধিকতর প্রয়োজন। বলা চলে যে, যদিও শিল্প, বস্তুবিজ্ঞান ও তদসংক্রান্ত আবিষ্কার- উদ্ভাবন সম্পর্কিত পথনির্দেশ খুবই কাম্য, তথাপি তা না পেলেও খুব বড় ধরনের ক্ষতি নেই। কারণ, মানুষ যদি বাড়ীঘর ও সভ্যতার উপকরণ নির্মাণ করতে না জানতো, চিকিৎসা শাস্ত্রের বিকাশ ঘটাতে না পারতো, শিল্প ও কলা সৃষ্টি করতে না পারতো, বরং বনে- জঙ্গলে, পাহাড়- পর্বতে, গাছের ডালে/ নীচে/ কোটরে বা পাহাড়ের গুহায় বসবাস করতো, বুনো ফল- শাকসব্জি ও কাঁচা মাছ- মাংস খেতো এবং রোদ- বৃষ্টি, হিংস্র বন্য প্রাণী ও রোগব্যাধির কারণে স্বল্পজীবী হতো; তাতে তার তেমন কোনো ক্ষতি হতো না। কারণ, শেষ পর্যন্ত তো তাকে মৃত্যুবরণ করতেই হয়। অতএব, তার আয়ু বিশ বছর, নাকি বিশ হাজার বছর তাতে তেমন কোনো পার্থক্য হতো না।

কিন্তু মানুষ যখন জানে যে, তার জন্য মৃত্যুর পরে এক অনন্ত জীবন অপেক্ষা করছে যেখানে তাকে ভালো- মন্দ ও ন্যায়- অন্যায়ের পরিপূর্ণ প্রতিফল ভোগ করতে হবে, তখন তার জন্য সামষ্টিক জীবনে সঠিক আচরণ তথা অন্যদের অধিকার বিনষ্ট না করা, বরং তার ওপর অন্যদের যে অধিকার রয়েছে তা যথাযথভাবে আদায় করা অপরিহার্য। কিন্তু এ ব্যাপারে তার মধ্যে যে সহজাত পথনির্দেশ রয়েছে তাকে সে যথেষ্ট মনে করে না।

মানুষের এ বিশেষ পথনির্দেশের প্রয়োজনীয়তা কতোগুলো ক্ষেত্রে খুবই প্রকট হয়ে ধরা পড়ে। যেমন: মানুষের বেঁচে থাকার জন্য খাদ্যের প্রয়োজন। প্রকৃতিতে পান ও ভক্ষণের উপযোগী

অনেক কিছু রয়েছে এবং মানুষ পরীক্ষা- নিরীক্ষা চালিয়ে প্রাকৃতিক উপাদানের দ্বারা নতুন নতুন কৃত্রিম বা যৌগিক খাদ্য- পানীয় প্রস্তুত করতে পারে। কিন্তু কতক খাদ্য- পানীয় তার শরীর, মন ও চরিত্রের জন্য ক্ষতিকারক হতে পারে। ক্ষেত্রবিশেষে এর ক্ষতিকারকতা অত্যন্ত দেরীতে প্রকাশ পেতে পারে এবং তার প্রভাব অত্যন্ত দীর্ঘ মেয়াদী, এমনকি পুরুষানুক্রমে বিস্তৃত হতে পারে। এসব ক্ষতিকারক খাদ্য- পানীয় ব্যক্তিগত পরীক্ষা- নিরীক্ষার (অভিজ্ঞতার) মাধ্যমে চিহ্নিত করা খুবই ঝুঁকিবহুল; এমনকি ঝুঁকি নিয়েও যথাসময়ে তা চিহ্নিত করা সম্ভব না- ও হতে পারে, বরং ঐ সব বস্তু ভক্ষণের ক্ষতি প্রকাশ পেতে বিলম্ব হওয়ায় ইতিমধ্যে আরো অনেকে তা পান বা ভক্ষণ করে বসতে পারে। অতএব, এরূপ ক্ষেত্রে বিশেষ পথনির্দেশের প্রয়োজন যাতে পথনির্দেশ লাভকারী ব্যক্তি অন্যদেরকে তা পৌঁছে দিতে পারেন।

দ্বিতীয়তঃ মানুষের স্বাধীনতার দাবী হচ্ছে পথনির্দেশ লঙ্ঘনের ক্ষমতার অধিকারী হওয়া এবং তার এরূপ ক্ষমতার অধিকারী হওয়া মানে তা লঙ্ঘনের সম্ভাবনা উড়িয়ে দেয়া যায় না। কিন্তু এ ধরনের লঙ্ঘনের প্রতিক্রিয়ায় মানুষের বিচারবুদ্ধি অসুস্থ হয়ে পড়তে পারে, ফলে তার মধ্যকার সহজাত পথনির্দেশ, বিশেষতঃ ন্যায়- অন্যায় ও ভালো- মন্দের অনুভূতি বিনষ্ট হয়ে যেতে পারে; অন্ততঃ দুর্বল হয়ে পড়তে পারে। এ কারণে তার জন্য এমন কোনো পথনির্দেশকের প্রয়োজন যার মধ্যে কোনো অবস্থায়ই ভালো- মন্দ ও ন্যায়- অন্যায়ের সহজাত অনুভূতি বিন্দু পরিমাণেও বিনষ্ট বা দুর্বল হবে না। এরূপ ব্যক্তি সৃষ্টিকর্তা অপরিহার্য সত্তার কাছ থেকে পথনির্দেশ লাভ করবেন এবং তা অন্যদের নিকট পৌঁছে দেবেন।

তৃতীয়তঃ কারণ ও ফলশ্রুতি বিধির আওতাধীন জগতে মানুষ ক্ষেত্রবিশেষে এমন এমন অবস্থার সম্মুখীন হতে পারে যে, সহজাত পথনির্দেশের ভিত্তিতে সে যে সব কর্তব্যবোধ অনুভব করে তার মধ্যকার দু'টি কর্তব্যবোধ পরস্পরের বিপরীতে অবস্থান নিয়েছে। এমতাবস্থায় সে বুঝতে পারছে না তার করণীয় কী। উদাহরণস্বরূপ, সহজাত পথনির্দেশের মাধ্যমে সে জানে যে, মিথ্যা বলা অত্যন্ত ঘৃণ্য কাজ। অন্যদিকে সে এ- ও জানে যে, কোনো যালেমকে সাহায্য করা বা সরাসরি সাহায্য না করলেও যার ফলে যালেমের জন্য যুলুম করার পথ খুলে যায় এমন কাজ সম্পাদন

করা মস্ত বড় অন্যায়। একই সাথে, যে কোনো মূল্যে নিজেকে যুলুম- নির্যাতন ও ক্ষতি থেকে রক্ষা করার জন্য তার মধ্যে রয়েছে দুর্বার সহজাত আকাঙ্ক্ষা। এমতাবস্থায়, ধরা যাক, এক ব্যক্তি কোনো যালেমের দ্বারা তাড়িত হয়ে এসে এই ব্যক্তির গৃহে আত্মগোপন করলো। অতঃপর অচিরেই উন্মুক্ত তলোয়ার হাতে নিয়ে একজন যালেম এসে তার কাছে জানতে চাইলো পলাতক ব্যক্তিকে দেখেছে কিনা। এ ক্ষেত্রে সে বুঝতে পারছে না, সত্য বলবে, নাকি মিথ্যা বলে মযলূম লোকটিকে বাঁচাবার চেষ্টা করবে, নাকি সত্য বলবে কিন্তু মযলূমকে যালেমের হাতে তুলে দিতে অস্বীকার করে নিজের নিরাপত্তাকে হুমকির সম্মুখীন করবে। এমতাবস্থায় সে সৃষ্টিকর্তার পক্ষ থেকে বিশেষ পথনির্দেশ কামনা করে।

চতুর্থতঃ মানুষ তার নিজের ও পারিপার্শ্বিক বিশ্বের পিছনে নিহিত বিস্ময়কর সৃষ্টিকুশলতা এবং সুশৃঙ্খল পরিচালনা লক্ষ্য করে সৃষ্টিকর্তার মহানত্ব ও মহত্ব স্মরণ করে বিস্ময়ে তাঁর প্রতি শ্রদ্ধাবনত হয়। সেই সাথে সে তার নিজের প্রতি স্রষ্টার সীমাহীন অনুগ্রহ দেখেও কৃতজ্ঞতায় মাথা নুইয়ে দেয়। তার মন বলে, মহান সৃষ্টিকর্তা এ বিশ্বজগৎকে উদ্দেশ্যহীনভাবে সৃষ্টি করেন নি। নিঃসন্দেহে এর কোনো সুনির্দিষ্ট লক্ষ্য রয়েছে। তেমনি তার মতো বিস্ময়কর ও জটিল বিচারবুদ্ধি সম্পন্ন প্রাণী সৃষ্টি এবং তার প্রতি এতো দয়া- অনুগ্রহ প্রদর্শন, তার জন্মের আগে থেকেই মাতৃদুগ্ধ, স্নেহ- মমতা- ভালোবাসা, খাদ্য- পানীয়, আলো- বাতাস ইত্যাদি প্রয়োজনীয় সব কিছুর ব্যবস্থা করে রাখা হয়েছে। এ কোনো অর্থহীন বা উদ্দেশ্যহীন কাজ হতে পারে না। পরম জ্ঞানী স্রষ্টার পক্ষ থেকে উদ্দেশ্যহীন কাজ হতে পারে না। তার মনে প্রশ্ন জাগে, কী সে উদ্দেশ্য? সে চিন্তা করে, স্রষ্টার সাথে তার সম্পর্ক কী? তার নিকট স্রষ্টার কোনো দাবী আছে কি? থাকলে কী সে দাবী? কীভাবে সে দাবী পূরণ করতে হবে? কীভাবে সৃষ্টিকর্তাকে সন্তুষ্ট করা যাবে? এ জন্যও সে সৃষ্টিকর্তার নিকট থেকে পথনির্দেশ কামনা করে। সে চায়, সৃষ্টিকর্তাই তাকে তাঁর পসন্দনীয় পথ দেখিয়ে দিন।

আইনপ্রণেতার প্রয়োজনীয়তা

মানুষ সামাজিক প্রাণী। কিন্তু পিপিলিকা বা মৌমাছির ন্যায় সামাজিক প্রাণীর জীবন থেকে মানুষের সামাজিক জীবন সম্পূর্ণ ভিন্ন ধরনের। অন্যান্য সামাজিক প্রাণীর সমাজবদ্ধতা সম্পূর্ণরূপে বা প্রায় সম্পূর্ণরূপে সহজাত পথনির্দেশের অধীন যার লঙ্ঘন তাদের পক্ষে সম্ভব নয়, বা একান্তই ব্যতিক্রম। ফলে ঐ সব প্রাণীর সামাজিক শৃঙ্খলা ও শাসন-প্রশাসনও সহজাত এবং জটিলতামুক্ত।

কিন্তু মানুষের সামাজিক জীবন পুরোপুরি সহজাত প্রবণতার অধীন নয়। মানুষের মধ্যে একদিকে যেমন সমাজবদ্ধ জীবনের সহজাত প্রবণতা রয়েছে, অন্যদিকে রয়েছে স্বাধীনতার সহজাত অনুভূতি। ফলে মানুষ চাইলে সমাজ থেকে বিচ্ছিন্ন জীবনযাপন বা সামাজিক শৃঙ্খলা ভঙ্গ করতেও সক্ষম। অন্যান্য সমাজবদ্ধ প্রাণীকুলের সমাজে শাসন-প্রশাসন এবং কর্মবিভাজনও সহজাত। ফলে সেখানে শাসন-প্রশাসন ও কর্মবিভাজন নিয়ে কোনোরূপ অসন্তোষ, বিরোধ, বিসম্বাদ ও বিদ্রোহের প্রশ্ন আসে না। (অবশ্য সর্বসাম্প্রতিক আবিষ্কার অনুযায়ী পিপিলিকা সমাজ ব্যতিক্রম; সেখানে অসন্তোষ এবং বিদ্রোহ-ষড়য ও আছে, তবে নিঃসন্দেহে মানব সমাজের পর্যায়ের নয়।) কিন্তু মানবসমাজে শাসন-প্রশাসন এবং কর্মবিভাজন ও ভালোমন্দ কর্মের প্রতিদান নিয়ে অহরহ মতপার্থক্য ও সংঘাত দেখা দেয়। তাই মতপার্থক্য ও সংঘাত এড়ানোর লক্ষ্যে মানুষের সমাজের জন্য আইন প্রণয়ন অপরিহার্য হয়ে পড়ে।

কিন্তু প্রশ্ন হচ্ছে, এ আইন প্রণয়ন করবে কে? এ আইন প্রণয়নের দায়িত্ব যিনি বা যারা পালন করবেন তাঁকে বা তাঁদেরকে অবশ্যই এ ব্যাপারে প্রয়োজনীয় যোগ্যতার অধিকারী হতে হবে। নয়তো তাঁরা তাঁদের প্রণীত আইনের দ্বারা সমাজের অন্ততঃ কিছু মানুষকে অবশ্যই ক্ষতিগ্রস্ত করবেন।

মানুষের সমাজ পরিচালনার লক্ষ্যে যিনি একদিকে মানুষের জন্য কল্যাণকর, অন্যদিকে নির্ভুল ও ক্ষতিকারকতামুক্ত - এমন আইন, বিশেষতঃ মৌলিক আইন প্রণয়ন করতে চাইবেন তাঁর জন্য যে যোগ্যতা প্রয়োজন সংক্ষেপে তা হচ্ছে:

১) তাঁকে মানুষ বিষয়ক জ্ঞানের ক্ষেত্রে পূর্ণাঙ্গ বিশেষজ্ঞ হতে হবে। অর্থাৎ তাঁকে মানুষের শরীর ও মনের ছোট- বড় সকল তথ্য, সকল বৈশিষ্ট্য ও রহস্য, তার সহজাত প্রবণতাসমূহ, আবেগ- উদ্দীপনা, আশা- আকাঙ্ক্ষা, সুপ্রবৃত্তি ও কুপ্রবৃত্তি এবং শক্তি ও দুর্বলতা সম্পর্কে খুটিনাটি সহ পরিপূর্ণ জ্ঞানের অধিকারী হতে হবে।

২) তাঁকে মানুষের শারীরিক ও মানসিক সব রকমের সম্ভাব্য পারস্পরিক সম্পর্ক ও তা থেকে সমাজে যে সব পরিস্থিতির উদ্ভব হওয়া সম্ভব এবং মানুষের ব্যক্তিগত ও সামষ্টিক জীবনে তার সম্ভাব্য প্রভাব সম্বন্ধে পুরোপুরি ওয়াকিফহাল হতে হবে।

৩) ব্যক্তি- মানুষের ও মানব সমাজের মধ্যে যে সব প্রতিভা ও সম্ভাবনা এবং পূর্ণতার বীজ সুপ্ত বা লুক্কায়িত রয়েছে সে সম্বন্ধে তাঁর পুরোপুরি জানা থাকতে হবে।

৪) নিকট ও দূর ভবিষ্যতে মানবসমাজে যে সব ঘটনা সংঘটিত হবার সম্ভাবনা আছে এবং তা ব্যক্তি ও সমাজের ওপর কী ধরনের ইতিবাচক ও নেতিবাচক প্রভাব বিস্তার করতে পারে সে সম্পর্কে তাঁর জানা থাকতে হবে।

৫) যে সব নীতি অনুসরণ করে মানুষের পক্ষে পূর্ণতায় উপনীত হওয়া সম্ভব তার সব কিছু সম্বন্ধে এবং যে সব নীতি তার পূর্ণতায় উপনীত হওয়ার পথে বাধা হয়ে দাঁড়াতে পারে সে সম্বন্ধেও তাঁকে ওয়াকিফহাল থাকতে হবে। তেমনি তাঁকে পূর্ণতা অভিমুখী বিভিন্ন পথের মধ্য থেকে নিকটতম পথ বেছে চিহ্নিত করা ও মানুষকে সেদিকে চালিত করার যোগ্যতার অধিকারী হতে হবে।

৬) সমাজে তাঁর এমন কোনো স্বার্থ থাকবে না যা আইন প্রণয়নকালে তাঁকে সমাজের বা সমাজের সদস্যদের একাংশের স্বার্থ জলাঞ্জলি দিয়ে হলেও স্বীয় স্বার্থ সংরক্ষণে প্ররোচিত করতে পারে।

৭) তাঁকে সকল প্রকার অপরাধপ্রবণতা এবং ভুল- ত্রুটি ও অপরাধের ‘সম্ভাবনা’ থেকে পুরোপুরি মুক্ত হতে হবে এবং ভাবাবেগ,   অনুনয়- বিনয় ও তোষামোদীতে নরম না হওয়া ও কোনো রকম চাপের মুখে নতি স্বীকার না করার মতো দৃঢ়তার অধিকারী হতে হবে।

নিঃসন্দেহে সৃষ্টিকর্তার পক্ষ থেকে প্রাপ্ত বিশেষ পথনির্দেশ ও জ্ঞান এবং তাঁর পক্ষ থেকে প্রাপ্ত সংরক্ষণের অধিকারী ব্যক্তি ছাড়া কারো পক্ষে এরূপ গুণের অধিকারী হওয়া সম্ভব নয়।

স্রষ্টা মনোনীত পথনির্দেশক

বলা বাহুল্য যে, এ ধরনের পথনির্দেশ প্রত্যেকের নিকট আসার প্রয়োজন হয় না। কারণ, তাহলে তা হতো সহজাত পথনির্দেশ এবং তার ফলে মানুষের স্বাধীনতা অর্থহীন হয়ে যেতো। আর বাস্তব অভিজ্ঞতায় আমরা দেখতে পাই যে, আমাদের সকলের নিকট এ ধরনের পথনির্দেশ আসে নি। তাই কোনো জনগোষ্ঠীর উদ্দেশে এ ধরনের পথনির্দেশ পাঠাতে হলে তা দু'একজনের নিকট আসাই যথেষ্ট - যারা তা অন্যদের নিকট পৌঁছে দেবেন। শুধু তা-ই নয়, তাঁরা লোকদেরকে তা শিক্ষা দেবেন এবং তদনুযায়ী চলতে সাহায্য করবেন।

এ ধরনের ব্যক্তিদের দায়িত্ব হচ্ছে মানুষের মধ্যে বিচারবুদ্ধি ('আক্ল্)-কে জাগ্রত ও শানিত করা এবং অসুস্থতা ও বিকৃতি থেকে সুস্থ ও মুক্ত করা, মানুষের মধ্যে ভালো-মন্দ, ন্যায়-অন্যায় ও ঔচিত্য-অনৌচিত্যের যে সহজাত পথনির্দেশ রয়েছে তাকে শক্তিশালী ও দ্বিধাদ্বন্দ্বমুক্ত করা, মানুষের বিচারবুদ্ধি যে সব বিষয়ে সঠিক ধারণায় পৌঁছতে সক্ষম নয় বা সঠিক ও ভুল সিদ্ধান্তের মধ্যে পার্থক্য নির্ণয়ে সক্ষম নয় সে সব বিষয়ে সঠিক পথনির্দেশ প্রদান করা এবং যারা সহজাত পথপ্রদর্শন লঙ্ঘন করে সঠিক পথ থেকে বিচ্যুত হয়েছে অথচ সঠিক পথে ফিরে আসতে চায় তাদেরকে হাত ধরে সঠিক পথে তুলে আনা ও সে পথে চলতে সহায়তা করা।

বিচারবুদ্ধির দাবী এই যে, এ ধরনের ব্যক্তি সৃষ্টিকর্তার নিকট থেকে শুধু পথনির্দেশই লাভ করবেন না, বরং তা মানুষের কাছে পৌঁছে দেয়া ও যারা তা গ্রহণ করবে তাদেরকে সঠিক পথে পরিচালনার দায়িত্বও লাভ করবেন এবং সৃষ্টিকর্তার পক্ষ থেকে তাঁর বিশেষ পথনির্দেশ লাভ ও দায়িত্ব প্রাপ্তির বিষয়টি তাঁর নিজের নিকট এমনভাবে সুস্পষ্ট থাকবে যে, এ ব্যাপারে তাঁর মধ্যে বিন্দুমাত্র সন্দেহ বা অস্পষ্টতা থাকবে না। এ কারণেই কোনো রকমের বিপদাপদ, এমনকি মৃত্যুর ঝুঁকিও তাঁকে স্বীয় দায়িত্ব পালন থেকে বিরত রাখতে পারবে না। তাঁর নিকট এ বিষয়ের সুস্পষ্টতা হতে হবে সাধারণ মানুষের নিকট পার্থিব বিষয়াদির সুস্পষ্টতারই অনুরূপ। অর্থাৎ তিনি পার্থিব জগতের পাশাপাশি ভিন্ন মাত্রার অপার্থিব জগতসমূহের সাথে, বিশেষতঃ সৃষ্টিকর্তার

সাথে - পার্থিব জগতের সাথে আমাদের সম্পর্কের ন্যায় - সুস্পষ্ট ও সন্দেহাতীত সম্পর্কের অধিকারী হবেন।

এ ধরনের লোকদেরকে আরবী ভাষায় ‘নবী’, ও ‘রাসূল’, ফার্সী ভাষায় ‘পায়াম্বার্’ ও ‘পয়গাম্বর’ এবং ইংরেজী ভাষায় ‘প্রোফেট্’ বলা হয়। অন্যান্য ভাষায়ও একই তাৎপর্য বুঝাবার জন্য তাদের নিজ নিজ বিশেষ পরিভাষা আছে বা উল্লিখিত পরিভাষাসমূহের কোনো কোনোটি ব্যবহৃত হয়ে থাকে। যে ভাষায় যে পরিভাষাই ব্যবহৃত হোক না কেন, যুগে যুগে এ দায়িত্বের অধিকারী বহু ব্যক্তির আগমন ঘটে।

অবশ্য যে কোনো খাঁটি জিনিসের যেমন নকল থাকতে পারে তেমনি যুগে যুগ নবী- রাসূল হবার মিথ্যা দাবীদার লোকের আবির্ভাবও কম ঘটে নি। তাই এ দায়িত্ব লাভের দাবীদারদের দাবী অবশ্যই বিচারবুদ্ধির আলোকে পরীক্ষা করে নেয়া উচিত যাতে সত্য দাবীদার ও মিথ্যা দাবীদারদের মধ্যে পার্থক্য করা যায় এবং মিথ্যা দাবীদারদের প্রতারণা থেকে বেঁচে থাকা ও সত্য দাবীদারদের অনুসরণ করা সম্ভবপর হয়।

নবী চেনার উপায়

সর্বশক্তিমান ও মহাজ্ঞানময় সৃষ্টিকর্তার নিকট থেকে বিশেষ পথনির্দেশের প্রয়োজনীয়তা মানব প্রজাতির সৃষ্টিপ্রকৃতিগত বৈশিষ্ট্য। কাজেই এটা নিঃসন্দেহে বলা যেতে পারে যে, প্রথম মানুষ থেকেই মানব প্রজাতি এ প্রয়োজন অনুভব করে আসছে। যদিও প্রথম মানুষের নিজের জন্য শুরুর দিকে বিশেষ পথনির্দেশের প্রয়োজনীয়তা খুব বেশী ছিলো না। কারণ, তখন কোনো সামষ্টিক ও সামাজিক সমস্যা ছিলো না এবং স্বভাবতঃই ধরে নেয়া যেতে পারে যে, প্রকৃতির সাথে প্রথম মানুষের সম্পর্ক ছিলো সরল ও সীমিত। যেমন: প্রকৃতিতে প্রাপ্ত ভক্ষণযোগ্য দ্রব্যাদির মধ্যে কী খাওয়া উচিত ও কী খাওয়া উচিত নয়, কেবল সে সম্পর্কে তাঁর নিশ্চিত ধারণার প্রয়োজন ছিলো।

অন্যদিকে সৃষ্টিকর্তার অস্তিত্ব ও তাঁর সাথে মানুষের সম্পর্ক বিচারবুদ্ধিজাত এমন জ্ঞান যা অনেকটা সহজাত জ্ঞানের কাছাকাছি সুনিশ্চিত জ্ঞান। তবে এ সম্পর্কের কারণে কোনো কিছু করণীয় আছে কিনা বা তার কার্যতঃ বহিঃপ্রকাশ কীভাবে ঘটাতে হবে প্রথম মানুষের জন্য তা জানারও প্রয়োজন ছিলো। তেমনি তাঁর সঙ্গিনীর সাথে তাঁর আচরণ, তাঁর কাছ থেকে প্রাপ্তব্য অধিকার ও তাঁর প্রতি পালনীয় দায়িত্ব- কর্তব্য কী হবে তা- ও জানার প্রয়োজন ছিলো বলে মনে হয়। অতএব, নিঃসন্দেহে সৃষ্টিকর্তার পক্ষ থেকে এ সব ব্যাপারে তাঁকে বিশেষ পথনির্দেশ পৌঁছানো হয়ে থাকবে। শুরুতে এর বেশী কিছু পথনির্দেশের প্রয়োজন হওয়ার কথা নয়।

বিচারবুদ্ধির দাবী অনুযায়ী প্রথম মানুষের জন্ম ছিলো পিতামাতা বিহীন। কারণ, তাঁর আগে কোনো মানুষ ছিলেন না যে, তাঁর পিতামাতা হবেন। অর্থাৎ তিনি ছিলেন সরাসরি সৃষ্টিকর্তার সৃষ্টি- ইচ্ছার ফসল - তা স্রষ্টা তাঁকে যে প্রক্রিয়ায়ই সৃষ্টি করে থাকুন না কেন (যা আমাদের অত্র আলোচনায় অপরিহার্য প্রসঙ্গ নয়)। তাই নিঃসন্দেহে তিনি ছিলেন কলুষমুক্ত। কারণ, পিতার প্রাণবীজ থেকে মাতৃগর্ভে জন্মগ্রহণকারী মানবশিশুই পিতামাতার ও তাদের পূর্বপুরুষদের শারীরিক- মানসিক বৈশিষ্ট্য জিনে ধারণ করে ভ্রুণে পরিণত হয় এবং সে ভ্রুণ মাতৃগর্ভে

থাকাকালীন সময়ে তার মাতার শারীরিক- মানসিক বৈশিষ্ট্য দ্বারা প্রভাবিত হয়। আর জন্ম নেয়ার পর থেকে সে পারিবারিক ও সামাজিক পরিবেশ হতে প্রভাব গ্রহণ করতে থাকে। সৃষ্টিকর্তার প্রত্যক্ষ সৃষ্টি হওয়ার কারণে প্রথম মানুষ ও তাঁর সঙ্গিনী অবশ্যই এ ধরনের বৈশিষ্ট্য ও প্রভাব থেকে মুক্ত ছিলেন, বরং তাঁদের মধ্যে স্রষ্টাপ্রদত্ত বৈশিষ্ট্যসমূহই ছিলো একমাত্র বৈশিষ্ট্য। তাই তাঁদের নিষ্কলুষতা বা পাপমুক্ততা প্রশ্নাতীত।

কিন্তু প্রথম মানুষের সন্তানদের নিয়ে সমাজের বিকাশ শুরু হলে এ ক্ষুদ্র সমাজের সদস্যদের পারস্পরিক সম্পর্ক ও স্বার্থ নির্ণয় করতে গিয়ে বিশেষ পথনির্দেশের প্রয়োজনীয়তা দেখা দেয়। নিঃসন্দেহে সৃষ্টিকর্তার প্রত্যক্ষ সৃষ্টি নির্মল অন্তঃকরণের অধিকারী ও সকল সদস্যের নিকট সমভাবে গ্রহণযোগ্যতার অধিকারী হিসেবে প্রথম মানুষটিই ছিলেন এ পথনির্দেশ লাভের জন্য যোগ্যতম ব্যক্তি। অবশ্য তখনো প্রয়োজনীয় পথনির্দেশের ক্ষেত্র ও মাত্রা ছিলো খুবই সীমিত। কিন্তু তাঁর সন্তানদের বংশধরদের ও তদপরবর্তীদের নিয়ে বৃহত্তর সমাজের গঠনপ্রক্রিয়ায় পথনির্দেশের ক্ষেত্র ও তার প্রয়োজনের মাত্রা ক্রমান্বয়েই সম্প্রসারিত হচ্ছিলো এবং নিঃসন্দেহে সে প্রয়োজন অনুযায়ী সৃষ্টিকর্তার কাছ থেকে প্রাপ্ত পথনির্দেশের পরিমাণও বৃদ্ধি পাচ্ছিলো।

পরবর্তীকালে মানবসমাজের অধিকতর বিস্তার লাভ এবং প্রথম মানুষ তথা প্রথম নবীর কাছ থেকে প্রাপ্ত পথনির্দেশ যথাযথভাবে সংরক্ষিত না থাকা, তদসহ স্থান- কালের ব্যবধান থেকে উদ্ভূত মানবিক সমস্যাবলীর সমাধানের লক্ষ্যে নতুন নতুন নবীর আবির্ভাব প্রয়োজনীয় হয়ে পড়ে।

যেহেতু সীমালঙ্ঘন, অপরাধ ও মিথ্যাচারের মতো নেতিবাচক বৈশিষ্ট্যসমূহের ‘সম্ভাবনা’ স্বাধীনতার অনিবার্য দাবী, সেহেতু নবীকে অস্বীকার করা এবং নবী না হয়েও নিজেকে নবী বলে দাবী করার সম্ভাবনা থেকে যায়। কারণ, জন্মগত ও সকলের জন্য সম- অবস্থানগত মর্যাদার অধিকারী প্রথম মানুষের নবী হওয়ার বিষয়টি যেভাবে সকলের বিচারবুদ্ধির কাছে সমভাবে ও অকাট্যভাবে সুস্পষ্ট ছিলো, পরবর্তী নবুওয়াত- দাবীকারীদের ক্ষেত্রে তা সকলের কাছে ত প সমভাবে ও অকাট্যভাবে সুস্পষ্ট হওয়া সম্ভব ছিলো না। এ কারণেই প্রথম নবীর পরবর্তী নবীগণকে সঠিকভাবে চেনার জন্য এক বা একাধিক নির্ভুল পথ থাকা অপরিহার্য।

নবী হবার দাবীদার কোনো ব্যক্তি নবী কিনা সে সম্পর্কে কয়েকটি পন্থায় নিশ্চিত হওয়া যেতে পারে। প্রথম পন্থা এই যে, প্রথম নবী কর্তৃক বা পরবর্তী যে কোনো নবী (যার নবুওয়াত অকাট্যভাবে প্রমাণিত) কর্তৃক কাউকে নবী হিসেবে পরিচিত করিয়ে দেয়া হবে। এভাবে নিশ্চিত নবী কর্তৃক নবী হিসেবে পরিচিত করিয়ে দেয়া ব্যক্তি যে সত্যি সত্যিই নবী, তাতে কোনোই সন্দেহের অবকাশ থাকতে পারে না। কারণ, এরূপ ব্যক্তির নবী হওয়ার ব্যাপারে সন্দেহ পোষণ করা মানে হচ্ছে উক্ত নিশ্চিত নবীর কথার সত্যতায় তথা তাঁর নবুওয়াতেই সন্দেহ পোষণ করা, যেহেতু বিচারবুদ্ধির রায় অনুযায়ী নবী মিথ্যা বলতে পারেন না এবং মিথ্যাবাদী ব্যক্তি নবী হতে পারে না।

একজন নবী কর্তৃক পরবর্তী কোনো নবীকে পরিচিত করিয়ে দেয়ার কাজটি দুইভাবে সম্পাদিত হতে পারে। প্রথমতঃ নবী সরাসরি কোনো ব্যক্তিকে নবী হিসেবে পরিচিত করিয়ে দিতে পারেন। এটা কেবল নবীর সমসাময়িক ব্যক্তি সম্পর্কেই সম্ভব। দ্বিতীয়তঃ পরবর্তীকালে আবির্ভূত হবেন এমন কোনো নবীর পরিচয় এমনভাবে পেশ করা হতে পারে (যেমন: ভবিষ্যত নবীর পিতার নাম-ঠিকানা, জন্মস্থান, জন্মকাল, বিশেষ বৈশিষ্ট্য ইত্যাদি) - যাতে লোকদের পক্ষে খুব সহজেই তাঁকে নবী হিসেবে চিনতে পারা সম্ভব হয়।

দ্বিতীয়োক্ত ক্ষেত্রে ভবিষ্যদ্বাণীকারী নবী ও ভবিষ্যদ্বাণীকৃত নবীর মধ্যকার স্থানগত, কালগত ও ভাষাগত ব্যবধান নবীকে চেনার ক্ষেত্রে সাধারণ মানুষের সামনে বাধা হয়ে দাঁড়াতে পারে। বিশেষ করে এ ব্যবধান যদি খুবই বেশী হয়, যেমন: হাজার হাজার মাইল, শত শত বছর এবং পারস্পরিক সম্পূর্ণ দুর্বোধ্য ভাষাগত ব্যবধান। এছাড়া ভবিষ্যদ্বাণীকারী নবীর প্রকাশ্য বিরোধিতাকারীরা এবং বাহ্যতঃ অনুসারী ভণ্ড-প্রতারকরা নবীর ভবিষ্যদ্বাণীকে বিকৃত করতে পারে। এ বিকৃতি মূল বক্তব্যেও হতে পারে, হতে পারে অনুবাদে অথবা ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণে। যদিও এতদসত্ত্বেও সূক্ষ্মদর্শী গবেষকদের পক্ষে গবেষণা করে সত্য উদঘাটন করা সম্ভব, কিন্তু সাধারণ মানুষের পক্ষে তা সম্ভব নয়। অন্যদিকে গবেষকগণ যে এতদসংক্রান্ত গবেষণা করবেনই, বা গবেষণায় সফল হবেনই অথবা সত্যের সন্ধান পেলেই সে সত্য প্রকাশ করবেনই

- তার নিশ্চয়তা নেই। তেমনি সত্যের দুশমনরা এ সব গবেষণাল ফলাফলকে বিকৃত ব্যাখ্যার মাধ্যমে প্রত্যাখ্যান করে বিভ্রান্তি সৃষ্টি করতে পারে।

এ সব কারণে দ্বিতীয়োক্ত ক্ষেত্রে নবীকে চেনার জন্যে আরো পন্থার প্রয়োজন রয়েছে। সে পন্থা এমন হওয়া চাই যার ফলে পূর্ববর্তী নবীর পক্ষ থেকে ভবিষ্যদ্বাণী করা হোক বা না- ই হোক এবং ভবিষ্যদ্বাণী করা হয়ে থাকলে তা অবিকৃত থাকুক বা না- ই থাকুক, উভয় অবস্থায়ই যেন নবুওয়াত দাবীকারীর দাবীর সত্যাসত্য সম্পর্কে নিশ্চিত হওয়া যেতে পারে। এ পন্থাটি হচ্ছে অলৌকিক ঘটনা - যাকে আরবী পরিভাষায় বলা হয় মু‘জিযাহ্ (معجزة)।

মু'জিযাহ্ কী?

মু'জিযাহ্ হচ্ছে মানুষের জানা কারণ ও ফলশ্রুতি বিধি বহির্ভূত অলৌকিক ঘটনা যা কোনোরূপ বৈজ্ঞানিক প্রক্রিয়া ও উপায়- উপকরণ ছাড়াই ঘটানো হয় এবং যিনি ঘটান তিনি সে ঘটনাকে স্বীয় নবুওয়াত- দাবীর সত্যতার প্রমাণ হিসেবে পেশ করে থাকেন।

সাধারণ কারণ ও ফলশ্রুতি বিধির আওতায় যে সব ঘটনা সংঘটিত হয় তা যত বড় ধরনের ঘটনাই হোক না কেন, তা মু'জিযাহ্ নয়। যেমন: চন্দ্রগ্রহণ, সূর্যগ্রহণ, ঝড়- বৃষ্টি, প্লাবন, ভূমিকম্প ইত্যাদি। বিভিন্ন জ্ঞান- বিজ্ঞানের দ্বারা হিসাব- নিকাশ করে কেউ হয়তো দাবী করতে পারে যে, সে অমুক তারিখে বা দিনে অমুক সময় সূর্যগ্রহণ ঘটাবে এবং কথিত সময়ে তা- ই ঘটলো। এটা মু'জিযাহ্ রূপে গণ্য হবে না। কারণ, সূর্যগ্রহণ একটি প্রাকৃতিক ঘটনা; সে হয়তো হিসাব- নিকাশ করে এর সঠিক সময় বের করতে পেরেছিলো। তেমনি বৈজ্ঞানিক উপায়- উপকরণের দ্বারা কোনো অস্বাভাবিক ঘটনা ঘটানো হলে তা মু'জিযাহ্ নয়। যেমন: মুরগী তা দিয়ে তিন সপ্তাহে ডিম থেকে বাচ্চা ফুটায়। এমতাবস্থায় কেউ ইনকিউবেটরের সাহায্যে বা, ধরুন, কোনো রাসায়নিক উপাদান মাখিয়ে দিয়ে এক ঘণ্টার মধ্যে ডিম থেকে বাচ্চা ফুটিয়ে দেখালো। এটাও মু'জিযাহ্ হিসেবে গণ্য হবে না।

কিন্তু কেউ যদি কোনোরূপ য পাতির আশ্রয় না নিয়ে এবং রাসায়নিক উপাদান ব্যবহার না করে শুধু মৌখিক নির্দেশের দ্বারা মুহূর্তের মধ্যে ডিম থেকে বাচ্চা বের করে আনতে পারেন তাহলে সে কাজটি মু'জিযাহ্ হবার সম্ভাবনা থাকে। তেমনি কেউ যদি মাটিতে বিশেষ ধরনের সার ও ওষুধ প্রয়োগ করে খেজুর বীচি লাগিয়ে তিন বছরের পরিবর্তে তিন মাসে খেজুর ফলাতে পারে, তো তার সে কাজ মু'জিযাহ্ হবে না। কিন্তু কেউ যদি সাধারণ মাটিতে সাধারণ খেজুর বীচি লাগিয়ে আধ ঘণ্টার মধ্যে পাকা খেজুর সরবরাহ করতে পারেন তাহলে তা- ই হবে মু'জিযাহ্।

নবুওয়াতের দাবীদার ব্যক্তি স্বীয় নবুওয়াতের প্রমাণ হিসেবে সৃষ্টিকর্তার অনুগ্রহে ও অনুমতিক্রমে লোকদের সামনে মু'জিযাহ্ প্রদর্শন করেন, অথবা স্বয়ং সৃষ্টিকর্তাই তাঁর নবুওয়াতের প্রমাণ

স্বরূপ তাঁকে কেন্দ্র করে এ ধরনের ঘটনা ঘটিয়ে থাকেন। অবশ্য জাদুকররাও অনেক ধরনের অস্বাভাবিক ঘটনা ঘটিয়ে থাকে। কিন্তু জাদুকরের জাদুর ও নবীর মু'জিযাহর উদ্দেশ্য- লক্ষ্য ও প্রদর্শনক্ষমতার উৎস সম্পূর্ণ আলাদা।

জাদুকর দীর্ঘদিনের সাধনা ও চর্চার মাধ্যমে জাদুকরী ক্ষমতা অর্জন করে থাকে এবং ভালোভাবে অনুসন্ধান করলে খুব সহজেই তার রহস্য উদঘাটন ও অন্যদের পক্ষে সে কলাকৌশল আয়ত্ত করা সম্ভব। কোনো জাদুকরের পক্ষেই, কমবেশী যা- ই হোক, শিক্ষা, সাধনা ও চর্চা ব্যতিরেকে জাদু আয়ত্ত করা সম্ভব নয়। সে যতো গোপনেই তা শিক্ষা করুক এবং যতো কম পরিমাণেই শিক্ষা করুক (আর পরে নিজে গোপনে ব্যাপকভাবে চর্চা করে দক্ষতা অর্জন করুক), অন্ততঃ যে তাকে জাদু শিক্ষা দিয়েছে সেই ওস্তাদ- জাদুকরের কাছে তার জাদুকর হওয়ার বিষয়টি গোপন থাকে না। তাই তার এ কাজ যে জাদু - এ সত্যটি যে কোনো সময় ফাশ হয়ে যাবার সম্ভাবনা থাকে। তাই জাদুকর কখনো কখনো বিশেষ পরিবেশে লোকদেরকে চমকে দেয়া বা প্রতারিত করার লক্ষ্যে নিজেকে অলৌকিক ক্ষমতার অধিকারী বলে দাবী করলেও সাধারণতঃ বেশীর ভাগ ক্ষেত্রেই নিজের জাদুকর পরিচয় গোপন করে না। কিন্তু নবী যে অলৌকিক ঘটনা দেখান তার পিছনে এরূপ কোনো সাধনা ও চর্চা থাকে না, বরং একমাত্র সৃষ্টিকর্তার ইচ্ছা ও অনুগ্রহেই তা সম্ভব হয়ে থাকে।

দ্বিতীয়তঃ জাদুকরের জাদু প্রদর্শনের পিছনে নিম্নোক্ত উদ্দেশ্যসমূহের এক বা একাধিক বা সবগুলো উদ্দেশ্যই নিহিত থাকে: (১) আনন্দ লাভ ও মানুষকে আনন্দ দান, (২) সরলমনা লোকদেরকে বোকা বানিয়ে আনন্দ লাভ, (৩) মানুষকে বিভ্রান্ত করে প্রতারণা করা, (৪) মানুষকে আনন্দদানের বিনিময়ে অর্থোপার্জন, (৫) খ্যাতি ও সুনাম অর্জন।

সাধারণতঃ একজন ছোট জাদুকর 'জাদুকর' হিসেবে জীবন শুরু করে দীর্ঘ সাধনার মাধ্যমে বড় জাদুকরে পরিণত হয়ে থাকে এবং 'বড় জাদুকর' হিসেবে পরিচিত হওয়াই তার লক্ষ্য থাকে ও তাতেই সে নিজেকে গৌরবান্বিত মনে করে। সাধারণতঃ কখনোই সে নিজেকে নবী বলে দাবী করে না, বরং এরূপ দাবী করতে ভয় পায়। অন্যদিকে নবীর মু'জিযাহ্ প্রদর্শনের উদ্দেশ্য

জাদুকরের জাদু প্রদর্শনের উদ্দেশ্যসমূহ থেকে সম্পূর্ণ স্বত ; তাঁর প্রদর্শিত মু'জিযাহর উদ্দেশ্য মানুষকে সৃষ্টিকর্তার প্রদর্শিত পথ অনুসরণে উদ্বুদ্ধ করার লক্ষ্যে স্বীয় নবুওয়াতের প্রতি তাদের অন্তরে আস্থা সৃষ্টি করা বা তা দৃঢ়তর করা।

পেশাদার জাদুকর ছাড়াও কোনো কোনো লোক মানসিক শক্তির উপর্যুপরি ও ব্যাপক চর্চার মাধ্যমে প্রায় জাদুকরের অনুরূপ অস্বাভাবিক কাজ সম্পাদনে সক্ষম হতে পারে। যেমন: পানির ওপর দিয়ে হেঁটে যাওয়া বা হিংস্র প্রাণীদের অনুগত করা। আর সরাসরি কারো কাছ থেকে শিক্ষা না করার কারণে তার স্বরূপ ও চর্চার বিষয়টি গোপন রাখাও সম্ভব হতে পারে। এ ধরনের শক্তি দ্বারা অনেক সময় মানুষের চিকিৎসা করা হয় বা মন নিয় ণ করা হয়, যেমন হিপনোটিজম বা সম্মোহনী শক্তির দ্বারা করা হয়।

তবে এ ধরনের শক্তি কেবল দীর্ঘ সাধনা ও চর্চার মাধ্যমেই অর্জিত হতে পারে। অন্যদিকে, আগেই যেমন উল্লেখ করা হয়েছে যে, মু'জিযাহ্ কোনো চর্চার ফসল নয়। তাছাড়া এ ধরনের কাজ ও মু'জিযাহর মধ্যে গুণগত পার্থক্য থাকে; মু'জিযাহ্ হয় অনেক উঁচু ধরনের কাজ - যা চর্চার দ্বারা অর্জন করা সম্ভব নয়, যেমন: মৃতকে জীবিতকরণ, মাটির পাখীকে প্রকৃত পাখীতে পরিণত করে আকাশে উড়িয়ে দেয়া, লাঠিকে সক্রিয় সাপে পরিণত করা, চন্দ্র দ্বিখণ্ডিতকরণ ইত্যাদি যা কোনো মানসিক শক্তির দ্বারা সম্ভব নয়।

জাদুতুল্য মানসিক শক্তির অধিকারী ব্যক্তি ও নবীর মধ্যে আরেকটি পার্থক্য এই যে, এ ধরনের ব্যক্তিরা কখনো না কখনো তাদের এ শক্তিকে স্বীয় পার্থিব স্বার্থ হাসিল, প্রতিশোধ গ্রহণ, প্রতিহিংসা চরিতার্থকরণ ও এ ধরনের অন্যান্য নেতিবাচক লক্ষ্যে বা 'সমুন্নত নয়' এমন ধরনের লক্ষ্যে ব্যবহার করে থাকে - যা নবীর দ্বারা কখনোই ঘটে না।

মু'জিযাহ্ এমন ধরনের হওয়া চাই যে, সংশ্লিষ্ট কাজটির মু'জিযাহ্ হওয়া সম্পর্কে তা প্রত্যক্ষকারীদের নিকট যেন কোনোরূপ অস্পষ্টতা, দুর্বোধ্যতা ও সংশয় না থাকে। এ কারণে মু'জিযাহ্ এমন বিষয়ের হওয়া চাই যে বিষয়ে সংশ্লিষ্ট সমাজে বহু বড় বড় বিশেষজ্ঞ থাকবে, কিন্তু নবুওয়াতের দাবীদার ব্যক্তি ঐ বিষয়ে এমন উন্নততম মানের কাজ সম্পাদন করবেন যা ঐ

সব বিশেষজ্ঞের দৃষ্টিতেও মানুষের পক্ষে সম্পাদন করা অসম্ভব। অন্যথায় যে সমাজে সংশ্লিষ্ট বিষয়ের বিশেষজ্ঞ নেই সে সমাজে ঐ বিষয়ের মু‘জিযাহ্ দেখানো হলে লোকেরা ঐ কাজটির মু‘জিযাহ্ হওয়া সম্পর্কে সন্দিহান হতে পারে। তাদের মনে হতে পারে যে, এ ব্যক্তি এ বিষয়ে বিরাট বিশেষজ্ঞ; এখানে এ বিষয়ের কোনো বড় বিশেষজ্ঞ নেই বলেই তাঁর বিশেষজ্ঞত্ব কেউ ধরতে পারছেন না এবং এই সুযোগকে কাজে লাগিয়ে এ ব্যক্তি নিজেকে নবী বলে দাবী করছেন। উপরোক্ত কারণেই, মানবজাতির ইতিহাসে নবুওয়াতের দাবীদার যে সব ব্যক্তির মু‘জিযাহ্র কাহিনী নির্ভরযোগ্য সূত্রে পাওয়া যায়, তাঁদের বেলায় দেখা যায় যে, তাঁদের প্রত্যেকের প্রদর্শিত মু‘জিযাহ্ সমূহের অন্ততঃ দু’একটি এমন, যে বিষয়ে সংশ্লিষ্ট সমাজে বড় বড় বিশেষজ্ঞ উপস্থিত ছিলেন।

হযরত মূসা (আঃ)- এর সময় মিসরে জাদুবিদ্যা উন্নতির চরম শিখরে উপনীত হয়েছিলো এবং তখন সে দেশে এমন সব বড় বড় জাদুকর ছিলো যাদের সেরা জাদুকর হবার ব্যাপারে সকলেরই পরিপূর্ণ আস্থা ছিলো। কিন্তু হযরত মূসা (আঃ)- এর লাঠি সাপে পরিণত হয়ে ঐ সব ওস্তাদ জাদুকরের সর্বোচ্চ মানের জাদুসমূহকে অকেজো করে দেয়। ফলে জাদুকররা বুঝতে পারে যে, মূসা (আঃ) যা নিয়ে এসেছেন তা জাদু নয়।

তেমনি হযরত ঈসা (আঃ)- এর সময়ে তাঁর আবির্ভাবস্থল ফিলিস্তিনে ও ফিলিস্তিন শাসনকারী রোমানদের মধ্যে চিকিৎসাবিজ্ঞানের চরমোন্নতি ঘটেছিলো। কিন্তু হযরত ঈসা (আঃ) তৎকালীন চিকিৎসাবিজ্ঞানের দৃষ্টিতে অসম্ভব এমন কিছু কাজ সম্পাদন করেন, যেমন: তিনি কুষ্ঠরোগীদেরকে কোনোরূপ ওষুধপত্র বা অস্ত্রোপচার ছাড়াই কেবল স্পর্শ দ্বারাই সুস্থ করে দেন, মৃতকে জীবিত করেন ও মাটি দ্বারা পাখী বানিয়ে তাকে প্রাণশীল করে উড়িয়ে দেন। এ থেকে সকলের কাছে স্পষ্ট হয়ে যায় যে, তিনি কোনো উঁচু দরের চিকিৎসাবিজ্ঞানী নন, বরং তাঁর দাবী অনুযায়ী যথার্থই সৃষ্টিকর্তা কর্তৃক মনোনীত নবী।

একইভাবে হযরত মুহাম্মাদ (ছ্বাঃ)- এর সময় মানবজাতির শ্রেষ্ঠতম সম্ভাবনাময় ভাষা আরবী তার প্রকাশক্ষমতার চরমোৎকর্ষে উপনীত হয়েছিলো এবং ঐ সময় আরবদের মধ্যে শ্রেষ্ঠতম কবি ও

বাচনশিল্পীর উদ্ভব ঘটেছিলো। বস্তুতঃ সংক্ষেপে ব্যাপকতম ও সূক্ষ্মতম ভাব সুন্দরতম কথার মধ্য দিয়ে প্রকাশের ক্ষেত্রে অন্যান্য ভাষা ও আরবী ভাষার মধ্যে এমনই আসমান- যমীনতুল্য পার্থক্য ছিলো যে,   আরবরা নিজেদেরকে 'আরাবী বা "সংক্ষেপে সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম ভাব প্রকাশক প্রাঞ্জলভাষী" ও অন্যদেরকে 'আজামী বা বোবা/ তোৎলা বলে অভিহিত করে নিজেদের শ্রেষ্ঠত্বের অহঙ্কার প্রকাশ করতো। কিন্তু হযরত মুহাম্মাদ (ছাঃ) যে কোরআন নিয়ে এলেন তার সামনে আরবদের শ্রেষ্ঠতম কবি ও বাচনশিল্পীগণ অক্ষম ও অসহায় হয়ে রণে ভঙ্গ দিতে বাধ্য হন।

নবীর পাপমুক্ততা

কোনো ব্যক্তিকে নবী হিসেবে চিনতে পারার জন্য তাঁর মধ্যে অপর যে বৈশিষ্ট্যটি পাওয়া অপরিহার্য তা হচ্ছে, তাঁর গোটা জীবনই পাপমুক্ত হতে হবে।

নবুওয়াত দাবী করার পূর্বেই হোক বা পরেই হোক, যে ব্যক্তি সর্বজনীনভাবে বিচারবুদ্ধি কর্তৃক পাপ বা অপরাধ বা অন্যায় হিসেবে পরিগণিত কোনো কাজে কখনো লিপ্ত ছিলো, সুস্থ বিচারবুদ্ধির রায় অনুযায়ী সে ব্যক্তি নবী হতে পারে না। কারণ, এরূপ ক্ষেত্রে তার পাপ, অপরাধ বা অন্যায় কাজ সম্পর্কে অবগত ব্যক্তির পক্ষে তাকে নবী হিসেবে মনে করা সম্ভব হবে না। ফলে সে নবুওয়াতের দাবীদার ব্যক্তিকে ও তার দাবীকে প্রত্যাখ্যান করলে সৃষ্টিকর্তা ঐ ব্যক্তিকে 'নবীকে প্রত্যাখ্যান করা'র অপরাধে অপরাধী বলে গণ্য করবেন না - এটা বিচারবুদ্ধির এক অকাট্য রায়। আর লোকেরা যদি নবীকে নবী হিসেবে চিনতেই না পারে, বরং তাঁর নবুওয়াত- দাবীর ব্যাপারে যুক্তিসঙ্গত কারণে সন্দেহ- সংশয়ে নিপতিত হয় তাহলে সৃষ্টিকর্তার পক্ষ থেকে নবী প্রেরণের লক্ষ্যই অনর্জিত থেকে যাবে।

এ কারণে বিচারবুদ্ধির রায় হচ্ছে, সর্বশক্তিমান সৃষ্টিকর্তার জন্য এটা অপরিহার্য যে, তিনি কোনো পাপমুক্ত ব্যক্তিকে নবী হিসেবে মনোনীত করবেন অথবা যাকে নবী হিসেবে মনোনীত করবেন তাঁকে জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত পাপ থেকে রক্ষা করবেন। মানুষকে বিভ্রান্ত হওয়া থেকে রক্ষা করার জন্য এটা অপরিহার্য।

বলা বাহুল্য যে, এখানে পাপ বলতে আস্তিক- নাস্তিক নির্বিশেষে সমস্ত মানুষের দৃষ্টিতে যা অন্যায় বা অপরাধ তা- ই বিবেচ্য; যে কাজের অন্যায় বা অপরাধ হওয়া বা না- হওয়া সম্পর্কে বিভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গির মধ্যে বিতর্ক আছে তা এখানে বিবেচ্য নয়। তাই মিথ্যাচার, হত্যা, ধর্ষণ, ব্যভিচার, চুরি- ডাকাতি, ধোঁকা- প্রতারণা, বিশ্বাসঘাতকতা, অন্যের সম্পদ জবর দখল ও আত্মসাত, আমানতের খেয়ানত, যুলুম- অত্যাচার, নির্যাতন ইত্যাদি অন্যায় কাজ কখনোই

একজন নবীকে স্পর্শ করতে পারে না। তেমনি তাঁর জীবনকে - নবুওয়াত- দাবীর পূর্বেও - দ্বিত্ববাদী, ত্রিত্ববাদী বা বহুত্ববাদী ধারণা ও কার্যকলাপ স্পর্শ করতে পারে না।

এ প্রসঙ্গে স্মর্তব্য যে, বিচারবুদ্ধি সৃষ্টিকর্তার অস্তিত্ব ও একত্ব সম্বন্ধে নিশ্চিত হবার পর তাঁর নিকট জবাবদিহিতার অনুভূতি ও তাঁর পক্ষ থেকে পথনির্দেশের প্রয়োজনীয়তাবোধের কারণেই নবীর সন্ধান করে থাকে। এ পথের শুরুর দিকেই, একত্ববাদে উপনীত হতে গিয়েই সে দ্বিত্ববাদ, ত্রিত্ববাদ, বহুত্ববাদ ও অবতারবাদ ইত্যাদিকে প্রত্যাখ্যান করে। অবশ্য অনেক ক্ষেত্রেই মানুষের বিচারবুদ্ধির ওপরে বিভিন্ন ধরনের ভ্রমাত্মক যুক্তি, চিন্তা ও অন্ধ বিশ্বাসের আবরণ পড়তে পারে এবং এর ফলে তার অন্তরে বিচারবুদ্ধির রায় হাল্কা ও অগভীর হয়ে পড়তে পারে বা সে গতানুগতিকতার বিরোধী বিচারবুদ্ধির রায়কে স্বীয় মস্তিষ্কে পোষণ করতে ও লোকদের সামনে প্রকাশ করতে ভয় পেতে পারে ও সে কারণে তা জোর করে চাপা দিতে পারে; অতঃপর নবী বা নবীর পক্ষ থেকে কেউ এসে তাকে সত্যকে স্মরণ করিয়ে দিয়ে তার বিচারবুদ্ধির রায়কেই সুতীক্ষ্ণ করার চেষ্টা করতে পারেন।

অন্য কথায়, নবীর মূল কাজই হচ্ছে জীবন ও জগতের মহাসত্য সম্বন্ধে এবং নিজের, অন্যদের ও স্রষ্টার প্রতি দায়িত্ব- কর্তব্য তথা ঔচিত্য- অনৌচিত্য সম্বন্ধে মানুষের বিচারবুদ্ধির রায়কে শানিত করা; বিতর্কিত বিষয়াদিতে সঠিক ফয়সালা এ দায়িত্বেরই সম্প্রসারণ মাত্র। এমতাবস্থায় চিন্তা বা কর্মের দিক থেকে বা উভয় দিক থেকেই কখনো না কখনো দ্বিত্ববাদ, ত্রিত্ববাদ, বহুত্ববাদ বা অবতারবাদে বিশ্বাসী ছিলো, অথবা সর্বজনস্বীকৃত কোনো অন্যায় বা পাপ কাজে কখনো না কখনো নিশ্চিতভাবেই লিপ্ত ছিলো - এমন ব্যক্তিকে বিচারবুদ্ধির পক্ষে স্রষ্টার পক্ষ থেকে মনোনীত নবী হিসেবে মেনে নেয়া সম্ভব হতে পারে না।

দ্বিতীয়তঃ এরূপ অবস্থায় স্বাভাবিকভাবেই মানুষের মনে প্রশ্ন জাগতে পারে যে, স্রষ্টার পক্ষে কি নবীর দায়িত্ব দেয়ার জন্য কোনো তাওহীদবাদী পাপমুক্ত মানুষ গড়ে তোলা অসম্ভব যে, কখনো না কখনো অংশীবাদে বা সর্বজনস্বীকৃত অন্যায় বা পাপে লিপ্ত ছিলো এমন একজন লোককে নবুওয়াতের দায়িত্ব দেবেন?

তৃতীয়তঃ এরূপ পরিস্থিতি ভণ্ড নবীর আবির্ভাবের জন্য অনু ল পরিবেশ তৈরী করে দেয়। কারণ, নবুওয়াতের মর্যাদার পার্থিব সম্মান লাভ অথবা মানুষকে বিভ্রান্ত করার লক্ষ্যে যে কোনো পাপাচারী লোকের পক্ষে নবী সেজে বসা সম্ভব। এ অবস্থায় এরূপ ব্যক্তি দাবী করতে পারে যে, সে আগে অংশীবাদী বা পাপকর্মে লিপ্ত হয়ে থাকলেও সৃষ্টিকর্তা অনুগ্রহ করে তাকে নবী পদে অভিষিক্ত করেছেন এবং এ দায়িত্বে অভিষিক্ত হবার পর থেকে আর সে অংশীবাদ বা পাপ কর্মে লিপ্ত হয় নি।

চতুর্থতঃ এরূপ অবস্থায় যে কারো বিচারবুদ্ধি একজন প্রকৃত নবীকে ভণ্ড নবী মনে করে প্রত্যাখ্যান করতে পারে এবং সে ক্ষেত্রে এ প্রত্যাখ্যানের জন্য তাকে অপরাধী গণ্য করা যাবে না। কারণ, এমনকি একজন অংশীবাদী বা পাপকর্মে লিপ্ত ব্যক্তি কর্তৃকও কাউকে নবী হিসেবে গ্রহণ করতে হলে তা বিচারবুদ্ধির রায়ের ভিত্তিতেই করতে হবে; এর কোনো বিকল্প নেই। এমতাবস্থায় বিচারবুদ্ধিই যদি কাউকে ভণ্ড নবী বলে রায় দেয় তখন তাকে নবী হিসেবে গ্রহণ করা কারো জন্যই অপরিহার্য হতে পারে না।

অর্থাৎ দেখা যাচ্ছে যে, অংশীবাদী বা কখনো না কখনো সর্বজনস্বীকৃত অন্যায় বা পাপ কর্ম সম্পাদনকারী ব্যক্তিকে নবুওয়াত প্রদান করা হলে নবী প্রেরণের মূল উদ্দেশ্যই ভণ্ডুল হয়ে যায়। অতএব, এ ব্যাপারে বিতর্কের অবকাশ নেই যে, একজন নবীকে তাঁর জীবনের নবুওয়াত দাবী করার পূর্ববর্তী অধ্যায়েও তাওহীদবাদী (একত্ববাদী) ও পাপমুক্ত হতে হবে।

এছাড়া যিনি নবী হবেন তাঁর জন্য তাঁর জীবনের নবুওয়াত দাবী করার পূর্ববর্তী অধ্যায়েও মনবতাবোধ, দয়ার্দ্রতা, সদাচরণ, পরোপকার, সাহসিকতা, নিঃস্বার্থপরতা, লোভহীনতা ইত্যাদি সদগুণের অধিকারী হওয়াও অপরিহার্য যাতে তাঁর নবী হওয়ার ব্যাপারে মানুষের মনে সহজেই আস্থার সৃষ্টি হতে পারে।

তবে মনে রাখা দরকার যে, নবীর পাপমুক্ততার বিষয়টি এমন নয় যে, নবীর মধ্যে পাপে লিপ্ত হবার ক্ষমতাই থাকবে না। বরং মানুষ হিসেবে প্রাপ্ত স্বাধীনতার বিচারে নবী ও অন্য মানুষের মধ্যে পাপে লিপ্ত হবার ক্ষমতার ব্যাপারে কোনোই পার্থক্য থাকা সম্ভব নয়। কারণ, কোনো

মানুষের পাপে লিপ্ত হবার ক্ষমতা কেড়ে নিলে সে আর মানুষ থাকবে না; ফেরেশতার সমপর্যায়ভুক্ত হবে। আর বলা বাহুল্য যে, এরূপ ব্যক্তি মানুষের জন্য অনুসরণীয় আদর্শ হতে পারে না। কারণ, সে ক্ষেত্রে মানুষের জন্য এ যুক্তি তৈরী হয়ে যায় যে, নবীর মধ্যে তো পাপের ক্ষমতাই নেই, তাই সে পাপ করে না; আমাদের মধ্যে পাপে লিপ্ত হবার ক্ষমতা রয়েছে, তাই আমাদের পক্ষে পাপে লিপ্ত হওয়াই স্বাভাবিক।

বরং নবীর পাপমুক্ততার বিষয়টি সৃষ্টিকর্তার পক্ষ থেকে স্বাভাবিক মানবিক কার্যকারণের মধ্য দিয়ে নিশ্চিতকরণই স্বাভাবিক ও সর্বজনীন বিচারবুদ্ধির নিকট গ্রহণযোগ্য। অর্থাৎ জন্মগতভাবে রক্তধারার পবিত্রতা ও সৃষ্টিকর্তা কর্তৃক নবীরূপে মনোনীত ব্যক্তি হিসেবে এ মর্যাদার সাথে সাংঘর্ষিক চিন্তা, কথা ও কাজ পরিহারের স্বাভাবিক প্রবণতার কারণে নবীর মধ্যে শুরু থেকেই এমন একটি রুচিবোধ ও চরিত্র গড়ে ওঠে যার ফলে ক্ষমতা থাকা সত্ত্বেও পাপ কর্মের প্রতি তাঁর মধ্যে কোনোরূপ আগ্রহ সৃষ্টি হয় না, বরং ঘৃণা সৃষ্টি হয়। উদাহরণস্বরূপ, মানুষ পায়খানা-পেশাব ভক্ষণ ও পান করতে সক্ষম হওয়া সত্ত্বেও কারো মধ্যে এর আগ্রহ সৃষ্টি হয় না (ব্যতিক্রম হিসেবে কদাচিৎ বহু কোটি মানুষের মধ্যে দু'একটি চরম বিকৃতরুচি ব্যক্তিকে এ কাজ করতে দেখা গেলেও), বরং সকল মানুষই এর প্রতি ঘৃণা বোধ করে থাকে। নবীর মধ্যে এই রূচিবোধই সর্বোচ্চ পর্যায়ের হয়ে থাকে যার ফলে সকল পাপ ও নোংরা কাজের প্রতি তাঁর মধ্যে ঘৃণা জন্ম নিয়ে থাকে।

এ প্রসঙ্গে আরো দু'একটি উদাহরণ দিলে বিষয়টি আরো পরিস্কার হতে পারে। যেমন: একটি অবুঝ শিশু একটি ফণা- তোলা সাপের বা একটি প্রদীপের শিখার সৌন্দর্যে আকৃষ্ট হয়ে তা ধরার জন্য আগ্রহী হতে পারে, কিন্তু কোনো বুদ্ধিমান মানুষ এ কাজে অগ্রসর হবে না বা আগ্রহ অনুভব করবে না। কারণ, শিশু সাপের সৌন্দর্য দেখলেও বিচারবুদ্ধিসম্পন্ন মানুষ এ সৌন্দর্যের আড়ালে সাক্ষাৎ মৃত্যু বা চরম য ণা দেখে শিউরে ওঠে। তেমনি সংশ্লিষ্ট বস্তুর প্রকৃত অবস্থা সম্বন্ধে অজ্ঞ একজন লোক বিদ্যুতবাহী তার স্পর্শ করতে বা পানি মনে করে এসিড পান করতে দ্বিধা করবে না এবং পিপাসার্ত অবস্থায় জানা না থাকার কারণে বিষমিশ্রিত শরবত পান করতে আগ্রহ অনুভব

করবে। কিন্তু যার সংশ্লিষ্ট বস্তুর প্রকৃত অবস্থা জানা আছে সে সযত্নে এ সব থেকে দূরে থাকবে; পিপাসায় প্রাণ ওষ্ঠাগত হলেও জানা অবস্থায় কিছুতেই সে এসিড বা বিষমিশ্রিত শরবত পান করবে না। ঠিক এভাবেই নবীর দৃষ্টিতে যে কোনো পাপকাজের ভয়াবহ পরিণাম সুস্পষ্টভাবে ধরা পড়ে বিধায় তিনি এ থেকে দূরে থাকবেন এবং এর প্রতি কখনোই আগ্রহ অনুভব করবেন না - এটাই বিচারবুদ্ধির দাবী।

অনেক সময় কোনো কোনো নবী সম্পর্কে সাধারণ মানুষের মধ্যে বা এমনকি ধর্মগ্রন্থে এমন সব বর্ণনা পাওয়া যায় যা থেকে মনে হয় যে, তাঁরা কখনো কখনো পাপকার্যে লিপ্ত হয়েছিলেন। কিন্তু যেহেতু বিচারবুদ্ধি নবীর পাপে লিপ্ত হবার বিষয়টি গ্রহণ করে না, সেহেতু এ ক্ষেত্রে তিনটি অবস্থা হতে পারে। তা হচ্ছে, হয় সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি আদৌ নবী ছিলেন না, অথবা সংশ্লিষ্ট বর্ণনাটি মিথ্যা বা বিকৃত, নয়তো বর্ণনাটির সঠিক তাৎপর্য গ্রহণ করা হয় নি।

নবী হচ্ছেন মানুষের কাছে স্রষ্টার পথনির্দেশ পৌঁছাবার প্রত্যক্ষ মাধ্যম এবং পূর্ণ শর্তাবলী বিশিষ্ট প্রতিনিধি, আর মানুষের জন্য স্রষ্টার মনোনীত নেতা ও শাসক। এ পদ মানুষের মধ্যকার সর্বোত্তম মর্যাদাপূর্ণ পদ। তাই যুগে যুগে সত্য নবী ছাড়াও বহু মিথ্যা নবীরও আবির্ভাব ঘটেছে। এরূপ ভণ্ড-প্রতারক ব্যক্তিরা স্বীয় প্রতারণার চক্রের সদস্যদের দ্বারা পরিকল্পিতভাবে মিথ্যা মু'জিযাহও প্রচার করে থাকে। তাই নবুওয়াতের দাবীদার কোনো ব্যক্তির জীবন সম্বন্ধে ব্যাপক ও গভীরভাবে অনুসন্ধান চালানো প্রয়োজন। অনুসন্ধানে তার জীবনে কখনো কোনো পাপকর্ম 'অকাট্যভাবে' প্রমাণিত হলে সে ব্যক্তি যে নবী নয়, বরং নবী হওয়ার মিথ্যা দাবীদার, অথবা সে নিজে দাবী না করলেও স্বার্থান্বেষীরা তাকে তথাকথিত নবী বানিয়েছে - তাতে সন্দেহ নেই।

অন্যদিকে বিচারবুদ্ধি বলে, ভণ্ড-প্রতারক পাপাচারীরা কোনো কোনো নবীর বা অনেক নবীর বা নবীদের (আঃ) নামে পাপকর্মের মিথ্যা কাহিনী তৈরী করে থাকতে পারে। দু'ধরনের লোকেরা এ কাজ করে থাকতে পারে। প্রথমতঃ কোনো নবীর বা নবীদের (আঃ) বিরোধীরা - যাদের উদ্দেশ্য ছিলো সংশ্লিষ্ট নবী বা নবীদের (আঃ) সম্বন্ধে মানুষকে বিভ্রান্ত করা এবং তাঁর বা তাঁদের ওপর অনাস্থা সৃষ্টি করা। দ্বিতীয়তঃ কোনো নবীর বা নবীদের (আঃ) অনুসারী হবার দাবীদার পাপাচারী

লোকেরা যারা নিজেদের পাপকর্মের সপক্ষে সাফাই ও অজুহাত সৃষ্টির উদ্দেশ্যে নবীর বা নবীদের (আঃ) নামে মিথ্যা রচনা করেছে।

কোনো বা কোনো কোনো ধর্মের মূল ধর্মীয় সূত্র থেকে কোনো বা কোনো কোনো নবীর দ্বারা পাপকর্ম সম্পাদিত হয়েছিলো বলে ধারণা পাওয়া গেলে সে ব্যাপারে বিচারবুদ্ধি তিনটি কারণ খুঁজে পায়। প্রথমতঃ সূত্রটি অকাট্যভাবে গ্রহণযোগ্য না হতে পারে। অর্থাৎ সূত্রটিকে যে বা যার সাথে সম্পর্কযুক্ত বলে দাবী করা হয় তা তাঁর বা তাঁদের সাথে সম্পর্কিত না- ও হতে পারে এবং তাঁর বা তাঁদের নামে অন্য কারো রচিত হতে পারে। বিশেষ করে তাঁর বা তাঁদের থেকে শুরু করে প্রতিটি স্তরের বর্ণনাকারীদের ঐতিহাসিকতা ও ন্যায়নিষ্ঠতার অকাট্যতা এবং প্রতি স্তরে তাঁদের সংখ্যা বিচারবুদ্ধির দৃষ্টিতে মিথ্যা রচিত হওয়ার সম্ভাবনা প্রত্যাখ্যানের জন্য যথেষ্ট বলে পরিগণিত না- ও হতে পারে। ফলে এরূপ সূত্রে কোনো নবী বা নবীদের (আঃ) দ্বারা পাপকার্য সম্পাদনের বর্ণনা বিচারবুদ্ধির নিকট মোটেই গ্রহণযোগ্য বিবেচিত হয় না।

দ্বিতীয়তঃ ধর্মীয় সূত্রটি উপরোক্ত মানদণ্ডে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি বা ব্যক্তিবর্গ থেকে উৎসারিত বলে অকাট্যভাবে প্রমাণিত হলে এবং সেই ব্যক্তি বা ব্যক্তিবর্গের গ্রহণযোগ্যতাও বিচারবুদ্ধির আদালতে অকাট্যভাবে প্রমাণিত হলে সে ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট সূত্রে কোনো বা কোনো কোনো নবীর (আঃ) পাপকর্মে লিপ্ত থাকার কথা উল্লিখিত পাওয়া গেলে তার দু'টি অবস্থা হতে পারে। প্রথমতঃ পাঠকের নিকট পাপকর্মের যে সংজ্ঞা বা সীমারেখা রয়েছে তা বিচারবুদ্ধির নিকট সর্বজনীন ও অকাট্যভাবে গ্রহণযোগ্য না- ও হতে পারে। অর্থাৎ নবীর বা নবীদের যে কাজের উল্লেখ দেখে পাঠক তাকে পাপকর্ম বলে মনে করতে পারেন, তা হয়তো আদৌ পাপকর্ম নয়। অর্থাৎ যে কাজের পাপ হওয়ার বিষয়টি বিতর্কিত পাঠক তাকেই অকাট্যভাবে পাপ বলে মনে করে নিয়েছেন। দ্বিতীয়তঃ পাঠক সংশ্লিষ্ট ধর্মীয় সূত্রের অর্থ গ্রহণে ভুল করে থাকতে পারেন। এ প্রসঙ্গে দু'একটি উদাহরণ দিলে বিষয়টি আরো পরিস্কার হবে।

গুরুত্বপূর্ণ ধর্মীয় সূত্র তাওরাত ও কোরআন মজীদে প্রথম মানুষের নাম 'আদম' বলে উল্লেখ করা হয়েছে। বলা বাহুল্য যে, প্রথম মানুষ হিসেবে তিনি নবীও ছিলেন বটে। তাওরাত ও কোরআনে

বলা হয়েছে যে, সৃষ্টিকর্তার নির্দেশ ভুলে গিয়ে তিনি ও তাঁর স্ত্রী নিষিদ্ধ বৃক্ষের ফল ভক্ষণ করেন। অনেকেই এটিকে মানুষের প্রথম পাপ বলে মনে করে। (শুধু তা-ই নয়, অনেকেই মনে করে যে, এ পাপের কারণেই তাঁকে সস্ত্রীক বেহেশত থেকে বের করে দেয়া হয়; নইলে মানব প্রজাতি আজো বেহেশতেই থাকতো, যদিও কোরআনে বলা হয়েছে যে, পৃথিবীর বুকে সৃষ্টিকর্তার প্রতিনিধির দায়িত্ব পালনের জন্যই তাঁকে সৃষ্টি করা হয়েছিলো।) কিন্তু ঐ বৃক্ষের ফল ভক্ষণ সর্বজনীনভাবে বিচারবুদ্ধির নিকট অন্যায় বা পাপ বলে পরিগণিত কাজসমূহের (যার অনেকগুলোর কথাই আমরা ইতিপূর্বে উল্লেখ করেছি) অন্তর্ভুক্ত ছিলো না। দ্বিতীয়তঃ উক্ত উভয় সূত্র থেকেই সুস্পষ্ট যে, তখন পর্যন্ত সৃষ্টিকর্তার পক্ষ থেকে হযরত আদম (আঃ)-কে কোনোরূপ ধর্মীয় বিধিবিধান প্রদান করা হয় নি। ফলে বিচারবুদ্ধি কেবল এটাই বলে না যে, ঐ বৃক্ষের ফল ভক্ষণ করার ফলে সর্বজনীনভাবে পাপ বা অন্যায় বলে পরিগণিত কোনো কাজ সম্পাদিত হয় নি, বরং এ-ও বলে যে, এর দ্বারা সৃষ্টিকর্তার পক্ষ থেকে প্রদত্ত কোনো বিশেষ 'বিধান'ও লঙ্ঘিত হয় নি। বরং এ ছিলো মানুষকে প্রদত্ত স্বাধীনতা মানুষ কীভাবে প্রয়োগ করতে পারে তার একটি পরীক্ষা মাত্র। পূর্ব-অভিজ্ঞতাবিহীন হযরত আদম ও হযরত হাওয়া (আঃ) কৌতুহলবশে ও শয়তানের দ্বারা প্রতারিত হয়ে ভুলবশতঃ উক্ত বৃক্ষের ফল ভক্ষণ করেন, যদিও এ ভুল কাজ করার কারণে তাঁরা কিছু না কিছু ক্ষতিগ্রস্ত হন।[৬] তাছাড়া এ-ও হতে পারে যে, তখনো তাঁরা শর'ঈ দায়িত্ব-কর্তব্য প্রযোজ্য হবার বয়সে উপনীত হন নি। অতএব, এ ঘটনা থেকে প্রমাণিত হয় না যে, নবী পাপকার্যে জড়িত হতে পারেন।

এবার ধর্মীয় সূত্র থেকে ভুল অর্থ গ্রহণের একটি দৃষ্টান্ত। কোরআন মজীদের বর্ণনা থেকে এরূপ তাৎপর্য গ্রহণ করা হয়েছে যে, হযরত ইবরাহীম (আঃ) প্রথমে নক্ষত্র, চন্দ্র ও সূর্যকে 'রব' (প্রভু/ সৃষ্টিকর্তা) মনে করেছিলেন অর্থাৎ তিনি ঐ সময় সাময়িকভাবে হলেও অংশীবাদী ধারণা পোষণ করেছিলেন। কিন্তু এ ঘটনার বর্ণনাকে তার পূর্ববর্তী আয়াত সমূহের সাথে মিলিয়ে পড়লে দেখা যায় যে, ঘটনাটি তাঁর নবুওয়াতের দায়িত্ব পালনের জন্য অভিষিক্ত হওয়ার পরবর্তী কালের। অতএব, সংশ্লিষ্ট অংশীবাদী কথাগুলো তাঁর নয়, বরং অন্য কারো। অর্থাৎ একজন

অংশীবাদী ও হযরত ইবরাহীম (আঃ)- এর মধ্যকার কথোপকথনকে এক ব্যক্তির অর্থাৎ হযরত ইবরাহীম (আঃ)- এর একার উক্তি বলে গণ্য করায় এরূপ ভুল ধারণার সৃষ্টি হয়েছে।

নবীগণের (আঃ) পাপমুক্ততা সম্পর্কে পূর্ণাঙ্গ আলোচনা স্বত গ্রন্থ রচনার দাবীদার।[৭] এখানে বিচারবুদ্ধির আলোকে মূল বিষয়টি প্রতিপাদনের লক্ষ্যে এতোটুকু আলোচনাই যথেষ্ট বলে মনে করি।

মহাসত্যের প্রশ্নে নবীর আপোসহীনতা

নবীর আরেকটি বৈশিষ্ট্য হচ্ছে জীবন ও জগতের অস্তিত্বের পিছনে নিহিত মহাসত্য প্রশ্নে আপোসহীনতা। বিচারবুদ্ধির দৃষ্টিতে কোনো রকম প্রলোভন, ভয়-ভীতি, এমনকি জীবনাশঙ্কার মুখেও নবী তাঁর নবুওয়াতের দাবী এবং জীবন ও জগতের অস্তিত্বের পিছনে নিহিত মহাসত্য প্রকাশ হতে বিরত থাকতে পারেন না। কারণ, তাঁকে নবী হিসেবে মনোনীত করার উদ্দেশ্যই এটা। আর মূল উদ্দেশ্য পরিত্যাগ করলে নবী আর নবী থাকেন না বা বলা যেতে পারে যে, নবী ও অ-নবীর মধ্যকার মৌলিক পার্থক্য বিলুপ্ত হয়ে যায়। তাই নবী সর্বাবস্থায়ই মহাসত্য প্রকাশ ও প্রচারের কাজ অব্যাহত রাখবেন।

অবশ্য নবীর আপোসহীনতার মানে এ নয় যে, তিনি জোর করে মানুষের ওপর মহাসত্যকে চাপিয়ে দেবেন বা সদাই সত্যপ্রত্যাখ্যানকারীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ-বিগ্রহে লিপ্ত থাকবেন। কারণ, সত্য চাপিয়ে দেয়ার বা জোর করে গ্রহণ করানোর বিষয় নয়। নবীর কাজ হচ্ছে মানুষের বিচারবুদ্ধিকে জাগ্রত করানো এবং তার সামনে মহাসত্যকে পেশ করা। বরং স্রষ্টার প্রতিনিধি স্বাধীনতার অধিকারী সৃষ্টি মানুষের ওপর কোনো চিন্তা ও কাজ জোর করে চাপিয়ে দেয়া মস্ত বড় অন্যায়, আর নবীর আবির্ভাবের অন্যতম উদ্দেশ্য হচ্ছে এ অন্যায় চর্চার অবসান ঘটানো। অতএব, অন্যদের ওপর স্বীয় বক্তব্য চাপিয়ে দিয়ে তিনি নিজেই এ উদ্দেশ্যের বিপরীত আচরণ করতে পারেন না। এমনকি কোনো জনগোষ্ঠী তাঁকে পুরোপুরি প্রত্যাখ্যান করলে এবং সেখানে তাঁর দাওয়াত আরো বিস্তারের কোনো সম্ভাবনা না থাকলে তিনি সংঘাত এড়াতে বা স্বীয়

অনুসারীদের জীবন রক্ষার্থে এবং সত্য প্রকাশ ও প্রচারের কাজ অব্যাহত রাখার লক্ষ্যে দেশ ত্যাগ করে অন্য কোথাও চলে যেতে পারেন। অন্যদিকে বিচারবুদ্ধি এ- ও বলে যে, উপযুক্ত পরিবেশ পেলে তিনি স্বীয় অনুসারীদের ওপর স্বীয় শাসন- কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করবেন এবং এটা তাঁর স্বাভাবিক অধিকার। আর এ কাজে কেউ বাধা দিলে ও সে ক্ষেত্রে সঙ্গতি থাকলে অথবা পরিস্থিতি বাধ্য করলে তিনি স্বীয় অনুসারীদেরকে সাথে নিয়ে সত্যকে রক্ষার জন্য যুদ্ধও করবেন। কিন্তু কোনো অবস্থাতেই তিনি পার্থিব স্বার্থে সত্য প্রকাশ ও প্রচারের ক্ষেত্রে কমবেশী করবেন না। এ পথে তাঁকে জীবন দিতে হলেও এ ব্যাপারে তিনি আপোস করবেন না।

কেবল প্রয়োজনেই নবী প্রেরণ

নবুওয়াত সম্বন্ধে সবশেষে যে গুরুত্বপূর্ণ কথাটি বলা অপরিহার্য তা হচ্ছে, মহান প্রজ্ঞাময় স্রষ্টা কোনো বাহুল্য কাজ করতে পারেন না। অতএব, বিচারবুদ্ধির রায় হচ্ছে এই যে, অপরিহার্য প্রয়োজনীয় না হলে তিনি অযথাই কোনো নবী প্রেরণ করেন না। এখানে 'প্রয়োজন' মানে মানুষের প্রয়োজন। অর্থাৎ মানব জাতির নিকট তাঁর প্রেরিত পথনির্দেশ পরিপূর্ণ ও পূর্ণাঙ্গ রূপে এবং অবিকৃতভাবে বিদ্যমান থাকলে তিনি এরপরও নতুন করে নবী ও পথনির্দেশ পাঠাবেন - এটা বিচারবুদ্ধির নিকট গ্রহণযোগ্য নয়। তাই এরূপ পরিস্থিতিতে কেউ নবুওয়াত লাভের প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ দাবী করলে তার সে দাবী বিবেচনাযোগ্য নয়।

নবী চেনার ক্ষেত্রে স্থান কালের ব্যবধানগত সমস্যা -

কোনো নবীর সাথে অভিন্ন স্থান-কালে অবস্থানকারী ব্যক্তির পক্ষে নবীকে চেনা খুবই সহজ। নবীকে চেনার যে সব উপায় রয়েছে তার সবগুলো বা যে কোনো একটির মাধ্যমেই সে নবীকে চিনতে পারে। যিনি অকাট্যভাবেই নবীরূপে প্রমাণিত তিনি যখন কাউকে নবীরূপে পরিচয় করিয়ে দেন, তখন তিনি তাঁর অনুসারীদের মধ্যকার যে ব্যক্তিদের সামনে নতুন নবীকে পরিচয় করিয়ে দিলেন তাদের মনে নতুন নবী সম্পর্কে বিন্দুমাত্র সংশয় থাকতে পারে না। কারণ, এরূপ ক্ষেত্রে সংশয় মানে পূর্বতন নবী সম্পর্কেই সংশয় পোষণ করা।

কোনো নবী যদি ভবিষ্যতে আসবেন এমন কোনো নবী সম্পর্কে ভবিষ্যদ্বাণী করেন এবং ভাবী নবীর নাম, পরিচয় ও তাঁকে চেনার অন্যান্য নিদর্শন বর্ণনা করেন, সে ক্ষেত্রে যাদের সামনে এ ভবিষ্যদ্বাণী করা হয়েছে বা অকাট্যভাবে পৌঁছেছে, তাদের জন্য নতুন নবীর সাক্ষাৎ পেলে তাঁকে চিনতে পারা খুবই সহজ। এতদসহ নবীর জীবনেতিহাস ও মু'জিযাহ্ তাঁর পরিচিতিকে আরো শক্তিশালী করে। এমনকি যার নিকট নতুন নবীর আগমনের ভবিষ্যদ্বাণী মওজূদ ছিলো না তার জন্যেও নবীর জীবন ও মু'জিযাহ্ প্রত্যক্ষ করার কারণে নবীকে নবী হিসেবে চিনতে পারা খুবই সহজ হয়ে যায়।

কিন্তু নবীর সাথে যে ব্যক্তির স্থানগত ও কালগত ব্যবধান রয়েছে তার পক্ষে নবীকে চিনতে পারা ততো সহজ নয়। আর এ ব্যবধান যতো বেশী হবে তার মনে নবীর নবী হওয়ার ব্যাপারে প্রত্যয় সৃষ্টি ততোই কঠিন হবে। কিন্তু যেহেতু নবী বা সৃষ্টিকর্তার পথনির্দেশলাভকারী ব্যক্তির আগমন বিচারবুদ্ধির অপরিহার্য দাবী, সেহেতু তাকে অবশ্যই নবীর সন্ধান করতে হবে এবং নবুওয়াতের দাবীদারদের সম্পর্কে প্রাপ্ত সকল তথ্য পর্যালোচনা করে দেখতে হবে।

পূর্ববর্তী নবীদের অস্তিত্ব ও নবুওয়াত অন্ধ বিশ্বাস ভিত্তিক

বিভিন্ন ধর্মের অনুসারীরা অতীতে বিভিন্ন নবীর আগমনের কথা বলে থাকে এবং তাদের ধর্মগ্রন্থসমূহেও তাঁদের নাম উল্লিখিত রয়েছে। ঐসব ধর্ম ও ধর্মগ্রন্থের অনুসারীরা অন্ধভাবে ঐ সব গ্রন্থ ও তাতে নবী হিসেবে উল্লিখিত ব্যক্তিদের ওপর বিশ্বাস পোষণ করে থাকে। কিন্তু সুস্থ ও মুক্ত বিচারবুদ্ধিসম্পন্ন কোনো ব্যক্তির পক্ষে পরীক্ষা- নিরীক্ষা ও যাচাই- বাছাই করা ব্যতীতই কোনো গ্রন্থের বা নবী বলে অভিহিত ব্যক্তিদের প্রতি অন্ধ বিশ্বাস পোষণ করা সম্ভব নয়। এ ক্ষেত্রে তাকে অবশ্যই সত্যাসত্য অনুসন্ধান করতে হবে। এ ক্ষেত্রে তার মনে বেশ কতগুলো প্রশ্ন জাগ্রত হয়। এগুলো হচ্ছে:

প্রথমতঃ যে ব্যক্তিকে নবী বলে দাবী করা হচ্ছে, আদৌ এরূপ কোনো ব্যক্তির অস্তিত্ব কখনো ছিলো কি? নাকি ধর্মনেতা বা ধর্মযাজক সাজা ভণ্ড- প্রতারক ব্যক্তিরা নিজেদের হীন স্বার্থ চরিতার্থ করার জন্য এরূপ কল্পিত ব্যক্তিত্ব তৈরী করেছে?

দ্বিতীয়তঃ কথিত ব্যক্তি যদি ঐতিহাসিক হয়ে থাকে তো সত্যিই নবী ছিলো কি? নাকি ভণ্ড নবী ছিলো এবং তার স্বার্থান্বেষী অনুসারীরা তাকে নবী বলে প্রচার করেছে? নাকি নিজে নবুওয়াত দাবী না করলেও স্বার্থান্বেষীরা তাকে নবী বলে মিথ্যা পরিচয় পেশ করেছে?

তৃতীয়তঃ তিনি যদি সত্যি সত্যিই নবী হয়ে থাকেন তো তাঁর জীবনেতিহাস ও তাঁর মাধ্যমে সৃষ্টিকর্তা কর্তৃক প্রেরিত পথনির্দেশ কি নির্ভুলভাবে আমাদের নিকটে পৌঁছেছে, নাকি বিকৃত হয়েছে?

চতুর্থতঃ উক্ত নবীর জীবনেতিহাস ও পথনির্দেশসমূহ যদি অবিকৃতভাবে আমাদের কাছে পৌঁছে থাকে তো তা কি শুধু তাঁর স্থান- কালের প্রয়োজন পূরণের জন্যই ছিলো, নাকি আমাদের বর্তমান স্থান- কালের প্রয়োজন পূরণের জন্যও তা যথেষ্ট?

পঞ্চমতঃ নবুওয়াতের ধারাবাহিকতা কি উক্ত নবীর মাধ্যমে শেষ হয়ে গিয়েছে, নাকি তাঁর পরেও কোনো নবী এসেছেন বা আসার সম্ভাবনা আছে?

এ প্রসঙ্গে উল্লেখ্য যে, কোনো ঘটনার বর্ণনা প্রত্যয় সৃষ্টিকারী হবার জন্য মুতাওয়াতির্ পর্যায়ের হওয়া অপরিহার্য। 'মুতাওয়াতির্' হচ্ছে যুক্তিবিজ্ঞানের একটি পরিভাষা। এর মানে হচ্ছে, ঘটনাটি বর্ণনা ধারাক্রমে প্রতিটি স্তরে এতো বেশী সংখ্যক লোকের দ্বারা বর্ণিত হওয়া চাই যতো লোকের পক্ষে মিথ্যা রচনার জন্য মতৈক্যে উপনীত হওয়া বিচারবুদ্ধির দৃষ্টিতে অসম্ভব। অর্থাৎ এরূপ সংখ্যক, ধরুন একশ' জন বা তার চেয়ে কিছু কম বা বেশী সংখ্যক লোক ঘটনাটি চাক্ষুষভাবে দেখে বর্ণনা করেছে। অতঃপর তাদের প্রত্যেকের কাছ থেকে শুনে অনুরূপ বিরাট সংখ্যক লোক (ধরুন কারো কাছ থেকে ৫০ জন, কারো কাছ থেকে ১০০ জন, কারো কাছ থেকে ২০০ জন ইত্যাদি) বর্ণনা করেছে এবং এই দ্বিতীয় স্তরের বর্ণনাকারীদের প্রত্যেকের কাছ থেকে পূর্বানুরূপ সংখ্যক লোক বর্ণনা করেছে। এভাবে বর্ণনাটি লিপিবদ্ধকারী পর্যন্ত পৌঁছেছে এবং বর্ণনাটি লিপিবদ্ধ করার সময় সকল স্তরের বর্ণনার ধারাক্রম ও প্রতিটি বর্ণনাকারীর ইতিহাস লিপিবদ্ধ করে রাখা হয়েছে। অনুরূপভাবে বর্ণনাটি যে ঐ ব্যক্তি সংগ্রহ, সংকলন ও লিপিবদ্ধ করেছেন, পরবর্তীকালে কেউ তাঁর নামে চালিয়ে দেয় নি - এ ব্যাপারেও মুতাওয়াতির্ পর্যায়ের বা অন্য ধরনের সাক্ষ্য- প্রমাণ (যেমন: এ যুগে স্থান- কাল ও পূর্ণাঙ্গ ঠিকানা উল্লেখ সহ মুদ্রিত দলীল) মওজূদ থাকা প্রয়োজন।

অনুরূপভাবে ঘটনাটি যদি সরাসরি তা প্রত্যক্ষকারী কোনো ব্যক্তি কর্তৃক লিপিবদ্ধ হয়ে থাকে সে ক্ষেত্রেও মুতাওয়াতির্ সংখ্যক প্রত্যক্ষদর্শী কর্তৃক এ মর্মে সাক্ষ্য প্রয়োজন যে, লেখক ঘটনাটি প্রত্যক্ষ করেছেন ও যথাযথভাবে লিপিবদ্ধ করেছেন। এ ক্ষেত্রে সাক্ষ্যদাতাদের ঐতিহাসিকতা ও নির্ভরযোগ্যতা সম্বন্ধেও প্রয়োজনীয় সাক্ষ্য- প্রমাণ মওজূদ থাকা অপরিহার্য।

প্রতিটি স্তরে প্রত্যয় সৃষ্টিকারী বিপুল সংখ্যক নির্ভরযোগ্য বর্ণনাকারীর বর্ণনা ছাড়াও কারো সম্পর্কে তার প্রতিপক্ষের অনু ল বা ইতিবাচক সাক্ষ্যও প্রত্যয় সৃষ্টিতে সহায়ক ভূমিকা পালন করতে পারে, তবে প্রত্যয় উৎপাদনের মূল হাতিয়ার হচ্ছে মুতাওয়াতির্ পর্যায়ের সাক্ষ্য- প্রমাণ ও বর্ণনা।

এ মানদণ্ডে বিচার করলে হযরত মুহাম্মাদ (ছ্বাঃ)- এর পূর্ববর্তী যে সব ব্যক্তিকে নবী বলে দাবী করা হয় তাঁদের নবী হওয়ার বিষয়টি প্রমাণিত হওয়া তো দূরের কথা, তাঁদের ঐতিহাসিক অস্তিত্বই সংশয়ের কবলে নিক্ষিপ্ত হয়। অবশ্য তাঁদের মধ্যকার কারো কারো নাম, নবী হওয়ার কথা ও তাঁদের গ্রন্থের কথা হযরত মুহাম্মাদ (ছ্বাঃ)- এর পেশকৃত গ্রন্থ্ কোরআন মজীদে উল্লিখিত রয়েছে। কিন্তু তার ভিত্তিতে তাঁদের ঐতিহাসিক অস্তিত্ব এবং নবী হওয়া ও গ্রন্থ্ রেখে যাওয়ার বিষয়টি গ্রহণ করতে চাইলে তা কোরআনের সত্যতা অর্থাৎ এর উপস্থাপনকারীর ঐতিহাসিকতা ও এটির ঐশী গ্রন্থ্ হওয়ার বিষয়টি প্রমাণিত হওয়ার ওপর নির্ভরশীল।

বস্তুতঃ মুসলমানদের দৃষ্টিতে ঐ সব নবী- রাসূল (আঃ) ও তাঁদের ওপর ঐশী গ্রন্থ্ নাযিল হওয়ার বিষয়টি যে সত্য বলে পরিগণিত হয়ে থাকে তা বিচারবুদ্ধির দৃষ্টিতে বা মুতাওয়াতির্ বর্ণনার কারণে নয়, বরং কোরআন মজীদে উল্লেখ থাকার কারণে। যেহেতু মুসলমানদের নিকট কোরআন মজীদের ঐশিতা বিচারবুদ্ধি দ্বারা প্রমাণিত এবং মুতাওয়ইতর্ সূত্রে প্রমাণিত যে, হযরত মুহাম্মাদ (ছ্বাঃ) এ গ্রন্থটি রেখে গেছেন, সেহেতু তাদের দৃষ্টিতে এ গ্রন্থে অন্তর্ভুক্ত সব কিছুই সত্য এবং এ কারণে এতে উল্লিখিত নবী- রাসূলগণ (আঃ) ও তাঁদের ওপর নাযিলকৃত গ্রন্থাবলীও সত্য।

কিন্তু অমুসলিমরা যেহেতু কোরআন মজীদকে ঐশী গ্রন্থ্ ও হযরত মুহাম্মাদ (ছ্বাঃ)- কে নবী বলে মানে না, তাই তাদের নিকট কোরআন মজীদের বক্তব্য কোনো দলীল নয়। ফলে তাদের বিচারবুদ্ধির পক্ষে কোরআন মজীদে উল্লেখের ভিত্তিতে পূর্ববর্তী নবী- রাসূলগণকে (আঃ) নবী মনে করা ও তাঁদের ওপর আসমানী কিতাব নাযিল হয়েছিলো বলে মনে করা সম্ভব নয়।

এ থেকে বিচারবুদ্ধি উপসংহারে উপনীত হয় যে, হযরত মুহাম্মাদ (ছ্বাঃ)- এর পূর্ববর্তী যে সব ব্যক্তিকে নবী বলে দাবী করা হয়, সাধারণভাবে সকলের নিকট গ্রহণযোগ্য হবার জন্য যে মুতাওয়াতির্ বর্ণনা প্রয়োজন তার অনুপস্থিতির কারণে, সর্বজনীন বিচারবুদ্ধির দৃষ্টিতে তাঁদের ঐতিহাসিক অস্তিত্ব নিঃসন্দেহ নয়। অবশ্য তাঁদের মধ্যকার কারো কারো অস্তিত্ব বিভিন্ন প্রাচীন

ইতিহাস গ্রন্থ থেকে জানা যায়। তবে ঐ সব ইতিহাস- গ্রন্থের অবিকৃত থাকার বিষয়টিও নিশ্চিত নয়।

এমনকি প্রাচীন ইতিহাস গ্রন্থাবলীতে যে সব নবীর নাম উল্লেখ করা হয়েছে তার ভিত্তিতে তাঁদের ঐতিহাসিক অস্তিত্বের বিষয়টি স্বীকার করে নিলেও তাঁদের নবী হওয়ার বিষয়টি বিচারবুদ্ধিগ্রাহ্যভাবে প্রমাণ করা সম্ভব নয়। কারণ, ইতিহাসে উল্লেখ থাকার কারণে পাত্রপাত্রীগণ ও তাঁদের সংশ্লিষ্ট বড় বড় ঘটনা সম্বন্ধে প্রত্যয় সৃষ্টি হওয়া সম্ভব হলেও পাত্রপাত্রীদের গুণাবলী ও তাঁদের প্রত্যেকের সাথে সংশ্লিষ্ট বিস্তারিত ও ছোটখাট ঘটনাবলী সম্বন্ধে প্রত্যয় সৃষ্টি হওয়া সম্ভব নয়। কারণ, এসব বর্ণনা সংশ্লিষ্ট পাত্রপাত্রীদের সাথে লেখকের বা তাঁর তথ্যসূত্রের সম্পর্ক দ্বারা প্রভাবিত হয়ে থাকা খুবই স্বাভাবিক। এ কারণেই অনেক ক্ষেত্রে অভিন্ন ঐতিহাসিক ব্যক্তিত্বকে দুই ইতিহাসকার কর্তৃক বিপরীতভাবে চিত্রিত করতে দেখা যায়।

এমতাবস্থায় নবী হিসেবে পরিগণিত কোনো ব্যক্তির ঐতিহাসিক অস্তিত্ব ইতিহাস থেকে প্রমাণিত হলেও, এমনকি ইতিহাসে তাঁকে নবী বলে উল্লেখ করা হলেও, তা থেকে তাঁর নবুওয়াত সংশ্লিষ্ট প্রমাণ ও ঘটনাবলী সম্পর্কে সুস্থ ও মুক্ত বিচারবুদ্ধির জন্যে প্রত্যয় সৃষ্টি হওয়া সম্ভব নয়। কারণ, নবীর ব্যক্তিচরিত্রের প্রকৃত অবস্থা এবং এতদসংশ্লিষ্ট ঘটনাবলী ও তথ্যাদি মুতাওয়াতির্ পর্যায়ের অথবা বিরোধীদের ইতিবাচক সত্যায়নের অধিকারী না হলে বিচারবুদ্ধির কাছে তা প্রত্যয় উৎপাদক হয় না। আর বলা বাহুল্য যে, হযরত মুহাম্মাদ (ছ্বাঃ)- এর পূর্ববর্তী নবী- রাসূলগণ (আঃ) সম্পর্কে এ জাতীয় বিষয়াদি ইতিহাসে যেভাবে পাওয়া যায় তা এ ধরনের নয়, বিশেষতঃ তা মুতাওয়াতির্ সূত্রে আমাদের নিকট পৌঁছে নি।

এরপরও, ইতিহাসে যাদের নাম নবী হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে তাঁদেরকে নবী বলে ধরে নিলেও তাঁদের নামে যে সব ধর্মগ্রন্থ প্রচলিত আছে সেগুলো যে তাঁদেরই রেখে যাওয়া এবং তাঁদের রেখে যাওয়া হলে তা যে অবিকৃত রয়েছে এ ব্যাপারে প্রত্যয় সৃষ্টি হওয়া সম্ভব নয়। আর নবীকে স্বীকার করার মানে কেবল তাঁদের ঐতিহাসিক অস্তিত্ব ও তাঁদের নবী হওয়ার সত্যতা স্বীকার করা এবং তাঁদের প্রতি সম্মান, শ্রদ্ধা ও ভালোবাসা পোষণ মাত্র নয়। কারণ, নবীর

আবির্ভাবের মূল উদ্দেশ্যই হচ্ছে মানুষকে সঠিক পথ প্রদর্শন। তাই কোনো নবীর রেখে যাওয়া গ্রন্থ অবিকৃতভাবে সংরক্ষিত না থাকলে তাঁর ঐতিহাসিক অস্তিত্ব ও তাঁর নবী হওয়ার সত্যতা স্বীকার এবং তাঁর প্রতি সম্মান, শ্রদ্ধা ও ভালোবাসা পোষণ করা ও না করায় মানুষের জীবন গঠন ও পরিচালনার ক্ষেত্রে খুব একটা পার্থক্য ঘটে না।

কোরআন ব্যতীত সব গ্রন্থই মানবরচিত

পূর্ববর্তী নবী- রাসূলগণের (আঃ) নামে প্রচলিত ধর্মগ্রন্থসমূহ যে যে নবী- রাসূলের (আঃ) নামে প্রচলিত আছে তা যে তাঁদের পরে অন্য লোকদের দ্বারা রচিত হয়েছে এ ব্যাপারে সন্দেহের অবকাশ নেই। তেমনি সে সব গ্রন্থে পরবর্তীকালে যে বিকৃতি সাধিত হয়েছে সে ব্যাপারেও সন্দেহ নেই। সংশ্লিষ্ট ধর্মের অনুসারীদের মধ্যকার পণ্ডিত- গবেষকগণ পর্যন্ত ঐ সব গ্রন্থের সংশ্লিষ্ট নবী- রাসূলগণের (আঃ) পরে রচিত হওয়া ও পরবর্তীতে আরো বিকৃত হওয়ার সত্যতা স্বীকার করেছেন।

হযরত মুহাম্মাদ (ছ্বাঃ)- এর পূর্ববর্তী নবীদের (আঃ) নামে যে সব ধর্মগ্রন্থ প্রচলিত আছে সেগুলোর রচনার ধরন ও বাচনভঙ্গি থেকেই প্রমাণিত হয় যে, সেগুলো মানুষের - সাধারণ লেখকদের রচিত। এ সব গ্রন্থের ভাষা ও বাচনভঙ্গিতে সামগ্রিকভাবে এমন কোনো বৈশিষ্ট্য খুঁজে পাওয়া যায় না যা দ্বারা প্রমাণিত হওয়া সম্ভব যে, এ সব গ্রন্থ মনুষ্য- উর্ধ মহান সত্তা সৃষ্টিকর্তার পক্ষ থেকে অবতীর্ণ।

অবশ্য এ সব গ্রন্থের বিভিন্ন অংশে বিক্ষিপ্তভাবে বহু উন্নত মানের, জ্ঞানপূর্ণ ও দিকনির্দেশক বক্তব্য রয়েছে। কিন্তু গ্রন্থ হিসেবে সামগ্রিক বিচারে এ সব গ্রন্থের কোনোটিই ঐশী গ্রন্থ নয়। এ সব গ্রন্থের বেশীর ভাগই মানবরচিত ইতিহাসগ্রন্থ মাত্র যার বিষয়বস্তু নবী- রাসূলগণের (আঃ) জীবন কাহিনী ও তাঁদের প্রচারিত কিছু কিছু শিক্ষা। অর্থাৎ একেক জন নবীর (আঃ) জীবনকাহিনী বর্ণনা করতে গিয়ে তাঁদের কিছু শিক্ষাও বিভিন্ন প্রসঙ্গে তুলে ধরা হয়েছে। তাই নবী- সংশ্লিষ্ট গ্রন্থ হিসেবে এগুলোকে হযরত মুহাম্মাদ (ছ্বাঃ)- এর জীবনী গ্রন্থের সাথে তুলনা করা যায় - যাতে বিভিন্ন প্রসঙ্গে কোরআন মজীদের কিছু আয়াতও উদ্ধৃত করা হয়েছে, কিন্তু এ সব গ্রন্থকে কিছুতেই কোরআন মজীদের সমপর্যায়ভুক্ত তথা ঐশী গ্রন্থ রূপে গণ্য করা চলে না। এখানে দু'একটি দৃষ্টান্ত দিলে বিষয়টি আরো পরিষ্কার হবে।

বাইবেল-এর ‘পুরাতন নিয়ম’ অংশের প্রথম পাঁচ পুস্তককে হযরত মূসা (আঃ)-এর ওপর অবতীর্ণ ‘তাওরাত’ বলে দাবী করা হয়। এ পঞ্চপুস্তকের সর্বশেষ পুস্তক ‘দ্বিতীয় বিবরণ’। পুস্তকটির ৩৪তম অর্থাৎ সর্বশেষ অধ্যায়ে হযরত মূসা (আঃ)-এর মৃত্যুকালীন ঘটনা, মৃত্যুকালীন বয়স, তাঁকে কবর দেয়া, বনি ইসরাঈলের শোক প্রকাশ ও সবশেষে হযরত ইউশা‘ বিন্ নূন্ (আঃ)-এর ‘বিজ্ঞতার আত্মায় পরিপূর্ণতা’র কথা বর্ণিত হয়েছে। এখন প্রশ্ন হচ্ছে, এ অধ্যায়টি কি তাওরাতের সর্বশেষ অধ্যায় রূপে হযরত মূসা (আঃ)- এর ওপর অবতীর্ণ হয়েছিলো?

হযরত ঈসা (আঃ)-এর ওপর নাযিলকৃত ঐশী কিতাব ‘ইনজীল্’ বলে দাবীকৃত বাইবেলের ‘নতুন নিয়ম’ অংশের প্রথম চার পুস্তকের অবস্থা সর্বাধিক করুণ। কারণ, বাইবেলের ‘পুরাতন নিয়ম’ অংশের প্রথম পাঁচ পুস্তককে একই গ্রন্থের অর্থাৎ ‘তাওরাত’- এর পর্যায়ক্রমিক পাঁচটি খণ্ড বলে গণ্য করা গেলেও ‘নতুন নিয়ম’-এর প্রথম চার পুস্তক চার জন ভিন্ন ভিন্ন লেখক কর্তৃক লিখিত হযরত ঈসা (আঃ)-এর জীবনকাহিনী বিষয়ক চারটি স্বত পুস্তক। চারটি পুস্তকের নামকরণও চারজন লেখকের নামে করা হয়েছে।

‘ইনজীল্’ নামে দাবীকৃত উক্ত পুস্তকগুলোর মধ্যকার বিভিন্ন বিষয়ের বিবরণে বেশ কিছু পার্থক্য ও কমবেশী পরিলক্ষিত হয়। উদাহরণস্বরূপ: ‘যোহন’ পুস্তকের সর্বশেষ দু’টি পদ এরূপ: “সেই শিষ্যই এ সকল বিষয়ে সাক্ষ্য দিচ্ছেন এবং এ সকল লিখেছেন; আর ‘আমরা’ জানি, তাঁর সাক্ষ্য সত্য। যীশূ (ঈসা) আরো অনেক কাজ করলেন; সে সব যদি এক এক করে লেখা হয় তাহলে, ‘আমার’ মনে হয়, লিখতে লিখতে এতো গ্রন্থ হয়ে উঠবে যে, জগতেও তা ধরবে না।” এ উদ্ধৃতি থেকে তৃতীয় ব্যক্তি কর্তৃক পুস্তকটি লিখিত হওয়ার বিষয়টি সুস্পষ্ট।

তেমনি ‘নতুন নিয়ম’-এর ‘লুক’ পুস্তকের সর্বশেষ দু’টি পদে হযরত ঈসা (আঃ)-এর চূড়ান্তভাবে স্বর্গারোহণের পর তাঁর শিষ্যদের জেরূশালেমে প্রত্যাবর্তন ও সদাপ্রভুর প্রশংসাকীর্তণের কথা বলা হয়েছে। এটা কি ঈশ্বরের পক্ষ থেকে হযরত ঈসা (আঃ)- এর ওপর নাযিলকৃত কথা হিসেবে গণ্য হতে পারে?

অন্যদিকে ‘মার্ক্’ পুস্তকের সর্বশেষ দুই পদে যীশূর স্বর্গে নীত হয়ে সদাপ্রভুর ডান পাশে বসার ও তাঁর শিষ্যদের ফিরে গিয়ে প্রচারকার্যে মনোনিবেশের কথা বলা হয়েছে।

প্রশ্ন হচ্ছে, উক্ত তিনটি পুস্তকের এ পদগুলো কি সৃষ্টিকর্তার পক্ষ থেকে হযরত ঈসা (আঃ)- এর ওপর অবতীর্ণ হয়েছিলো? হয়ে থাকলে তা কখন? কখন তিনি তাঁর শিষ্যদের নিকট এ ঐশী প্রত্যাদেশ পৌঁছে দিয়েছিলেন?

আর ‘মথি’ পুস্তকের প্রথম অধ্যায়ে হযরত ঈসা (আঃ)- এর পূর্বপুরুষদের তালিকা (নসবনামা) দেয়া হয়েছে; এটিও ঈশ্বরের পক্ষ থেকে হযরত ঈসা (আঃ)- এর ওপর অবতীর্ণ হয়েছিলো বলে মেনে নিতে হবে কি?

হিন্দু ধর্মের ধর্মগ্রন্থ সমূহের মধ্যে বাচনভঙ্গি ও কাঠামোগত বিচারে সম্ভবতঃ ‘গীতা’য় পরিবর্তন ও বিকৃতির মাত্রা সবচেয়ে কম। কিন্তু এটিও একটি মানবরচিত গ্রন্থ। কারণ, গ্রন্থটির বিষয়বস্তু হচ্ছে কুরুক্ষেত্রের রণাঙ্গনে অর্জুন ও শ্রীকৃষ্ণের কথোপকথন - যাতে অর্জুনের যুদ্ধে অস্বীকৃতির জবাবে প্রদত্ত শ্রীকৃষ্ণের ভাষণ অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। এতে কুরুক্ষেত্রের বর্ণনা ও অর্জুনের অস্বীকৃতিবাচক উক্তির অন্তর্ভুক্তি থেকে সুস্পষ্ট যে, কোনো তৃতীয় ব্যক্তি কর্তৃক এটি রচিত হয়েছে অর্থাৎ পুরো গ্রন্থটি স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ কর্তৃক রচিত বা কথিত নয়।

পূর্ববর্তী ধর্মগ্রন্থসমূহের বিষয়বস্তু পরীক্ষা করলে সে সবে এতো বেশী পরিমাণে বিকৃতি বের হবে যা বিস্তারিতভাবে তুলে ধরতে হলে বিশ্বকোষ রচনা করতে হবে।

বাইবেলের বিভিন্ন পুস্তকে বিভিন্ন নবী- রাসূলের (আঃ) চরিত্রে এমন সব কলঙ্ক লেপন করা হয়েছে যা কোনো নবী সম্পর্কে তো দূরের কথা, কোনো সাধারণ মানুষ সম্পর্কেও চিন্তা করা কষ্টকর। তেমনি হিন্দু ধর্মের বিভিন্ন গ্রন্থে তথাকথিত দেবতাদের যে সব জঘন্য কাণ্ডকারখানার বর্ণনা রয়েছে তা ইতর শ্রেণীর মানুষ সম্বন্ধেও ভাবতে কষ্ট হয়।

বিকৃতির ক্ষেত্রে বর্তমানে প্রচলিত প্রায় সকল প্রাচীন ধর্মগ্রন্থের অবস্থাই একই রকম।

অতএব, এটা সুস্পষ্ট যে, কোরআন- পূর্ববর্তী যে সব ধর্মগ্রন্থ পাওয়া যায় সেগুলো পুরোপুরি মানবরচিত, যদিও সেগুলোতে কমবেশী ঐশী বাণী অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। যে সব নবী- রাসূলের

(আঃ) নামে প্রচলিত তাঁদের পরে অন্য লোকদের দ্বারা এসব গ্রন্থ রচিত হয় এবং কালের প্রভাবে আরো দারুণভাবে বিকৃত হয়। অতএব, না ঐ সব ধর্মগ্রন্থ পথনির্দেশের জন্য গ্রহণযোগ্য হতে পারে, না তাতে নবী হিসেবে উল্লিখিত ব্যক্তিদের নবী হওয়া সম্পর্কে ঐসব গ্রন্থে উল্লেখের ভিত্তিতে প্রত্যয় হাছিল হতে পারে। এমনকি তাঁরা যদি সত্যি সত্যিই নবী হয়েও থাকেন তথাপি তাঁদের ওপর অবতীর্ণ ঐশী কিতাব বর্তমান না থাকায় বা থাকলেও অবিকৃতভাবে না থাকায় তাঁদের নবী হওয়ার ব্যাপারে প্রত্যয়ের তেমন কোনো বাস্তব কার্যকরিতা (সুফল) থাকতে পারে না।

মোদ্দা কথা, বিচারবুদ্ধি হযরত মুহাম্মাদ (ছ্বাঃ)- এর পূর্ববর্তী নবী- রাসূলগণ (আঃ) ও কোরআন-পূর্ববর্তী ঐশী কিতাব সমূহ সম্বন্ধে প্রত্যয়ে উপনীত হতে সক্ষম নয়। কারণ, তা মুতাওয়াতির্ সূত্রে আমাদের নিকট পৌঁছে নি।

এ প্রসঙ্গে উল্লেখ্য যে, কোনো গ্রন্থ মুতাওয়াতির্ বা প্রামাণ্য হলে তাতে বিকৃতি ও পরিবর্তন সাধিত হওয়া বা মূল ভাষা থেকে তা হারিয়ে যাওয়া সম্ভব নয় এবং মূল ভাষায় তার একাধিক পাঠ (text) হওয়াও সম্ভব নয়। অতএব, সকল বিচারেই কোরআনপূর্ব ধর্মগ্রন্থসমূহ পুরোপুরি - প্রত্যাখ্যাত।

মু'জিযাহ্ই চূড়ান্ত প্রমাণ

স্থান ও কালগত ব্যবধান থেকে উদ্ভূত সংশয় দূরীকরণের জন্যই মুতাওয়াতির্ বর্ণনা অপরিহার্য। কিন্তু বর্ণনা যতোই মুতাওয়াতির্ হোক না কেন, যে ব্যক্তি একজন নবীকে প্রত্যক্ষ করেছে, তাঁর জীবন ও আচরণ দেখেছে এবং তাঁর মু'জিযাহ্ও প্রত্যক্ষ করেছে, তার মধ্যে নবীর নবী হওয়া সম্পর্কে যে ধরনের প্রত্যয় সৃষ্টি হওয়া সম্ভব, যারা তাঁকে দেখে নি, তাঁর জীবন ও আচরণ প্রত্যক্ষ করে নি এবং যাদের সামনে তাঁর পক্ষ থেকে কোনো মু'জিযাহ্ সংঘটিত হয় নি, তাদের মধ্যে সে ধরনের প্রত্যয় তৈরী হওয়া সম্ভব নয়। আর তাদের মধ্যে প্রত্যয় সৃষ্টি হলেও তা

মাত্রাগত দিক থেকে প্রত্যক্ষকারীদের প্রত্যয়ের তুলনায় দুর্বলতর হতে বাধ্য; এমনকি তাদের মধ্যে আদৌ প্রত্যয় সৃষ্টি না- ও হতে পারে।

এ প্রসঙ্গে আরো স্মর্তব্য যে, কোনো নবীর ঐতিহাসিক অস্তিত্ব ও ঐশী গ্রন্থ লাভের তথ্য এবং তা পরবর্তী প্রজন্মসমূহের নিকট পৌঁছার ঘটনাটি মুতাওয়াতির্ পর্যায়ে ঘটেছে কিনা তা কেবল জ্ঞানী- গুণী ও গবেষকদের পক্ষে দীর্ঘ ও সুগভীর গবেষণার মাধ্যমে নিশ্চিত করা সম্ভব। আর এ কাজ যথেষ্ট সময়সাপেক্ষ। অন্যদিকে গবেষকগণ এ বিষয়ে গবেষণা করবেন কিনা তা নিশ্চিত করে বলা চলে না এবং গবেষণা করলেও বিভিন্ন কারণে তাঁরা তাঁদের গবেষণাল ফলাফল সাধারণ মানুষের নিকট প্রকাশ না- ও করতে পারেন। অন্যদিকে তাঁরা যে সঠিক ফলাফল প্রকাশ করেছেন এ ব্যাপারে বিভিন্ন কারণে মানুষের মধ্যে আস্থা সৃষ্টি না- ও হতে পারে। তাই লোকদের সামনে একজন নবীর নবুওয়াতের এমন প্রমাণ পেশ করা অপরিহার্য যা অবশ্যই সর্বোচ্চ মানের প্রত্যয় উৎপাদনে সক্ষম হবে। আর তা হচ্ছে একমাত্র মু'জিযাহ্।

অতএব, কোনো নবীর মু'জিযাহ্ যদি স্থান ও কালের সীমাবদ্ধতা থেকে মুক্ত হয় কেবল তখনই তাঁর নবী হওয়া সম্পর্কে স্থান ও কাল নির্বিশেষে সকলের জন্য সমভাবে সর্বোচ্চ মাত্রার প্রত্যয় উৎপাদন হওয়া সম্ভব। বলা বাহুল্য যে, হযরত মুহাম্মাদ (ছ্বাঃ)- এর পূর্ববর্তী নবী- রাসূলগণের (আঃ) কেউই এরূপ কোনো কালোত্তীর্ণ মু'জিযাহর অধিকারী ছিলেন না। তাঁদের মু'জিযাহ্ ছিলো তাঁদের স্থান ও কালের লোকদের জন্য এবং তাঁদের সাথে সাথে তাঁদের প্রদর্শিত মু'জিযাহ্ও ইতিহাসের পাতায় আত্মগোপন করেছে। তাই তাঁদের ঐতিহাসিক অস্তিত্ব, প্রদর্শিত মু'জিযাহর বিবরণ ও রেখে যাওয়া গ্রন্থাবলী এমনকি মুতাওয়াতির্ সূত্রে বর্ণিত বলে প্রমাণিত হলেও (যদিও বাস্তবে তা প্রমাণিত হয় না), স্থান- কালের ব্যবধানের কারণে তাঁদের সম্পর্কে প্রত্যয়ের মাত্রা হতো দুর্বলতর। কিন্তু সংশ্লিষ্ট বর্ণনাসমূহ মুতাওয়াতির্ পর্যায়ের ও অকাট্যভাবে প্রামাণ্য না হওয়ায় সেগুলো আদৌ প্রত্যয় উৎপাদক হতে পারে না।

যার কোনো নবী নেই

এ প্রসঙ্গে একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হচ্ছে এই যে, স্থানগত ও পারিপার্শ্বিক কারণে কোনো ব্যক্তির নিকট আদৌ কোনো নবী- রাসূলের (আঃ) খবর না পৌঁছতে পারে অথবা সত্য নবীর পরিচয় বিকৃতভাবে পৌঁছতে পারে ও তার পক্ষে কোনোভাবেই সে বিকৃতির জাল ভেদ করে সত্য নবীর সত্যতায় উপনীত হওয়া সম্ভব না- ও হতে পারে; এমতাবস্থায় তার করণীয় কী?

এ ধরনের সমস্যা বর্তমান উন্নত যোগাযোগ ব্যবস্থার যুগে ব্যতিক্রম বৈ নয়। বিশেষ করে শিক্ষিত লোকদের জন্যে এ ধরনের সমস্যার মুখোমুখি হওয়ার সম্ভাবনা খুবই কম। কেবল সভ্যতার আলো বিবর্জিত বিচ্ছিন্ন অসভ্য জনপদগুলোতেই এ ধরনের সমস্যা দেখা দিতে পারে। অবশ্য সভ্য জগতেও কম হলেও কোথাও কোথাও এ সমস্যা দেখা দেয়া অসম্ভব নয়।

এ ধরনের পরিস্থিতিতে ব্যক্তিকে পুরোপুরিভাবে তার বিচারবুদ্ধির পথনির্দেশ অনুসরণ করে চলতে হবে।

আমাদের ইতিপূর্বেকার আলোচনা থেকে সুস্পষ্ট যে, মানুষের বিচারবুদ্ধি একাই সৃষ্টিকর্তার অস্তিত্ব ও একত্বের ধারণায় উপনীত হয় এবং মৃত্যুপারের অনন্ত জীবনের ধারণা তার সহজাত। সে এ পার্থিব জীবনের বিভিন্ন অপূর্ণতা ও অন্যায়ের প্রেক্ষাপটে মৃত্যুপরবর্তী জীবন প্রত্যাশা করে এবং সৃষ্টিকর্তার পক্ষে জীবনের পুনঃ- অস্তিত্বদানকে সে সম্ভব বলে মনে করে। এ থেকে তার মধ্যে সৃষ্টিকর্তার নিকট জবাবদিহিতার ধারণা তৈরী হয় এবং তার বিচারবুদ্ধি বা বিবেকবোধের অনুসরণের প্রয়োজনীয়তার অনুভূতি সৃষ্টি হয়। তার মনে হয়, তার বিচারবুদ্ধি যে সব কাজকে উচিত মনে করে তা না করলে এবং যে সব কাজকে অনুচিত মনে করে তা করলে সৃষ্টিকর্তা তাকে শাস্তি দিতে পারেন। এ ধরনের অনুভূতি প্রতিটি মানুষের সহজাত; এর কোনো ব্যতিক্রম নেই।

এমতাবস্থায় যার নিকট কোনো সত্য নবীর পরিচয় যথাযথভাবে পৌঁছে নি এবং তার পরিবেশগত অবস্থা যদি তার মনে সত্য নবী সন্ধানের প্রয়োজনীয়তার অনুভূতি সৃষ্টির পথে অন্তরায় হয় বা অন্তরায় না হলেও তার পক্ষে তা সন্ধান করা সম্ভব না হয়, সে ক্ষেত্রে তাকে অবশ্যই তার

বিচারবুদ্ধির রায়কে অনুসরণ করে চলতে হবে। চিন্তা- চেতনা ও আচরণের ক্ষেত্রে সে বিচারবুদ্ধির রায়ের বরখেলাফ করলে অবশ্যই সে তার বিবেকের আদালতে অপরাধী সাব্যস্ত হবে। অতএব, এ সব ব্যাপারে সে যে তার সৃষ্টিকর্তার দরবারেও অপরাধী সাব্যস্ত হবে তাতে সন্দেহের অবকাশ নেই।

বিচারবুদ্ধির দৃষ্টিতে নবুওয়াতে মুহাম্মাদী (ছ্বাঃ)

মুসলমানদের দ্বারা সর্বশেষ নবী ও রাসূল হিসেবে অনুসৃত হযরত মুহাম্মাদ (ছ্বাঃ)- এর ঐতিহাসিক অস্তিত্ব সম্বন্ধে সামান্যতম বিতর্কেরও অবকাশ নেই। পূর্ববর্তী নবী- রাসূলগণের (আঃ) অস্তিত্ব ও নবুওয়াতের বিষয়টি যেখানে ধর্মীয় সূত্রের ওপর নির্ভর করে ইতিহাসে স্থানলাভ করেছে, সেখানে হযরত মুহাম্মাদ (ছ্বাঃ)- এর ঐতিহাসিক অস্তিত্ব ধর্মীয় সূত্রের ওপর নির্ভরতা ছাড়াই অকাট্যভাবে প্রমাণিত।

সপক্ষ- বিপক্ষ নির্বিশেষে কোনো ঐতিহাসিক সূত্রই হযরত মুহাম্মাদ (ছ্বাঃ)- এর ঐতিহাসিক অস্তিত্ব এবং এখন থেকে চৌদ্দ শতাব্দী আগে (খৃস্টীয় সপ্তম শতাব্দীর শুরুর দিকে) আরবের বুকে তাঁর নবুওয়াত- দাবী সম্বন্ধে না সন্দেহ প্রকাশ করেছে, না এ ব্যাপারে ধর্মীয় সূত্রের ওপর নির্ভর করেছে। যারা তাঁর নবুওয়াত- দাবীকে সত্য বলে স্বীকার করেন নি, তাঁরাও স্বীকার করেছেন যে, তিনি খৃস্টীয় ষষ্ঠ শতাব্দীর অষ্টম দশকের শুরু থেকে খৃস্টীয় সপ্তম শতাব্দীর চতুর্থ দশকের শুরুর দিক পর্যন্ত আরব ভূমিতে জীবনযাপন করেন এবং নিজেকে নবী বলে দাবী করেন।

তিনি ছিলেন মদীনার বুকে প্রথম প্রতিষ্ঠানিক রা ও সরকারের প্রতিষ্ঠাতা এবং তৎকালীন বিশ্বের বৃহত্তম সাম্রাজ্যগুলোর সম্রাটদেরকে তাঁর দ্বীন গ্রহণের জন্য আহবান জানিয়ে তিনি যে সব পত্র লিখেছিলেন তা মানব জাতির ইতিহাসের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ প্রামাণ্য দলীল সমূহের অন্যতম। এ সব কারণে তাঁর ঐতিহাসিক অস্তিত্ব সম্বন্ধে বিন্দুমাত্র সন্দেহ পোষণের কোনো সুযোগই নেই।

ইতিহাস সাক্ষ্য দেয়, হযরত মুহাম্মাদ (ছ্বাঃ) আরবের মক্কাহ্ নগরীতে জন্মগ্রহণ করেন এবং চল্লিশ বছর বয়সে নিজেকে নবী বলে দাবী করেন। এরপর দীর্ঘ তেরো বছর যাবত নানা প্রতি লতার মধ্য দিয়ে সেখানে নিজ ধর্মমত (ইসলাম) প্রচার করেন। অতঃপর তিনি মদীনায় গিয়ে একটি রা প্রতিষ্ঠা ও পরিচালনা করেন। মক্কাস্থ তাঁর প্রতিপক্ষ সহ বিভিন্ন শক্তির সাথে

তাঁকে কয়েক বার যুদ্ধও করতে হয়। এছাড়া তিনি তৎকালীন হাবাশাহ্ (আবিসিনিয়া - বর্তমান ইথিওপিয়া) সম্রাট, মিসর সম্রাট, পারস্য সম্রাট ও রোম সম্রাটের নিকট পত্রসহ প্রতিনিধিদল প্রেরণ করেন। এ সবই ঐতিহাসিক ঘটনা। তাই তাঁর অস্তিত্ব ও নবুওয়াত- দাবী সম্পর্কে জানার জন্য ইতিহাসকে ধর্মীয় সূত্রের বা তাঁর অনুসারীদের ওপর নির্ভর করতে হয় নি।

তিনি কেমন মানুষ ছিলেন? তা জানার জন্যও ইতিহাসকে ধর্মীয় সূত্র (কোরআন মজীদ) বা তাঁর অনুসারীদের (মুসলমানদের) ওপর নির্ভর করতে হয় নি।

মক্কাহ্ নগরীতে তিনি হঠাৎ করে আবির্ভূত কোনো অপরিচিত বহিরাগত বা রহস্যজনক ব্যক্তি ছিলেন না। তিনি নবুওয়াত- দাবীর পূর্বাপর মিলিয়ে তিপ্পান্ন বছর বয়স পর্যন্ত মক্কায় এবং পরবর্তী দশ বছর মদীনায় সকলের সামনে ও সকলের মধ্যে বসবাস করেন। সম্ভ্রান্ত বংশের সন্তান হিসেবে মক্কায় তিনি ছিলেন একজন সুপরিচিত ব্যক্তি; তবে নবুওয়াত- দাবীর পূর্ব পর্যন্ত কোনো গুরুত্বপূর্ণ বা প্রভাবশালী ব্যক্তি ছিলেন না, বরং একজন অত্যন্ত ভালো সাধারণ মানুষ ছিলেন। চল্লিশ বছর বয়সে তিনি নবুওয়াত লাভ করেছেন বলে দাবী করেন ও গোপনে অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ কিছু সংখ্যক মানুষের কাছে তা প্রকাশ করেন। এরপর তেতাল্লিশ বছর বয়স থেকে তিনি প্রকাশ্যে ও ব্যাপকভাবে তাঁর নবুওয়াত- দাবী এবং সর্বসাধারণের অংশীবাদী ধর্মমতের বিপরীতে স্বীয় একত্ববাদী ধর্মমতের প্রচার শুরু করেন।

নবুওয়াত- দাবীর পূর্বে তিনি কোনো নেতা, সমাজপতি, পুরোহিত বা ধর্মনেতা, জ্ঞানী- মনীষী, দার্শনিক, বাগ্মী, কবি- সাহিত্যিক, ভাষাবিদ বা অন্য কোনো ধরনের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তি ছিলেন না। এমনকি তিনি লেখাপড়াও জানতেন না; তিনি ছিলেন নিরক্ষর। তাই কোনো ধর্মগ্রন্থ বা অন্য কোনো ধরনের গ্রন্থ পঠন- অধ্যয়নের সুযোগও তাঁর হয় নি।

তাঁর সময়ে মক্কাহ্বাসীদের মধ্যে লেখাপড়াজানা লোকের সংখ্যা ছিলো খুবই কম; তাঁর নবুওয়াত- দাবী কালে এদের সংখ্যা ছিলো জনাবিশেকের মতো। তাই সে সময় কোনো লোকের লেখাপড়া জানা থাকলে তা অন্যদের জানা না থাকার প্রশ্নই ওঠে না। তিনি কোনো অসাধারণ প্রতিভাবান ব্যক্তিও ছিলেন না। বলা বাহুল্য, লেখাপড়া না জানলেও কোনো অসাধারণ প্রতিভার

অধিকারী ব্যক্তির প্রতিভার বহিঃপ্রকাশ কোনো না কোনোভাবে ঘটেই, তাই এরূপ প্রতিভা দীর্ঘ চার দশক কাল গোপন থাকতে পারে না। তাঁর কাছ থেকে এ ধরনের কোনো প্রতিভার বহিঃপ্রকাশও ঘটে নি।

কিন্তু তিনি জ্ঞানী- গুণী, প্রতিভাবান, নেতৃস্থানীয় বা প্রভাবশালী ব্যক্তি ছিলেন না বটে, তবে তৎকালীন অংশীবাদী প্রায় অসভ্য আরবের সেই কলুষিত পরিবেশে তিনি ছিলেন একজন খুবই ভালো মানুষ। আস্তিক- নাস্তিক নির্বিশেষে সকল মানুষের কাছে তথা সুস্থ বিচারবুদ্ধির কাছে উত্তম বলে বিবেচিত গুণাবলী, যেমন: সত্যবাদিতা, আমানতদারী, পরোপকারিতা, দয়ার্দ্রতা, শান্তিপ্রিয়তা ইত্যাদির জন্য তিনি সুপরিচিত ছিলেন। অন্যদিকে মিথ্যা, পরস্ব অপহরণ, যুলুম- অত্যাচার, হত্যা, স াস, আমানতের খেয়ানত, ব্যভিচার, নেশাখোরী ইত্যাদি যতো রকমের খারাপ ও নিন্দনীয় কাজ তৎকালীন আরবকে, বিশেষ করে মক্কাহকে মহামারীর মতো গ্রাস করেছিলো তা বিন্দুমাত্রও তাঁকে স্পর্শ করে নি। এ কারণে তিনি মক্কাহবাসীদের সকলের কাছেই প্রিয়পাত্র ছিলেন। কিন্তু তিনি যখন তাদের অংশীবাদী ধর্ম ও সমাজ ব্যবস্থাকে ভ্রান্ত বলে অভিহিত করেন এবং একত্ববাদ প্রচার করতে শুরু করেন তখন তারা তাঁর শত্রুতে পরিণত হয়। তবে শত্রুতে পরিণত হলেও তখনো তারা তাঁর সকল উত্তম গুণের ওপরই আস্থা পোষণ করতো। এ কারণেই তাদের অনেকেই দূরদেশে সফরে গমনকালে নিজ ধর্মের লোকদের কাছে স্বীয় ধনসম্পদ আমানত রেখে যেতে ভরসা না পেয়ে তাঁর নিকট আমানত রেখে যেতো। এমনকি কেবল ভিন্ন মতাবলম্বী হবার কারণে তারা যখন তাঁকে হত্যা করার সিদ্ধান্ত নেয় তখনো তাঁর নিকট তাদের মধ্যকার বহু লোকের ধনসম্পদ গচ্ছিত ছিলো এবং তিনি গোপনে মক্কাহ্ ত্যাগ করে মদীনায় চলে যাবার সময় ঐ সব ধনসম্পদ তাদের মালিকদের কাছে ফিরিয়ে দেয়ার দায়িত্বে অবহেলা করেন নি, বরং এ কাজের জন্যে তিনি তাঁর চাচাতো ভাই হযরত আলী (আঃ)- কে দায়িত্ব দিয়ে যান।

তিনি প্রচলিত ধর্ম ও সমাজ ব্যবস্থার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেন, দেবদেবীদের অসারতার কথা বলেন, এভাবে সমাজের শত্রুতার উদ্রেক করে নিজেকে বিপদাপন্ন করেন। পার্থিব স্বার্থের

পূজারী স্থিতাবস্থার সমর্থকদের দৃষ্টিতে তাঁর এ আচরণ ছিলো পাগলামি স্বরূপ। অথচ তারা জানতো যে, তিনি পাগল ছিলেন না। তিনি পাগলসুলভ কোনো আচরণই করেন নি। তিনি বরং তাদের চিন্তা- চেতনা ও ধ্যান- ধারণার অন্ধত্বের বিরুদ্ধে কথা বলেন। সকলকে বিচারবুদ্ধির রায় মেনে চলার আহবান জানিয়ে এবং জীবন ও জগতের মহাসত্য সম্বন্ধে বিচারবুদ্ধির অকাট্য যুক্তি উপস্থাপন করে তিনি প্রমাণ করেন যে, এই সহজ- সরল নিরক্ষর সাধারণ মানুষটি সহসাই এমন এক জ্ঞানীতে পরিণত হয়েছেন যে, তিনি ইতিহাসের সকল যুগের শ্রেষ্ঠতম দার্শনিক- মনীষীদের ও ধর্মীয় পণ্ডিতদের পর্যন্ত ছাড়িয়ে গেছেন। কিন্তু অন্যদের মতো পার্থিব স্বার্থের দিকে না তাকিয়ে সত্য প্রকাশের মাধ্যমে নিজেকে বিপদাপন্ন করার কারণে, আভিধানিক অর্থে নয়, রূপকার্থে তারা তাঁকে পাগল বলে আখ্যায়িত করে।

কিন্তু তারা যেমন জানতো, তেমনি মক্কাহর সর্ব স্তরের মানুষই জানতো যে, তিনি পাগল নন, বরং মহাসত্যের প্রকাশক। তাই ক্রমেই সমাজের মুক্তবিবেক সৎ মানুষেরা ও মযলূম লোকেরা একজন- দু'জন করে তাঁর অনুসারী হতে থাকেন। বিশেষ করে তিনি আল্লাহর নিকট থেকে প্রাপ্ত ওয়াহী (প্রত্যাদেশ) হিসেবে দাবী করে যে সব বক্তব্য প্রকাশ করেন তার সুউচ্চ সাহিত্যিক মান, প্রাঞ্জলতা, ওজস্বিতা, মাধুর্য ও জ্ঞানগর্ভতার প্রভাবে বহু লোক তাঁর নবুওয়াতের দাবী মেনে নিয়ে তাঁর অনুসারী হয়ে যান। এমতাবস্থায় 'পাগল' আখ্যা কোনোই কাজ না দেয়ায় কায়েমী স্বার্থের ধারক- বাহকরা তাঁকে কবি বলে আখ্যায়িত করে। কিন্তু তারা জানতো যে, তিনি কবি নন।

এ প্রসঙ্গে উল্লেখ্য যে, মানব জাতির ভাষাসমূহের মধ্যে আরবী ভাষা সর্বাধিক প্রকাশক্ষমতার সম্ভাবনার অধিকারী এবং এ ক্ষেত্রে অন্য কোনো ভাষার পক্ষেই আরবী ভাষার ধারেকাছেও পৌঁছা সম্ভব নয়। সংক্ষিপ্ততম বক্তব্যে সূক্ষ্মতম ও গভীরতম তাৎপর্য প্রকাশের ক্ষমতার কারণে আরবরা তাদের ভাষাকে বলতো "লিসানে 'আরাবী" (সূক্ষ্মতম ভাব প্রকাশক্ষম প্রাঞ্জল ভাষা), আর আরব ও অনারবদের ভাষার প্রকাশক্ষমতার মধ্যকার আকাশ- পাতাল পার্থক্য বিবেচনা করে তারা অনারবদেরকে বলতো 'আজামী (বোবা)। তারা মনে করতো, বোবা প্রাণীদের (পশু- পাখীদের)

যেমন কোনো ভাষা নেই, বরং কতোগুলো ধ্বনির সাহায্যে কোনো মতে তারা নিজেদের মধ্যে ভাববিনিময় করে, ঠিক সেভাবেই অনারবদের ভাষা আদৌ ভাষা পদবাচ্য নয়; তারা কতোগুলো শব্দ ও বাক্য দ্বারা কোনো মতে নিজেদের অপরিহার্য প্রয়োজনীয় ভাব বিনিময় করে থাকে।[৮]

বস্তুতঃ সভ্যতার আলো বিবর্জিত আরবদের গৌরব করার মতো অন্য কোনো সাংস্কৃতিক উপাদান বা সভ্যতার নিদর্শনই ছিলো না। তাদের গৌরব করার মতো একটিমাত্র সাংস্কৃতিক উপাদান ছিলো, তা হচ্ছে তাদের ভাষা। আর তৎকালে আরবী ভাষা, বিশেষ করে কবিতার ক্ষেত্রে, প্রকাশক্ষমতার শীর্ষে উপনীত হয়েছিলো। প্রতি বছর মক্কায় 'ওকায্ মেলা' নামে একটি মেলা অনুষ্ঠিত হতো এবং এ উপলক্ষ্যে আরব কবিদের মধ্যে কবিতা প্রতিযোগিতা হতো। এতে আরবী ভাষার শ্রেষ্ঠ কবিগণ তাঁদের কবিতা পরিবেশন করতেন এবং প্রবীণ কবি ও ভাষাবিদগণ সেগুলো পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে সাতটি শ্রেষ্ঠতম কবিতা নির্বাচন করতেন। এ কবিতাগুলো স্বর্ণক্ষরে লিপিবদ্ধ করে কা'বাহ্ গৃহের দেয়ালগাত্রে ঝুলিয়ে রাখা হতো এবং এ কারণে এগুলোকে "সাব্'আহ্ মু'আল্লাক্বাহ্" (ঝুলন্ত সাত) বলা হতো।

কিন্তু এ সব কবিতা ইতিপূর্বে জনমনে বিস্ময়কর সম্মোহনী প্রভাব সৃষ্টি করলেও হযরত মুহাম্মাদ (ছ্বাঃ) আল্লাহর পক্ষ থেকে তাঁর নিকট নাযিলকৃত ঐশী গ্রন্থ কোরআন মজীদের আয়াত ও সূরা হিসেবে দাবী করে যে সব বক্তব্য পেশ করেন তা মানুষের হৃদয়-মনে এমনই গভীর প্রভাব সৃষ্টি করে যে, তার কাছে ঐ সব কবিতা নিস্প্রভ হয়ে পড়ে। তাছাড়া শ্রেষ্ঠতম আরবী কবিতাগুলোতে প্রাঞ্জলতা, ওজস্বিতা, ভাষার সৌন্দর্য ও ভাবের গভীরতা যতোই থাকুক না কেন, তাতে একই সাথে জ্ঞানগর্ভতা ও জীবনপথে চলার জন্য পথনির্দেশের স্থানদান সম্ভব হয় না যা কোরআন মজীদে রয়েছে।

এ কারণে আরবরা ভালোভাবেই জানতো যে, হযরত মুহাম্মাদ (ছ্বাঃ) কবি নন এবং কোরআন কোনো কাব্যগ্রন্থ নয়।

অন্যদিকে কোরআনের প্রভাবে যারা আকৃষ্ট হন এর প্রতি তাঁদের আকর্ষণ ছিলো এতোই গভীর ও ব্যাপক যে, তাঁরা প্রচলিত ধর্ম ও সমাজ ব্যবস্থা এবং এর ধারক- বাহক সমাজপতি, ধর্মনেতা, এমনকি স্বীয় পরিবার- পরিজন ও আত্মীয়- স্বজনকে পর্যন্ত পরিত্যাগ করে হযরত মুহাম্মাদ (ছ্বাঃ)- এর দলেই শুধু ভিড়ে যান নি, বরং প্রত্যেকে নিজের জীবনের চেয়েও তাঁকে বেশী ভালোবাসতে লাগলেন।

যেহেতু জাদু- ম র দ্বারা স্বামী- স্ত্রী, ভাই- ভাই ও স্বজনদের মধ্যে বিচ্ছেদ সৃষ্টি করা হয়, সেহেতু কোরআনের প্রভাবে আরবদের সমাজে ও পরিবারে ভাঙ্গন সৃষ্টি হওয়ায় হযরত মুহাম্মাদ (ছ্বাঃ)- এর বিরোধীরা কোরআনকে জাদু ও তাঁকে জাদুকর বলে অভিহিত করাকেই যথোচিত মনে করে, যদিও তারা জানতো যে, তিনি জাদুকর নন এবং কোরআন কোনো জাদু নয়। কারণ, জাদুকরের কাজের পিছনে থাকে হীন উদ্দেশ্য। ধর্ম ও সমাজ সংস্কার, মানুষকে চিন্তা- চেতনার অন্ধত্ব থেকে মুক্ত করে বিচারবুদ্ধির আলোকোজ্জ্বল জগতে এনে স্বাধীন সিদ্ধান্ত গ্রহণের জন্যে ছেড়ে দেয়ার যে মহান দায়িত্ব কোরআন পালন করছে, জাদুকর তা করে না। তেমনি স্রেফ মানসিক শক্তি বা প্রভাবসৃষ্টিকারী কিন্তু জ্ঞানমূলক বিষয়বস্তু বিহীন জাদুম র সাথে জ্ঞানগর্ভমূলক ও পথনির্দেশক কোরআনের আয়াত সমূহ ও সূরাকে কিছুতেই তুলনা করা চলে না। তবু অনন্যোপায় হয়ে তারা এ ভিত্তিহীন আখ্যায় তাঁকে ও কোরআনকে আখ্যায়িত করে। কিন্তু সর্বজনীনভাবে ঘৃণ্য ও নিন্দনীয় - এমন কোনো দোষ তারা তাঁর ওপর আরোপ করতে পারে নি। আর তা করলেও মানুষের কাছে সে মিথ্যা দোষারোপ গ্রহণযোগ্য হতো না। সকলের কাছে সুপরিচিত ও সর্বোত্তম বলে পরিগণিত এ মানুষটির বিরুদ্ধে যে কোনো মিথ্যা দোষারোপ করলেই যে মানুষ তা মেনে নেবে এমন ভরসা তাদের ছিলো না। বরং এতে হিতে বিপরীত হবার আশঙ্কাই ছিলো বেশী।

তৎকালীন আরব উপদ্বীপে মক্কাহর অংশীবাদীরা ছাড়াও ইয়াহূদী ও খৃস্টানদের বসবাস ছিলো। এ তিন গোষ্ঠীরই আরব উপদ্বীপের বাইরে যোগাযোগ ছিলো। তৎকালীন বিশ্বে রোম ও পারস্য সাম্রাজ্য ছিলো দু'টি বৃহৎ শক্তি। এছাড়া মিসর ও আবিসিনিয়ায় (বর্তমান ইথিওপিয়ায়)ও দু'টি

উল্লেখযোগ্য রা শক্তি ছিলো। হযরত মুহাম্মাদ (ছ্বাঃ) মদীনায় যাওয়ার পর সেখানে রা ও সরকার প্রতিষ্ঠা করেন এবং উপরোক্ত চারটি দেশের শাসকদের নিকটই ইসলামের দাও'আত দিয়ে পত্র প্রেরণ করেন।

এর আগে তিনি মক্কায় থাকাকালে তাঁর অনুসারীদের একাংশ আবিসিনিয়ায় হিজরত করেছিলেন। মক্কাহর অংশীবাদীরা তাঁর বিরুদ্ধে মোকাবিলার জন্যে মিত্র সন্ধান করতে ও তাঁকে কোণঠাসা করতে আবিসিনিয়ার সম্রাট না াসীর দরবারে ও পরবর্তীকালে রোম সম্রাট হেরাক্লিয়াসের দরবারে প্রতিনিধিদল পাঠিয়েছিলো। এ উভয় প্রতিনিধি-দলই হযরত মুহাম্মাদ (ছ্বাঃ)-এর বিরুদ্ধে প্রচলিত ধর্মমতের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ও নতুন ধর্মমত প্রচারের অভিযোগ করে, কিন্তু সর্বজনীন দৃষ্টিতে মন্দ, দোষ বা অপরাধ বলে পরিগণিত এমন কোনো কাজে জড়িত থাকার অভিযোগ তাঁর বিরুদ্ধে পেশ করে নি, বরং সর্বজনীন দৃষ্টিতে উত্তম বলে পরিগণিত গুণাবলীতে তাঁর ভূষিত থাকার কথা তারা স্বীকার করে।

আরবের ইয়াহূদী ও খৃস্টানদেরও অনেকেই তাঁকে নবী বলে মেনে নেয় নি এবং তাদের অনেকেই পরে আরবের বাইরে চলে যায়। কিন্তু তারাও তাঁর বিরুদ্ধে কোনোরূপ দোষের কথা প্রচার করে নি। তারা তাদের নিজ নিজ ধর্মগ্রন্থের ভবিষ্যদ্বাণীর ভিত্তিতে প্রতিশ্রুত নবী বা ত্রাণকর্তার আবির্ভাবের জন্য প্রতীক্ষা করছিলো। তবে তাদের ধারণা ছিলো যে, সে নবীর আবির্ভাব তাদের মধ্যেই ঘটবে। কিন্তু তা না হওয়ায়, বরং মক্কাহর কুরাইশদের মধ্যে এ নবীর আবির্ভাব হওয়ায় এবং তিনি তাদের ধর্মে পুঞ্জীভূত মিথ্যা ও কুসংস্কারের বিরোধিতা করায় আরবের ইয়াহূদী ও খৃস্টানদের বেশীর ভাগই তাঁর অনুসরণ করতে আগ্রহী হয় নি। কিন্তু তা সত্ত্বেও তারা তাঁর বিরুদ্ধে উত্থাপন করার মতো কোনো দোষ খুঁজে পায় নি।

মোদ্দা কথা, সপক্ষ-বিপক্ষ নির্বিশেষে ঐতিহাসিক সূত্রসমূহের মুতাওয়াতির্ বর্ণনা থেকে কয়েকটি বিষয় নিশ্চিতভাবে জানা যায়। তা হচ্ছে:

* হযরত মুহাম্মাদ (ছ্বাঃ) একজন ঐতিহাসিক ব্যক্তিত্ব যার স্থান ও কাল সম্বন্ধে কোনোরূপ অস্পষ্টতা বা সংশয় নেই।

* জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত তিনি সমাজমানুষের মধ্যে বসবাস করেন। ফলে তাঁর জীবনের কোনো অধ্যায় বা কোনো দিকের ওপর কোনোরূপ অজ্ঞানতা, অস্পষ্টতা বা রহস্যময়তার আবরণ নেই।

* তিনি ছিলেন সর্বজনীনভাবে স্বীকৃত উত্তম গুণাবলীর আধার এবং সর্বজনীনভাবে স্বীকৃত মন্দ গুণাবলী থেকে মুক্ত। এ ব্যাপারে শত্রু- মিত্র কারো মধ্যে কোনোরূপ দ্বিমতের অবকাশ নেই।

* তিনি নিজেকে নবী বলে দাবী করেছিলেন।

* তিনি খুবই ভালো লোক ছিলেন, কিন্তু তিনি ছিলেন নিরক্ষর; লেখাপড়া জানতেন না; কোনোদিন কোনো বই- পুস্তক পড়েন নি বা কোনো শিক্ষকের নিকট শিক্ষা গ্রহণ করেন নি। নবুওয়াত দাবী করার পূর্বে তিনি কোনোরূপ জ্ঞানী- গুণী, দার্শনিক, কবি, ভাষাবিদ, ধর্মনেতা বা সমাজনেতা ছিলেন না এবং তাঁর মধ্যে কোনোরূপ বিশেষ প্রতিভা লক্ষ্য করা যায় নি। কিন্তু নবুওয়াত দাবী করার সাথে সাথে তিনি জীবন ও জগতের মহাসত্য সম্বন্ধে এবং মানব জীবনের সকল দিকের জন্য পথনির্দেশমূলক এমন সব জ্ঞানপূর্ণ ও তত্ত্বমূলক কথা বলতে শুরু করেন যা পরবর্তী কালের সকল যুগের সকল জ্ঞানী- গুণী, মনীষী ও দার্শনিকের বিস্ময় উৎপাদন করে এবং তিনি এমন ভাষায় সে বক্তব্য পেশ করেন যে, আরবী ভাষার শ্রেষ্ঠতম কবি, ভাষাবিদ ও বাক্যবাগীশগণ পর্যন্ত প্রাঞ্জলতা, ওজস্বিতা, সৌন্দর্য, ভাব ও জ্ঞানগর্ভতার বিচারে সে বক্তব্যের কাছে হার মানতে বাধ্য হন। কিন্তু এ সব কিছুর জন্য তিনি নিজের বাহাদুরী দাবী করেন নি। বরং তিনি দাবী করেন যে, এ সবই সৃষ্টিকর্তা আল্লাহ্ তা'আলার পক্ষ থেকে তাঁকে প্রত্যাদেশ করা হয়েছে যাতে তিনি মানুষের কাছে তা পৌঁছে দেন।

তাঁর এ অবস্থা এবং তাঁর আকস্মিক পরিবর্তন পর্যালোচনা করলে বিচারবুদ্ধির পক্ষে তাঁর নবুওয়াত- দাবী মেনে নেয়া ছাড়া গত্যন্তর থাকে না।

শ্রেষ্ঠতম ও সর্বোত্তম মানুষ

মানব জাতির ইতিহাসে হযরত মুহাম্মাদ (ছ্বাঃ) যে শ্রেষ্ঠতম ও সর্বোত্তম মানুষ এ সত্য তাঁর ধর্মের অনুসারী নন এমন জ্ঞানী- গুণীরাও স্বীকার করেছেন। একজন নবীর মধ্যে যে সব ইতিবাচক গুণাবলী থাকা প্রয়োজন তিনি তার সবগুলোরই পূর্ণ মাত্রায় অধিকারী ছিলেন এবং যে সব নেতিবাচক বৈশিষ্ট্য থেকে একজন নবীর মুক্ত থাকা অপরিহার্য তিনি তা থেকে পুরোপুরি মুক্ত ছিলেন। এহেন ব্যক্তি যখন নিজেকে নবী বলে দাবী করেন তখন যে কোনো সত্যপন্থী সুস্থ বিচারবুদ্ধি সম্পন্ন মানুষ তাঁকে নবী হিসেবে স্বীকার করতে বাধ্য। পার্থিব লাভ- লোভ, পদমর্যাদা এবং 'পাছে লোকে কিছু বলে' ধরনের দ্বিধা- দ্বন্দ্ব ও সংস্কারের কাছে আত্মসমর্পণ করে নি এমন সুস্থ বিচারবুদ্ধি অবশ্যই তাঁকে নবী হিসেবে মেনে নেবে।

কিন্তু দুর্ভাগ্যজনক যে, পাশ্চাত্যের অনেক মনীষী কোরআন মজীদের জ্ঞানগর্ভতা ও সাহিত্যিক সৌন্দর্যের বিচারে এবং তাঁর জীবনাচরণ ও ঐতিহাসিক ভূমিকার কারণে হযরত মুহাম্মাদ (ছ্বাঃ)-কে মানব জাতির ইতিহাসে 'শ্রেষ্ঠতম ও একক অসাধারণ প্রতিভার অধিকারী' শ্রেষ্ঠতম জ্ঞানী ও সর্বোত্তম মানুষ হিসেবে উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করে কার্যতঃ কোরআনকে তাঁর রচিত গ্রন্থ বলে দাবী করেছেন। অর্থাৎ তাঁরা তাঁকে নবী বলে মানতে অস্বীকার করেছেন। কিন্তু হযরত মুহাম্মাদ (ছ্বাঃ)-এর নিরক্ষর অবস্থায় এরূপ মহাজ্ঞানী হওয়া কী করে সম্ভব হলো এবং দীর্ঘ চল্লিশ বছর বয়স পর্যন্ত তাঁর এ কথিত অসাধারণ প্রতিভার মোটেই বহিঃপ্রকাশ না ঘটাই বা কী করে সম্ভব হলো - তার জবাব এ সব মনীষী প্রদান করেন নি।

তার চেয়েও বড় কথা, তাঁরা যে ব্যক্তির [হযরত মুহাম্মাদ (ছ্বাঃ)- এর] সর্বোত্তম গুণাবলীতে মোহিত হয়ে তাঁকে মানবজাতির ইতিহাসে শ্রেষ্ঠতম মানুষ বলে অভিহিত করলেন, তিনি স্বয়ং যেখানে নিজেকে নবী বলে দাবী করেছেন, সেখানে তাঁকে অসাধারণ প্রতিভা বলে অর্থাৎ নবী নন বলে অভিহিত করে কার্যতঃ তাঁকে পরোক্ষভাবে নবী হওয়ার মিথ্যা দাবীদার বলে অভিহিত করেছেন।

এভাবে উক্ত মনীষীগণ স্ববিরোধিতার আশ্রয় নিয়েছেন। কারণ, বিদ্যমান ঐতিহাসিক ও অন্যান্য তথ্য- প্রমাণাদির ভিত্তিতে তিনি প্রকৃতই মানব জাতির শ্রেষ্ঠতম ও সর্বোত্তম মানুষ বলে যদি তাঁদের প্রত্যয় জন্মে থাকে তাহলে তাঁরা তাঁর নবুওয়াত- দাবীকে শ্রদ্ধাভরে মেনে নিতে বাধ্য। আর তাঁরা যদি তাঁর নবুওয়াতের দাবীকে মিথ্যা মনে করে থাকেন (যা করলে অবশ্য তার কারণ ও প্রমাণ পেশ করা অপরিহার্য - যা তাঁরা করেন নি) তাহলে তাঁদের পক্ষ থেকে তাঁর এতো সব প্রশংসা ভণ্ডামি বৈ নয়। কারণ, কোনো ব্যক্তি নবী না হয়েও নিজেকে নবী বলে দাবী করলে তাঁকে মানবজাতির ইতিহাসের শ্রেষ্ঠতম ও সর্বোত্তম মানুষ বলে অভিহিতকরণ এক ধরনের ভণ্ডামি ছাড়া আর কিছু হতে পারে না।

বস্তুতঃ হযরত মুহাম্মাদ (ছ্বাঃ)- এর গুণ- বৈশিষ্ট্যসমূহ ঐতিহাসিক সূত্রে এমনভাবে বর্ণিত হয়েছে যে, তা অস্বীকার করা বা এড়িয়ে যাওয়া কারো পক্ষেই সম্ভব নয়। তাই এ সব মনীষী তা স্বীকার করে নিতে বাধ্য হয়েছেন, কিন্তু স্বীয় অন্তরের ব্যাধিগ্রস্ততার কারণে তাঁরা তাঁকে নবী বলে স্বীকার করার পরিবর্তে অসাধারণ প্রতিভা বলে তাঁর প্রশংসাকীর্তণ করে তাঁর নবুওয়াত থেকে অন্যদের দৃষ্টিকে ফিরিয়ে রাখার অপচেষ্টা করেছেন।

প্রতিশ্রুত নবী

রাসূলে আকরাম হযরত মুহাম্মাদ (ছ্বাঃ) সম্পর্কে এ পর্যন্ত যা কিছু উল্লেখ করা হলো বিচারবুদ্ধির নিকট তাঁর নবুওযাত- দাবী গ্রহণযোগ্য হবার জন্য তা- ই যথেষ্ট। তা সত্ত্বেও এতদসংক্রান্ত প্রত্যয়কে অধিকতর শক্তিশালী করার জন্য বিভিন্ন ধর্মগ্রন্থে ‘প্রতিশ্রুত নবী’ সংক্রান্ত ভবিষ্যদ্বাণীর প্রতি দৃষ্টি দেয়া যেতে পারে।

কোরআন- পূর্ববর্তী ধর্মগ্রন্থ সমূহের ঐতিহাসিক ধারাবাহিকতা ও প্রামাণ্যতা প্রমাণ করা সম্ভব নয় - এ এক অকাট্য সত্য। এ সব ধর্মগ্রন্থ হয় পুরোপুরি মানবরচিত, নয়তো ঐশী গ্রন্থের বিকৃত ও পরিবর্তিত রূপ - এতেও সন্দেহ নেই। তবে বিকৃত ও পরিবর্তিত হলেও এ সব গ্রন্থে যে মূল গ্রন্থাবলীর কিছু কিছু বক্তব্য রয়ে গেছে তাতেও বিচারবুদ্ধি সন্দেহ পোষণ করে না। এমনকি

মানবরচিত হলেও তাতে যে ঐশী গ্রন্থের কিছু কিছু বক্তব্য অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে তাতেও সন্দেহ করার কারণ নেই। দ্বিতীয়তঃ বিচারবুদ্ধি এ- ও স্বীকার করে যে, বিকৃতির নায়করা কোনো দলীলে কেবল সেই সব বিষয়ই পরিবর্জন, বিকৃত বা সংযোজন করে থাকে যা তাদের অন্যায় স্বার্থের হেফাযতের জন্য প্রয়োজন। যা কিছু তাৎক্ষণিকভাবে তাদের স্বার্থের সাথে সাংঘর্ষিক নয় তা বিকৃত বা বর্জন না করাই স্বাভাবিক। এভাবে এসব গ্রন্থে অতীতের ঐশী গ্রন্থাবলীর অনেক বক্তব্য রয়ে গেছে বলে বিচারবুদ্ধি রায় প্রদান করে।

অতীতের এ সব ধর্মগ্রন্থে একটি অভিন্ন বিষয় পাওয়া যায়, তা হচ্ছে একজন প্রতিশ্রুত নবী বা ত্রাণকর্তা বা অবতার সম্পর্কে ভবিষ্যদ্বাণী। এ সব ভবিষ্যদ্বাণীতে সৃষ্টিকর্তার বিশ্বজনীন বাণী নিয়ে একজন নবী বা ত্রাণকর্তার আবির্ভাবের কথা যেমন বলা হয়েছে, তেমনি তাঁর নাম, আবির্ভাবস্থল, পরিচয়বাচক বিভিন্ন নিদর্শন, কার্যকলাপ ও তাঁর জীবনের গুরুত্বপূর্ণ ঘাত-প্রতিঘাতের কথাও বলা হয়েছে। এর সবগুলোই একমাত্র হযরত মুহাম্মাদ (ছ্বাঃ)- এর সাথে মিলে যায়। অবশ্য অনেক ক্ষেত্রে মূল ভাষার গ্রন্থ হারিয়ে যাওয়া ও অন্য ভাষায় অনূদিত হওয়ার কারণে কতক মূল নামও হারিয়ে যায় এবং তদস্থলে অনূদিত নাম অন্তর্ভুক্ত হয়। অর্থাৎ ব্যক্তি ও স্থানের নামকে গুণবাচক বিশেষ্য গণ্য করে অনুবাদ করা হয়েছে। কিন্তু এ সব নামকে আরবী ভাষায় অনুবাদ করলে মূল নাম পাওয়া যায়। শুধু তা- ই নয়, বার্নাবাসের ইনজীল্ সহ কতক গ্রন্থে এখনো সুস্পষ্ট ভাষায় 'মুহাম্মাদ', 'আহমাদ্' [হযরত মুহাম্মাদ (ছ্বাঃ)- এর অপর নাম] ইত্যাদি মূল নাম বহাল দেখতে পাওয়া যায়। [বলা বাহুল্য যে, হযরত মুহাম্মাদ (ছ্বাঃ)- এর জন্মের পূর্ব থেকে চলে আসা এ সব গ্রন্থ যে মুসলমানদের রচিত নয় এবং এ সব ভবিষ্যদ্বাণীর পিছনে যে মুসলমানদের কোনো কারসাজি থাকতে পারে না - সে ব্যাপারে বিতর্কের অবকাশ নেই।] এ বিষয়ে বিভিন্ন ভাষায় বহু গ্রন্থ রচিত হয়েছে।

এবার আমরা এ সব ভবিষ্যদ্বাণী সম্পর্কে বিচারবুদ্ধির আলোকে সাধারণভাবে পর্যালোচনা করবো। এ পর্যালোচনা এ জন্য প্রয়োজন যে, প্রাচীন ধর্মগ্রন্থ সমূহের অনুসারী হবার দাবীদারগণ তাঁদের ধর্মগ্রন্থে একজন প্রতিশ্রুত নবী বা ত্রাণকর্তার আগমনের ভবিষ্যদ্বাণী থাকার

কথা স্বীকার করা সত্ত্বেও হযরত মুহাম্মাদ (ছ্বাঃ)- ই যে সেই নবী বা ত্রাণকর্তা তা মেনে নিতে রাযী নন। তাঁদের এ অবস্থানের পরিপ্রেক্ষিতে আমরা কয়েকটি সর্বজনস্বীকৃত ও অকাট্যভাবে প্রমাণিত সত্যের পুনরুল্লেখ করে অতঃপর প্রতিশ্রুত নবী বা ত্রাণকর্তার আবির্ভাব বিষয়ক প্রশ্নের সমাধান নির্দেশের চেষ্টা করবো।

এ প্রসঙ্গে অকাট্যভাবে প্রমাণিত ও সর্বজনস্বীকৃত বিষয়গুলো হচ্ছে এই:

* মুসলমানদের দ্বারা সর্বশেষ নবী ও রাসূল হিসেবে অনুসৃত হযরত মুহাম্মাদ (ছ্বাঃ)- এর পূর্ববর্তী কোনো নবী 'প্রতিশ্রুত নবী' বা 'প্রতিশ্রুত ত্রাণকর্তা' নন। কারণ, পূর্ববর্তী প্রতিটি উল্লেখযোগ্য ধর্মগ্রন্থেই এ বিষয়ে ভবিষ্যদ্বাণী করা হয়েছে। এর মানে ঐ সব গ্রন্থ রচনাকালে বা তার পূর্বে প্রতিশ্রুত নবীর আগমন ঘটে নি।

হযরত মূসা (আঃ) উক্ত প্রতিশ্রুত নবী নন। কারণ, তিনি নিজেকে প্রতিশ্রুত নবী বলে দাবী করেন নি। বরং তাওরাতে প্রতিশ্রুত নবীর আগমনের ভবিষ্যদ্বাণী করা হয়েছে যা তাঁর প্রতিশ্রুত নবী না হওয়ার সপক্ষে অকাট্য প্রমাণ।

হযরত ঈসা (আঃ)ও সেই প্রতিশ্রুত নবী নন। কারণ, ইয়াহূদীরা তাঁকে আদৌ নবী বলে মানে না। অতএব, তাদের কাছে তাঁর প্রতিশ্রুত নবী হবার প্রশ্নই ওঠে না। আর খৃস্টানরা তাঁকে 'খোদার পুত্র' মনে করলেও তিনি নিজেকে 'প্রতিশ্রুত নবী' বলে দাবী করেছেন এমন কথা খৃস্টানদের উপস্থাপিত ইনজীল্ বলে দাবীকৃত কোনো পুস্তকেই নেই, বরং এ সব পুস্তকে তাঁর পক্ষ থেকে 'ত্রাণকর্তা' (পারাক্লিতাস্)- এর আগমনের প্রতিশ্রুতি রয়েছে। তাই ইয়াহূদী ও খৃস্টান উভয় ধর্মের অনুসারীরাই প্রতিশ্রুত মেসিয়াহ্ বা পারাক্লিতাসের তথা প্রতিশ্রুত নবীর আবির্ভাবের জন্য প্রতীক্ষা করছে।

একইভাবে হিন্দু ধর্মের অনুসারীরাও 'কলির অবতার'- এর আগমনের জন্য অপেক্ষা করছে।

* হযরত মুহাম্মাদ (ছ্বাঃ)- এর আবির্ভাব ও ঐশী গ্রন্থ হিসেবে কোরআন মজীদকে পেশ করার পূর্ব পর্যন্ত বিভিন্ন ধর্মাবলম্বীদের মধ্যে প্রচলিত ধর্মগ্রন্থসমূহের তিনটি নেতিবাচক বৈশিষ্ট্য হচ্ছে: (১) এ সব গ্রন্থ অবিকৃত নেই। (২) এ সব গ্রন্থে কালোত্তীর্ণ ও বিশ্বজনীন তথা সকল যুগের সকল

মানুষের জন্য ব্যবহারযোগ্য বিধিবিধান ও পথনির্দেশ নেই। (৩) এ সব গ্রন্থে মানবজীবনের সকল দিকের জন্য পথনির্দেশ ও বিধিবিধান নেই। অর্থাৎ এ সব গ্রন্থ পথনির্দেশক হিসেবে অপূর্ণ।

* হযরত ঈসা (আঃ)- এর অন্তর্ধানের[১] পর প্রায় দুই হাজার বছর অতিক্রান্ত হয়ে গেছে। এ দীর্ঘ সময়ের মধ্যে একমাত্র হযরত মুহাম্মাদ (ছ্বাঃ) ছাড়া নবুওয়াতের গুণ- বৈশিষ্ট্যের অধিকারী নবুওয়াতের দাবীদার দ্বিতীয় কোনো ব্যক্তির আবির্ভাব হয় নি।

* এমতাবস্থায় হযরত মুহাম্মাদ (ছ্বাঃ) যদি নবী না হয়ে থাকেন তো মেনে নিতে হবে যে, সৃষ্টিকর্তা সুদীর্ঘ কাল যাবত মানব জাতিকে পথনির্দেশ ও পথনির্দেশক বিহীন অবস্থায় ফেলে রেখেছেন। মানবতা পথভ্রষ্টতার পঙ্কিলাবর্তে পড়ে শতাব্দীর পর শতাব্দী হাবুডুবু খাচ্ছে, কিন্তু সৃষ্টিকর্তা তাদের প্রতি দৃষ্টি দিচ্ছেন না। তারা পথনির্দেশক ও ত্রাণকর্তার জন্য অপেক্ষা করছে, কিন্তু তিনি তাদের সে প্রয়োজন পূরণ করছেন না। তিনি যে প্রতিশ্রুত নবী ও ত্রাণকর্তা পাঠাবেন বলে কথা দিয়েছিলেন সে প্রতিশ্রুতি পূরণের প্রয়োজন অনুভব করছেন না। এ প্রতিশ্রুতি যদি আরো পরে পূরণ করা হয়, তো এ দীর্ঘ সময়ের হতভাগ্য পথভ্রষ্টদের অবস্থা কী হবে? তাদের পথভ্রষ্টতার জন্য কে দায়ী হবে? স্বয়ং সৃষ্টিকর্তাই কি দায়ী হবেন না?

কিন্তু পরম দয়াবান ও মেহেরবান পরম জ্ঞানী সর্বশক্তিমান সৃষ্টিকর্তা তথা পরম প্রমুক্ত অপরিহার্য সত্তা সম্বন্ধে এমন হীন, নীচ ও সঙ্কীর্ণ ধারণা পোষণ করা চলে কি?

এমতাবস্থায় হযরত মুহাম্মাদ (ছ্বাঃ)- এর নবুওয়াত- দাবীর বিষয়টিকে নিরপেক্ষভাবে ও বিচারবুদ্ধির আলোকে বিবেচনা করা প্রয়োজন। এ ক্ষেত্রে আমরা দেখতে পাই:

* হযরত ঈসা (আঃ)- এর অন্তর্ধানের প্রায় ৫৮০ বছরের মাথায় হযরত মুহাম্মাদ (ছ্বাঃ) নবুওয়াত দাবী করেন যখন হযরত ঈসা (আঃ)- এর ওপর নাযিলকৃত ঐশী গ্রন্থও (যা তখন পর্যন্ত সর্বশেষ ঐশী গ্রন্থ) ব্যাপকভাবে বিকৃত হয়েছে এবং এর অনেকগুলো ব্যাপক প্রচলিত বিকৃত সংস্করণের ভিড়ে অপেক্ষাকৃত নির্ভুল সংস্করণ পরিত্যক্ত ও বিস্মৃত হয়ে গেছে।

* একজন নবীর মধ্যে যে সব অপরিহার্য গুণ থাকা প্রয়োজন তার সবগুলোই তাঁর মধ্যে পাওয়া যায় এবং যে সব নেতিবাচক বৈশিষ্ট্য থেকে নবীর মুক্ত থাকা প্রয়োজন তা থেকে তিনি মুক্ত ছিলেন।

* পূর্ববর্তী ধর্মগ্রন্থসমূহে প্রতিশ্রুত নবী বা ত্রাণকর্তার যে নাম পাওয়া যায় (যেমন: বার্নাবাসের ইনজীলে উল্লিখিত 'মুহাম্মাদ' ও 'আহমাদ') তাঁর নাম- ও তা- ই, অথবা সংশ্লিষ্ট গ্রন্থে বর্ণিত নাম আরবী ভাষায় অনুবাদ করলে তাঁর নামের শব্দেই অনুবাদ করতে হয়। প্রতিশ্রুত নবীর আবির্ভাব ও তৎপরতার স্থান (যেমন: উটের দেশ, ফারান পর্বত ইত্যাদি) সংক্রান্ত এবং তাঁর জীবনে ঘটিতব্য গুরুত্বপূর্ণ ঘটনাবলী ইত্যাদির ভবিষ্যদ্বাণী তাঁর সাথে মিলে যায়।

* ঐশী গ্রন্থ হিসেবে তিনি যে গ্রন্থ পেশ করেছেন তা বিগত প্রায় দেড় হাজার বছর যাবত অবিকৃত রয়েছে - এ ব্যাপারে বিতর্কের অবকাশ নেই।

* তিনি নিজেকে (স্থান- কাল নির্বিশেষে তাঁর যুগ ও পরবর্তীকালীন) 'সকল মানুষের জন্য' আল্লাহর রাসূল বলে দাবী করেছেন - যা পূর্ববর্তী কোনো নবী করেছেন বলে জানা যায় না। তিনি আরো দাবী করেছেন যে, পূর্ববর্তী গ্রন্থাবলীতে তাঁরই আগমনের ভবিষ্যদ্বাণী করা হয়েছে।

* তিনি যে গ্রন্থ পেশ করেছেন তা সাহিত্যিক সৌন্দর্য ও জ্ঞানগর্ভতার বিচারে পূর্ববর্তী সকল গ্রন্থের তুলনায় শ্রেষ্ঠতর এবং মানবিক ক্ষমতার উর্ধে। এ গ্রন্থ অনুরূপ মানসম্পন্ন কোনো গ্রন্থ বা এর কোনো অধ্যায় (সূরা)- এর মানসম্পন্ন কোনো অধ্যায় রচনার জন্য সমগ্র মানব প্রজাতিকে চ্যালেঞ্জ প্রদান করেছে এবং এ চ্যালেঞ্জ মোকাবিলার প্রতিটি চেষ্টাই ব্যর্থ হয়েছে। এ চ্যালেঞ্জ এখনো বিদ্যমান রয়েছে।

* তিনি মানবজীবনের প্রতিটি দিক- বিভাগের জন্য প্রয়োজনীয় বিধিবিধান, মূলনীতি ও পথনির্দেশ প্রদান করেছেন। তিনি ঐশী গ্রন্থ হিসেবে দাবী করে যে গ্রন্থ (কোরআন) পেশ করেছেন তা মানবিক জীবনবিধানকে পরিপূর্ণ করে দিয়েছে বলে তথা পূর্ণাঙ্গ জীবনবিধান পেশ করেছে বলে দাবী করেছে।

* কোরআন সীমাহীন জ্ঞান- বিজ্ঞানের আধার। বিস্ময়কর প্রকাশকৌশলের আশ্রয় নিয়ে মধ্যম আয়তনের এ গ্রন্থে সকল জ্ঞানকে এমনভাবে নিহিত রাখা হয়েছে যে, যতো বার নতুন করে অধ্যয়ন- গবেষণা করা হচ্ছে ততোই তা থেকে নতুন নতুন জ্ঞান- উপকরণ ও দিকনির্দেশ বেরিয়ে আসছে - যা মানবিক গ্রন্থে অসম্ভব। এমন কোনো যুগজিজ্ঞাসা আজ পর্যন্ত পাওয়া যায় নি যার জবাব দানে এ গ্রন্থ ও এ নবীর রেখে যাওয়া পথনির্দেশ অপারগ হয়েছে।

* তিনি নিজেকে সর্বশেষ নবী বলে দাবী করেছেন এবং ঘোষণা করেছেন যে, তাঁর পরে আর কোনো নতুন নবীর আগমন ঘটবে না।

এ সব বিষয় বিবেচনা করার পর মুক্ত বিবেক ও সুস্থ বিচারবুদ্ধি সম্পন্ন কোনো মানুষের পক্ষে হযরত মুহাম্মাদ (ছ্বাঃ)- কে প্রতিশ্রুত নবী ও ত্রাণকর্তা বলে মেনে নিতে অস্বীকৃতি জানানো সম্ভব কি? কেবল স্বার্থান্ধতাই এ সত্য মেনে নেয়া থেকে কাউকে বিরত রাখতে পারে। তাঁর এ পরিচয় জানার পরেও যারা মুখে তাঁকে অস্বীকার করছে তাদের অন্তর অবশ্যই তাঁকে সত্য বলে সাক্ষ্য দেয়। তাদের অন্তরের সাক্ষ্য ও মুখের অস্বীকৃতি উভয়ই তাদের দেহের প্রতিটি কোষে, হয়তোবা প্রতিটি পরমাণুতে, লিপিবদ্ধ হয়ে যাচ্ছে যা একদিন তাদের সামনে উন্মোচিত হয়ে তাদের স্ববিরোধিতার অপরাধকে অকাট্যভাবে প্রমাণ করে দেবে।

অবিকৃত কোরআন

কোরআন মজীদ যে মানবিক রচনাক্ষমতার উর্ধস্থিত এক মহান গ্রন্থ তা এর যে কোনো পাঠকের নিকটই সুস্পষ্টভাবে ধরা পড়তে বাধ্য। ইতিপূর্বে যেমন উল্লেখ করা হয়েছে, অন্যান্য ধর্মগ্রন্থকে কোরআনের পাশাপাশি রেখে তুলনা করলে স্পষ্ট প্রতিভাত হবে যে, ঐ সব গ্রন্থ যে ঐশী গ্রন্থের বিকৃত রূপ শুধু তা- ই নয়, বরং ঐ সব গ্রন্থের প্রায় সবগুলোই মানুষের রচিত গ্রন্থ যাতে ঐশী গ্রন্থের কিছু উদ্ধৃতি বা বক্তব্য বা বিষয়বস্তু বিক্ষিপ্তভাবে বা মানবিক রচনাবিন্যাসে অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। আরো লক্ষণীয় বিষয় হলো এই যে, ঐ সব গ্রন্থ যে সব ধর্মীয় ব্যক্তিত্বের ওপর অবতীর্ণ গ্রন্থ বলে দাবী করা হয় তা তাঁদের নিজেদেরও রচিত নয়, বরং পরবর্তী কালে অন্য লোকেরা রচনা করে তাঁদের নামে প্রচলন করে দিয়েছেন। এমতাবস্থায়, যুক্তির খাতিরে যদি কোরআন মজীদে সামান্য কিছুটা বিকৃতির সম্ভাবনাকে স্বীকার করেও নেয়া হয়, তথাপি বলতে হবে যে, মানুষের রচিত ঐ সব তথাকথিত ঐশী গ্রন্থের মোকাবিলায় কোরআন মজীদের অনুসরণ ছাড়া গত্যন্তর নেই।

কিন্তু প্রকৃত সত্য হচ্ছে এই যে, কোরআন মজীদ যে বিকৃতি থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত ঐতিহাসিক ও বিচারবুদ্ধির দলীল থেকে তা অকাট্যভাবে প্রমাণিত।

এ এক বিতর্কাতীত সত্য যে, কোরআন মজীদ দীর্ঘ তেইশ বছর যাবত অল্প অল্প করে নাযিল হয়েছে এবং সাথে সাথেই, হযরত মুহাম্মাদ (ছ্বাঃ) কর্তৃক পূর্ব থেকে নিয়োজিত বেশ কয়েক জন লিপিকার (কাতেবে ওয়াহী) তা লিখে নিতেন। তাঁর কতক ছ্বাহাবী (সঙ্গী/ সহচর) ব্যক্তিগতভাবেও তা লিখে নিতেন এবং বিপুল সংখ্যক ছ্বাহাবী তা মুখস্ত করতেন। কোনো আয়াত বা আয়াত- সমষ্টি নাযিলের পর তা হযরত মুহাম্মাদ (ছ্বাঃ) কর্তৃক নির্দেশিত পরম্পরা বিন্যাসে লিপিবদ্ধ ও মুখস্ত করা হতো। আর হযরত মুহাম্মাদ (ছ্বাঃ) প্রতি বছর রামাযান মাসে ঐ সময় পর্যন্ত নাযিলকৃত আয়াত ও

সূরা সমূহ বিন্যাস পরম্পরা অনুযায়ী ধারাবাহিকভাবে পাঠ (তেলাওয়াত) করতেন এবং ছ্বাহাবীগণ তাঁর পাঠের সাথে স্বীয় লিখিত কপি বা স্মৃতিকে মিলিয়ে নিতেন।

এভাবে দীর্ঘ তেইশ বছরে কোরআন নাযিল সমাপ্ত হয় এবং তার লিপিবদ্ধকরণ ও মুখস্তকরণও সমাপ্ত হয়। কোরআন মজীদের সর্বশেষ আয়াত নাযিল হয় হযরত মুহাম্মাদ এর -(ছ্বাঃ) ইন্তেকালের প্রায় তিন মাস আগে হজ্বের সময়। ফলে কোরআন মজীদের একটি আয়াতও লিপিবদ্ধতা, মুখস্তকরণ ও বিন্যাসের বাইরে থাকে নি। অতঃপর কোরআন মজীদ নিয়ে কখনোই বিতর্ক সৃষ্টি হয় নি এবং বিগত চৌদ্দশ' বছর যাবত সারা বিশ্বের মুসলমানদের কাছে কোরআনের একটিই পাঠ (text) রয়েছে। কোনোরূপ বিকৃতি বা সংযোজনবিযোজন ঘটলে এটা সম্ভব হতো - তঃ কোরআন মজীদ হচ্ছে মানব জাতির ইতিহাসে সর্বোচ্চ মুতাওয়াতির্ সূত্রে বর্ণিত না। বস্তু একমাত্র গ্রন্থ এবং এ কারণে তাতে বিকৃতির বিন্দুমাত্র সুযোগ বা সম্ভাবনা ছিলো না বা নেই।

হযরত মুহাম্মাদ (ছ্বাঃ)- এর ইন্তেকালের সময় তাঁর ছ্বাহাবীর সংখ্যা ছিলো লক্ষাধিক যাদের মধ্যে বহু সংখ্যক হাফেযে কোরআন ছিলেন (কোরআন যাদের মুখস্ত ছিলো)। বেশ কয়েক জন ছ্বাহাবীর নিকট কোরআনের নিজস্ব কপি ছিলো, সেই সাথে ছিলো হযরত মুহাম্মাদ (ছ্বাঃ) কর্তৃক রেখে যাওয়া সরকারীভাবে লিপিবদ্ধকৃত কপি। অতঃপর প্রতিদিনই কোরআনের কপি ও হাফেযের সংখ্যা বৃদ্ধি পেতে থাকে এবং হযরত মুহাম্মাদ (ছ্বাঃ)- এর ইন্তেকালের পরবর্তী এক প্রজন্মের ব্যবধানে হাফেযের সংখ্যা লাখের কোঠা ছাড়িয়ে যায়। এহেন অভিন্ন পাঠ বিশিষ্ট গ্রন্থে বিকৃতির সম্ভাবনা মেনে নিতে হলে মানুষের পক্ষে কোনো তথ্যের সত্যতাই স্বীকার করা সম্ভব নয়।

কিন্তু এতদসত্ত্বেও অজ্ঞতা ও অসতর্কতা বশতঃ অথবা অসদুদ্দেশ্যে কতক লোক কোরআনে বিকৃতির সম্ভাবনাকে একেবারে উড়িয়ে দিতে নারাজ (যদিও এ সম্ভাবনা খুবই কম বলে স্বীকার করে)। তাই এ সম্পর্কিত দু'টি বিষয়ের ওপর আলোকপাত করা যরূরী মনে করছি।

প্রথমতঃ কতক হাদীছ থেকে এরূপ ধারণা হয় যে, প্রথম খলীফাহর খেলাফত- কালে কোরআন লিপিবদ্ধ করা হয় এবং কেউ কেউ কোরআনের আয়াত বলে দাবী করে কোনো উক্তি নিয়ে এলে তা লিপিবদ্ধ করার জন্যে দু'জন সাক্ষী হাযির করার শর্তারোপ করা হয়, আর কেউ কেউ দু'জন

সাক্ষী হাযির করতে ব্যর্থ হওয়ায় তাঁদের আনীত উক্তি কোরআনের আয়াত হিসেবে লিপিবদ্ধ করাতে ব্যর্থ হন। পরবর্তীকালে কেউ কেউ নাকি এমন দাবী করেন যে, কোরআনের কোনো বড় সূরার কিছু অংশ লিখিত কোরআন থেকে বাদ পড়েছে। আবার একজন বরেণ্য ছ্বাহাবীর নামে এমন দাবীও করা হয়েছে যে, তাঁর মতে নাকি কোরআন মজীদের শেষ দু'টি সূরা (আল্- ফালাক্ব ও আন্- নাস্) কোরআন মজীদের অংশ হিসেবে নাযিল হয় নি, বরং হযরত মুহাম্মাদ (ছ্বাঃ)- এর নিকট ব্যক্তিগত দো'আ হিসেবে নাযিল হয়েছিলো।

আসলে পুরো কাহিনীটিই মিথ্যা। কারণ, সংশ্লিষ্ট হাদীছ ও রেওয়াইয়াত (বর্ণনা)গুলো অন্ততঃ প্রথম স্তরে স্বল্পসংখ্যক সূত্রে বর্ণিত - হাদীছ বিজ্ঞানের পরিভাষায় যাকে খবরে ওয়াহেদ বলা হয়। অন্যদিকে বিদ্যমান কোরআন মজীদ হচ্ছে মানবজাতির ইতিহাসে সর্বোচ্চ স্তরের মুতাওয়াতির্ বর্ণনা। বলা বাহুল্য যে, কোনো খবরে ওয়াহেদ বর্ণনার ভিত্তিতে মুতাওয়াতির্ বর্ণনায় সন্দেহ পোষণ করা বিচারবুদ্ধিবিরুদ্ধ কাজ।

তাছাড়া সংশ্লিষ্ট বর্ণনাগুলোতে বিষয়বস্তুগত অনেক দুর্বলতা নিহিত রয়েছে। যেমন:

(১) রাসূলে আকরাম হযরত মুহাম্মাদ (ছ্বাঃ) যে সরকারীভাবে লিপিকারদের দ্বারা কোরআন লিপিবদ্ধ করিয়ে রেখে যান, সে ব্যাপারে বিতর্ক নেই। এমতাবস্থায় কোরআনের সে কপিকে উপেক্ষা করে প্রথম খলীফাহ্ কোরআনকে নতুন করে সংকলন করাবেন - এরূপ ধৃষ্টতা দেখানো তাঁর পক্ষে সম্ভব ছিলো না। তাছাড়া ছ্বাহাবীগণ রাসূলে আকরাম হযরত মুহাম্মাদ (ছ্বাঃ) ও কোরআন মজীদকে যেরূপ প্রাণের চেয়ে বেশী ভালোবাসতেন তাতে এরূপ উদ্যোগকে তাঁরা মেনে নিতেন না শুধু তা- ই নয়, বরং এ অপরাধে খলীফাহকে হত্যা করতেও তাঁরা দ্বিধাবোধ করতেন না। এ ধরনের পদক্ষেপ নেয়া হলে তা হতো একটি রক্তক্ষয়ী গৃহযুদ্ধের উপযুক্ত কারণ। কিন্তু সংশ্লিষ্ট বর্ণনাগুলোতে এ ব্যাপারে সামান্যতম প্রতিবাদের কথাও উল্লেখ নেই। বাস্তবে এরূপ নতুন সংকলনের কোনো ঘটনাই ঘটে নি বিধায় কোনো প্রতিবাদও ঘটে নি এবং তার উল্লেখও হয় নি।

(২) হযরত মুহাম্মাদ (ছ্বাঃ)- এর ইন্তেকালের তিন মাস আগে কোরআন নাযিল সমাপ্ত হওয়া ও এ সময়ে ছ্বাহাবীদের সংখ্যা লক্ষাধিক হওয়ার ব্যাপারে বিতর্ক নেই। এমতাবস্থায় দুই জন সাক্ষী সহ

মাত্র তিনজন লোকের বর্ণনা দ্বারা কোরআনের আয়াত সাব্যস্তকরণের মানদণ্ড নির্ধারণের মতো উদ্ভট কাজ কোনো ছ্বাহাবীর পক্ষে সম্ভব হতে পারে না এবং এরূপ মানদণ্ড নির্ধারণ করা হলে তা অন্য ছ্বাহাবীদের প্রতিবাদ ছাড়া পার পেয়ে যেতো না।

যেহেতু হযরত মুহাম্মাদ (ছ্বাঃ) প্রতি বছর রামাযান মাসে ঐ সময় পর্যন্ত নাযিলকৃত পুরো কোরআন মজীদ নামাযে তেলাওয়াত করতেন এবং মসজিদে নববীতে বিপুল সংখ্যক ছ্বাহাবী তাঁর পিছনে নামায আদায় করতেন সেহেতু তাঁর জীবনের সর্বশেষ রামাযান পর্যন্ত নাযিলকৃত আয়াত সমূহ হাজার হাজার ছ্বাহাবীর জানা ছিলো। অতঃপর মাত্র পৌনে তিন মাসের মধ্যে আয়াত নাযিল সমাপ্ত হয়ে যায় এবং তাঁর জীবনের এই শেষ দিককার সময়টিতে সব সময়ই লিপিকারগণ ছাড়াও বিরাট সংখ্যক ছ্বাহাবী তাঁর সাথে থাকতেন। আর সর্বশেষ আয়াত নাযিলের পরেও তিনি প্রায় তিন মাস বেঁচে ছিলেন। ফলে এ শেষের দিককার আয়াতগুলোও বিরাট সংখ্যক ছ্বাহাবীর জানা থাকার কথা। এমতাবস্থায় কেউ কোনো উক্তিকে কোরআন মজীদের আয়াত বলে দাবী করবে অথচ দু'জন সাক্ষীও হাযির করতে পারবে না - এরূপ তথ্য অধিকতর উদ্ভট।

(৩) ছ্বাহাবীগণ কোরআন মজীদকে এতোখানি ভালবাসতেন যে, তাঁদের অনেকে কোরআনের জন্য জীবন দিয়েছেন এবং যারা বেঁচে ছিলেন তাঁদেরও অনেকেই কোরআনের প্রতি ভালোবাসার কারণে বিভিন্ন সময় নির্যাতন সহ্য করেছেন ও বিভিন্ন যুদ্ধে আহত হয়েছেন। তাই কোরআন মজীদের কোনো সূরায় সামান্যতম হ্রাসবৃদ্ধি হলেও তাঁরা তা মেনে নিতেন না, বরং এ ব্যাপারে ব্যাপক রক্তপাত সংঘটিত হতো। কোরআনে হ্রাসবৃদ্ধি তো দূরের কথা, স্বয়ং রাসূলে আকরাম হযরত মুহাম্মাদ (ছ্বাঃ) কর্তৃক লিপিবদ্ধ করানো কপি বর্তমান থাকা অবস্থায় নতুন করে কোরআন লিপিবদ্ধ করার উদ্যোগকেও তাঁরা সহ্য করতেন না। বিশেষ করে ছ্বাহাবীদের মধ্যে খেলাফত নিয়ে দ্বন্দ্ব একটি ঐতিহাসিক তিক্ত সত্য; এমতাবস্থায় প্রথম খলীফাহর বিরোধীরা এ ধরনের উদ্যোগকে তাঁর বিরুদ্ধে বিদ্রোহ সৃষ্টির জন্য কাজে লাগাতে দ্বিধা করতেন না। কিন্তু ইতিহাসে এ ধরনের কোনো বিদ্রোহ তো দূরের কথা, এরূপ ঘটনার বিরুদ্ধে মৃদু প্রতিবাদের কথাও উল্লেখ

নেই, যা থেকে প্রমাণিত হয় যে, প্রথম খলীফাহ্‌র সময় কোরআন লিপিবদ্ধ করার কোনো ঘটনাই ঘটে নি।

(৪) কেউ কেউ সংশ্লিষ্ট খবরে ওয়াহেদ হাদীছগুলোর দুর্বলতা চাপা দেয়ার লক্ষ্যে গোঁজামিলের আশ্রয় নিয়ে বলতে চান যে, হযরত মুহাম্মাদ (ছ্বাঃ)- এর রেখে যাওয়া কোরআন মজীদের কপিটির পৃষ্ঠাগুলো বিভিন্ন বস্তুর ও বিভিন্ন আকৃতির ছিলো, তাই প্রথম খলীফাহ্ হয়তো একটি সুষম কপি তৈরী করতে চেয়েছিলেন [যদিও সংশ্লিষ্ট হাদীছ সমূহে তা নেই, বরং এ সব হাদীছে যুদ্ধে বিপুল সংখ্যক হাফেযে কোরআনের শহীদ হওয়ার পরিপ্রেক্ষিতে কোরআন হারিয়ে যাওয়ার ভয়ে ‘সংকলন’ করার কথা বলা হয়েছে]। কিন্তু এ ব্যখ্যা গ্রহণযোগ্য নয়। কারণ, সে ক্ষেত্রে হযরত মুহাম্মাদ (ছ্বাঃ)- এর রেখে যাওয়া কপি থেকে কপি করানো হতো, লোকদের থেকে শুনে (তা- ও আবার একজন উপস্থাপক ও দু’জন সাক্ষীতে সন্তুষ্ট থেকে) নয়।

বস্তুতঃ রাসূলে আকরাম হযরত মুহাম্মাদ (ছ্বাঃ) যেখানে কোরআন মজীদের লিপিবদ্ধ কপি ও বহু সংখ্যক হাফেযে কোরআন ছ্বাহাবী রেখে যান এবং যার কপি ও হাফেযের সংখ্যা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পেয়ে সোয়া দু’শ’ বছরে গণনাযোগ্যতার উর্ধে উঠে যায়, ঠিক সেই সময় অর্থাৎ হযরত মুহাম্মাদ (ছ্বাঃ)- এর ইন্তেকালের প্রায় সোয়া দু’শ’ বছর পরে সংগৃহীত ও লিপিবদ্ধ খবরে ওয়াহেদ হাদীছের ভিত্তিতে কোরআন সম্বন্ধে বিন্দুমাত্র সন্দেহ পোষণ করাও বিচারবুদ্ধির কাছে গ্রহণযোগ্য নয়।

হাদীছ সংকলনকারীগণ যতোই আন্তরিকতার সাথে পরীক্ষা- নিরীক্ষা করুন না কেন, এ সংক্রান্ত হাদীছগুলো যে পূর্ববর্তী সোয়া দু’শ’ বছরের মধ্যে কোনো এক সময় ইসলামের সুচতুর দুশমনদের দ্বারা অথবা হাদীছ বর্ণনার গৌরব লোভীদের দ্বারা ছ্বাহাবীদের নামে রচিত হয়েছিলো তাতে সন্দেহের বিন্দুমাত্র অবকাশ নেই।

দ্বিতীয়তঃ তৃতীয় খলীফাহ্ কর্তৃক কোরআন মজীদের ত্রুটিপূর্ণ কপি নষ্ট করার ঘটনাকে হাতিয়ার বানিয়েও ইসলামের দুশমনরা কোরআনের অবিকৃত থাকা সম্বন্ধে সন্দেহ সৃষ্টি করতে চায়। কিন্তু তাদের এ সন্দেহ বিচারবুদ্ধির কাছে গ্রহণযোগ্য নয়। কারণ, এটা সর্বসম্মত অভিমত যে,

প্রথমে কোরআন মজীদকে আরবদের বিভিন্ন গোত্রের আঞ্চলিক উচ্চারণে তেলাওয়াতের অনুমতি দেয়া হয়। এতে কিছু শব্দের উচ্চারণে রাসূলে আকরাম হযরত মুহাম্মাদ (ছ্বাঃ) ও তাঁর সঙ্গী-সাথীদের উচ্চারণ থেকে পার্থক্য ঘটলেও তাতে অর্থে কোনোই পার্থক্য ঘটতো না। তবে অনেকে আঞ্চলিক উচ্চারণের ভিত্তিতে মুখস্ত করে তা অনুরূপভাবে লিপিবদ্ধও করে। কিন্তু লিখিত রূপে এ ধরনের গৌণ পার্থক্য (যাতে অর্থে পার্থক্য ঘটতো না) ভবিষ্যতে, বিশেষতঃ ইসলাম ও কোরআন অনারব এলাকায় বিস্তার লাভ করার পরে, বিভ্রান্তির কারণ হতে পারে এবং মুসলমানরা কোরআনের ব্যাপারে খুবই সংবেদনশীল ছিলেন বিধায় আঞ্চলিক উচ্চারণ ও লিপিকে স্বেচ্ছাকৃত বিকৃতি গণ্য করে পরস্পর রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষে লিপ্ত হতে পারেন আশঙ্কায় কোরআনের সকল কপিকে মূল কপির সাথে মিলিয়ে সংশোধন করার এবং সংশোধনযোগ্য না হলে তা নষ্ট করে ফেলার নির্দেশ দেয়া হয়। এ কারণেই নির্বিশেষে ছ্বাহাবীগণ সহ সকলেই তা মেনে নেন।

বলা বাহুল্য যে, ঐ সময় হযরত আলী (আঃ) ও হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে আব্বাস (রাঃ) সহ শ্রেষ্ঠতম আলেম ও কোরআন-বিশেষজ্ঞ ছ্বাহাবীগণের প্রায় সকলেই বেঁচে ছিলেন। অতএব, তৃতীয় খলীফাহ্ কোরআন মজীদে কোনোরূপ বিকৃতি সাধন করলে কেউই, বিশেষ করে বীরত্ব ও সাহসিকতার জন্য খ্যাত এবং হযরত মুহাম্মাদ (ছ্বাঃ) কর্তৃক জ্ঞানের নগরী হিসেবে অভিহিত হযরত আলী (আঃ) তা মেনে নিতেন না, বরং তৃতীয় খলীফাহর বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করতেন। এমনকি পরবর্তীকালে যারা প্রশাসনিক কারণে তাঁর বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেন ও তাঁকে হত্যা করেন তাঁরাও তাঁর বিরুদ্ধে কোরআন মজীদে বিকৃতি সাধনের কোনো অভিযোগ আনেন নি, অথচ সত্যি সত্যিই তিনি যদি কোরআন মজীদকে বিকৃত করতেন তাহলে সেটিকেই তাঁর বিরুদ্ধে সবচেয়ে বড় অভিযোগ হিসেবে দাঁড় করানো যেতো।

এছাড়া তৃতীয় খলীফাহ্ কোরআন বিকৃত করলে যে সব ছ্বাহাবীর নিকট কোরআনের সঠিক কপি ছিলো তাঁদের অনেকেই বিদ্রোহে সাহসী না হলেও অন্ততঃ স্বীয় কপি গোপন করে রাখার চেষ্টা করতেন এবং পরবর্তীকালে উপযুক্ত সময়ে, বিশেষ করে হযরত আলী (আঃ)-এর খেলাফতকালে তা প্রকাশ করতেন। ফলে কোরআনের একাধিক সংস্করণ পাওয়া যেতো।

অতএব, তৃতীয় খলীফাহ্ কোরআন বিকৃত করেছিলেন এবং সকলে তা বিনা প্রতিবাদে মেনে নিয়েছিলেন এরূপ উদ্ভট চিন্তার আদৌ কোনো সারবত্তা নেই।

কোরআন: অবিনশ্বর মু‘জিযাহ্

আমরা ইতিপূর্বে যেমন উল্লেখ করেছি, একজন নবীর জীবন প্রত্যক্ষকরণ ও মুতাওয়াতির্ বর্ণনা থেকে তাঁর নবুওয়াত সম্বন্ধে প্রত্যয় সৃষ্টি হয়। কিন্তু মু‘জিযাহ্ দর্শনের মাধ্যমে সর্বোচ্চ মাত্রার প্রত্যয় সৃষ্টি হয়ে থাকে। এ কারণে যিনি মু‘জিযাহ্ দর্শন করেছেন এবং যিনি তা দর্শন করেন নি এতদুভয়ের প্রত্যয়ের মধ্যে বিরাট মাত্রাগত ব্যবধান থাকে। এটাই স্বাভাবিক।

বস্তুতঃ মু‘জিযাহ্ প্রত্যক্ষকারীদের অন্তরে নবীর নবী হওয়া সম্পর্কে যেভাবে পূর্ণ মাত্রায় প্রত্যয় সৃষ্টির পাশাপাশি মানসিক পরিতৃপ্তি ও প্রশান্তির সৃষ্টি হয়, তাদের তুলনায়, যারা প্রত্যক্ষ করে নি, কেবল বিচারবুদ্ধির দ্বারা মুতাওয়াতির্ বর্ণনার ভিত্তিতে প্রত্যয়ের অধিকারী হয়েছে, তাদের প্রত্যয়ের গভীরতা ও দৃঢ়তা যেমন কম হওয়ার সম্ভাবনা আছে, তেমনি তাদের অন্তরে পরিপূর্ণ পরিতৃপ্তি ও প্রশান্তি সৃষ্টির সম্ভাবনাও কম।

এ দুই ব্যক্তির প্রত্যয়ের তুলনা হতে পারে কোনো বস্তুর মিষ্টতা সম্বন্ধে ঐ দুই ব্যক্তির ধারণার সাথে যাদের মধ্যকার একজন কোনো নির্ভরযোগ্য ব্যক্তির বক্তব্যের ভিত্তিতে বস্তুটির উপাদানসমূহ সম্বন্ধে অবগত হয়ে তার মিষ্টতা সম্পর্কে জ্ঞানের অধিকারী হয়েছে, অপর জন ঐ বস্তু থেকে কিছুটা ভক্ষণ করে তার মিষ্টতা সম্বন্ধে ধারণা অর্জন করেছে।

তাই অতীতের নবী- রাসূলগণের (আঃ) মু‘জিযাহ্ সংক্রান্ত তথ্যাদিতে দেখা যায় যে, তাঁদের অনেকেই বিপুল সংখ্যক মানুষের সামনে মু‘জিযাহ্ প্রদর্শন করেছেন। তেমনি কেউ কেউ বিভিন্ন ধরনের মু‘জিযাহ্ প্রদর্শন করেছেন। আবার কেউ কেউ একই মু‘জিযাহ্ বার বার প্রদর্শন করেছেন। রাসূলে আকরাম হযরত মুহাম্মাদ (ছ্বাঃ)ও বিভিন্ন ধরনের মু‘জিযাহ্ প্রদর্শন করেছেন। যেমন: তিনি চন্দ্র দ্বিখণ্ডিত করেছেন, সাপ তাঁর সাথে কথা বলে, কাঠের মিম্বার (জুমু‘আহ্ মসজিদে ইমাম বা খতীবের খোত্ববাহ্ দানকালে দাঁড়াবার প্লাটফরম) তাঁর সংস্পর্শ থেকে বঞ্চিত হবার কারণে ক্রন্দন করে, বৃক্ষ তাঁকে সালাম ও সম্মান প্রদর্শন করে, তাঁর দো‘আর ফলে সীমিত খাদ্যে বরকত (প্রচুর প্রবৃদ্ধি) হয়, ইত্যাদি।

এভাবে দেখা যায় যে, নবী- রাসূলগণের (আঃ) জীবদ্দশায় তাঁদের পারিপার্শ্বিক প্রায় সকল মানুষই কোনো না কোনো মু'জিযাহ্ প্রত্যক্ষ করার সুযোগ পায়। কিন্তু স্থানগত ও কালগত ব্যবধানজনিত কারণে অন্যরা এ সুযোগ থেকে বঞ্চিত থাকে। ফলে স্বভাবতঃই তাদের প্রত্যয় মু'জিযাহ্ প্রত্যক্ষকারীদের প্রত্যয় থেকে দুর্বলতর হতে পারে এবং এ ব্যবধান যতো বেশী হবে দুর্বলতাও ততোই বেশী হতে পারে। তাছাড়া মানব জাতির ইতিহাসে দেখা গেছে, অনেক ক্ষেত্রেই দ্বীনী ব্যক্তিত্ব বা ধর্মনেতাদের ভক্তরা তাঁদের মর্যাদা বৃদ্ধি ও লোকদেরকে তাঁদের প্রতি আকৃষ্ট করার উদ্দেশ্যে তাঁদের নামে বহু মিথ্যা অলৌকিক কাহিনী রচনা করেছে। ফলতঃ শত- সহস্র বছর ব্যবধানের কোনো কোনো ব্যক্তির মনে নবীর মু'জিযাহ্ সম্পর্কে প্রাপ্ত বর্ণনার ওপর প্রত্যয় সৃষ্টি না- ও হতে পারে এবং এ ব্যাপারে তাদের মনে সংশয় উঁকি দিতে পারে। তাই এরূপ ব্যক্তিদের প্রকৃতি মু'জিযাহ্ প্রত্যক্ষ করতে চায়। কিন্তু একজন নবীর ইন্তেকালের পর আর তাঁর পক্ষে মু'জিযাহ্ প্রদর্শন সম্ভব নয়। অবশ্য বিশেষ স্থান- কালের জন্য প্রেরিত নবীর জন্যে মৃত্যুর পরে মু'জিযাহ্ প্রদর্শনের প্রয়োজনও থাকে না।

কিন্তু যে নবীর নবুওয়াত বিশ্বজনীন ও কালোত্তীর্ণ তাঁর জন্যে এমন এক মু'জিযাহ্ পেশ করা অপরিহার্য যা হবে স্থানগত ও কালগত সীমাবদ্ধতার উর্ধে। এ কারণেই বিশ্বজনীন ও কালোত্তীর্ণ নবুওয়াতের অধিকারী নবী হযরত মুহাম্মাদ (ছ্বাঃ)- কে এমনই এক মু'জিযাহ্ প্রদান করা হয় যা স্থানগত ও কালগত সীমাবদ্ধতার উর্ধে। তা হচ্ছে তাঁর ওপর নাযিলকৃত ঐশী গ্রন্থ কোরআন মজীদ।

কোরআনের মু'জিযাহ্ সম্বন্ধে আরবী ও ফার্সী সহ বিভিন্ন ভাষায় বহু গ্রন্থ রচিত হয়েছে। [অত্র গ্রন্থকারেরও কোরআনের মু'জিযাহ্ শীর্ষক একটি অপ্রকাশিত গ্রন্থ রয়েছে।] এখানে অতি সংক্ষেপে কোরআনের মু'জিযাহ্ সম্পর্কে আলোকপাত করা হচ্ছে:

কোরআন মজীদ নিজেকে মু'জিযাহ্ হিসেবে পেশ করেছে একটি গ্রন্থ হিসেবে স্বীয় জ্ঞানগর্ভতা, সাহিত্যগুণ ও শৈল্পিক বৈশিষ্ট্যের ভিত্তিতে।

এটা অনস্বীকার্য বিষয় যে, যে কোনো ভাষায় সাহিত্যিক গুণ ও শৈল্পিক সমৃদ্ধির বিচারে শ্রেষ্ঠতম রচনাগুলো হচ্ছে নিছকই সাহিত্য। তত্ত্বকথা, দর্শন, ধর্ম, নৈতিকতা, সমাজ, আইন, রা ব্যবস্থা, যুদ্ধ, বিচার ও বিজ্ঞান ইত্যাদি বিষয়ক কোনো গ্রন্থে সর্বোত্তম সাহিত্যিক সৌন্দর্য ও শিল্পগুণ ফুটিয়ে তোলাকে কখনোই কোনো ভাষায়ই সম্ভব গণ্য করা হয় নি। কিন্তু কোরআন মজীদ ঐসব বিষয়ে পরিপূর্ণ একটি গ্রন্থ হওয়া সত্ত্বেও আরবী ভাষার শ্রেষ্ঠতম সাহিত্যগুণ ও শিল্পসমৃদ্ধ গ্রন্থের মর্যাদা অধিকার করেছে।

এ প্রসঙ্গে আরবী ভাষার শ্রেষ্ঠত্ব সম্পর্কে সামান্য আভাস দেয়া যরূরী মনে করছি।

সূক্ষ্মতম, গভীরতম ও ব্যাপকতম ভাব প্রকাশের জন্য আরবী ভাষা এমনই বিরাট সম্ভাবনার অধিকারী যে, বিশ্বের অন্য কোনো উন্নত ভাষা তার শতকরা দশ ভাগ সম্ভাবনারও অধিকারী নয়। আরবী ভাষায় এককেটি ক্রিয়াবিশেষ্য থেকে কয়েকশ' ক্রিয়ারূপ ও শব্দরূপ (বিশেষ্য-বিশেষণ) নিষ্পন্ন হয়। অন্যদিকে আরবী বাক্যপ্রকরণের সম্ভাবনাও ব্যাপক। কম কথায়, ব্যাপক ও গভীর ভাব প্রকাশ এবং নতুন বাক্য বা শব্দ যোগ না করে কেবল বাক্যমধ্যস্থ শব্দে সামান্য হ্রাস- বৃদ্ধি বা পরিবর্তন করে অথবা শব্দ অগ্রপশ্চাত করে বা উহ্য রেখে ভাবপ্রকাশে সূক্ষ্মতিসূক্ষ্ম পরিবর্তনের সম্ভাবনাও আরবী ভাষায় বিস্ময়করভাবে বেশী। নিজেদের ভাষার এ বৈশিষ্ট্য সম্বন্ধে অবগত ছিলো বলেই এ ভাষাভাষী লোকেরা নিজেদেরকে বলতো 'আরাবী - সূক্ষ্ম ভাবপ্রকাশক্ষম প্রাঞ্জল ভাষী এবং অন্যদেরকে বলতো 'আজামী- বোবা।

বস্তুতঃ মানুষের ব্যাপক ভাবপ্রকাশক্ষমতার তুলনায় পশুপাখীদের সীমিত সংখ্যক ধ্বনির মাধ্যমে ভাববিনিময় বা কথোপকথনের দৃষ্টিতে মানুষ যেভাবে এ সব প্রাণীকে (তাদের নিজস্ব ভাষা থাকা সত্ত্বেও) 'বোবা প্রাণী' বলে থাকে, ঠিক একইভাবে, আরবী ভাষার তুলনায় অন্যান্য ভাষার প্রকাশক্ষমতার সীমাবদ্ধতা দৃষ্টে আরবরা অন্যান্য ভাষার লোকদেরকে 'বোবা' বলে অবজ্ঞা করতো।

হযরত মুহাম্মাদ (ছ্বাঃ)- এর নবুওয়াত- দাবীর সমসময়ে আরবী ভাষা তার বিকাশ ও উৎকর্ষের চরমতম শিখরে উপনীত হয়েছিলো এবং ঐ সময় এ ভাষার শ্রেষ্ঠতম কবি ও বাক্যবাগীশ বা

বাচনশিল্পীদের আবির্ভাব ঘটেছিলো। আরবী সাহিত্যের শ্রেষ্ঠতম কবিতাগুলো মোটামুটি ঐ সময়ই রচিত হয়েছিলো এবং এ ভাষার প্রাঞ্জলতম ও বলিষ্ঠতম গদ্য বক্তব্যসমূহও একই সময় কথিত হয়েছিলো।

ঐ সময় আরবদের সংস্কৃতিচর্চার কেন্দ্রীয়, অথবা বলা চলে, একমাত্র বিষয় ছিলো কবিতা ও শিল্পগুণ সমৃদ্ধ গদ্য বক্তব্য। এ বিষয়ে আরবদের মধ্যে প্রতি বছর বিরাট এক জনাকীর্ণ মেলায় প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হতো এবং প্রতিযোগিতায় বিজয়ী শ্রেষ্ঠতম কবি ও কবিতাকে সম্মানিত করা হতো। আর, ইতিপূর্বে যেমন উল্লেখ করা হয়েছে, শ্রেষ্ঠতম কবিতাগুলোকে স্বর্ণাক্ষরে লিখে কা'বাহ্ গৃহের গাত্রে টানিয়ে রাখা হতো।

কবিতা ও বক্তব্যের শ্রেষ্ঠত্ব বিচারের মানদণ্ড হিসেবে বিবেচিত বিষয়গুলো ছিলো:

* সংক্ষিপ্ততম কথার মাধ্যমে ব্যাপকতম ও সূক্ষ্মতম ভাব প্রকাশ।
* বিষয়বস্তু ও উদ্দিষ্ট ভাবের জন্য উপযুক্ততম শব্দের ব্যবহার ও সুবোধ্যতা।
* বক্তব্যের মাধুর্য, প্রাঞ্জলতা, ওজস্বিতা, বলিষ্ঠতা ও ঝঙ্কার- ব্যঞ্জনা।
* উপমা- উৎপ্রেক্ষা ও ইশারা- ইঙ্গিতের সার্থক ব্যবহার।
* তত্ত্ব ও তথ্য ইত্যাদি উপস্থাপন।

বলা বাহুল্য যে, যে কোনো ভাষায়ই শ্রেষ্ঠতম কবিতা ও গদ্য বক্তব্য নির্ণয়ের মানদণ্ড এগুলোই। কিন্তু সাধারণতঃ দেখা যায় যে, কোনো একটি কবিতা বা গদ্য বক্তব্যে এর সবগুলো বৈশিষ্ট্যের স্থান দেয়া সম্ভব হয় না। যেমন: ওজস্বিতকে চরম মাত্রায় উন্নীত করতে গেলে মাধুর্যের মাত্রা চরমে উপনীত করা সম্ভব হয় না। তত্ত্ব ও তথ্য তুলে ধরতে গেলে মাধুর্য ও ওজস্বিতাকে চরমে উপনীত করা যায় না এবং উপমা- উৎপ্রেক্ষা ও ইশারা- ইঙ্গিত ব্যবহার কঠিন হয়ে পড়ে। এ সব সমস্যা মোকাবিলা করে সার্বিকভাবে তুলনামূলক বিচারে কবিতা বা বক্তব্যের শ্রেষ্ঠত্ব নির্ধারণ করা হয়।

এখানে আরেকটি উল্লেখ্য বিষয় হচ্ছে এই যে, আরবী ভাষায় সংক্ষেপে সূক্ষ্মতম, ব্যাপকতম ও সুন্দরতম ভাব প্রাঞ্জল বা ওজস্বি ভাষায় প্রকাশের সম্ভাবনা 'প্রায় সীমাহীন' বিধায় কোনো মানুষের পক্ষেই এর সর্বোচ্চ সম্ভাবনা ব্যবহার করে কিছু লেখার নিশ্চয়তা দেয়া সম্ভব নয়। তাই

দেখা যায়, সুদক্ষ লোকেরা শ্রেষ্ঠতম কবিতা ও বক্তব্য বিশ্লেষণ করেও নির্দেশ করতে সক্ষম হন যে, এর মান আরো উন্নত করা যেতো। যেমন: এ শব্দটির পরিবর্তে অমুক শব্দটি অধিকতর উপযোগী ছিলো বা বাক্যবিন্যাসে এরূপ রদবদল হলে আরো উত্তম হতো। তবে শেষ পর্যন্ত বিভিন্ন কবিতা ও বক্তব্য পরীক্ষা করে তুলনামূলক বিচারে শ্রেষ্ঠত্ব নির্ধারণ করা হয়। কিন্তু কোরআন মজীদ এ দিক থেকে অনন্য।

সার্বিক বিচারে কোরআন মজীদ এবং তার সূরা ও আয়াতগুলো উন্নততম মানের অধিকারী। কোনো একটি ক্ষেত্রেও এরূপ নির্দেশ করা সম্ভব নয় যে, এ আয়াত বা সূরায় যে ভাব প্রকাশ করতে চাওয়া হয়েছে সে বিচারে অমুক শব্দটির পরিবর্তে অমুক শব্দটির ব্যবহার অধিকতর উপযোগী হতো বা বাক্যবিন্যাসে অমুক পরিবর্তন বেহতর হতো।

বস্তুতঃ ভাব, ভাষা ও তাৎপর্য সব কিছুই শতকরা একশ' ভাগ বজায় রাখা কেবল কোরআন মজীদেই সম্ভব হয়েছে, মানব রচিত কোনো কবিতা বা গদ্যে তা সম্ভব হয় নি এবং হবে না - এটা সুনিশ্চিত। কোরআন মজীদ এর ভিত্তিতেই নিজেকে মু'জিযাহ্ বলে দাবী করে চ্যালেঞ্জ প্রদান করেছে। কোরআন বলেছে, লোকেরা যদি কোরআনকে আল্লাহর কিতাব বলে মনে না করে, হযরত মুহাম্মাদ (ছ্বাঃ)- এর রচিত বলে মনে করে, তাহলে তারা এর একটি সূরার (এমনকি তিন আয়াত বিশিষ্ট ছোট সূরা হলেও) সমমানের একটি সূরা রচনা করে আনুক; এ কাজে তারা যে কারো সাহায্য নিতে পারে, এমনকি সারা দুনিয়ার সমস্ত মানুষ ও জিন্ একত্রিত হয়ে পারলেও তা করে দেখাক।

কিন্তু এ চ্যালেঞ্জ গ্রহণে কেউ সক্ষম হয় নি। তৎকালীন আরবের শ্রেষ্ঠতম কবি ও বাগ্মীগণ পর্যন্ত এ চ্যালেঞ্জ গ্রহণে ব্যর্থ হয়ে শেষ পর্যন্ত হযরত মুহাম্মাদ (ছ্বাঃ)- কে 'জাদুকর' ও কোরআনকে 'জাদু' বলে আখ্যায়িত করেন - যে দাবীর অসারতা নতুন করে প্রমাণের অপেক্ষা রাখে না।

পরবর্তীকালেও কোরআন মজীদের চ্যালেঞ্জ গ্রহণের অর্থাৎ কোনো কোনো ছোট সূরার সম মানসম্পন্ন একই বিষয়বস্তু সম্বলিত সূরা রচনার জন্য বিভিন্ন প্রচেষ্টা চালানো হয়। কিন্তু এরূপ

সকল প্রচেষ্টাই ব্যর্থ হয়। কারণ, দেখা গেছে, জ্ঞানগর্ভতা ও সাহিত্যিক সৌন্দর্য উভয়ের উচ্চ মানের একত্র সমাবেশ কোরআন মজীদের সমপর্যায়ে সম্ভব নয়।

কোরআন মজীদের চ্যালেঞ্জ এখনো বিদ্যমান রয়েছে। কোরআন যদি আল্লাহ্‌র কিতাব না হয়ে হযরত মুহাম্মাদ (ছ্বাঃ)-এর রচিত হতো তাহলে অন্য লোকদের (শ্রেষ্ঠতম কবি-সাহিত্যিক, জ্ঞানী-গুণী, দার্শনিক ও বিজ্ঞানীদের) পক্ষে একত্র হয়ে তার সম মানসম্পন্ন গ্রন্থ রচনা করা সম্ভব হতো। আরবী ভাষাভাষী এ ধরনের যোগ্যতা-সম্পন্ন বহু অমুসলিম কবি-সাহিত্যিক, জ্ঞানী-গুণী, দার্শনিক ও বিজ্ঞানী সব যুগেই ছিলেন এবং এখনো রয়েছেন। এমনকি অনারবদের মধ্যেও সব যুগেই আরবী ভাষা-সাহিত্য ও কোরআনের জ্ঞানে অসাধারণ পাণ্ডিত্যের অধিকারী এ ধরনের সুযোগ্য ব্যক্তিবর্গ (প্রাচ্যবিদগণ) ছিলেন এবং রয়েছেন। তাঁরা সমন্বিত প্রচেষ্টার মাধ্যমে কোরআনের বিকল্প রচনার চেষ্টা করতে পারেন।

বস্তুতঃ যারা ইসলামকে মোকাবিলা করার জন্য অপপ্রচার, ষড়য ও যুদ্ধবিগ্রহে হাজার হাজার কোটি ডলার ব্যয় করছেন তাঁরা এর চেয়ে অনেক কম ব্যয়ে একটি সমন্বিত প্রকল্প গ্রহণ করে কোরআনের বিকল্প উপস্থাপনের চেষ্টা করতে পারেন। এতে তাঁরা সফল হলে ইসলামের ঐশী ধর্ম হবার দাবী মিথ্যা প্রমাণিত হতো এবং এর ফলে নিজে নিজেই ইসলামের বিলুপ্তি ঘটতো। কিন্তু তাঁরা সে পথে অগ্রসর হচ্ছেন না। কারণ, যারাই কোরআনের সাথে ভালোভাবে পরিচিত তাঁরা - মুসলমান-অমুসলমান নির্বিশেষে - জানেন যে, কোরআনের বিকল্প উপস্থাপন করা মানবিক ক্ষমতার (এমনকি গোটা মানব জাতির সম্মিলিত প্রচেষ্টা হলেও) উর্ধে।

এ প্রসঙ্গে উল্লেখ করতে হয় যে, যে কোনো বিষয়ের অলৌকিকতা বা মু'জিযাহ্ চিহ্নিত করার জন্য সংশ্লিষ্ট বিষয়ে বিশেষজ্ঞ হওয়া বা সংশ্লিষ্ট বিষয়ের বিশেষজ্ঞদের ভূমিকা থেকে অনুধাবন করা অপরিহার্য। যেমন: মু'জিযাহ্ হিসেবে প্রদর্শিত বিষয়টি বা ঘটনাটি যদি জাদুর সাথে মিল বিশিষ্ট হয় তাহলে কেবল জাদুকরদের পক্ষেই নিশ্চিত হওয়া সম্ভব যে, কাজটি কি মু'জিযাহ্, নাকি জাদু। আর যারা জাদুকর নয় তারা জাদুকরদের প্রতিক্রিয়া থেকে এ সম্বন্ধে সঠিক ধারণায় উপনীত হতে পারে। অর্থাৎ তা যদি জাদু হয়ে থাকে তাহলে অন্য জাদুকররা অবশ্যই তার

মোকাবিলা করতে বা তাকে ভণ্ডুল করে দিতে সক্ষম হবে বা তার জারিজুরি ফাশ করে দিতে পারবে। একজন জাদুকরের একার ক্ষমতায় সম্ভব না হলেও সম্মিলিতভাবে তারা অবশ্যই সফল হবে। কিন্তু জাদুকররা যদি ঐ কাজটিকে মোকাবিলা করতে, বা ভণ্ডুল করে দিতে বা তার জারিজুরি ফাশ করে দিতে সক্ষম না হয় তাহলে এটাই প্রমাণিত হবে যে, কাজটি জাদু নয়, বরং মু'জিযাহ্। এমতাবস্থায় সাধারণ মানুষের জন্য তাকে মু'জিযাহ্ বলে মেনে নেয়া ছাড়া গত্যন্তর নেই।

চিকিৎসাশাস্ত্রের সাথে মিলযুক্ত বা অন্য কোনো শাস্ত্রের সাথে মিলযুক্ত মু'জিযাহ্ রূপে উপস্থাপিত কোনো কাজ প্রকৃতই মু'জিযাহ্ কিনা সে ক্ষেত্রেও নিশ্চিত হবার পন্থা এটাই। অর্থাৎ কোনো ব্যক্তি নিজেই সংশ্লিষ্ট বিষয়ে বিশেষজ্ঞ হলে নিজেই সে চ্যালেঞ্জ গ্রহণের চেষ্টা করে দেখবেন যে, তা কি মু'জিযাহ্, নাকি মানবিক বিশেষজ্ঞত্বের কাজ। আর উক্ত ব্যক্তি সংশ্লিষ্ট বিষয়ে বিশেষজ্ঞ না হলে সে লক্ষ্য করবে যে, এ বিষয়ের বিশেষজ্ঞগণ এর চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করে সফল হয়েছেন, নাকি হন নি, নাকি চ্যালেঞ্জ এড়িয়ে গেছেন।

অতএব, যারা আরবী ভাষা- সাহিত্য ও কোরআন মজীদের জ্ঞানে বিশেষজ্ঞ নন, তাঁদের জন্য কোরআন মু'জিযাহ্ কিনা সে প্রশ্নে সিদ্ধান্তহীনতায় থাকার কোনো সুযোগ নেই। তাঁরা 'জানি না' বলে বিষয়টি পাশ কাটিয়ে যেতে পারেন না। বরং তাঁদেরকে দেখতে হবে যে, এ ব্যাপারে আরবী ভাষা- সাহিত্য ও কোরআন বিষয়ক অমুসলিম বিশেষজ্ঞদের ভূমিকা কী? তাঁরা যখন কোরআনের চ্যালেঞ্জ গ্রহণে, এমনকি তার তিন আয়াত বিশিষ্ট একটি ছোট সূরার সম মানসম্পন্ন বিকল্প সূরা রচনা করতেও সক্ষম হন নি, তখন কোরআন যে একটি মু'জিযাহ্ এ ব্যাপারে সন্দেহের বিন্দুমাত্রও অবকাশ থাকে না।

কোরআন মজীদের অবিনশ্বর মু'জিযাহ্ হওয়ার প্রধানতম বৈশিষ্ট্য এটাই অর্থাৎ কোরআন মজীদের ভাষা- সাহিত্যগত মান ও জ্ঞানগর্ভতা এতোই উঁচু মানের যে, এ উভয় দিকের মান বজায় রেখে কোরআনের বা তার কোনো সূরার সম মানসম্পন্ন বিকল্প রচনা করা মানুষের পক্ষে সম্ভব নয়।

তবে এ ছাড়াও কোরআন মজীদের মু'জিযাহ্ হওয়ার আরো কয়েকটি নিদর্শন রয়েছে। যেমন:

* কোরআন তার তেলাওয়াতকারী ও শ্রবণকারীর মন- মগয, চিন্তা- চেতনা ও আচার- আচরণকে বিস্ময়করভাবে প্রভাবিত করে। এমনকি ভাষাগত ব্যবধানের কারণে কোরআনের তাৎপর্য যে বুঝতে পারে না তার ওপরেও এর প্রভাব কমবেশী বিস্তার লাভ করে। এ প্রভাব কেবল সাময়িকভাবে ভালো লাগা ও হৃদয় আপ্লুত হয়ে যাওয়ার মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়, বরং পাঠকারী ও শ্রবণকারীর চরিত্রের ওপরও কমবেশী স্থায়ী প্রভাব বিস্তার করে। কোনো মানবরচিত গ্রন্থেরই এ ধরনের প্রভাব লক্ষ্য করা যায় না।

* কোরআনের তেলাওয়াত বা তার শ্রবণের বার বার পুনরাবৃত্তি সত্ত্বেও মানবরচিত শ্রেষ্ঠতম গ্রন্থাবলী বা যুগান্তকারী কবিতা ও ভাষণসমূহের ন্যায় এর আকর্ষণ মোটেই হ্রাস পায় না বা হাল্কা হয়ে যায় না, বরং ক্রমেই বৃদ্ধি পায়।

* একটি মধ্যম আয়তনের গ্রন্থ্ হওয়া সত্ত্বেও পুরো কোরআন মজীদ মুখস্ত করা ও মুখস্ত রাখা খুবই সহজ কাজ এবং বিশ্বে একই সময় লক্ষ লক্ষ মানুষের তা মুখস্ত আছে। মানব জাতির ইতিহাসে দ্বিতীয় কোনো পুস্তকের, এমনকি কোনো ক্ষুদ্র পুস্তিকার ক্ষেত্রেও এমনটি ঘটে নি।

* কোরআন মজীদে বিভিন্ন ধরনের জ্ঞান- বিজ্ঞান যেমন: দর্শন, সৃষ্টিতত্ত্ব, তত্ত্বকথা, নীতিশাস্ত্র, ধর্মীয় বিধান, সমাজবিজ্ঞান, আইন, রাজনীতি, অর্থনীতি, সমাজতত্ত্ব, নৃবিজ্ঞান, নক্ষত্রবিজ্ঞান, প্রাকৃতিক বিজ্ঞান, মনস্তত্ত্ব, ইতিহাস ইত্যাদি সকল জ্ঞান- বিজ্ঞানের সমাহার ঘটেছে। মানবজাতির ইতিহাসে দ্বিতীয় এমন কোনো গ্রন্থ্ পাওয়া যাবে না যাতে এতো বিপুল সংখ্যক বিষয় স্থান পেয়েছে। মানবরচিত গ্রন্থের ক্ষেত্রে ভাবাই যায় না যে, এমন স্বল্পায়তনে এতো বেশী সংখ্যক বিষয় স্থান দেয়া যেতে পারে।

* কোরআন মজীদের আরেকটি অনন্য বৈশিষ্ট্য এই যে, তা যতোই অধ্যয়ন করা হয় ততোই তা থেকে নতুন নতুন তত্ত্ব, তথ্য ও তাৎপর্য বেরিয়ে আসে এবং যতো বার নতুন করে অধ্যয়ন করা হয় ততো বারই তা থেকে আরো নতুন নতুন জ্ঞান বেরিয়ে আসে। এভাবে বিগত চৌদ্দশ' বছরে

কোরআন থেকে জ্ঞানের বিশাল ভাণ্ডার বেরিয়ে এসেছে এবং এখনো পুনঃঅধ্যয়ন থেকে আরো নতুন নতুন জ্ঞান বেরিয়ে আসা অব্যাহত রয়েছে।

* কোরআন মজীদের বাচনভঙ্গি ও রচনাকৌশল মানুষের রচিত বৈজ্ঞানিক, দার্শনিক বা ধর্মীয় গ্রন্থের রচনারীতি থেকে সম্পূর্ণ স্বত । মানুষের রচিত যে কোনো গ্রন্থ পুরোপুরি না পড়া পর্যন্ত গ্রন্থকারের মূল প্রতিপাদ্য বিষয় সম্পর্কে পূর্ণাঙ্গ ও স্বচ্ছ ধারণা লাভ করা সম্ভব নয়। কিন্তু কোরআন মজীদের রচনাকৌশল এমন যে, তার একটি ছোট সূরা অধ্যয়ন করলেও তাতে সমগ্র কোরআনের শিক্ষা ও পথনির্দেশের নির্যাস পাওয়া যায়। এ যেন একটি প্রাকৃতিক ফলবান বৃক্ষ যার ছোট- বড় যে কোনো শাখায়ই পুরো বৈশিষ্ট্য - অভিন্ন পাতা, ফুল ও ফল - বিরাজমান, কেবল পরিমাণে কম আর বেশী। মানবরচিত কোনো গ্রন্থেই এ বৈশিষ্ট্য পাওয়া সম্ভব নয়।

* কোরআন মজীদে বেশ কিছু ভবিষ্যদ্বাণী করা হয় যা কালের প্রবাহে যথাসময়ে কার্যে পরিণত হয়। যেমন: (১) কোরআন মজীদের মক্কায় অবতীর্ণ একটি সূরায় (সূরা লাহাব) মক্কার কাফেরদের অন্যতম নেতা আবু লাহাবের ও তার শক্তির (রূপকার্থে 'দুই হাত') ধ্বংসের এবং তার স্ত্রীর লাকড়ি বহনকালে খেজুর পাতার রশিতে গলায় ফাঁস লেগে মারা যাওয়ার ভবিষ্যদ্বাণী করা হয়। এ ভবিষ্যদ্বাণী হুবহু বাস্তবায়িত হয়। (২) রোমান ও পারস্য সম্রাটের মধ্যকার যুদ্ধে রোম সম্রাট পরাজিত হবার পর কোরআন মজীদের সূরা আর্- রূম্- এ ভবিষ্যদ্বাণী করা হয় যে, 'কয়েক' (আরবী ভাষার প্রচলন অনুযায়ী দশ- এর কম) বছরের মধ্যেই পুনরায় রোম পারস্যের ওপর বিজয়ী হবে এবং কার্যতঃও তা- ই ঘটে। (৩) হুদায়বিয়ায় রাসূলে আকরাম হযরত মুহাম্মাদ (ছ্বাঃ) ও মক্কাহর কাফেরদের মধ্যে যে চুক্তি সম্পাদিত হয় কার্যতঃ তা ছিলো মুসলমানদের জন্য অপমানজনক, কিন্তু কোরআন মজীদে (সূরা আল্- ফাতহ্) একে 'সুস্পষ্ট বিজয়' হিসেবে অভিহিত করে আশু মক্কাহ্ বিজয়ের ভবিষ্যদ্বাণী করা হয় এবং অচিরেই সে ভবিষ্যদ্বাণী কার্যে পরিণত হয়।

* কোরআন মজীদে এমন বহু বৈজ্ঞানিক তথ্য রয়েছে যা কোরআন নাযিলের সময়কার মানুষের জানা ছিলো না এবং বহু পরে বিজ্ঞানীরা তা আবিষ্কার করেন। যেমন: (১) উদ্ভিদের প্রাণ থাকার

কথা। (২) মাতৃগর্ভে মানুষের ভ্রুণ থেকে পূর্ণাঙ্গ মানবশিশুতে পরিণত হওয়ার বিভিন্ন স্তর। (৩) বায়ুর দ্বারা উদ্ভিদজগতে পরাগায়ণপ্রক্রিয়া। (৪) পৃথিবীর বিভিন্ন স্থানে বিভিন্ন সময়ে সূর্যের উদায়াস্ত ঘটা। (৫) ভূপৃষ্ঠে দু'টি প্রাচ্য ভূখণ্ড (এশিয়া- ইউরোপ ও আফ্রিকা) ছাড়াও দু'টি পাশ্চাত্য ভূখণ্ডের (উত্তর ও দক্ষিণ আমেরিকা) অস্তিত্ব থাকা। (৬) মিঠা পানি ও লোনা পানির সমুদ্র পাশাপাশি থাকা সত্ত্বেও এবং মাঝখানে কোনোরূপ প্রাকৃতিক বাধা না থাকা সত্ত্বেও দুই ধরনের পানি পরস্পর মিশে না যাওয়া। কোরআন মজীদে এ ধরনের আরো অনেক বৈজ্ঞানিক তথ্য রয়েছে এবং কোরআনের বিজ্ঞান সম্পর্কে বিভিন্ন ভাষায় বহু গ্রন্থ রচিত হয়েছে।

মোদ্দা কথা, কোরআন মজীদ যে মহান সৃষ্টিকর্তার পক্ষ থেকে নাযিলকৃত গ্রন্থ এবং একমাত্র অবিকৃত ঐশী গ্রন্থ হিসেবে সকল মানুষেরই কর্তব্য এ মহাগ্রন্থ থেকে পথনির্দেশ গ্রহণ করা - এটাই সুস্থ বিচারবুদ্ধির রায়। এ ব্যাপারে বিশেষজ্ঞ- অবিশেষজ্ঞ নির্বিশেষে কারো মনেই সন্দেহ পোষণের অবকাশ নেই।

খাতমে নবুওয়াতঃ ইসলামগৃহের ভিত্তি -

ইসলামের তাত্ত্বিক মৌলিক ভিত্তি তিনটি: তাওহীদ, আখেরাত ও নবুওয়াত। এ তিনটির কোনো একটিকে প্রত্যাখ্যান মানে গোটা দ্বীন ইসলামকেই প্রত্যাখ্যান। কারণ, আল্লাহর অস্তিত্ব ও একত্বের অনুভূতি থেকেই তাঁর সাথে মানুষের সম্পর্ক এবং তাঁর প্রতি দায়িত্ব- কর্তব্যের অনুভূতি সৃষ্টি হয়। এ অনুভূতিরই জবাব হচ্ছে খোদায়ী দ্বীন বা ইসলামী জীবনবিধান যা কেবল নবী-রাসূলগণের (আঃ) মাধ্যমেই মানুষের নিকট আসা সম্ভব। অন্যদিকে মৃত্যুর পরে শাস্তি ও পুরস্কারের কোনো জগৎ না থাকলে দ্বীন পালনের কোনো অপরিহার্যতাই থাকে না। তাই এ তিনটি মৌলিক ভিত্তির কোনো একটির প্রতি উপেক্ষা প্রদর্শন করা হলে বাকী দু'টিকে গ্রহণ ও বর্জন সমার্থক হয়ে দাঁড়ায়।

ইসলামের এ তিনটি মৌলিক ভিত্তিকে আরো কিছুটা বিস্তারিতভাবে উপস্থাপন করলে এ সংখ্যা দাঁড়ায় সাতটিতে। তা হচ্ছে: তাওহীদ, আখেরাত, নবুওয়াত, নবুওয়াতে মুহাম্মাদী (ছ্বাঃ), কোরআন মজীদের ঐশিতা, খাতমে নবুওয়াত ও অভিন্ন ক্বিবলাহ্। অবশ্য এ সব ভিত্তির মধ্যকার এক বা একাধিক ভিত্তি অন্য অনেক ধর্মেই পাওয়া যায়। বিশেষ করে অতীতের নবী-রাসূলগণের (আঃ) অনুসারী হবার দাবীদারদের দ্বারা তাঁদের নামে তৈরী কতক ধর্মে তাওহীদ, আখেরাত ও নবুওয়াতের মূলনীতি রয়েছে। এ ক্ষেত্রে যে ভিত্তিটি অন্য সমস্ত ধর্ম থেকে ইসলামকে স্বত করেছে তা হচ্ছে রাসূলে আকরাম হযরত মুহাম্মাদ (ছ্বাঃ)- এর শেষ নবী হওয়া বা খাতমে নবুওয়াত। এক হিসেবে যদি বলা হয় যে, খাতমে নবুওয়াতই হচ্ছে ইসলাম তাহলে ভুল বলা হবে না। কারণ, কেউ এই একটি বিষয়কে গ্রহণ করলে তার কাছে ইসলামের বাকী সবগুলো মূলনীতিই গ্রহণযোগ্য হতে বাধ্য।

বস্তুতঃ রাসূলে আকরাম হযরত মুহাম্মাদ (ছ্বাঃ)- এর শেষ নবী হওয়ার মানেই হচ্ছে তিনি আল্লাহর নবী, আর যেহেতু তিনি এ গ্রন্থটিকে আল্লাহর কিতাব হিসেবেই পেশ করেছেন সেহেতু তাঁর উপস্থাপিত গ্রন্থ কোরআন মজীদ আল্লাহর কিতাব। আর যেহেতু এ গ্রন্থ নিজেকে সকল প্রকার

বিকৃতি থেকে সংরক্ষিত বলে দাবী করেছে এবং রাসূলে আকরাম হযরত মুহাম্মাদ (ছ্বাঃ)- কে 'সকল মানুষের জন্য আল্লাহর রাসূল' বলে ঘোষণা করেছে, সেহেতু তাঁর পরে আর কোনো নবী আসার কোনো উপযোগিতাই থাকে না। তাই বিচারবুদ্ধির দাবী অনুযায়ী তাঁর জন্য শেষ নবী হওয়া অপরিহার্য। অতএব, তাঁর পরে কেউ যদি নিজেকে নবী বলে দাবী করে তো সে ব্যক্তি ও তার অনুসারীরা অনিবার্যভাবেই ইসলাম- গৃহের বাইরে চলে গেছে।

অনেকে মনে করে যে, নতুন নবীর আগমনে বিশ্বাসী লোকেরা যদি রাসূলে আকরাম হযরত মুহাম্মাদ (ছ্বাঃ)- কে সর্বশ্রেষ্ঠ নবী বলে স্বীকার করে এবং নিজেদেরকে মুসলমান বলে পরিচয় দেয় তাহলে তাদেরকে জোর করে অমুসলিম বলা উচিত নয়। তারা আরো মনে করে যে, ইসলামের অন্য সকল ব্যাপারেই যখন তারা একমত, এমতাবস্থায় একটি বিষয়ে মতপার্থক্যের কারণে নতুন নবীর আগমনে বিশ্বাসী লোকদেরকে অমুসলিম গণ্য করা ঠিক হবে না।

কাউকে নবী মানা- নামানা ধর্ম পৃথক হওয়ার কারণ

উপরোক্ত ধারণাটি যারা পোষণ করে করে তারা একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বাস্তব সমস্যার প্রতি দৃষ্টি না দেয়ার কারণে এরূপ ধারণা পোষণ করে থাকে। তা হচ্ছে, দু'টি জনগোষ্ঠী দু'টি স্বত ধর্মের অনুসারী হিসেবে পরিগণিত হয় নবুওয়াতের দাবীদার কোনো ব্যক্তিকে নবী হিসেবে মানা ও না- মানার ভিত্তিতে। এ কারণেই খৃস্টানরা ইয়াহূদীদের মতোই হযরত ঈসা (আঃ)- এর পূর্ববর্তী সকল নবীর [হযরত মূসা (আঃ) সহ] নবুওয়াত স্বীকার করা সত্ত্বেও হযরত ঈসা (আঃ)- কে নবী হিসেবে মানা- নামানার ভিত্তিতে তারা ও ইয়াহূদীরা দু'টি স্বত ধর্মাবলম্বী জনগোষ্ঠীতে পরিণত হয়েছে। অনুরূপভাবে মুসলমানরা রাসূলে আকরাম হযরত মুহাম্মাদ (ছ্বাঃ)- এর পূর্ববর্তী সকল নবী- রাসূল (আঃ)- এর [হযরত মূসা ও হযরত ঈসা (আঃ) সহ] নবুওয়াত স্বীকার করা সত্ত্বেও হযরত মুহাম্মাদ (ছ্বাঃ)- এর নবুওয়াত স্বীকার করা- নাকরার ভিত্তিতে তারা ইয়াহূদী ও খৃস্টানদের থেকে স্বত ধর্মাবলম্বীতে পরিণত হয়েছে। অতএব, রাসূলে আকরাম হযরত মুহাম্মাদ (ছ্বাঃ)- এর পরে নবুওয়াত দাবীকারী কোনো ব্যক্তিকে যারা নবী বলে স্বীকার করে তারা হযরত মুহাম্মাদ

(ছ্বাঃ)- কে শ্রেষ্ঠতম নবী বলে স্বীকার করলেও যেহেতু মুসলমানরা নবুওয়াতের দাবীদার নতুন ব্যক্তিকে নবী বলে স্বীকার করে না সেহেতু তারা ও মুসলমানরা স্বত ধর্মাবলম্বী। এমতাবস্থায় নতুন নবুওয়াত দাবীকারীকে নবী বলে গ্রহণকারীদেরকে মুসলমান বলে স্বীকার করতে হলে অনিবার্যভাবেই মুসলমানদের জন্য অন্য কোনো পরিচিতিবাচক নাম খুঁজতে হবে। তবে সর্বজনীনভাবে স্বীকৃত রীতি হচ্ছে এই যে, নতুন জনগোষ্ঠীই নতুন নাম গ্রহণ করবে; পুরনো নামটি যারা ধারাবাহিকভাবে ব্যবহার করে আসছে তারাই তা ব্যবহার করতে থাকবে।

যে ব্যক্তি নবুওয়াতের নতুন দাবীদার তার অনুসারীরা ও তাকে প্রত্যাখ্যানকারীরা স্বত ধর্মাবলম্বী - এ অকাট্য সত্যটি যে কোনো সুস্থ বিচারবুদ্ধি গ্রহণ করে নিতে বাধ্য। এটা স্বীকার করে নিয়েও আমরা কেবল যুক্তির খাতিরে বিচার করে দেখতে পারি যে, কোনো কোনো গোষ্ঠী যে রাসূলে আকরাম হযরত মুহাম্মাদ (ছ্বাঃ)- এর পরে নতুন নবুওয়াত দাবীকারীদের নবী বলে স্বীকার করেছে সুস্থ বিচারবুদ্ধির আলোকে এর আদৌ কোনো সুযোগ আছে কিনা।

এ প্রসঙ্গে কয়েকটি বিষয় বিশেষভাবে প্রণিধানযোগ্য। তা হচ্ছে: প্রথমতঃ যে সব কারণে নবী প্রেরণ করা হয় রাসূলে আকরাম হযরত মুহাম্মাদ (ছ্বাঃ)- এর পরে আর সে ধরনের কোনো কারণই বর্তমান নেই। কারণ, তিনি যে দ্বীন নিয়ে এসেছেন, কোরআন মজীদের দ্ব্যর্থহীন ঘোষণা অনুযায়ী, তা পূর্ণাঙ্গ ও সংরক্ষিত। দ্বিতীয়তঃ পূর্ববর্তী নবী- রাসূলগণের (আঃ) ভবিষ্যদ্বাণী অনুযায়ী রাসূলে আকরাম হযরত মুহাম্মাদ (ছ্বাঃ) ছিলেন প্রতিশ্রুত নবী ও ত্রাণকর্তা তথা শ্রেষ্ঠতম নবী। শ্রেষ্ঠতম নবীর আগমনের পর আর তাঁর চেয়ে কম গুরুত্বপূর্ণ কোনো নবীর আগমনের যৌক্তিকতা থাকে না। তৃতীয়তঃ বিচারবুদ্ধির রায় অনুযায়ী নবীর অবর্তমানে পূর্ণাঙ্গ দ্বীন ও অবিকৃত ঐশী কিতাব বিদ্যমান থাকলে তার প্রচার- প্রসার ও প্রতিষ্ঠার জন্য ঐ নবীর কতক সুযোগ্য অনুসারী থাকাই যথেষ্ট, নবীর প্রয়োজন থাকে না। কারণ, যে নবীর কাছে আদৌ কোনো ওয়াহী নাযিল হবে না ও তিনি কোনো ঐশী বিধান আনবেন না (কারণ, আনলে তা বিদ্যমান দ্বীনের পূর্ণতার বরখেলাফ হবে) এমন নবীর ধারণা অভিনব।

এতদসত্ত্বেও যুক্তির খাতিরে যদি এ ধরনের কোনো নবীর আগমনের সম্ভাব্যতা স্বীকার করে নেয়া হয়, সে ক্ষেত্রে প্রশ্ন জাগে যে, নতুন নবুওয়াত দাবীকারী ব্যক্তি যে ভণ্ডপ্রতারক নয় তার কী - নিশ্চয়তা আছে? এ ক্ষেত্রে একটি অপযুক্তি (fallacy - مغالطة) উপস্থাপন করা হয় যে, রাসূলে আকরাম হযরত মুহাম্মাদ)ছ্বাঃকে শ্রেষ্ঠতম নবী বলে স্বীকার করে তাঁর চেয়ে কম মর্যাদার -(অধিকারী'যিল্লী নবী' (ছায়া নবীর আগমন ঘটতে পারে।(

এ ক্ষেত্রে প্রশ্ন হচ্ছে, যুক্তির খাতিরে যদি কথিত 'যিল্লী নবী' আগমনের সম্ভাব্যতা স্বীকার করে নেয়া হয় তারপর প্রশ্ন আসে যে, নবুওয়াতের দাবীদার ব্যক্তি যে সত্যিই 'যিল্লী নবী', নবুওয়াতের ভণ্ড দাবীদার নয়, তার প্রমাণ কী? কারণ, কেবল রাসূলে আকরাম হযরত মুহাম্মাদ (ছ্বাঃ)- কে শ্রেষ্ঠতম নবী বলে স্বীকার করাই যদি কারো 'যিল্লী নবী' হওয়ার জন্য যথেষ্ট হয় তাহলে যে কোনো ভণ্ড- প্রতারকই তাঁকে স্বীকার করে নিয়ে নিজের জন্য নবুওয়াতের মর্যাদা দাবী করতে পারে।

এমতাবস্থায় নতুন নবীর আগমনের সম্ভাবনা থাকলে এ জন্য রাসূলে আকরাম হযরত মুহাম্মাদ (ছ্বাঃ) কর্তৃক এরূপ কাউকে পরিচিত করিয়ে যাওয়া বা কোরআন মজীদে এরূপ ব্যক্তির পরিচয় উল্লেখ থাকা অপরিহার্য ছিলো। বলা বাহুল্য যে, না তিনি এরূপ কাউকে পরিচিত করিয়ে দিয়ে গেছেন, না পরে কোনো নবী আসার কথা কোরআন মজীদে উল্লিখিত আছে।

এ প্রসঙ্গে আরো উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, কোরআন মজীদের সূরা আল্- বাক্বারাহর শুরুর দিকে কোরআন থেকে হেদায়াত লাভকারী মুত্তাকী- পরহেযগার লোকদের যে পরিচয় দেয়া হয়েছে তার মধ্যে অন্যতম হচ্ছে রাসূলে আকরাম হযরত মুহাম্মাদ (ছ্বাঃ) ও তাঁর পূর্ববর্তী নবী- রাসূলদের (আঃ) ওপর যা নাযিল হয়েছে তার সত্যতায় ঈমান পোষণ করা; তাঁর পরবর্তী কারো নবুওয়াত বা ওয়াহীর ওপরে ঈমান পোষণের কথা বলা হয় নি। অথচ কোরআন মজীদের ঘোষণা অনুযায়ী পূর্ববর্তী নবীগণ (আঃ) তাঁদের অনুসারীদের বলে গেছেন যে, রাসূলে আকরাম হযরত মুহাম্মাদ (ছ্বাঃ)- এর আবির্ভাব ঘটলে তারা যেন তাঁর ওপরে ঈমান আনে ও তাঁর আনুগত্য করে।

এমতাবস্থায় তাঁর পরে কোনো নবী আসার সম্ভাবনা থাকলে তার প্রতি ঈমান আনার ব্যাপারে কোরআন মজীদে অবশ্যই অনুরূপ নির্দেশ থাকতো।

‘মোহর ধারণের’ অপযুক্তি

এ প্রসঙ্গে নতুন নবুওয়াত দাবীকারীকে নবী বলে স্বীকার- কারীদের উপস্থাপিত একটি টযুক্তির বিভ্রান্তি অপনোদন করা প্রয়োজন মনে করি।

যেহেতু কোরআন মজীদে রাসূলে আকরাম হযরত মুহাম্মাদ (ছ্বাঃ)- কে ‘খাতামুন্নাবিয়্যীন’ (নবীদের খাতাম্ বা মোহর) বলা হয়েছে এবং মুসলমানরা এর ভিত্তিতে তাঁকে ‘শেষ নবী’ বলে দাবী করে, তার বিপরীতে এরা দাবী করে যে, এর মানে হচ্ছে পরবর্তীতে কোনো নবীর আগমন ঘটলে তাকে অবশ্যই হযরত মুহাম্মাদ (ছ্বাঃ)- এর মোহর ধারণ করে আসতে হবে। তারা হযরত মুহাম্মাদ (ছ্বাঃ)- এর মোহর ধারণ- এর অর্থ করেছে তাঁকে ‘শ্রেষ্ঠতম নবী’ বলে স্বীকার করা। কিন্তু এটা মেনে নিলে যে কোনো ভণ্ড- প্রতারকের জন্যই নবুওয়াত- দাবীর দরযা উন্মুক্ত হয়ে যায় তা আমরা আগেই উল্লেখ করেছি।

অধিকন্তু তাদের এ যুক্তি শুধু অপযুক্তিই নয়, বরং উদ্ভটও বটে। কারণ, কোনো নবীর রাসূলে আকরাম হযরত মুহাম্মাদ (ছ্বাঃ)- এর মোহর ধারণ- এর প্রকৃত অর্থ হচ্ছে তিনি যাকে নবী বলে মোহরাঙ্কিত তথা অভিহিত করেছেন তিনিই নবী। অতএব, যাদের নাম কোরআন মজীদে ও অকাট্যভাবে নির্ভরযোগ্য হাদীছে নবী হিসেবে উল্লিখিত হয়েছে তাঁরাই নবী। যে ব্যক্তি রাসূলে আকরাম হযরত মুহাম্মাদ (ছ্বাঃ)- কে শ্রেষ্ঠতম নবী বলে স্বীকার করলো কার্যতঃ রাসূলে আকরাম হযরত মুহাম্মাদ (ছ্বাঃ) তাকে নবী বলে মোহরাঙ্কিত করেন নি। ঐ ব্যক্তির এ কাজকে মোহরাঙ্কিতকরণ বলে গণ্য করলে বলতে হবে যে, বরং সে- ই হযরত মুহাম্মাদ (ছ্বাঃ)- কে ‘শ্রেষ্ঠ নবী’ হিসেবে মোহরাঙ্কিত করলো, যদিও তিনি যে কোনো ভণ্ড নবী কর্তৃক মোহরাঙ্কিত হওয়া বা তার স্বীকৃতি থেকে বেনিয়ায।

এরপরও যদি কেউ নতুন নবীর আগমনের ‘সম্ভাবনা’ স্বীকার করে তো বলতে হবে যে, যেহেতু কোরআন মজীদে এরূপ কোনো নবীর আগমনের ভবিষ্যদ্বাণী ও তার আনুগত্যের নির্দেশ নেই, সেহেতু এরূপ ব্যক্তিকে মেনে নেয়ার কোনো দায়িত্ব মুসলমানদের ওপর নেই এবং তাকে প্রত্যাখ্যান করলে আদৌ কোনো অপরাধ হবে না। বরং ভণ্ড নবীর প্রতারণার আশঙ্কা এড়াতে তাকে প্রত্যাখ্যান করাই হবে অপরিহার্য কর্তব্য। তেমনি একজন নবুওয়াত- দাবীকারীকে মানা ও না- মানার ভিত্তিতে সংশ্লিষ্ট দু’টি জনগোষ্ঠীকে অবশ্যই দু’টি ভিন্ন ভিন্ন ধর্মীয় জনগোষ্ঠী বলে গণ্য করতে হবে।

বিচারবুদ্ধির আলোকে হযরত মুহাম্মাদের উত্তরাধিকারি (ছ্বাঃ)ত্ব

হযরত মুহাম্মাদ যেমন বিচারবুদ্ধির এ সত্যটি - শেষ নবী (ছ্বাঃ) (عقل - Reason) দ্বারা উদঘাটিত হয়, তেমনি তা কোরআন মজীদের দলীল দ্বারাও প্রমাণিত। এখন প্রশ্ন হচ্ছে, তাঁর ইন্তেকালের অব্যবহিত পরে ও পরবর্তীকালে মুসলিম উম্মাহর নেতৃত্ব, পথনির্দেশ ও শাসনকর্তৃত্বের দায়িত্ব কে বা কা'রা পালন করবেন? অন্য কথায়, হযরত মুহাম্মাদ এর উত্তরাধিকারী কে বা -(ছ্বাঃ) কা'রা হবেন?

বস্তুতঃ মুসলিম উম্মাহর সামনে বিরাজমান গুরুত্বপূর্ণ দ্বীনী- রাজনৈতিক প্রশ্নগুলোর মধ্যে এটিই সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ।

কেন এ বিষয়ে আলোচনা

হযরত রাসূলে আকরাম (ছ্বাঃ)- এর স্থলাভিষিক্ততা নিয়ে যে মতপার্থক্য সৃষ্টি হয় তার ফলে ইসলামের ইতিহাসে বহু তিক্ত ঘটনার অবতারণা হয় এবং মুসলমানরা প্রথমতঃ দুই ভাগে ও পরে আরো বহু ভাগে বিভক্ত হয়ে পড়ে। অন্যদিকে এ বিষয়কে কেন্দ্র করে ইসলামের ইতিহাসের বহু সম্মানিত ব্যক্তির কঠোর সমালোচনা করা হয়েছে - যা ইসলাম ও মুসলমানদের জন্য বি তকরও বটে। তাই অনেকে মনে করেন যে, দীর্ঘ চৌদ্দ শতাব্দীর বেশী কাল আগে সংঘটিত এ মতপার্থক্য নিয়ে আজ নতুন করে আলোচনা করা ও ইসলামের ইতিহাসের তিক্ত পাতাগুলো ওল্টানো কিছুতেই উচিত নয়।

কোনো মুসলমানের পক্ষেই এ ব্যাপারে দ্বিমত করা উচিত হতো না যদি না বিষয়টি বর্তমান কালেও মুসলমানদের দ্বীনী ও রাজনৈতিক জীবনের ওপর নেতিবাচক প্রভাব বিস্তার করে থাকতো। অতীতের দ্বীনী নেতৃবৃন্দ যদি এতদসংক্রান্ত ভুলক্রুটির 'প্রভাব'কে এড়িয়ে চলতেন তাহলে সংশ্লিষ্ট মতপার্থক্যের বিষয়টি গুরুত্ব হারিয়ে ফেলতো।

কিন্তু দুর্ভাগ্যজনক যে, অতীতে ভুলগুলো শোধরানো হয় নি; তখন সম্মানিত ব্যক্তিদের সম্মান রক্ষার্থে দ্বীনী মতামতগুলোর ক্ষেত্রে তাঁদের ভুলগুলোকে আঁকড়ে থাকা হয়েছে। এমনকি ক্ষেত্রবিশেষে কোরআন মজীদের সাথে সাংঘর্ষিক মতামতকেও বর্জন করা হয় নি। পরবর্তীকালে এই সাথে আরো অনেক ভুল যোগ করা হয়েছে। এর ফলে উম্মাহর ভিতরে 'আক্বাএদের বিভিন্ন শাখা- প্রশাখায় বহু চরমপন্থী (ইফরাতী) ভ্রান্ত অন্ধ বিশ্বাসের সৃষ্টি হয়েছে যেগুলোর ভিত্তিতে এক মুসলমান অন্য মুসলমানকে বিদ্'আতী, ফাসেক্ব, এমনকি কাফের ও হত্যাযোগ্য মনে করছে এবং বাস্তবেও - আজও - হত্যা করছে। উদাহরণস্বরূপ, অনেকে মনে করছে, নবী- রাসূলগণ (আঃ) নিষ্পাপ ছিলেন না, অথচ বিস্ময়ের ব্যাপার এই যে, ছ্বাহাবীদেরকে সমালোচনার উর্ধে গণ্য করছে এবং তাঁদের সমালোচনাকারীদেরকে কাফের ও মুরতাদ্ গণ্য করছে। এমনকি কোনো কোনো গোষ্ঠী আল্লাহ্ তা'আলার শরীর আছে বলেও বিশ্বাস করছে। কেউ কেউ মাযার যিয়ারতকে শির্ক্ গণ্য করছে। এ ধরনের আরো অনেক অন্ধ বিশ্বাস বিরাজ করছে।

অন্যদিকে আমলের ক্ষেত্রে মতপার্থক্য কেবল মুস্তাহাব ও মাকরূহর মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকে নি, বরং কতক ফরয ও হারামের বিষয়েও মতপার্থক্য সৃষ্টি হয়েছে, অথচ আমরা জানি যে, নবী- রাসূলগণের (আঃ) আগমনের অন্যতম প্রধান উদ্দেশ্য ছিলো ফরয ও হারাম সম্পর্কে আল্লাহ্ তা'আলার ফয়সালা পৌঁছে দেয়া এবং এ ব্যাপারে মতপার্থক্য সৃষ্টি হবার কোনো যুক্তিসঙ্গত কারণ নেই। তারপরও এ বিষয়ে মতপার্থক্য হয়েছে। উদাহরণস্বরূপ, এক বৈঠকে 'তিন' ত্বালাক্ব দেয়া হলে তা কি ফেরৎযোগ্য 'একবার' ত্বালাক্ব হিসেবে পরিগণিত হবে, নাকি ফেরৎ- অযোগ্য চূড়ান্ত ত্বালাক্ব হিসেবে গণ্য হবে; অস্থায়ী বিবাহ কি হালাল, নাকি ব্যভিচারতুল্য হারাম; ইফতার কি সূর্যাস্তের সাথে সাথে করতে হবে, নাকি 'রাত হওয়া' পর্যন্ত রোযা পূর্ণ করতে হবে - নইলে রোযা ভঙ্গ হয়ে যাবে; ওযূতে কি পা ধু'তে হবে, নাকি মাসেহ্ করতে হবে; মাসেহর ক্ষেত্রে মোযার ওপর মাসেহ্ করতে হবে, নাকি মোযা খুলে খালি পায়ের ওপর করতে হবে; কুকুরের মাংস খাওয়া কি হালাল, নাকি হারাম; নিখোঁজ স্বামীর স্ত্রী কি অন্যত্র বিবাহ করতে পারবে, নাকি পারবে না এবং পারলে কতোদিন পরে পারবে; খুমস্ কোন্ কোন্

খাতে প্রযোজ্য হবে; ওয়াছ্বীয়াত্ করা কি ফরয, নাকি মুস্তাহাব এবং তা উত্তরাধিকারীর জন্য করা যাবে কিনা; মৃত ব্যক্তির রেখে যাওয়া বসতগৃহের মীরাছ কি কেবল তাতে বসবাসকারীদের প্রাপ্য, নাকি অন্য উত্তরাধিকারীদেরও প্রাপ্য এবং এ ধরনের আরো অনেক ফরয ও হারাম সম্পর্কে মতপার্থক্য সৃষ্টি হয়েছে।

যেহেতু এ সব মতপার্থক্য ছ্বাহাবীদের পারস্পরিক মতপার্থক্য এবং তাঁদের অনেকের মতের সাথে হযরত রাসূলে আকরাম (ছ্বাঃ)- এর আহলে বাইতের (আঃ) ইমামগণের মতের পার্থক্য থেকে বা সতর্কভাবে বলতে গেলে, আমাদের কাছে রাসূলুল্লাহ্ (ছ্বাঃ)- এর, ছ্বাহাবীদের ও ইমামগণের মত হিসেবে দাবী করে যা পৌঁছানো হয়েছে সে সবের মধ্যকার সাংঘর্ষিকতা থেকে উদ্ভূত।

এমতাবস্থায় পারস্পরিক সাংঘর্ষিক মতামতসমূহের ক্ষেত্রে বিভিন্ন ছ্বাহাবীর নামে বর্ণিত হাদীছ ও মতামতের মধ্যে এবং তাঁদের ও হযরত রাসূলে আকরাম (ছ্বাঃ)- এর আহলে বাইতের ইমামগণের (আঃ) নামে বর্ণিত হাদীছ ও মতামতের মধ্যে (‘আক্বল্, কোরআন মজীদ, মুতাওয়াতির্ হাদীছ্ ও ইজমা‘এ উম্মাহর সাথে সাংঘর্ষিক না হওয়া সাপেক্ষে) অগ্রাধিকার নির্ধারণ করা অপরিহার্য।[১০]

ফয়সালার মানদণ্ড

এক দৃষ্টিতে বিচারবুদ্ধির দলীল দ্বারা নয়, বরং উদ্ধৃতিযোগ্য দলীল অর্থাৎ কোরআন মজীদ ও অকাট্য প্রত্যয় উৎপাদক হাদীছের সাহায্যে ইসলামের মৌল নীতিমালা নিয়ে বিস্তারিতভাবে আলোচনার মাধ্যমেই রাসূলুল্লাহ্ (ছ্বাঃ)- এর স্থলাভিষিক্ততা সংক্রান্ত প্রশ্নের জবাব উদঘাটন করা প্রয়োজন - যেখানে অবশ্য বিচারবুদ্ধি সহায়ক হিসেবে ভূমিকা পালন করবে মাত্র। সে হিসেবে এ বিষয়টি বিচারবুদ্ধির আলোকে জীবনজিজ্ঞাসা সমূহের জবাব উদঘাটনকারী অত্র গ্রন্থের আলোচ্য বিষয়ের আওতাভুক্ত নয়, বরং পরবর্তী পর্যায়ে আলোচ্য বিষয়।

তবে দু’টি কারণে আমরা বর্তমান পর্যায়ে অর্থাৎ বিচারবুদ্ধির দলীলের ভিত্তিতে এ ব্যাপারে আলোচনা করছি। প্রথমতঃ কোরআন- হাদীছ বিদ্যমান থাকা সত্ত্বেও এ প্রশ্নের জবাব সন্ধান সংক্রান্ত জ্ঞান- গবেষণার ক্ষেত্রে পদ্ধতিগত কিছু দুর্বলতার কারণে মতপার্থক্য লক্ষ্য করা যায়। এ মতপার্থক্য পুরোপুরি নিরসন করতে হলে বিস্তারিত ও বিশেষজ্ঞত্ব পর্যায়ের আলোচনা প্রয়োজন -

যা বিশেষজ্ঞ গবেষকগণের দায়িত্ব। যদিও এ ধরনের গবেষণা স্বত ভাবে সম্পাদনীয় - অত্র গ্রন্থে তার অবকাশ নেই, তবে এ ক্ষেত্রেও নীতিগত ও গবেষণার পদ্ধতিগত প্রশ্নে বিচারবুদ্ধি আমাদেরকে পথ দেখাতে সক্ষম। দ্বিতীয়তঃ বিচারবুদ্ধি যদি এমন কোনো ফয়সালায় উপনীত হতে পারে যা প্রত্যাখ্যান করা কোনো সুস্থ বিচারবুদ্ধির পক্ষে সম্ভব নয়, সে ক্ষেত্রে সে সর্বজনীন সমাধান অবশ্যই পেশ করা উচিত।

রাসূলুল্লাহর (ছ্বাঃ) স্থলাভিষিক্ত নির্ধারণের দায়িত্ব কা'র?

এখানে মতপার্থক্যের বিষয়টি সম্পর্কে অত্যন্ত সংক্ষেপে বলা যেতে পারে যে, রাসূলুল্লাহ্ (ছ্বাঃ)-এর ইন্তেকালের পরে তাঁর দ্বীনী ও রাজনৈতিক উত্তরাধিকার বা স্থলাভিষিক্ততা তথা নেতৃত্ব ও শাসন-কর্তৃত্বের অধিকার প্রশ্নে ছ্বাহাবীগণ দুই ভাগে বিভক্ত হয়ে যান এবং এ মতপার্থক্যের ধারাবাহিকতায় পরবর্তীকালে মুসলিম উম্মাহ্ দু'টি প্রধান ধারায় বিভক্ত হয়ে পড়ে, যদিও আরো পরে অন্য কতক বিষয়কে কেন্দ্র করে এ উভয় ধারার প্রতিটি থেকেই একাধিক উপধারার সৃষ্টি হয়।

মুসলমানদের দু'টি প্রধান ধারার মধ্যকার একটি ধারার (শিয়া) বক্তব্য এই যে, নবীর অবর্তমানে তাঁর উম্মাহর পরিচালনা, নেতৃত্ব ও শাসন-কর্তৃত্বের জন্য হুবহু নবীর গুণাবলী সম্পন্ন তথা নিষ্পাপ ও নির্ভুল ঐশী নেতৃত্ব অপরিহার্য। যদিও শেষ নবীর আগমন এবং খোদায়ী ওয়াহীর পরিপূর্ণতা ও সংরক্ষণ নিশ্চিত হওয়ার পর আর নতুন কোনো ওয়াহী ও নবীর প্রয়োজন থাকছে না, কিন্তু ওয়াহী ও দ্বীনের বিধি-বিধানের সঠিক ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ এবং তার ভিত্তিতে উম্মাহর পরিচালনা, নেতৃত্ব ও শাসন-কর্তৃত্বের জন্য নবীর অনুরূপ গুণাবলীর অধিকারী তথা পাপ ও ভুল থেকে সংরক্ষিত নেতৃত্ব না থাকলে এবং নেতৃত্ব নির্বাচনের দায়িত্ব মানুষের হাতে ছেড়ে দেয়া হলে ভুল ও নিম্ন মানের নেতৃত্ব নির্বাচনের আশঙ্কা থেকে যায় এবং এ ধরনের নেতৃত্ব ও শাসন-কর্তৃত্বের কারণে উম্মাহর পথভ্রষ্টতা, নিদেন পক্ষে তার মানের অধঃগমন অনিবার্য। তাই হযরত রাসূলে আকরাম (ছ্বাঃ)-এর স্থলাভিষিক্ততার জন্য আল্লাহ্ তা'আলার পক্ষ থেকে পাপ ও ভুল থেকে সংরক্ষিত নেতৃত্ব মনোনীত হওয়া অপরিহার্য।

এ মূলনীতির ভিত্তিতে এ ধারাটির দাবী হচ্ছে, আল্লাহ্ তা'আলা রাসূলুল্লাহ্ (ছ্বাঃ)-এর অবর্তমানে তাঁর পর্যায়ক্রমিক স্থলাভিষিক্ততা ও উম্মাহকে নেতৃত্বদানের জন্য তাঁর মাধ্যমে বারো জন ইমামকে মনোনীত ও তাঁদের নাম ঘোষণা করেছেন - যাদেরকে তিনি সকল প্রকার গুনাহ্ ও ভুলভ্রান্তি থেকে রক্ষা করেছেন। এই বারো জন ইমাম হলেন হযরত 'আলী (আঃ), হযরত ইমাম

হাসান ও হযরত ইমাম হোসেন (আঃ) এবং হযরত ইমাম হোসেন (আঃ)- এর নয়জন পর্যায়ক্রমিক বংশধর। এদের মধ্যে সর্বশেষ হলেন একাদশ ইমাম হাসান 'আসকারী (আঃ)- এর পুত্র প্রতিশ্রুত ইমাম মাহদী (আঃ)- যিনি হিজরী ২৫৫ সালে জন্মগ্রহণ করেন এবং বর্তমানে আত্মগোপনরত আছেন। আল্লাহ্ তা'আলা নিজ কুদরতে তাঁকে দীর্ঘজীবী করেছেন এবং পরে কোনো উপযুক্ত সময় তিনি আত্মপ্রকাশ ও মুসলিম উম্মাহর মধ্যে গণ- অভ্যুত্থান সৃষ্টি করে বিশ্ব ইসলামী হুকুমত প্রতিষ্ঠা করবেন।

দ্বিতীয় ধারাটির (সুন্নী) মতে, যেহেতু কোরআন মজীদ ক্বিয়ামত পর্যন্তকার সকল মানুষের জন্য পরিপূর্ণ পথনির্দেশ সেহেতু হযরত রাসূলে আকরাম (ছ্বাঃ)- এর ইন্তেকালের পর কোরআন মজীদ ও রাসূলের (ছ্বাঃ) সুন্নাহর অনুসরণই যথেষ্ট; আর যেহেতু কোরআন মজীদে নামোল্লেখ সহ কাউকে রাসূলুল্লাহ্ (ছ্বাঃ)- এর স্থলাভিষিক্ত হিসেবে উম্মাহর ইমাম ও শাসক মনোনীত করার কথা উল্লেখ করা হয় নি, সুতরাং মুসলমানরা নিজেরাই নিজেদের নেতা ও শাসক নির্বাচিত করবে।

এর জবাবে শিয়া ধারার পক্ষ থেকে বলা হয়েছে যে, যেহেতু মুসলমানদের প্রধান দুই ধারার বিভিন্ন হাদীছে বারো জন ইমামের কথা নাম সহ উল্লিখিত হয়েছে, বিশেষ করে মুতাওয়াতির্ হাদীছ অনুযায়ী, রাসূলুল্লাহ্ (ছ্বাঃ) তাঁর ইন্তেকালের কয়েক মাস আগে হজ্ব সমাপনের পর মক্কাহর অদূরস্থ গ্বাদীরে খুম্ নামক স্থানে এক মহাসমাবেশে আনুষ্ঠানিকতার মাধ্যমে তাঁর পরে মুসলমানদের "মাওলা" অর্থাৎ নেতা ও শাসক হিসেবে হযরত 'আলী (আঃ) কে মনোনীত করে গিয়েছেন সেহেতু তাঁদেরকে আল্লাহ্ কর্তৃক মনোনীত ইমাম হিসেবে মেনে নেয়া অপরিহার্য।

কিন্তু সুন্নী ধারা 'বারো জন ইমাম' সংক্রান্ত হাদীছগুলোকে মুতাওয়াতির্ মনে না করায় এবং হযরত 'আলী (আঃ)- এর "মাওলা" হওয়া সংক্রান্ত হাদীছে এ শব্দটিকে 'বন্ধু' অর্থে ব্যবহৃত বলে দাবী করে হযরত 'আলী (আঃ) কে রাসূলুল্লাহ্ (ছ্বাঃ)- এর অব্যবহিত পরবর্তী নেতা ও শাসক মনোনীতকরণ সংক্রান্ত ধারণা প্রত্যাখ্যান করে।

এর জবাবে শিয়া ধারার যুক্তি হচ্ছে এই যে, যেহেতু কোরআন মজীদে মুসলমানদেরকে পরস্পরের বন্ধু ও একটি ভ্রাতৃসম্প্রদায় বলে উল্লেখ করা হয়েছে সেহেতু নতুন করে ও

আলাদাভাবে হযরত ‘আলী (আঃ) কে মুসলমানদের বন্ধু হিসেবে পরিচয় করিয়ে দেয়া - তা- ও এক বিরাট আনুষ্ঠানিকতার মধ্য দিয়ে - নিঃসন্দেহে একটি বাহুল্য কাজ, আর নবী- রাসূলগণ (আঃ) বাহুল্য কাজ করেন না। অতএব, রাসূলুল্লাহ্ (ছ্বাঃ) উক্ত অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে হযরত ‘আলী (আঃ) কে স্বীয় উত্তরাধিকারী এবং অব্যবহিত পরবর্তী ইমাম ও শাসক নিয়োগ করে গিয়েছেন।

রাসূলুল্লাহর (ছ্বাঃ) উত্তরাধিকারিত্ব: বিচারবুদ্ধির দাবী [১১]

আল্লাহ্ তা'আলা যে সব মুখ্য উদ্দেশ্যে মানুষের কাছে স্বীয় বাণী সহ যুগে যুগে নবী- রাসূলগণকে (আঃ) পাঠিয়েছেন তা হচ্ছে লোকদেরকে আল্লাহ্ ও পরকাল সংক্রান্ত সঠিক ধারণার সাথে পরিচিত করা, তাদের কাছে আল্লাহর আদেশ ও নিষেধ সমূহ পৌঁছে দেয়া, আল্লাহর বাণী ও আদেশ- নিষেধের ব্যাখ্যা প্রদান, মূল বিধিবিধানের ছোটখাট শাখা- প্রশাখা প্রণয়ন, সর্বাবস্থায় স্বীয় অনুসারীদের নেতৃত্ব প্রদান এবং সম্ভবপর হলে তথা রা ক্ষমতা আয়ত্তাধীন হলে জনগণের ওপর শাসনক্ষমতা পরিচালনা।

পূর্ণাঙ্গ দ্বীন নাযিল হওয়ার পরে নতুন কোনো ওয়াহী নাযিলের প্রয়োজন নেই, অতএব, নতুন কোনো নবী আগমনেরও প্রয়োজন নেই। কিন্তু মওজূদ ওয়াহীর ব্যাখ্যাকরণ, মুসলমানদেরকে পথনির্দেশ প্রদান এবং তাদের ওপর শাসনকর্তৃত্ব পরিচালনার প্রয়োজনীয়তা অবশিষ্ট থেকে যায়। মূলতঃ এ সব কাজের জন্যই নবীর প্রয়োজন হতো, নইলে আল্লাহ্ তা'আলা ফেরেশতার মাধ্যমে স্বীয় পরিচয় ও আদেশ- নিষেধ সম্বলিত কিতাব পাঠাতে পারতেন। কিন্তু তিনি তা পাঠান নি, বরং সব সময়ই তা নবী- রাসূলগণের (আঃ) মাধ্যমে পাঠিয়েছেন। এখন প্রশ্ন হচ্ছে, নবুওয়াতের ধারাবাহিকতা সমাপ্ত হয়ে যাবার পর নবীর অবর্তমানে যিনি এ দায়িত্ব পালন করবেন তাঁর জন্য কী ধরনের গুণাবলীর অধিকারী হওয়া প্রয়োজন?

বিচারবুদ্ধির রায় অনুযায়ী, এ কাজ সম্পাদনকারীর জন্য যে সব গুণাবলীর অধিকারী হওয়া প্রয়োজন সেগুলোকে সংক্ষেপে তিনটি গুণের মধ্যে সমন্বিত করা যায়, তা হচ্ছে: জ্ঞান, পাপমুক্ততা ও অন্তর্দৃষ্টি বা দূরদর্শিতা। অবশ্য একজন নেতার মধ্যে অন্তর্দৃষ্টি বা দূরদর্শিতা আছে কিনা তা কেবল কালের প্রবাহে উদ্ভূতব্য সঙ্কটের অবস্থাগুলোতে তাঁর দায়িত্ব পালনের মধ্য দিয়ে ধরা পড়ে; আগেই তা জানা যায় না। কিন্তু অপর দু'টি গুণ তাঁর মধ্যে আছে কিনা তা তাঁর দায়িত্বগ্রহণকালেই সুস্পষ্ট থাকা প্রয়োজন।

আমাদের এ কথার মানে হচ্ছে, নবীর স্থলাভিষিক্ত ব্যক্তির মধ্যে নবীর রেখে যাওয়া জ্ঞান পরিপূর্ণ ও উচ্চতম মাত্রায় থাকা অপরিহার্য এবং সেই সাথে তাঁর দ্বারা পাপ সংঘটিত না হওয়ার বিষয়টি নিশ্চিত থাকতে হবে।

ইমাম বা শাসক যদি নবীর রেখে যাওয়া পরিপূর্ণ জ্ঞানের অধিকারী না হন তাহলে তিনি ভুল করবেন এবং তাঁর ভুলের দ্বারা উম্মাহকে ইহকালে ও পরকালে ক্ষতির মধ্যে নিক্ষেপ করবেন। অন্যথায় তাঁকে তাঁর চেয়ে বেশী জ্ঞানের অধিকারী ব্যক্তিদের পরামর্শ ও পথনির্দেশের ওপর নির্ভর করতে হবে। সে ক্ষেত্রে তা হবে তাঁর দুর্বলতার পরিচায়ক। কিন্তু রা ে র সর্বোচ্চ কেন্দ্র দুর্বল ও পরনির্ভরশীল হওয়া কাম্য নয়। তাছাড়া জ্ঞানের ক্ষেত্রে সর্বাগ্রগণ্য না হলে তিনি সঠিক ও ভুল পরামর্শের মধ্যে পার্থক্য করতে ও সঠিক পরামর্শ অনুসরণ করতে সক্ষম হবেন তারও নিশ্চয়তা নেই। শুধু তা- ই নয়, পদের মর্যাদা রক্ষার্থে তিনি তাঁর তুলনায় অধিকতর জ্ঞানী ব্যক্তিদের পরামর্শ গ্রহণ থেকে পুরোপুরিও বিরত থাকতে পারেন, বা সব সময় তা গ্রহণ না করে কখনো কখনো স্বীয় ভিত্তিহীন মতের অনুসরণ করতে পারেন।

অন্যদিকে ইমাম যদি পাপমুক্ত না হন তাহলে তিনি সকল ক্ষেত্রে আল্লাহর আইনের সঠিক বাস্তবায়ন করবেন না, সর্বাবস্থায় ন্যায়বিচার করবেন না, পক্ষপাতিত্ব থেকে মুক্ত থাকবেন না, বায়তুল মালের (রা ীয় কোষাগারের) সম্পদের ন্যায়সঙ্গত বণ্টন করবেন না। মোট কথা, পাপমুক্ত না হলে তিনি ইসলামের পূর্ণাঙ্গ প্রতিচ্ছবি রূপে নিজেকে পেশ করবেন না এবং নবীর যথার্থ উত্তরাধিকারী ও স্থলাভিষিক্ত হিসেবে নিজেকে অন্যদের সামনে দৃষ্টান্তে পরিণত করতে পারবেন না। ফলে তাঁর প্রশাসন যালেম, দুর্নীতিবায, চাটুকার ও স্বার্থান্বেষী আত্মসাৎকারীদের থেকে মুক্ত থাকার কোনোই নিশ্চয়তা থাকবে না।

এ প্রসঙ্গে উল্লেখ্য যে, ‘ইলমী যোগ্যতা ও পাপমুক্ততার বিষয়টি অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত। কারণ, কোনো ব্যক্তি পরিপূর্ণ দ্বীনী ‘ইলমের অধিকারী না হলে তার পক্ষে ছোট- বড় প্রতিটি ফরয ও হারাম সম্বন্ধে জানা না থাকার কারণে প্রতিটি ফরয আঞ্জাম দেয়া ও প্রতিটি হারাম থেকে বিরত থাকা সম্ভব নয়।

অবশ্য কেউ ‘ইলমের অধিকারী হলেই গুনাহ্ থেকে মুক্ত থাকবে তার নিশ্চয়তা নেই, কিন্তু ‘ইলমের অধিকারী না হলে গুরুদায়িত্ব কাঁধে বহনকারী ব্যক্তি কোনোভাবেই পাপমুক্ত থাকতে পারবে না।

এখন প্রশ্ন হচ্ছে, আমরা যদি মেনে নেই যে, ইমামের অর্থাৎ রাসূলুল্লাহ্ (ছ্বাঃ)-এর স্থলাভিষিক্তের জন্য পরিপূর্ণ দ্বীনী জ্ঞানের অধিকারী ও পাপমুক্ত হওয়া প্রয়োজন সে ক্ষেত্রে এ ধরনের ব্যক্তিকে বেছে নেয়ার দায়িত্ব কার? আল্লাহ্ই কি এ ধরনের ব্যক্তিকে মনোনীত করবেন, নাকি জনগণ তাকে বেছে নেবে?

আমরা লোকদের জ্ঞানের অধিকারী হওয়া-নাহওয়ার বিষয়টি মোটামুটি নির্ণয় করতে পারি, কিন্তু পাপমুক্ততার ক্ষেত্রে কারো প্রকাশ্যে পাপ না করা সম্বন্ধে জানতে পারলেও তার গোপন পাপ থাকলে তা জানা কেবল আল্লাহ তা‘আলার পক্ষেই সম্ভব।

এমতাবস্থায় বিচারবুদ্ধির দাবী হচ্ছে এই যে, স্বয়ং আল্লাহ্ তা‘আলার পক্ষ থেকে এ ধরনের ব্যক্তিকে বেছে নেয়া হলে তা হবে বান্দাহদের প্রতি বিরাট অনুগ্রহ। কিন্তু আল্লাহ্ তা‘আলা এ ধরনের কোনো ব্যক্তিকে বেছে নিয়ে নামোল্লেখপূর্বক মনোনয়ন দিয়েছেন কিনা তা যদি আমাদের জানা না থাকে তাহলে আমাদেরকে আল্লাহর কিতাব ও রাসূলের সুন্নাতে এতদসংক্রান্ত প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ পথনির্দেশ কী আছে তা দেখতে হবে এবং এতদুভয়ে নিহিত ইঙ্গিত যার বেলায় প্রযোজ্য তাঁকে খুঁজে বের করে তাঁকেই আল্লাহর পসন্দনীয় ব্যক্তি মনে করে তাঁর হাতে এ দায়িত্ব সোপর্দ করতে হবে। অর্থাৎ আল্লাহর কিতাব ও রাসূলের সুন্নাতে পরিপূর্ণ ‘ইলমের অধিকারী ব্যক্তির ও পাপমুক্ত ব্যক্তির কথা উল্লেখ থাকলে তা যার বেলায় প্রযোজ্য হয় তাঁকেই ইমাম ও শাসক হিসেবে বরণ করে নিতে হবে।[১২]

যদিও বিচারবুদ্ধির উপরোক্ত রায়ের সাথে দ্বিমত করার এবং অপেক্ষাকৃত কম জ্ঞানের অধিকারী ও পাপমুক্ততার নিশ্চয়তা বিহীন ব্যক্তিকে ইমাম ও শাসকের পদে বসানোর কোনো গ্রহণযোগ্যতা থাকতে পারে না তথাপি এ প্রসঙ্গে উত্থাপিত একটি প্রশ্নের জবাব পুরোপুরি এড়িয়ে যাওয়া ঠিক

হবে না, যদিও বিষয়টির সম্পর্ক অংশতঃ বিচারবুদ্ধির সাথে ও অংশতঃ ঐতিহাসিক তথ্যের সাথে।

বলা হয় যে, মুসলমানরা যদি তাদের নিজেদের জন্য ইমাম ও শাসক বেছে নেয় এবং তিনি যদি 'ইলমী দিক থেকে সর্বাগ্রগণ্য না- ও হন এবং পাপমুক্ততার নিশ্চয়তা না থাকলেও দৃশ্যতঃ তিনি পাপাচারী না হন, আর তিনি যদি কোরআন ও সুন্নাহর ভিত্তিতে তাদেরকে শাসন ও পরিচালনা করেন তাহলে তা- ই যথেষ্ট। অতএব, আল্লাহ্ তা'আলার পক্ষ থেকে কোনো ইমাম ও শাসক মনোনীত করা অপরিহার্য নয়।

এ যুক্তি এ কারণে গ্রহণযোগ্য নয় যে, উম্মাতের হেদায়াত ও পরিচালনার ক্ষেত্রে ইমাম বা শাসক কোনো প্রশ্নের বা সমস্যার সম্মুখীন হবার পর কোরআন ও সুন্নাহ্ থেকে তার জবাব বা সমাধান খুঁজে বের করবেন এবং এরপর সংশ্লিষ্ট প্রশ্নের জবাব বা উদ্ভূত সমস্যার সমাধান দেবেন - এর পরিবর্তে তাঁর মস্তিষ্কে ইতিমধ্যেই মওজূদ কোরআন- সুন্নাহর জ্ঞানের দ্বারা জবাব দেবেন এটাই হওয়া উচিত। অর্থাৎ ইমাম বা শাসকের কাছে জবাব বা সমাধান পূর্ব থেকেই মওজূদ থাকতে হবে। কারণ, ক্ষেত্রবিশেষে তাঁর কাছে সমাধান খোঁজার মতো যথেষ্ট সময় না- ও থাকতে পারে।

দ্বিতীয়তঃ রাসূলুল্লাহর (ছ্বাঃ) ইন্তেকালের পর কোরআন মজীদ যেভাবে লিপিবদ্ধ আকারে হাতের কাছে ছিলো সুন্নাহ্ কখনোই সেভাবে লিপিবদ্ধ আকারে মওজূদ ছিলো না। সুন্নাহ্ অনেক বিলম্বে এমন সময়ে ও এমন অবস্থায় লিপিবদ্ধ হয়েছে যখন তাতে অনেক মিথ্যার সংমিশ্রণ ঘটেছিলো। এমনকি কোরআন মজীদ লিপিবদ্ধ আকারে মওজূদ থাকলেও কতক ক্ষেত্রে তার ব্যাখ্যা রাসূলুল্লাহ্ (ছ্বাঃ)- এর কাছ থেকে জানা প্রয়োজন ছিলো। এমতাবস্থায়, ইমাম ও শাসক পদের জন্য রাসূলুল্লাহ্ (ছ্বাঃ)- এর কাছ থেকে কোরআন ও সুন্নাহর পূর্ণাঙ্গ জ্ঞান অর্জনকারী ব্যক্তির কোনো বিকল্প ছিলো না।[১৩]

অবশ্য সতর্কতার নীতির দাবীও এটাই ছিলো। কারণ, আল্লাহ্ তা'আলার পক্ষ থেকে নেতা ও শাসক মনোনীত না হয়ে থাকলেও মুসলমানদের জন্য উচিত ছিলো সেই ব্যক্তিকে এ দায়িত্ব

অর্পণ করা যার আল্লাহ্ কর্তৃক মনোনীত হওয়ার বিষয়টি নিশ্চিত না হলেও এর ‘সম্ভাবনা’ ছিলো। কারণ, হাদীছে গ্বাদীরে ব্যবহৃত “মাওলা” শব্দের উদ্দেশ্য যদি ‘বন্ধু’ হয়ে থাকে তাহলেও অন্য কারো পরিবর্তে হযরত ‘আলী (আঃ)কে এ দায়িত্বে অধিষ্ঠিত করায় কোনো সমস্যা ছিলো না। কিন্তু এর উদ্দেশ্য যদি ‘নেতা ও শাসক’ বুঝানো হয়ে থাকে তাহলে অন্যকে এ দায়িত্ব অর্পণ করা ঠিক হয় নি। আর সতর্কতার নীতির দাবী হচ্ছে দু’টি পন্থার যেটিতে ঝুঁকি নেই সেটি অনুসরণ করতে হবে।

ইমাম মাহ্দী সম্পর্কে মতপার্থক্য (আঃ)

শিয়া- সুন্নী নির্বিশেষে সকল মুসলমানই ‘শেষ যমানায়’ রাসূলে আকরাম হযরত মুহাম্মাদ (ছাল্লাঃ)-এর বংশে হযরত ইমাম মাহ্দীর (আঃ) ‘আবির্ভাব বা আত্মপ্রকাশ’ ও বিশ্ব ইসলামী হুকুমত প্রতিষ্ঠার ধারণা পোষণ করে। কিন্তু এতদসংক্রান্ত কতক বিষয়ে উভয় ধারার মতের মধ্যে পার্থক্য রয়েছে।

আল্লাহ্ তা‘আলা কর্তৃক মনোনীত বারো জন ইমামের ধারণা পোষণকারী শিয়া ধারার মতে, হযরত ইমাম মাহ্দী (আঃ) হলেন এ বারো জন ইমামের মধ্যকার সর্বশেষ ইমাম; তিনি এখন থেকে পৌনে বারশ’ বছর আগে (হিজরী ২৫৫ সালে) জন্মগ্রহণ করেছেন এবং পাঁচ বছর বয়স থেকে আত্মগোপন করে আছেন; আল্লাহ্ তাঁকে দীর্ঘজীবী করেছেন এবং যথাযথ ক্ষেত্র প্রস্তুত হবার পর তিনি আত্মপ্রকাশ করবেন। কিন্তু সুন্নী ধারার মতে, হযরত ইমাম মাহ্দী (আঃ) এখনো জন্মগ্রহণ করেন নি।

অনেক সময়, কারো পক্ষে হাজার বছরেরও বেশীকাল আয়ুর অধিকারী হওয়া সম্ভব কিনা - এ প্রশ্ন তোলা হয়। কিন্তু বিচারবুদ্ধির দৃষ্টিতে এ প্রশ্ন গুরুত্ব বহন করে না। কারণ, এটা সম্ভব হতেই পারে; ইতিহাসে এর চেয়েও দীর্ঘজীবী ব্যক্তিদের কথা উল্লিখিত আছে। হযরত নূহ্ (আঃ) কমবেশী হাজার বছর বেঁচে ছিলেন। হযরত খিযির্ (আঃ) এখনো বেঁচে আছেন বলে ইসলামের সকল ধারার অনুসারীদের বিশ্বাস - যার মানে তিনি তিন হাজার বছরেরও বেশীকাল যাবত বেঁচে আছেন।

অতএব, হযরত ইমাম হাসান্ ‘আসকারী (আঃ)-এর পুত্র ইমাম মাহ্দী কিনা - এটাই পর্যালোচনার বিষয়; তিনি ইমাম মাহ্দী হলে আল্লাহর ইচ্ছায় তাঁর হাজার বছরের বেশীকাল বেঁচে থাকা ও প্রকৃত পরিচয় গোপন রেখে সমাজে অবস্থান করা কোনো অস্বাভাবিক ব্যাপার নয়। তবে তিনিই ইমাম মাহ্দী কিনা - এটা সম্পূর্ণই সংশ্লিষ্ট হাদীছ সমূহের পর্যালোচনার মাধ্যমে

নিশ্চিত হতে হবে। এ ব্যাপারে বিচারবুদ্ধি স্বাধীনভাবে কোনো রায় দিতে পারে না, সংশ্লিষ্ট হাদীছ সমূহ পর্যালোচনার কাজে সাহায্য করতে পারে মাত্র।

তবে এ ব্যাপারে বিশেষভাবে লক্ষণীয় বিষয় হচ্ছে এই যে, মুসলমানদের দু'টি প্রধান ধারার মধ্যে শিয়া ধারার মতে, হযরত ইমাম মাহ্দী (আঃ) শৈশবে - পাঁচ বছর বয়সে তাঁর পিতার ইন্তেকালের সাথে সাথেই আত্মগোপন করেন এবং পরবর্তী ষাট বছর তাঁর পিতার চারজন ঘনিষ্ঠ শিষ্যের মাধ্যমে বাইরের লোকদের সাথে যোগাযোগ রাখতেন এবং এদের মধ্যকার সর্বশেষ ব্যক্তির ইন্তেকালের পর তিনি স্বীয় পরিচিতি সহকারে বাইরের লোকদের সাথে আর যোগাযোগ রাখেন না যদিও তিনি সমাজে স্বীয় মতামত পেশ করে থাকেন। তাই পঁয়ষট্টি বছর বয়সের পর থেকে আত্মপ্রকাশের পূর্ব পর্যন্ত তাঁর জীবনকালের ইতিহাস অজ্ঞাত রয়েছে এবং থাকবে।

এ 'আক্বীদাহ্ অনুযায়ী হযরত ইমাম মাহ্দী (আঃ) তাঁর প্রকৃত পরিচয় গোপন করে সমাজে বিচরণ করায় তাঁকে কেউ না চেনার কারণে তাঁর আনুষ্ঠানিক আবির্ভাবের পূর্বে তাঁকে গ্রহণ করা বা না করা নিয়ে মতপার্থক্য দেখা দিচ্ছে না।

অন্যদিকে সুন্নী ধারার মতে, হযরত ইমাম মাহ্দী (আঃ) এখনো জন্মগ্রহণ করেন নি। কিন্তু তিনি যখন জন্মগ্রহণ করবেন তখন থেকে আনুষ্ঠানিকভাবে নেতৃত্বের দাবীদার হবার তথা পারিভাষিক অর্থে আবির্ভাবের বা আত্মপ্রকাশের পূর্ব পর্যন্ত তাঁর জীবন কেমন হবে সে সম্পর্কে এ ধারার হাদীছ সমূহে কোনো বক্তব্য নেই। এ থেকেও তাঁর 'আত্মগোপন'- এর একটি পরোক্ষ ধারণা পাওয়া যায়, যদিও তা থেকে তাঁর জন্মকাল সম্বন্ধে কোনো ধারণা করা সম্ভব নয়।

ইমাম মাহ্দী (আঃ) সম্পর্কে উভয় ধারার তথ্যসূত্রাদি থেকে একটি বিষয় সুস্পষ্ট যে, তাঁকে গ্রহণ করা বা না করার প্রশ্নটি তাঁর আনুষ্ঠানিক আবির্ভাবের পরেই দেখা দেবে, তার আগে নয়। আর তাঁর গুণাবলী ও আবির্ভাব- পরবর্তী কর্মতৎপরতা সম্বন্ধে উভয় ধারার বর্ণনায় উল্লেখ করার মতো বড় ধরনের কোনো পার্থক্য নেই। ফলে হযরত ইমাম মাহ্দী (আঃ) জন্মগ্রহণ করেছেন অথবা করবেন এ সম্পর্কিত মতপার্থক্যের বিষয়টি বর্তমানে কেবল তাত্ত্বিক পর্যায়ে সীমাবদ্ধ; বর্তমানে বাস্তব জীবনে এ মতপার্থক্যের কোনো কার্যকরিতা নেই।

হযরত রাসূলে আকরাম (ছ্বাঃ)- এর পর্যায়ক্রমিক স্থলাভিষিক্ত হিসেবে আল্লাহ্ তা'আলার পক্ষ থেকে বারো জন মা'ছুম্ (নিষ্পাপ ও ভুলের উর্ধে) ইমাম মনোনীত হয়েছেন - এ 'আক্বীদাহ্ পোষণকারী শিয়া মাযহাবের অনুসারীরা চৌদ্দ জন মহান ব্যক্তিত্ব [বারো জন ইমাম, হযরত রাসূলে আকরাম (ছ্বাঃ) ও হযরত ফাতেমাহ্ ('আলাইহাস্ সালাম্)]কে নিষ্পাপ ও ভুলের উর্ধে বলে গণ্য করে থাকে। প্রশ্ন হচ্ছে, সুন্নী মাযহাবের অনুসারীরা তাঁদেরকে কোন্ দৃষ্টিতে দেখে থাকে?

শিয়া মাযহাবের দৃষ্টিতে যিনি ইমাম মাহদী (আঃ) তাঁর জন্মগ্রহণ ও বেঁচে থাকা সম্বন্ধে সুন্নী ধারার মধ্যে সংশয় রয়েছে। অন্য তেরো জন ব্যক্তিত্বকে সামগ্রিকভাবে সকল মুসলমানই ভক্তিশ্রদ্ধা করে ও ভালোবাসে। কিন্তু প্রশ্ন হচ্ছে, তাঁদের নিষ্পাপ ও ভুলের উর্ধে থাকা এবং মর্যাদা সম্বন্ধে আহলে সুন্নাতের ধারণা কী?

হযরত রাসূলে আকরাম (ছ্বাঃ) যে ছোট- বড় যে কোনো ধরনের গুনাহ্ ও ভুল থেকে মুক্ত ছিলেন এ ব্যাপারে শিয়া- সুন্নী নির্বিশেষে প্রায় সকল মুসলমানই একমত (যদিও অনেক পরবর্তীকালে সুন্নী ধারার মধ্য থেকে বিচ্ছিন্নভাবে কেউ কেউ এ ব্যাপারে দ্বিমত প্রকাশ করেছেন - যার পিছনে কোনো গ্রহণযোগ্য ভিত্তি না থাকায় তা আদৌ গুরুত্ব পাবার অধিকারী নয়)।

বাকী বারো জন মহান ব্যক্তিত্ব অর্থাৎ হযরত ফাতেমাহ্ (আঃ) ও আহলে বাইতের ধারার প্রথম এগারো জন ইমাম (আঃ) সম্পর্কে শিয়া ও সুন্নী ধারণার মধ্যে যে মতপার্থক্য রয়েছে তাত্ত্বিক দৃষ্টিতে তা একটি বড় ধরনের মতপার্থক্য হলেও সুন্নী সমাজের আচরণ সম্পর্কে গভীরভাবে তলিয়ে চিন্তা করলে দেখা যাবে যে, এ ব্যাপারে দুই ধারার মধ্যে ব্যবধান খুবই অল্প। কারণ, শিয়া মাযহাবের অনুসারীরা যেখানে উক্ত তেরো জন ব্যক্তিত্বকে গুনাহ্ ও ভুল থেকে খোদায়ী সংরক্ষণের অধিকারী মনে করে, সেখানে সুন্নী মাযহাবের অনুসারীরা একটি মূলনীতি হিসেবে তাঁদের জন্য এ ধরনের সংরক্ষণের ধারণা পোষণ না করলেও তাঁদের কাউকেই গুনাহর কাজ বা ভুল কাজ সম্পাদনকারী বলে মনে করে না।

সুন্নী মাযহাবের অনুসারীরা তাঁদের ব্যাপারে খুবই সতর্ক ও সশ্রদ্ধ আচরণ করে থাকে এবং তাঁদেরকে নীতিগতভাবে সমালোচনার উর্ধে গণ্য করাকে অপরিহার্য মনে না করলেও কার্যতঃ তাঁদের কারো সমালোচনা করে না। অর্থাৎ সুন্নী জগৎ তাত্ত্বিকভাবে তাঁদের জন্য গুনাহ্ ও ভুল থেকে মুক্ত থাকাকে অপরিহার্য গণ্য না করলেও কার্যতঃ তাঁদেরকে গুনাহ্ ও ভুল থেকে মুক্ত গণ্য করছে এবং কেউই তাঁদের সমালোচনা করছে না।

তাদের এ সতর্ক আচরণের পিছনে নিহিত কারণ অনুসন্ধান করলে কয়েকটি প্রধান কারণ পাওয়া যায়:

প্রথমতঃ তাঁরা হযরত রাসূলে আকরাম (ছ্বাঃ)- এর প্রিয়তম ব্যক্তিবর্গ ও তাঁদের বংশধর।

দ্বিতীয়তঃ তাঁদের মধ্যকার অন্ততঃ প্রথম চার ব্যক্তি [হযরত ফাতেমাহ্ 'আলী, হাসান ও হোসেন (আঃ)] রাসূলুল্লাহ্ (ছ্বাঃ)- এর আহলে বাইতের সদস্য - যে ব্যাপারে সমগ্র উম্মাহর মধ্যে ইজমা' রয়েছে এবং কোরআন মজীদে তাঁদের পবিত্রকরণের কথা বলা হয়েছে। আর নামাযের ভিতরে আালে মুহাম্মাদের ওপর ছ্বালাত্ প্রেরণ করা হয় - যাতে (বিশেষ করে হানাফী মাযহাবে) তাঁদেরকে আালে ইবরাহীমের সমমর্যাদা সম্পন্ন হিসেবে অর্থাৎ হযরত ইবরাহীম্ (আঃ)- এর বংশে আগত নবী- রাসূল ও ইমামগণের (আঃ) সমতুল্য হিসেবে উল্লেখ করা হয়।

তৃতীয়তঃ সুন্নী ধারার বিভিন্ন হাদীছে সমগ্র উম্মাহর মধ্যে ইহকালে ও পরকালে এ চার ব্যক্তির সর্বোচ্চ মর্যাদা ও তাঁদের প্রতি রাসূলুল্লাহ্ (ছ্বাঃ)- এর অবারিত ভালোবাসার কথা উল্লিখিত হয়েছে এবং সেই সাথে তাঁদের প্রতি ভালোবাসা পোষণের জন্য উম্মাহর প্রতি নির্দেশ দেয়া হয়েছে। এছাড়া হাদীছে বিশেষ করে হযরত ফাতেমাহ্ (আঃ)কে 'বেহেশতী নারীদের নেত্রী' এবং হযরত ইমাম হাসান ও হযরত ইমাম হোসেন (আঃ)কে 'বেহেশতী যুবকদের নেতা' বলে উল্লেখ করা হয়েছে - যা নিয়মিতভাবে জুমু'আহ্ ও ঈদের নামাযের খোত্ববায় অপরিহার্যভাবে উল্লেখ করা হয়। এছাড়া রাসূলুল্লাহ্ (ছ্বাঃ) নিজেকে জ্ঞানের নগরী ও হযরত 'আলী (আঃ)কে তার দরযা এবং 'আলীর (আঃ) সাথে তাঁর সম্পর্ককে হযরত হারূন্ (আঃ)- এর সাথে হযরত মূসা (আঃ)- এর সম্পর্কের অনুরূপ বলে উল্লেখ করেছেন।

চতুর্থতঃ হযরত ‘আলী (আঃ) থেকে শুরু করে হযরত ইমাম জা‘ফার্ ছ্বাদেক্ব (আঃ) পর্যন্ত আহলে বাইতের ধারার প্রথম ছয়জন ইমাম যে দ্বীনী ‘ইলম্ ও তাক্বওয়া- পরহেযগারীর দিক থেকে নিজ নিজ যুগে উম্মাহর মধ্যে শ্রেষ্ঠতম ও যোগ্যতম ব্যক্তি ছিলেন - এটা আহলে সুন্নাতের মধ্যে একটি সর্বজনবিদিত বিষয়। অন্যদিকে পরবর্তী পাঁচজন ইমাম সম্পর্কে সুন্নী ধারার সাধারণ মানুষ তেমন কিছু না জানলেও এ ধারার ওলামায়ে কেরাম তাঁদের সম্পর্কেও যথেষ্ট ভক্তি- শ্রদ্ধা পোষণ করেন।

পঞ্চমতঃ সুন্নী ধারার প্রধান চার মাযহাবের মধ্য থেকে প্রথম দুই মাযহাব্ যাদের নামে পরিচিত অর্থাৎ হযরত ইমাম আবূ হানীফাহ্ ও হযরত ইমাম মালেক ছিলেন হযরত ইমাম জা‘ফার্ ছ্বাদেক্বের শিষ্য এবং হযরত ইমাম শাফে‘ঈ ও হযরত ইমাম আহমাদ্ ইবনে হাম্বাল ছিলেন ইমাম মালেকের শিষ্য ও প্রশিষ্য। আর বিশেষভাবে ইমাম আবূ হানীফাহ্ ইমাম জা‘ফার্ ছ্বাদেক্ব (আঃ)কে স্বীয় যুগের শ্রেষ্ঠতম আলেম হিসেবে প্রশংসা করেছেন এবং তাঁর কাছ থেকে অর্জিত ‘ইলম্- কে স্বীয় একমাত্র ‘ইলমী সম্বল হিসেবে উল্লেখ করেছেন। এছাড়া ইমাম শাফে‘ঈ আহলে বাইতের প্রতি বিস্ময়করভাবে গভীর মহব্বত প্রকাশ করেছেন।

ষষ্ঠতঃ মুতাওয়াতির্ হিসেবে পরিগণিত না হলেও সুন্নী ধারার কতক হাদীছে বারো জন ইমামের নামোল্লেখ থাকার কারণে তাঁদের আল্লাহর পক্ষ থেকে মনোনীত ইমাম হওয়ার বিষয়টিকে সুন্নী ওলামায়ে কেরাম ‘অসম্ভব’ মনে করেন না।

এক হিসেবে, আহলে বাইতের (আঃ) ধারার ইমামগণের গুনাহ্ ও ভুল হতে মুক্ত থাকা প্রশ্নে শিয়া মাযহাবের ‘আক্বীদাহর চেয়ে সুন্নী মাযহাবের ধারণা ও আচরণের বাস্তব গুরুত্ব অনেক বেশী। কারণ, সুন্নীদের আচরণ থেকে নিষ্পন্ন ধারণা অনুযায়ী তাঁরা গুনাহ্ ও ভুল থেকে খোদায়ী সংরক্ষণের অধিকারী না থাকা সত্ত্বেও নিজ নিজ গুণাবলীর কারণে গুনাহ্ ও ভুল থেকে মুক্ত ছিলেন। (কিন্তু দুর্ভাগ্যজনক যে, তাঁদের প্রতি এতো ভক্তি- শ্রদ্ধা পোষণ সত্ত্বেও আহলে সুন্নাত্ তাঁদেরকে অনুসরণ করছে না।)

এ হচ্ছে আহলে বাইতের (আঃ) ধারার ইমামগণ সম্বন্ধে সুন্নী জগতের সাধারণ ধারণা ও আচরণ। এর পাশাপাশি সুন্নী জগতের ‘ইরফানী (আধ্যাত্মিক) ধারাগুলোর মধ্যে ব্যতিক্রম হিসেবে

দু'একটি বাদে প্রায় সবগুলোরই সিলসিলাহ্ (ধারাবাহিকতা) উক্ত ইমামগণের কারো না কারো মাধ্যমে ও তাঁর পূর্ববর্তীদের হয়ে হযরত 'আলী ও হযরত ফাতেমাহ্ (আঃ)- এর মাধ্যমে হযরত রাসূলে আকরাম (ছ্বাঃ) পর্যন্ত পৌঁছেছে। অর্থাৎ সুন্নী জগতের আধ্যাত্মিক ধারাগুলো উক্ত ইমামগণের ইমামতকে রাজনৈতিক ও ফিক্বহী দিক থেকে বিবেচনা না করে 'ইরফানী দিক থেকে বিবেচনা করেছে এবং তাঁদেরকে হযরত রাসূলে আকরাম (ছ্বাঃ)- এর আধ্যাত্মিক উত্তরাধিকারী গণ্য করেছে।

অন্যদিকে বিরল ব্যতিক্রম বাদে সাধারণভাবে সুন্নী জগৎ প্রথম চারজন খলীফাহকে খলীফায়ে রাশেদ (সঠিক পথের অনুসারী খলীফাহ্) বলে গণ্য করে এবং তাঁদের অন্যতম হিসেবে হযরত আলী (আঃ)- কেও খলীফায়ে রাশেদ বলে গণ্য করে। এছাড়া বিরল ব্যতিক্রম বাদে তাদের প্রায় সকলেই হযরত ইমাম হাসান ও হযরত ইমাম হোসেন (আঃ)কে দ্বীনী যোগ্যতার মানদণ্ডে স্বীয় যুগে খেলাফতের একমাত্র যোগ্য ব্যক্তি ও হক্বদার বলে মনে করে।

হযরত ইমাম আবূ হানীফাহ্ ও প্রথম দিকে হযরত ইমাম মালেকও উমাইয়াহ্ ও 'আব্বাসী খলীফাদেরকে অবৈধ শাসক বলে গণ্য করতেন এবং আহলে বাইতের ধারাবাহিকতায় তাদের বিরুদ্ধে যে ক'টি বিদ্রোহ সংঘটিত হয় সেগুলোকে বৈধ বলে ফত্ওয়া দেন এবং বিশেষ করে ইমাম আবূ হানীফাহ্ বিপ্লবীদেরকে আর্থিক সাহায্য দেন। 'আব্বাসী খেলাফতের সাথে সহযোগিতা না করা ও তাদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহে সমর্থন ও সহযোগিতার কারণে তাঁরা সরকারের আক্রোশের শিকার হন; ইমাম মালেককে নির্যাতনের শিকার হতে হয় এবং ইমাম আবূ হানীফাহকে কারারুদ্ধ করে বিষপ্রয়োগে হত্যা করা হয়। অর্থাৎ হযরত রাসূলে আকরাম (ছ্বাঃ)- এর স্থলাভিষিক্ততার ক্ষেত্রে প্রথম তিন খলীফাহর বিষয়টির ব্যতিক্রম বাদে তাঁদের নীতিগত অবস্থান ছিলো আহলে বাইতের ইমামগণের নীতিগত অবস্থানের খুবই কাছাকাছি, বরং বলা যেতে পারে যে, অভিন্ন।[১৫]

আমাদের উপরোক্ত আলোচনা থেকে সুস্পষ্ট যে, আহলে বাইতের ইমামগণের (আঃ) আল্লাহর পক্ষ থেকে মনোনীত ইমাম হওয়া প্রশ্নে সুন্নী জগতের ওলামায়ে কেরাম শতকরা একশ' ভাগ

নিশ্চিত না হলেও তাঁদের আচরণ ও এ আচরণের পিছনে নিহিত কারণগুলো থেকে প্রতীয়মান হয় যে, তাঁরা এ ব্যাপারে 'শক্তিশালী সম্ভাবনা'র ধারণা পোষণ করতেন ও করে থাকেন - যা ইয়াক্বীনের কাছাকাছি। অর্থাৎ আহলে বাইতের ধারাবাহিকতার ইমামগণ সম্পর্কে শিয়া ও সুন্নী 'আক্বীদাহর মধ্যে কার্যতঃ বা আচরণগত দিক থেকে তেমন কোনো পার্থক্য নেই।

অবশ্য প্রথম তিন জন খলীফাহর মর্যাদা সম্বন্ধে দুই ধারার মধ্যে মতপার্থক্য রয়েছে। তা হচ্ছে, সুন্নী ধারা যেখানে প্রথম চারজন খলীফাহকেই বৈধ ও সঠিক পথানুসারী খলীফাহ্ বলে গণ্য করে থাকে (যা নেহায়েতই ভক্তি ও ভালোবাসা থেকে উৎসারিত ধারণা - যার পিছনে কোনো অকাট্য তাত্ত্বিক ভিত্তি নেই), সেখানে শিয়া ধারা প্রথম তিন খলীফাহকে বৈধ মনে করে না। তাদের মতে, যেহেতু হযরত আলী (আঃ) ছিলেন আল্লাহ্ তা'আলা কর্তৃক মনোনীত ও হযরত রাসূলে আকরাম (ছ্বাঃ) কর্তৃক ঘোষিত প্রথম খলীফাহ্, সেহেতু তাঁকে পাশ কাটিয়ে পর পর তিন জন যে খলীফাহ্ হয়েছিলেন তাঁদের সে খেলাফত বৈধ ছিলো না। এ ব্যাপারে শিয়াদের মধ্যকার কতক লোক অনেক সময় অত্যন্ত কঠোর মন্তব্য করে থাকে। কিন্তু এ ব্যাপারে শিয়া মাযহাবের অনুসারী সকলের আচরণ অভিন্ন নয়। যেমন: শিয়া মাযহাবের একটি শাখা যায়দী শিয়ারা প্রথম দুই খলীফাহর খেলাফতকে বৈধ গণ্য করে।

তবে প্রথম তিন খলীফাহর ব্যাপারে সাম্প্রতিককালে শিয়া মাযহাবের প্রধান উপধারা ইছনা' 'আশারিয়াহ্ বা বারো ইমামী ধারার ওলামায়ে কেরামের একটা উল্লেখযোগ্য অংশ একটি ভারসাম্যপূর্ণ তত্ত্ব উপস্থাপন করেছেন। তাঁদের মতে, আল্লাহর পক্ষ থেকে মনোনীত ইমামের কার্যতঃ খেলাফতের দায়িত্বে অধিষ্ঠানের বিষয়টি জনগণ কর্তৃক ইমামকে ইমাম হিসেবে চিনতে পারা ও বরণ করে নেয়ার ওপর নির্ভরশীল। কারণ, কারো জন্য ইমামকে ইমাম হিসেবে গ্রহণ করে নেয়া তখনই অপরিহার্য হয় যখন এ ব্যাপারে তার জন্য ইতমামে হু াত্[১৬] হয়। এ কারণেই হযরত আলী (আঃ) কেবল তখনই খেলাফতের দায়িত্ব গ্রহণ করেন যখন জনগণ তাঁকে এ দায়িত্বের জন্য উপযুক্ততম ব্যক্তি হিসেবে চিনতে পারে ও খলীফাহ্ হিসেবে বরণ করে নেয়। একই কারণে তিনি নিজেকে খেলাফতের হক্বদার জানা সত্ত্বেও প্রথম তিন খলীফাহর সাথে

সহযোগিতা করেছেন। আর যেহেতু তিনি নিজে তাঁদেরকে মেনে নেন ও তাঁদের সাথে সহযোগিতা করেন সেহেতু শিয়াদের জন্য তাঁদের সম্পর্কে অসম্মানজনক কথা বলা ঠিক হবে না, বরং সসম্মানে ‘ইলমী আলোচনা করতে হবে। বর্তমানে শিয়াদের মধ্যে এ ধারণা পোষণকারীদের প্রভাব দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে।

অতএব, দেখা যাচ্ছে যে, ইমামত ও খেলাফত প্রশ্নে শিয়া ও সুন্নীদের মধ্যকার চৈন্তিক ও আচরণগত উভয় ক্ষেত্রেই ব্যবধান যতো বেশী মনে করা হয়, আসলে ততো বেশী নয়। তবে আহলে বাইতের (আঃ) ইমামগণ সম্পর্কে সুন্নী জগতের ‘আক্বীদাহ্ ‘আল্লাহ্ কর্তৃক মনোনীত নিষ্পাপ ও ভুলমুক্ত ইমাম’-এর ‘আক্বীদাহর কাছাকাছি হওয়া সত্ত্বেও সুন্নী মাযহাবগুলোর প্রতিষ্ঠাতাগণ সতর্কতার নীতির দাবী অনুযায়ী উক্ত ইমামগণের অনুসরণ না করে তাঁদের ধারার বাইরে কেন স্বত ফিক্বহী ধারা বা মাযহাব্ গড়ে তুললেন এটা একটা বিরাট প্রশ্ন বটে। এ প্রশ্নের সংক্ষিপ্ত জবাব হচ্ছে এই যে, তাঁরা সম্ভবতঃ সমকালীন যালেম স্বৈরাচারী সরকারের যুলুম-নির্যাতন হতে নিরাপদ থাকার লক্ষ্যে এ পথ বেছে নিয়েছিলেন। কিন্তু দুর্ভাগ্যজনক বিষয় যে, পরবর্তীকালে তাঁদের ধারার আলেমগণের অনেকে মাযহাবী তিক্ততা ও বিরোধ সৃষ্টির পথ বেছে নেন।

এ প্রসঙ্গে আরেকটি বিষয়ের ওপর আলোকপাত করা প্রয়োজন বলে মনে হয়। তা হচ্ছে, শিয়া মাযহাবের উদ্ভব সম্পর্কে সুন্নী জগতে একটি ব্যাপক প্রচারণা হচ্ছে এই যে, শিয়া মাযহাবের উদ্ভবের সাথে আহলে বাইতের (আঃ) কোনো সম্পর্ক নেই; ‘আবদুল্লাহ্ ইবনে সাবা’ নামে জনৈক ইয়াহূদী ষড়য মূলকভাবে ইসলাম গ্রহণ করে মুসলমানদের বিভক্ত করার লক্ষ্যে শিয়া মাযহাব্ গঠন করে; তৃতীয় খলীফাহর বিরুদ্ধে বিদ্রোহও সে-ই সংগঠিত করেছিলো। অন্যদিকে রাসূলুল্লাহ্ (ছ্বাঃ)-এর আহলে বাইতের ধারার ইমামগণ (আঃ) সম্বন্ধে বলা হয় যে, তাঁরা আহলে সুন্নাতেরই বুযুর্গ ব্যক্তি ছিলেন।

এ সম্পর্কে অত্যন্ত সংক্ষেপে বলতে হয় যে, ‘আব্দুল্লাহ্ ইবনে সাবা’ একটি কল্পিত চরিত্র। কারণ, সর্বপ্রথম মাত্র একজন বর্ণনাকারী - সাইফ্ বিন্ ‘উমার্- তার কথা বলেছে। আর সাইফ্

বিন্ ‘উমার্ ছিলো মিথ্যা রচনাকারী। কারণ, বহু ঐতিহাসিক ঘটনার ক্ষেত্রেই তার বর্ণনা অন্যান্য বর্ণনাকারীর বর্ণনার সাথে মিলে না। তাছাড়া ‘আব্দুল্লাহ্ ইবনে সাবা’কে সে যে ধরনের বীর নায়ক হিসেবে চিত্রিত করেছে এবং তার নামে যে সব কাহিনী রচনা করেছে সে ধরনের বিখ্যাত ‘ঐতিহাসিক’ চরিত্র ও ঘটনার ক্ষেত্রে একজনমাত্র বর্ণনাকারীর বর্ণনা গ্রহণযোগ্য নয়। তাছাড়া তাকে তৃতীয় খলীফাহর বিরুদ্ধে বিদ্রোহের সংগঠক বলা হয়েছে অথচ এ বিদ্রোহে অনেক শীর্ষস্থানীয় ছ্বাহাবী অংশগ্রহণ করেন এবং তার উস্কানিতে তাঁরা এতে অংশ নেন বলে দাবী করা মানে তাঁদের মর্যাদা, ব্যক্তিত্ব ও বিবেচনাকে অবমাননা করা। আরো দাবী করা হয়েছে যে, হযরত ‘আলী (আঃ) তাকে হত্যা করেন। তাহলে এরপর আর কথিত তার প্রচলিত মাযহাব টিকে থাকার কথা নয়।

দ্বিতীয়তঃ যদি মেনে নিতে হয় যে, শিয়া মাযহাবের সাথে আহলে বাইতের ইমামগণের সম্পর্ক নেই এবং তাঁরা আহলে সুন্নাতের বুযুর্গ ছিলেন তাহলে প্রশ্ন ওঠে যে, সুন্নী ধারার মধ্যে তাঁদের বিশেষ করে হযরত ইমাম জা‘ফার্ ছ্বাদেক্ব (আঃ)- এর ফিক্বাহ্ কোথায়। অর্থাৎ আহলে বাইতের ইমামগণ আহলে সুন্নাতের বুযুর্গ ছিলেন - এ দাবী একটি গোঁজামিল ছাড়া আর কিছু নয়।

রাসূলুল্লাহর (ছ্বাঃ) স্থলাভিষিক্ততা বিতর্কের প্রায়োগিক গুরুত্ব

হযরত রাসূলে আকরাম (ছ্বাঃ)- এর স্থলাভিষিক্ত ব্যক্তি কে হবেন এ বিষয়টির গুরুত্ব দু'টি কারণে: কোরআন মজীদের ব্যাখ্যা- বিশ্লেষণ তথা দ্বীনী জিজ্ঞাসাসমূহের সঠিক জবাব প্রদান ও উম্মাহর শাসনকর্তৃত্ব পরিচালনা। ইমাম বা শাসক যদি আল্লাহর পক্ষ থেকে মনোনীত হন তাহলে এ উভয় ক্ষেত্রেই তাঁর এখতিয়ার চূড়ান্ত, কিন্তু তিনি যদি জনগণের দ্বারা নির্বাচিত হন তাহলে তাঁর এখতিয়ার কেবল শাসনকর্তৃত্বের মধ্যেই সীমাবদ্ধ; দ্বীনী জিজ্ঞাসাসমূহের জবাবদানের ক্ষেত্রে 'শাসক হিসেবে' তাঁর কোনোই এখিতয়ার থাকতে পারে না। সে ক্ষেত্রে এ দায়িত্ব পুরোপুরিই উপযুক্ত ওলামায়ে কেরামের। তবে স্বয়ং শাসকও যদি আলেম হন সে ক্ষেত্রে তিনিও একজন আলেম হিসেবে দ্বীনী জিজ্ঞাসার ক্ষেত্রে স্বীয় মতামত ব্যক্ত করবেন, কিন্তু তা সকলের জন্য মেনে নেয়া অপরিহার্য হবে না।

শিয়া মাযহাবের 'আক্বীদাহ্ অনুযায়ী যে বারো জন ইমাম আল্লাহর পক্ষ থেকে মনোনীত তাঁদের মধ্য থেকে এগারো জন দুনিয়া থেকে বিদায় নিয়েছেন এবং সর্বশেষ ইমাম হযরত মাহদী (আঃ) আত্মগোপনরত অবস্থায় আছেন। ফলে আজকের দিনে তাঁদের শাসনকর্তৃত্বের বিষয়টি আর প্রাসঙ্গিক নেই।

অন্যদিকে দ্বীনী জিজ্ঞাসাসমূহের ক্ষেত্রে হযরত রাসূলে আকরাম (ছ্বাঃ)- এর হাদীছ সমূহ ও তাঁর আহলে বাইতের ধারায় আগত ইমামগণের (আঃ) বর্ণিত হাদীছ ও প্রদত্ত মতামত পুরোপুরি মওজূদ রয়েছে। অবশ্য রাসূলুল্লাহ্ (ছ্বাঃ)- এর হাদীছ ও আহলে বাইতের ইমামগণের (আঃ) উক্তির সাথে তাঁদের নামে রচিত অনেক মিথ্যাও মিশ্রিত রয়েছে। এমতাবস্থায় যথাযথ যোগ্যতাসম্পন্ন ওলামায়ে কেরামের তথা মুজতাহিদগণের দায়িত্ব হচ্ছে সত্যানুসন্ধানী মন নিয়ে গবেষণা করে যে সব হাদীছ ও মতামত যথার্থই তাঁদের কাছ থেকে এসেছে সেগুলো উদঘাটন করা।

দ্বীনী তথ্যসূত্রসমূহের ক্রমবিন্যাস ও অগ্রাধিকার

এ ক্ষেত্রে মুজতাহিদ-গবেষকগণের জন্য সর্বাগ্রে দ্বীনী তথ্যসূত্র সমূহের ক্রমবিন্যাস ও অগ্রাধিকারের বিষয়টি সম্পর্কে ফয়সালা করা অপরিহার্য। এ ক্ষেত্রে আমরা মনে করি তথ্যসূত্রাদির ক্ষেত্রে যেহেতু নিম্নোক্ত ক্রমবিন্যাসে কোনোরূপ একদেশদর্শিতার স্থান নেই সেহেতু এগুলো সকলের কাছে সমভাবে গ্রহণীয়:

(**১**) **'আক্বল্।**

আমরা ইতিপূর্বে যেমন উল্লেখ করেছি, 'আক্বল্ হচ্ছে সমগ্র মানবজাতির জন্য সমভাবে গ্রহণযোগ্য অভিন্ন মানদণ্ড এবং এর ভিত্তিতেই একজন অমুসলিম ইসলাম গ্রহণ করে। এমতাবস্থায় 'আক্বল্ হচ্ছে ইসলামের ভিত্তি এবং কোনো অবস্থায়ই তাকে উপেক্ষা করা যাবে না। বিশেষ করে যেখানে মতপার্থক্য দেখা দেবে সেখানে 'আক্বল্-এর রায়কে অবশ্যই অগ্রাধিকার দিতে হবে। 'আক্বাএদের মৌলিক বিষয়গুলোর (তাওহীদ, আখেরাত ও খাতমে নবুওয়াত) ফয়সালা 'আক্বলের দ্বারা করার পরবর্তী স্তরে কোরআন মজীদের তাৎপর্য গ্রহণ ও ইজতিহাদের ক্ষেত্রে 'আক্বল্-কে সহায়ক এবং মতপার্থক্যের ক্ষেত্রে নির্ধারক হিসেবে গ্রহণ করতে হবে। 'আক্বলের সঠিক ব্যবহারের লক্ষ্যে মুজতাহিদকে যুক্তিবিজ্ঞান, অবিতর্কিত মৌলিক দর্শন ও জ্ঞানতত্ত্বের সাথে ভালোভাবে পরিচিত হতে হবে।

(**২**) **কোরআন মজীদ**

কোরআন মজীদ থেকে সঠিক তাৎপর্য গ্রহণের লক্ষ্যে একজন আলেমকে অবশ্যই কোরআন নাযিলকালীন আরবী ভাষা ও তাৎপর্যবিজ্ঞানের সাথে ভালোভাবে পরিচিত হতে হবে। সেই সাথে তাঁকে তৎকালীন আরবের ও বিশ্বের সমাজপরিবেশ ও সভ্যতা-সংস্কৃতি সম্পর্কে যথেষ্ট ধারণার অধিকারী হতে হবে। এছাড়া কোরআন মজীদের আয়াত থেকে 'আক্বাএদের অকাট্য 'আক্বলী ভিত্তির সাথে সাংঘর্ষিক কোনো তাৎপর্য গ্রহণ করা যাবে না; এ ধরনের কোনো দৃশ্যতঃ স্ববিরোধী বক্তব্য পেলে তার সঠিক তাৎপর্য উদঘাটনের জন্য ব্যাপকভাবে অনুসন্ধান করতে হবে।[১৭]

(৩) **মুতাওয়াতির্ হাদীছ।**

(৪) **ইজমা‘এ উম্মাহ্।**

এ চারটি তথ্যসূত্র ব্যবহার করার পর আর ‘আক্বাএদের কোনো গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে এবং ফরয ও হারাম সংক্রান্ত কোনো বিষয়ে মতপার্থক্য থাকার কোনো কারণ নেই। অতঃপর মুস্তাহাব ও মাকরূহ্ সহ গৌণ বিষয়াদিতে ফয়সালায় উপনীত হওয়ার ক্ষেত্রে হযরত রাসূলে আকরাম (ছ্বাঃ)-এর নামে বর্ণিত হাদীছ ও তাঁর আহলে বাইতের ধারাবাহিকতায় আগত ইমামগণের (আঃ) মতামত ব্যবহার করতে হবে।

এ ক্ষেত্রে কয়েকটি মূলনীতি অনুসরণ করা প্রয়োজন। তা হচ্ছে:

(১) রাসূলুল্লাহ্ (ছ্বাঃ) ও আহলে বাইতের কোনো ইমামের (আঃ) নামে বর্ণিত যে কোনো কথাই অকাট্যভাবেই রাসূলুল্লাহ্ (ছ্বাঃ) বা ইমামের বর্ণিত হওয়া অপরিহার্য নয়। অতএব, চার অকাট্য তথ্যসূত্রের কোনোটির সাথে সাংঘর্ষিক হলে তা গ্রহণ করা যাবে না।

(২) বর্ণনাকারী (রাভী)দের গ্রহণযোগ্যতা বিচার সাপেক্ষে গ্বায়রে মুতাওয়াতির্ বর্ণনার ক্ষেত্রে প্রতিটি স্তরে তুলনামূলকভাবে অধিক সংখ্যক বর্ণনাকারীর বর্ণনাকে অগ্রাধিকার দিতে হবে।

(৩) বর্ণনার স্তরসংখ্যা কম হলে সে বর্ণনাকে বেশী স্তরসংখ্যা বিশিষ্ট বর্ণনার ওপর অগ্রাধিকার দিতে হবে।

(৪) যেহেতু আহলে সুন্নাতের দৃষ্টিতে রাসূলুল্লাহ্ (ছ্বাঃ)-এর আহলে বাইতের ধারাবাহিকতার ইমামগণের (আঃ) আল্লাহর পক্ষ থেকে মনোনীত এবং পাপ ও ভুলের উর্ধে হওয়ার বিষয়টি নিশ্চিত না হলেও এর সম্ভাবনা উড়িয়ে দেয়া যায় না এবং কার্যতঃ তাঁদের কারো ওপরে গুনাহ্ ও ভুলকরণ আরোপিত হয় নি সেহেতু সতর্কতার নীতি অনুযায়ী তাঁদের কথাকে অকাট্যভাবে সত্য ও গ্রহণীয় বলে গণ্য করতে হবে। এর প্রায়োগিক দিক হচ্ছে এই যে, হাদীছ ও রেওয়াইয়াতের (বর্ণনার) স্তর গণনার ক্ষেত্রে হাদীছে রাসূলের (ছ্বাঃ) বেলায় যেমন প্রথম বর্ণনাকারী (ছ্বাহাবী) থেকে গণনা ও বর্ণনাকারী বিচার করতে হবে ঠিক সেভাবেই ইমামের (আঃ) উক্তির বেলায়ও ইমামের পর থেকে প্রথম বর্ণনাকারী হতে বর্ণনাস্তর গণনা ও বর্ণনাকারী বিচার করতে হবে।

(৫) যেহেতু আহলে বাইতের যে কোনো ইমাম তথ্যসূত্র উল্লেখ করে বা না করে যা কিছু বর্ণনা করেছেন তার সবই সরাসরি বা পূর্ববর্তী ইমামগণের মাধ্যমে রাসূলুল্লাহ্ (ছ্বাঃ) থেকে প্রাপ্ত বর্ণনা বলে দাবী করেছেন তাঁদের কার্যতঃ পাপমুক্ততার বিষয়টি বিবেচনা করে সে সব বর্ণনাকে ঐ অর্থেই গ্রহণ করতে হবে এবং এ কারণে রাসূলুল্লাহ্ (ছ্বাঃ)- এর নামে বর্ণিত কোনো খবরে ওয়াহেদ হাদীছের সাথে তার সাংঘর্ষিকতার ক্ষেত্রে অন্যান্য মানদণ্ডে (যেমন: বর্ণনাকারীদের স্তরসংখ্যা ও তাঁদের নির্ভরযোগ্যতা) বিচার করে এতদুভয়ের মধ্যে অগ্রাধিকার নির্ধরণ করতে হবে।

(৬) আহলে বাইতের যে কোনো ইমামের (আঃ) কোনো মতামত যদি সুস্পষ্টতঃই তাঁর একান্ত ব্যক্তিগত মতামত বলে প্রতীয়মান হয় সে ক্ষেত্রেও অন্যান্য ইসলামী মনীষীর মতামতের ওপর তাঁর মতকে অগ্রাধিকার দিতে হবে।

(৭) পরস্পর বিরোধী ধারার মধ্যে কোনো ধারার হাদীছ ও রেওয়াইয়াতে অন্য ধারার সপক্ষে কোনো বক্তব্য থাকলে তাকে বিশেষ গুরুত্ব প্রদান করতে হবে।

উক্ত মূলনীতিসমূহ - যা সকলের ক্ষেত্রে অভিন্ন - মেনে চলা হলে অতঃপর দ্বীনী জিজ্ঞাসাসমূহের জবাবের ক্ষেত্রে কোনো গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে মতপার্থক্যের কারণ নেই।[১৮]

ইমাম মাহদী এর আবির্ভাবপূর্ব দ্বীনী নেতৃত্ব -(আঃ)

হযরত ইমাম মাহদী (আঃ) - তা তিনি জন্মগ্রহণ করে থাকুন বা না- ই করে থাকুন - আবির্ভূত না হওয়ায় বা আত্মপ্রকাশ না করায় এবং জনসমক্ষে উপস্থিত হয়ে নেতৃত্ব ও শাসনকর্তৃত্ব দাবী না করায় তাঁর নেতৃত্ব ও শাসনকর্তৃত্ব মেনে নেয়ার বিষয়টি বর্তমানে শিয়া- সুন্নী উভয়ের জন্য প্রায় অভিন্ন রূপ পরিগ্রহ করেছে। এমতাবস্থায় অধিকতর গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন হচ্ছে চার খলীফাহ্ ও আহলে বাইতের ইমামগণ - উভয়ের অনুপস্থিতিতে আজকের দিনে মুসলিম উম্মাহর নেতৃত্ব ও শাসন- কর্তৃত্বের প্রশ্নটির সমাধান কীভাবে করণীয়।

এ প্রশ্নটি তাত্ত্বিক ছাঁচে ফেলে উপস্থাপন করতে হলে বলতে হবে যে, আজকে সুন্নীদের সামনে প্রশ্ন: হযরত রাসূলে আকরাম (ছ্বাঃ)- এর অবর্তমানে উম্মাহর পথনির্দেশ, নেতৃত্ব ও শাসন- কর্তৃত্বের দায়িত্ব ও অধিকার কা'র? তেমনি শিয়াদের সামনে প্রশ্ন: হযরত ইমাম মাহদী (আঃ)- এর অনুপস্থিতিকালে উম্মাহর পথনির্দেশ, নেতৃত্ব ও শাসন- কর্তৃত্বের দায়িত্ব ও অধিকার কা'র?এ প্রশ্নের জবাবে সুন্নীদের অনেকের মনে হতে পারে যে, রাসূলুল্লাহ্ (ছ্বাঃ)- এর অবর্তমানে উম্মাহর নেতৃত্বের দায়িত্ব চার খলীফাহর তথা চার খলীফাহ্ ছিলেন রাসূলুল্লাহ্ (ছ্বাঃ)- এর পর্যায়ক্রমিক উত্তরাধিকারী। আবার কেউবা তাত্ত্বিকভাবে ছ্বাহাবী, তাবে'ঈন্ ও তাবে' তাবে'ঈন্- কে রাসূলুল্লাহ্ (ছ্বাঃ)- এর পর্যায়ক্রমিক উত্তরাধিকারী বলে মনে করতে পারে। কিন্তু এ ধরনের জবাব উক্ত প্রশ্নের তাত্ত্বিক জবাব হিসেবে গণ্য হতে পারে না। বরং এর জবাব হতে হবে একটি ব্যক্তিনিরপেক্ষ জবাব; চার খলীফাহকে বাস্তব প্রায়োগিক ক্ষেত্রে উক্ত জবাবে প্রাপ্তব্য কাঠামোর আওতায় ফেলার চেষ্টা করা যেতে পারে। দ্বিতীয়তঃ ছ্বাহাবী, তাবে'ঈন্ বা তাবে' তাবে'ঈনের মতো সুনির্দিষ্ট কয়েকটি প্রজন্মের ব্যক্তিগণও এ প্রশ্নের জবাব হতে পারেন না। বরং

এর জবাব হতে হবে এমন একটি তাত্ত্বিক জবাব যা ক্বিয়ামত পর্যন্ত প্রযোজ্য হবার উপযোগী - যে কাঠামোতে উক্ত তিনটি প্রজন্ম থেকেও উপযুক্ত নেতৃত্ব পাওয়া যেতে পারে।

এ ক্ষেত্রে বিচারবুদ্ধির রায় এই যে, যিনি বা যারা আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের (ছ্বাঃ) আদেশ- নিষেধ ও পথনির্দেশ সম্বন্ধে তথা ইসলামের সকল দিক- বিভাগ সম্বন্ধে পুরোপুরি অবগত তিনি বা তাঁরাই উম্মাহকে নেতৃত্ব ও পথনির্দেশ দেবেন এবং উম্মাহর শাসনকর্তৃত্ব পরিচালনা করবেন; এটা একই সাথে তাঁর বা তাঁদের কর্তব্য ও অধিকার দুইই। আর শিয়া মাযহাবের দৃষ্টিকোণ থেকে বিবেচনা করলে হযরত ইমাম মাহদী (আঃ)- এর আত্মগোপনে থাকার যুগে নেতৃত্ব ও শাসনকর্তৃত্বের প্রশ্নের জবাবও এটাই।

অবশ্য, ইতিপূর্বেও যেমন উল্লেখ করা হয়েছে, এ ধরনের ব্যক্তিকে বা ব্যক্তিবর্গকে উপরোক্ত ধরনের জ্ঞানগত যোগ্যতার অধিকারী হওয়ার পাশাপাশি আরো দু'টি বৈশিষ্ট্যের অধিকারী হতে হবে। একটি বৈশিষ্ট্য হচ্ছে, তাঁকে বা তাঁদেরকে চিন্তাচেতনায় -, জীবন ও আচরণে এবং মানুষকে শিক্ষা ও পথনির্দেশ দানের ক্ষেত্রে পুরোপুরি ভারসাম্যের অধিকারী হতে হবে; এ ধরনের ব্যক্তি বা ব্যক্তিবর্গ চরমপন্থী ইফরাতী) - extremist)ও হবেন না, শিথিলপন্থী তাফরীতী) - liberal)ও হবেন না, বরং আল্লাহ্ এবং তাঁর রাসূল ও তাঁর আহলে বাইতের ইমামগণ (ছ্বাঃ) (আঃ) যে বিষয়ের ওপর যতোটুকু গুরুত্ব আরোপ করেছেন তিনি বা তাঁরা সে বিষয়ের ওপর ঠিক ততোটুকু গুরুত্ব আরোপ করবেন।

অপর বৈশিষ্ট্যটি হচ্ছে, তাঁকে বা তাঁদেরকে যুগসচেতন হতে হবে; পরিস্থিতির দাবী অনুযায়ী উম্মাহকে নেতৃত্ব দানের মতো দূরদর্শিতা বা অন্তর্দৃষ্টি (বাছ্বীরাত)- এর অধিকারী হতে হবে। ইতিপূর্বে যেমন উল্লেখ করা হয়েছে, নবীর মাধ্যমে পথনির্দেশের প্রয়োজনীয়তা এখানেই নিহিত। নয়তো আল্লাহ্ তা'আলা চাইলে ফেরেশতার মাধ্যমে তাঁর পথনির্দেশসমূহ এমনভাবে পাঠাতে পারতেন যে সম্পর্কে কারো মনেই সন্দেহ সৃষ্টি হতো না। কিন্তু তার পরিবর্তে নবী- রাসূলগণের (আঃ) মাধ্যমে পথনির্দেশ পাঠানো হয় এবং তাঁরা পরিস্থিতি অনুযায়ী লোকদেরকে পরিচালনা করেন।

আমরা রাসূলে আকরাম হযরত মুহাম্মাদ (ছ্বাঃ)- এর জীবনে দেখতে পাই, তিনি মক্কায় তিন বছর গোপনে বাছাই করা লোকদের মধ্যে তাঁর আদর্শ প্রচার করেন এবং পরবর্তী দশ বছর প্রকাশ্যে প্রচারকার্য চালান। এ সময় তিনি কোনোরূপ সংঘাত বা প্রতিরোধের পন্থা অনুসরণ করেন নি; যুলুম- অত্যাচার সহ্য করেছেন, কিন্তু প্রতিশোধ নেয়ার চেষ্টা করেন নি। এরপর তিনি দেশত্যাগ করে মদীনায় চলে যান। সেখানে অনু ল পরিবেশ পেয়ে তিনি ইসলামী রা প্রতিষ্ঠা করেন ও ইয়াহূদীদের সাথে শান্তিচুক্তি সম্পাদন করেন। মদীনার জীবনের দশ বছরে তিনি দ্বীন প্রচারের পাশাপাশি প্রশাসন গড়ে তোলেন এবং টনৈতিক তৎপরতাও চালান। এ সময় যুদ্ধ অনিবার্য হয়ে ওঠায় তিনি একদিকে যেমন একাধিক বার যুদ্ধ করেন, তেমনি ইসলাম ও মুসলিম উম্মাহর কল্যাণ বিবেচনায় যুদ্ধ এড়ানোর জন্য, দৃশ্যতঃ অপমানজনক শর্তাবলী সত্ত্বেও তিনি সন্ধি করেন (হুদায়বিয়ায়)। অর্থাৎ ইসলামী নেতৃত্বের জন্য পরিস্থিতি বিবেচনা করে পদক্ষেপ গ্রহণের যোগ্যতা তথা দূরদর্শিতা একটি অপরিহার্য মৌলিক গুণ।

অতএব, যথাযথ ও পরিপূর্ণ দ্বীনী জ্ঞান, ভারসাম্যপূর্ণ চিন্তা- চেতনা, চরিত্র ও আচরণ এবং দূরদর্শিতা - এই তিনটি গুণের অধিকারী ব্যক্তিই ইসলামী নেতৃত্বের উপযুক্ত - ইসলামী পরিভাষায় যাকে 'যুগসচেতন ও দূরদৃষ্টিসম্পন্ন নিষ্ঠাবান মুজতাহিদ' বলা যেতে পারে। ইসলামী উম্মাহর নেতৃত্ব প্রদান এরূপ ব্যক্তি বা ব্যক্তিবর্গের শুধু অধিকারই নয়, দায়িত্বও বটে। কোরআন মজীদের বিভিন্ন আয়াতে এরূপ ব্যক্তিদের মর্যাদার ওপর আলোকসম্পাৎ করা হয়েছে। অন্যদিকে শিয়া- সুন্নী নির্বিশেষে সকল মুসলমানের নিকট অভিন্নভাবে গ্রহণযোগ্য একটি হাদীছে বলা হয়েছে:

العلماء ورثة الانبياء.

"আলেমগণ নবীগণের উত্তরাধিকারী।"

বলা বাহুল্য যে, এ হাদীছে 'আলেম বলতে বর্তমানে প্রচলিত অর্থে প্রথাগত বা প্রতিষ্ঠানিক আলেম বুঝানো হয় নি, বরং এমন ব্যক্তিদেরকে বুঝানো হয়েছে যারা নবী না হয়েও নবীর গুণাবলী (জ্ঞান, আচরণ ও দূরদর্শিতা)- এর অধিকারী; তাঁদের কাছে নতুন কোনো ওয়াহী

নাযিল হয় না, কিন্তু তাঁরা মওজূদ ওয়াহীর পূর্ণ জ্ঞানের অধিকারী। অন্যথায় তাঁদের পক্ষে নবীদের (আঃ) উত্তরাধিকারী হওয়া সম্ভব নয়। কারণ, নবীদের (আঃ) উত্তরাধিকারী হওয়া মানে নবীদের (আঃ) অবর্তমানে তাঁদের সকল দায়িত্ব পালন করা।

এখন প্রশ্ন হচ্ছে, এ ধরনের ব্যক্তিত্ব কীভাবে উম্মাহর নেতৃত্ব ও শাসনকর্তৃত্বের অধিকারী হবেন এবং উম্মাহর সাথে তাঁর বা তাঁদের সম্পর্ক কেমন হবে?

বলা বাহুল্য যে, একজন নবীকে যেভাবে বিচারবুদ্ধি দ্বারা চিনে নিতে হয় সেভাবেই নবীর (ও নিষ্পাপ ইমামের) উত্তরাধিকারী যুগসচেতন ও ভারসাম্যপূর্ণ চিন্তা-চরিত্রের অধিকারী মুজতাহিদকেও বিচারবুদ্ধি দ্বারা চিনে নেয়া অপরিহার্য। বিচারবুদ্ধির আলোকে বিশ্লেষণ করে কারো নবী হবার ব্যাপারে নিশ্চিত হবার পর তাঁকে গ্রহণ ও আশ্রয় করার নামই নবীর প্রতি ঈমান। অন্ধ বিশ্বাসের দ্বারা এ ঈমান হাছিল হয় না। কারণ, অন্ধ বিশ্বাস এমন এক কর্মপদ্ধতি যার আশ্রয় নিলে ঘটনাক্রমে যেমন প্রকৃত নবীকে নবী বলে মেনে নেয়া ও আশ্রয় করা হতে পারে, তেমনি ভণ্ড নবীকেও নবী বলে মেনে নেয়া ও আশ্রয় করা হতে পারে - যার পরিণতি ব্যক্তি ও সমাজের ইহ-পরকালের জন্য, অন্ততঃ পরকালের জন্য, অত্যন্ত মারাত্মক।

একইভাবে কোনো ব্যক্তি প্রকৃতই নবীদের (আঃ), এবং শিয়া মাযহাবের মতে, নবীদের (আঃ) ও একই সাথে নিষ্পাপ ইমামের (আঃ), উত্তরাধিকারী হবার যোগ্যতাসম্পন্ন কিনা সে ব্যাপারে বিচারবুদ্ধির আলোকে যাচাই-বাছাই করে নিশ্চিত হওয়ার পরেই তাঁকে আশ্রয় করতে হবে এবং তাঁর সমস্ত আদেশ-নিষেধ ও পথনির্দেশ মেনে চলতে হবে; প্রয়োজনে তাঁর আদেশে ধন-সম্পদ, স্বজনসম্পর্ক, এমনকি জীবন পর্যন্ত বিসর্জন দিতে হবে। অর্থাৎ ব্যক্তির ওপর নবীর যে অধিকার আছে, নবীর উত্তরাধিকারীরও তদনুরূপ অধিকার আছে।

কাউকে প্রকৃত ওয়ারেছে নবী (নবীর উত্তরাধিকারী) জানার পর তাঁকে গ্রহণ না করা বা তাঁর কথা অমান্য করা এবং নবীকে গ্রহণ না করা ও তাঁর কথা অমান্য করার মধ্যে কার্যতঃ কোনো পার্থক্য নেই। এ কারণে ওয়ারেছে নবীকে অবশ্যই বিচারবুদ্ধি দ্বারা চিহ্নিত করে গ্রহণ করতে হবে। এরূপ গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে অন্ধ বিশ্বাস ও অন্যের অন্ধ অনুসরণ অত্যন্ত ঝুঁকিবহুল কর্মনীতি। কারণ, এ

ক্ষেত্রে স্বার্থান্বেষী ভণ্ড- প্রতারকের খপ্পরে পড়ার আশঙ্কা উড়িয়ে দেয়া যায় না। বলা বাহুল্য যে, এরূপ প্রতারকের খপ্পরে পড়লে ব্যক্তির ইহকাল ও পরকাল উভয়ই, অন্ততঃ পরকাল ধ্বংস হওয়া অনিবার্য।

এ আলোচনা থেকে সুস্পষ্ট যে, ব্যক্তির জন্য নবীর অবর্তমানে নবীর উত্তরাধিকারীর অনুসরণ অপরিহার্য। অতএব, তাকে অবশ্যই উপরোক্ত শর্তাবলী বিশিষ্ট মুজতাহিদের সন্ধান করতে হবে এবং পাওয়া মাত্রই তাঁকে আশ্রয় করতে হবে। মুসলিম সমাজের জন্য এরূপ কোনো না কোনা মুজতাহিদের উপস্থিতি নিঃসন্দেহে ফরযে কেফায়ী। অর্থাৎ উম্মাহর মধ্যে কমপক্ষে একজন অনুসরণযোগ্য মুজতাহিদ থাকতেই হবে, না থাকলে গোটা উম্মাহ্ই এক অনিশ্চিত ও ঝুঁকিপূর্ণ অবস্থার কবলে নিক্ষিপ্ত হবে। ব্যক্তি যদি এ ধরনের কোনো অনুসরণযোগ্য মুজতাহিদ খুঁজে না পায় তাহলে তার জন্য স্বয়ং মুজতাহিদ হওয়ার চেষ্টা করা বা সমাজে যাতে কমপক্ষে একজন মুজতাহিদ তৈরী হতে পারেন এ জন্য একটি প্রক্রিয়ার সূচনা করা অপরিহার্য কর্তব্য।

নবীর উত্তরাধিকারিত্ব প্রসঙ্গে আরেকটি প্রশ্ন এই যে, রাসূলে আকরাম হযরত মুহাম্মাদ (ছ্বাঃ)- এর ইন্তেকালের পরে [শিয়া মাযহাব অনুযায়ী হযরত ইমাম মাহদী (আঃ)- এর আত্মগোপনের পরে] নবীগণের (আঃ) উত্তরাধিকারী অভিন্ন সময়ে একজন হওয়া অপরিহার্য, নাকি একাধিক হতে পারেন? এ প্রশ্নের জবাব হচ্ছে এই যে, একজনও হতে পারেন, একাধিক হতেও বাধা নেই।

অতীতে একই সময় বিশ্বের বুকে একাধিক নবী (আঃ) থাকার বিষয়টি একটি প্রমাণিত বিষয়। শুধু এক নবীর সহযোগী অন্য নবীই ছিলেন না, বরং একই সময় বিভিন্ন ভূখণ্ডে স্বত ভাবে দায়িত্ব পালনকারী একাধিক নবীর দৃষ্টান্তও রয়েছে। যেমন: হযরত ইবরাহীম (আঃ) ও হযরত লূত্ব (আঃ), হযরত ইসমাঈল (আঃ) ও হযরত ইসহাক (আঃ) এবং হযরত শু'আইব (আঃ) ও হযরত মূসা (আঃ)। দ্বিতীয়তঃ পূর্বোক্ত হাদীছে আলেম ও উত্তরাধিকারী উভয় ক্ষেত্রেই বহুবচন ব্যবহৃত হয়েছে।

এছাড়াও আহলে সুন্নাতের বিভিন্ন সূত্রে বর্ণিত অনেক হাদীছের তাৎপর্য অনুযায়ী আলেমগণ রাসূলে আকরাম হযরত মুহাম্মাদ (ছ্বাঃ)- এর প্রতিনিধি (নায়েবে নবী)। অন্যদিকে শিয়া মাযহাবের বিভিন্ন হাদীছ অনুযায়ীও হাদীছ বর্ণনাকারীগণ তথা ওলামায়ে কেরাম হযরত রাসূলে আকরাম (ছ্বাঃ)- এর ও নিষ্পাপ ইমামগণের (আঃ) প্রতিনিধি। অন্যদিকে রাসূলে আকরাম হযরত মুহাম্মাদ (ছ্বাঃ) তাঁর জীবদ্দশায় বিভিন্ন স্থানে বিভিন্ন প্রতিনিধি প্রেরণ করেন। দ্বীন প্রচার ও শিক্ষাদান, টনৈতিক তৎপরতা পরিচালনা, যুদ্ধ ও শাসনকার্য ইত্যাদি সব কিছুই ছিলো তাঁদের দায়িত্ব। কখনো একজন প্রতিনিধির ওপর একটি দায়িত্ব অর্পিত থাকতো, কখনো একাধিক বা সবগুলো দায়িত্ব অর্পিত হতো। মোদ্দা কথা, একই সময় তাঁর একাধিক প্রতিনিধি ছিলেন। তাঁরা হযরত রাসূলে আকরাম (ছ্বাঃ)- এর নিকট থেকে প্রাপ্ত শিক্ষা ও দিকনির্দেশ অনুযায়ী নিজ নিজ দায়িত্ব পালন করতেন এবং কোনো ক্ষেত্রে নতুন সমস্যার সম্মুখীন হলে উক্ত শিক্ষা ও দিকনির্দেশের আলোকে বিচারবুদ্ধির সাহায্যে চিন্তা ও বিশ্লেষণ করে সমাধানে উপনীত হতেন অথবা হযরত রাসূলে আকরাম (ছ্বাঃ)- এর নিকট এসে সংশ্লিষ্ট সমস্যার সমাধান জেনে নিতেন।

বস্তুতঃ হযরত রাসূলে আকরাম (ছ্বাঃ)- এর পক্ষ থেকে কোথাও প্রতিনিধি হিসেবে প্রেরিত কোনো ছ্বাহাবী যখন তাঁর কাছ থেকে প্রাপ্ত শিক্ষা ও দিকনির্দেশের আলোকে বিচারবুদ্ধির সাহায্যে চিন্তা ও বিশ্লেষণ করে কোনো সমস্যার সমাধানে উপনীত হতেন তা ছিলো এক ধরনের ইজতিহাদ।

হযরত রাসূলে আকরাম এর জীবদ্দশায় কতক ক্ষেত্রে তাঁর -(ছ্বাঃ)অবস্থানস্থল থেকে স্থানগত ব্যবধানের কারণে এবং যোগাযোগ যথেষ্ট সময়সাপেক্ষ হওয়ায় সরাসরি তাঁর নিকট থেকে কোনো প্রশ্নের জবাব জানার সুযোগ না থাকায় তাঁর কতক প্রতিনিধি যেভাবে কোরআন মজীদ ও তাঁর দিকনির্দেশের আলোকে চিন্তাগবেষণা করে কোনো সমস্যার সমাধান উদ্ভাবন করতেন -, তাঁর ইন্তেকালের পর কালগত ব্যবধানে অবস্থানকারী মুজতাহিদগণও একই পন্থায়, বরং অধিকতর সুবিন্যস্ত (systematic) পদ্ধতির আশ্রয় নিয়ে, সমস্যাবলীর সমাধান উদ্ভাবন করে থাকেন।

প্রকৃত পক্ষে মুজতাহিদের কাজ হচ্ছে এ দৃষ্টিকোণ থেকে গবেষণা করা যে, স্বয়ং নবী করীম (ছ্বাঃ)- এর নিকট (এবং শিয়া মতে, সেই সাথে নিষ্পাপ ইমামের কাছে) এ প্রশ্ন করা হলে তাঁর

পক্ষ থেকে কী উত্তর পাওয়ার সম্ভাবনা ছিলো? অর্থাৎ মুজতাহিদের কাজ নিজের পক্ষ থেকে মনগড়া সমাধান পেশ করা নয়, বরং হযরত রাসূলে আকরাম (ছ্বাঃ)- এর প্রদত্ত সমাধান চিহ্নিত করা বা তাঁর পক্ষ থেকে দেয়া হতে পারতো এমন সম্ভাব্য সমাধান উদঘাটন করা। আর যেহেতু হযরত রাসূলে আকরাম (ছ্বাঃ)- এর জীবদ্দশায় একই সময় তাঁর একাধিক প্রতিনিধি ছিলেন সেহেতু তাঁর ইন্তেকালের পরে একই সময় একাধিক ওয়ারেছে নবী থাকায় কোনোই বাধা নেই।

আমাদের এ আলোচনা থেকে সুস্পষ্ট হয়ে গেলো যে, নবীর প্রতিনিধিত্ব বা উত্তরাধিকারিত্বের বিষয়টি নবুওয়াতের কর্মগত (ওয়াহী আগমনগত নয়) সম্প্রসারণ ও ধারাবাহিকতা মাত্র। অর্থাৎ হযরত নবী করীম (ছ্বাঃ)- এর জীবদ্দশায় তাঁর মনোনীত প্রতিনিধির যে দায়িত্ব- কর্তব্য ও অধিকার- মর্যাদা ছিলো, তাঁর ইন্তেকালের পরে তাঁর উত্তরাধিকারী (যথাযথ শর্তাবলীর অধিকারী মুজতাহিদ)- এর দায়িত্ব- কর্তব্য ও অধিকার- মর্যাদা তা- ই। অতএব, হযরত নবী করীম (ছ্বাঃ)- এর জীবদ্দশায় কোনো ব্যক্তিকে তাঁর মনোনীত প্রতিনিধি হিসেবে জানার পরে তাঁর প্রতি আনুগত্য ও তাঁকে অমান্য করা যেরূপ স্বয়ং হযরত নবী করীম (ছ্বাঃ)- এর প্রতি আনুগত্য ও তাঁকে অমান্য করার সমার্থক ছিলো, তাঁর ইন্তেকালের পর তাঁর উত্তরাধিকারী যথাযথ শর্তাবলীর অধিকারী মুজতাহিদ হিসেবে কারো ব্যাপারে প্রত্যয় সৃষ্টি হবার পর তাঁর আনুগত্য ও তাঁকে অমান্য করা প্রত্যয়ের অধিকারী ঐ ব্যক্তির জন্য অনুরূপভাবে হযরত নবী করীম (ছ্বাঃ)- এর আনুগত্য ও তাঁকে অমান্য করার সমার্থক বলে গণ্য হবে। এ ব্যাপারে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নেই।

বলা বাহুল্য যে, কোনো ব্যক্তি যদি কারো ব্যাপারেই ওয়ারেছে নবী বলে প্রত্যয়ের অধিকারী হতে না পারে, সে ক্ষেত্রেও সে এ দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি পাবে না। কারণ, সে ক্ষেত্রে তাকে দুনিয়ার অপর কোনো প্রান্তে গিয়ে হলেও এরূপ ওয়ারেছে নবী খুঁজে পাবার চেষ্টা করতে হবে, অথবা নিজে ওয়ারেছে নবী হবার জন্য প্রয়োজনীয় চেষ্টাসাধনা ও অধ্যবসায়ে আত্মনিয়োগ করতে হবে অথবা সমাজে যাতে এরূপ কোনো ওয়ারেছে নবী গড়ে উঠতে পারে সে জন্যে প্রয়োজনীয় প্রক্রিয়া শুরু করতে হবে বা এরূপ প্রক্রিয়া বিদ্যমান থাকলে তাতে সম্ভব সব রকম সহায়তা প্রদান করতে হবে।

যথাযথ শর্তাবলীর অধিকারী মুজতাহিদ- নেতৃত্ব পরিস্থিতি বিবেচনায় প্রচলিত সমাজ ও রা ব্যবস্থার সাথে যখন যে ধরনের সম্পর্ক ও আচরণ নির্ধারণ করে দেবেন তাঁর অনুসারীদের জন্য তখন সে ধরনের সম্পর্ক রক্ষা ও আচরণ করা অপরিহার্য হবে। আর তিনি যদি পরিস্থিতি উপযুক্ত বিবেচনা করে রা ক্ষমতা হস্তগত করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন তখন তাঁর অনুসারীদের জন্য তাঁর সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন এবং এ জন্য তাঁর নির্দেশ অনুযায়ী যে কোনো ত্যাগ স্বীকার অপরিহার্য হবে। তিনি কোন্ পদ্ধতিতে রা ক্ষমতা হস্তগত করার চেষ্টা করবেন পরিস্থিতি বিবেচনায় তিনি নিজেই তা নির্ধারণ করবেন; এ ব্যাপারে তিনি কোনো ধরাবাঁধা নিয়মের অনুসরণ করতে বাধ্য নন।

একই সময় বিশ্বের বিভিন্ন অংশে একাধিক মুজতাহিদ নেতৃত্ব কর্তৃক একাধিক ইসলামী রা প্রতিষ্ঠায় বাধা নেই, আবার তাঁরা যদি প্রয়োজন বা উত্তম মনে করেন তো এক রা প্রতিষ্ঠায়ও বাধা নেই। অবশ্য কাছাকাছি অবস্থানরত একাধিক মুজতাহিদের পক্ষে ভৌগোলিক কারণে একাধিক রা প্রতিষ্ঠা সম্ভব নয় বিধায় তাঁদের জন্য একটিমাত্র রা প্রতিষ্ঠা ছাড়া গত্যন্তর নেই। যেমন: একই শহরে অবস্থানরত একাধিক মুজতাহিদ- নেতৃত্ব - যাদের অনুসারীরা স্বত এলাকাসমূহে বসবাস করে না, বরং সকল এলাকায় মিশ্রিত অবস্থায় বসবাস করে, তাঁদের প্রত্যেকেই ওয়ারেছে নবীর মর্যাদায় অধিষ্ঠিত থেকেই নিজেদের মধ্য থেকে কাউকে রা ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত করবেন। রা প্রধান হিসেবে তাঁর ক্ষমতা ও এখিতয়ার, রা শাসন পদ্ধতি এবং তার ক্ষমতার মেয়াদকাল তাঁরা মতৈক্যের ভিত্তিতে নির্ধারণ করে দেবেন। তিনি দেশ শাসনের ব্যাপারে তাঁদের পরামর্শ মেনে চলতে বাধ্য থাকবেন এবং তিনি শারীরিক, মানসিক, নৈতিক বা রাজনৈতিক যোগ্যতা হারিয়েছেন বলে মনে করলে তাঁরা তাঁকে ক্ষমতাচ্যুত করতে পারবেন। কারণ, তাঁদের প্রত্যেকেই ব্যক্তিগতভাবে হযরত রাসূলে আকরাম (ছ্বাঃ)- এর উত্তরাধিকারী ও প্রতিনিধি এবং নতুন ওয়াহী প্রাপ্তি ছাড়া রাসূলুল্লাহ্ (ছ্বাঃ)- এর সকল দায়িত্ব- কর্তব্য ও অধিকার- মর্যাদা- এখতিয়ারের অধিকারী। তাঁরা তাঁদের রাজনৈতিক ক্ষমতার অধিকারের একটি অংশ সমঝোতার ভিত্তিতে আমানত স্বরূপ একজনের ওপর অর্পণ করেছেন মাত্র যা তাঁরা ফিরিয়ে নেয়ার অধিকারও রাখেন।

এ প্রসঙ্গে উল্লেখ্য যে, কেউ কেউ মনে করেন, কাউকে দ্বীনী নেতা বা দ্বীনী শাসক হিসেবে কবূল করে শপথ গ্রহণ করলে অতঃপর আর তা প্রত্যাহার করার সুযোগ থাকে না বা তিনি যতোদিন জীবিত থাকবেন ততোদিন পর্যন্ত তাঁর অনু লে শপথ গ্রহণকারীদের জন্য তাঁর পরিবর্তে অন্য কাউকে নেতারূপে গ্রহণ করা বৈধ হবে না। কিন্তু তাঁদের এ ধারণা সঠিক নয়। কারণ, ওয়ারেছে নবী বা নায়েবে নবী কোনো নবী নন এবং তাঁর গুনাহ্ ও ভুল থেকে বেঁচে থাকা নবীর মতো (শিয়া মাযহাবের মতে, নবী ও ইমামের মতো) নিশ্চিত নয়। বরং শব্দ সহযোগে উল্লেখ করা হোক বা না- ই হোক, এ ধরনের নেতার ওপর নেতৃত্ব অর্পণ ও তাঁর অনু লে শপথ গ্রহণ হয় শর্তাধীন এবং যতোক্ষণ তাঁর মধ্যে সংশ্লিষ্ট সকল শর্ত বিদ্যমান থাকে ততোক্ষণই তিনি আনুগত্যের উপযুক্ত থাকেন।

দু'টি কারণে তাঁর ওপর নেতৃত্ব অর্পণ ও তাঁর অনু লে আনুগত্য- শপথ শর্তাধীন।

প্রথমতঃ তাঁকে চিহ্নিত করা হয় শুধু বাহ্যিক অবস্থা বিবেচনা করে; নবীর মতো মু'জিযাহ্ তাঁর থাকে না এবং থাকা অপরিহার্যও নয়। তাছাড়া বাহ্যিক মানদণ্ডও তাঁর ও নবীর ক্ষেত্রে হুবহু এক নয়। যেমন: জীবনে কখনো কোনো পাপ না থাকা নবীর জন্য (এবং শিয়া মতে, ইমামের জন্যও) অপরিহার্য। কিন্তু নায়েবে নবী বা ওয়ারেছে নবীর জন্য এ শর্ত এরূপ কঠোর নয়। হতে পারে একজন মুজতাহিদের দ্বারা যৌবনে বা মুজতাহিদ হওয়ার আগে কোনো গুনাহ্ সংঘটিত হওয়ার বিষয় জানা আছে, কিন্তু মুজতাহিদ হবার পরে ও দীর্ঘ বহু বছর যাবত তাঁর মধ্যে অকাট্যভাবে গুনাহ্ বলে বিবেচিত কোনো দোষ দেখা যায় নি। এমতাবস্থায় ব্যক্তি ও সমষ্টি তাঁকে অনুসরণ করতে পারে এবং তাঁর অনু লে আনুগত্য- শপথ গ্রহণ করতে পারে। কিন্তু পরবর্তীকালে তাঁর মধ্যে আরো এমন ধরনের দোষ ধরা পড়তে পারে যা আগেও ছিলো, কিন্তু আনুগত্যকারী ব্যক্তি তা লক্ষ্য করে নি, অথবা বিচারবুদ্ধির যে মানদণ্ডে বিচার করে ব্যক্তি বা সমষ্টি তাঁকে আনুগত্যের উপযুক্ত মনে করে তাঁর অনু লে শপথ গ্রহণ করেছিলো এখন দেখতে পাচ্ছে যে, সে মানদণ্ড যথেষ্ট ছিলো না এবং প্রকৃত পক্ষে ঐ ব্যক্তি আনুগত্যের উপযুক্ত ছিলেন না।

দ্বিতীয়তঃ হতে পারে যে, ব্যক্তি বা সমষ্টি যার অনু লে আনুগত্য- শপথ গ্রহণ করেছিলো তিনি ঐ সময় যথাযথ শর্তের অধিকারী ছিলেন, কিন্তু পরবর্তীকালে কোনো শর্ত হারিয়ে ফেলেছেন। আর যেহেতু তিনি নবী নন, এবং শিয়া মতে, নবী বা আল্লাহ্- মনোনীত ইমাম কোনোটাই নন, এ কারণে তিনি নবী বা ইমামের মতো পাপ ও ভুল থেকে খোদায়ী সংরক্ষণের অধিকারী নন, সেহেতু তাঁর যোগ্যতা হারানো অসম্ভব কিছু নয়। এমতাবস্থায় তাঁর প্রতি আনুগত্য অব্যাহত রাখা মানে ব্যক্তিদের পরকালীন জীবনকে (এবং ক্ষেত্রবিশেষে ইহকালীন জীবনকেও) হুমকির মুখে ঠেলে দেয়া।

অবশ্য কারো অনু লে আনুগত্য- শপথ গ্রহণ করা ও শপথ প্রত্যাহার করে নেয়া উভয়ই আন্তরিকভাবে (ইখলাছের সাথে) যথার্থ মনে করে করতে হবে; এর পিছনে কোনো পার্থিব স্বার্থ (যেমন: অর্থ, পদ, সম্মান, মর্যাদা বা সুযোগ- সুবিধা লাভ বা পার্থিব ঝুঁকি এড়ানো) থাকলে সে অবশ্যই আল্লাহ্ তা'আলার নিকট অপরাধী বা কপটাচারী বলে পরিগণিত হবে, এমনকি তার সিদ্ধান্তটি (গ্রহণের বা বর্জনের) প্রকৃত পক্ষে সঠিক হলেও। আর ব্যক্তি যদি কেবল আল্লাহর সন্তুষ্টির লক্ষ্যে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে থাকে সে ক্ষেত্রে সাধ্যানুযায়ী সঠিক সিদ্ধান্তে পৌঁছার জন্য চেষ্টা করা সত্ত্বেও প্রকৃতই যদি সিদ্ধান্তটি ভুল হয়, তাতে পার্থিব ক্ষতি হলেও পরকালীন ক্ষতি থেকে সে আল্লাহ্ তা'আলার অনুগ্রহমূলক সুরক্ষার অধিকারী হবে বলে আশা করা যায়।

অন্যদিকে কাউকে নেতৃত্ব অর্পণ বা তাঁর প্রতি আনুগত্য- শপথের বিষয়টি মূলগতভাবেই সুনির্দিষ্ট সময়ের জন্য হতে ইসলামের দৃষ্টিতে আপত্তির কোনো কারণ নেই। কারণ, যেহেতু নবীর উত্তরাধিকারী বা ওয়ারেছ নবী স্বয়ং নবীর মতো নিষ্পাপ বা নির্ভুল হবার নিশ্চয়তার অধিকারী নন, সেহেতু তাঁর প্রতি অন্যদের আজীবনের জন্য আনুগত্য তাঁর মধ্যে অহঙ্কারসহ অন্যবিধ বিচ্যুতি, এমনকি সীমালঙ্ঘনপ্রবণতা তৈরী করতে পারে। অন্যদিকে স্বয়ং হযরত রাসূলে আকরাম (ছ্বাঃ) বিভিন্ন সময় যাদেরকে প্রতিনিধি নিয়োগ করেন তাঁদের প্রত্যেককেই স্থায়ীভাবে নিয়োগদান করেন নি। অতএব, নীতিগতভাবেই ওয়ারেছে নবী বা নায়েবে নবীর পদমর্যাদা কারো জন্য স্থায়ী হবেই এমন কোনো কথা নেই। বিশেষ করে স্বয়ং হযরত রাসূলে আকরাম

(ছ্বাঃ)- এর মনোনয়নের তুলনায় মুসলমানদের নিজেদের মনোনয়ন দুর্বলতর হবার সম্ভাবনা বেশী। তাই নেতৃত্বের বিষয়টি সীমিত সময়ের জন্য ও শর্তাধীন হতে বাধা নেই।

নেতৃত্বের শর্তাধীনতার ক্ষেত্রে অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হচ্ছে এই যে, মুজতাহিদগণ যে হযরত রাসূলে আকরাম (ছ্বাঃ)- এর উত্তরাধিকারী ও প্রতিনিধি, তা তাঁর অবর্তমানে তাঁর সকল দায়িত্ব পালনের জন্য। কিন্তু তাঁরা নিজেদের মধ্য থেকে যাকে রাজনৈতিক নেতা বা রা নেতা নির্বাচন করবেন, তাঁকে নির্বাচন করবেন কেবল রাজনৈতিক বা রা ীয় দায়িত্বের জন্য অর্থাৎ তাঁদের নেতৃত্বের রাজনৈতিক বা রা ীয় অংশটি তাঁরা এক ব্যক্তির ওপর অর্পণ করবেন এবং তিনি তা যথাযথভাবে পালন করেন কিনা সেদিকে লক্ষ্য রাখবেন। এই অর্পণের ফলে তাঁদের নিজেদের উত্তরাধিকারিত্ব ও প্রতিনিধিত্বের মর্যাদা রহিত হয়ে যাবে না। অতএব, রাজনৈতিক বা রা ীয় দায়িত্ব বহির্ভূত বিষয়াদিতে যে সব গৌণ ক্ষেত্রে তাঁদের ভিন্ন মত রয়েছে সে সব ক্ষেত্রে তাঁদের প্রত্যেকের অনুসারীরা পূর্বের ন্যায়ই নিজ নিজ মুজতাহিদ- নেতার মতের অনুসরণ করবেন। এ সব ক্ষেত্রে রাজনৈতিক বা রা ক্ষমতা ব্যবহার করে উক্ত নেতার মত বা সংখ্যাগুরুর মত সকলের ওপর চাপিয়ে দেয়া যাবে না।

এ প্রসঙ্গে আরেকটি বিষয় উল্লেখ করা বিশেষ জরুরী। তা হচ্ছে, অ- মুজতাহিদগণের জন্য সর্বাবস্থায়ই কোনো না কোনো জীবিত মুজতাহিদের অনুসরণ করা অপরিহার্য। এ ক্ষেত্রে কোনো মৃত মুজতাহিদের অনুসরণ করা যথেষ্ট নয়। কারণ, মৃত মুজতাহিদের পক্ষে যেমন নবজাগ্রত যুগজিজ্ঞাসার জবাব দেয়া সম্ভব নয়, তেমনি পরিবর্তিত পরিস্থিতির প্রেক্ষিতে বা ভুল ধরা পড়ার কারণে ইতিপূর্বে প্রদত্ত স্বীয় রায় পরিবর্তন করাও সম্ভব নয়।

একজন মুজতাহিদ যত উঁচু দরের মুজতাহিদই হন না কেন, যেহেতু তিনি নবী নন (শিয়া মতে, নবী বা ইমাম নন), সেহেতু তাঁর ইজতিহাদে ভুল হতেই পারে এবং মৃত্যুর পূর্বে তাঁর নিজের কাছে সে ভুল ধরা না- ও পড়তে পারে। দ্বিতীয়তঃ কালগত সীমাবদ্ধতা উপেক্ষা করে মৃত মুজতাহিদের অনুসরণ যদি যথেষ্ট হতো তাহলে ইজতিহাদ ও মুজতাহিদের আদৌ প্রয়োজন হতো না। কারণ, সে ক্ষেত্রে কোরআন- সুন্নাহ্ই যথেষ্ট হতো। কিন্তু যেহেতু স্থানগত ও কালগত

ব্যবধানের কারণে কোরআন- হাদীছ থেকে সঠিক তাৎপর্য ও ফয়সালা বের করার জন্য ইজতিহাদ ও মুজতাহিদের প্রয়োজন রয়েছে, সেহেতু মৃত মুজতাহিদের প্রদত্ত রায়ের ভুল সংশোধন ও নবজাগ্রত যুগজিজ্ঞাসার জবাব উদঘাটনের জন্য নতুন মুজতাহিদের প্রয়োজন রয়েছে। তাই যারা মুজতাহিদ নয় তাদের জন্য জীবিত মুজতাহিদের অনুসরণ করা অপরিহার্য; তারা মৃত মুজতাহিদের ফয়সালা ততোটাই অনুসরণ করবে যতোটা জীবিত মুজতাহিদ অনুমোদন করবেন। এখানে ইজতিহাদ- বিরোধীদের বক্তব্যের ওপর সংক্ষেপে হলেও আলোকপাত করা অপরিহার্য বলে মনে হয়।

বর্তমানে মুসলমানদের মধ্যে এমন কয়েকটি ধারা- উপধারার উপস্থিতি লক্ষ্য করা যায় যারা ইজতিহাদকে শুধু অপ্রয়োজনীয় মনে করে না, বরং দ্বীন ও ঈমানের জন্য ক্ষতিকর বলে মনে করে। তাদের মধ্যকার কোনো কোনো দলের মতে, শুধু কোরআনের এবং অন্যদের মতে, কোরআন ও হাদীছের অনুসরণই যথেষ্ট এবং মুজতাহিদের ফয়সালা মেনে চলা মানে আল্লাহ্ তা'আলা ও তাঁর রাসূলের (আঃ) সাথে সংশ্লিষ্ট মুজতাহিদগণকে শরীক করা।

তাদের এ ধরনের চরমপন্থী অভিমত মোটেই সঠিক নয়। কোরআন- হাদীছের বর্তমানে ইজতিহাদের প্রয়োজন কেন সে সম্পর্কে ইতিপূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে। অর্থাৎ মুজতাহিদের কাজ হচ্ছে কোরআন- হাদীছের সঠিক তাৎপর্য উদ্ধার এবং হযরত রাসূলে আকরাম (ছ্বাঃ)- এর ও শিয়া মতে, সেই সাথে নিষ্পাপ ইমামের (আঃ), তথা এক কথায় মা'ছূমের (নিষ্পাপ ব্যক্তিত্বের) তথা বিধানদাতা বা শরীয়তদাতার (আল্লাহর) প্রকৃত ফয়সালা ও সম্ভাব্য ফয়সালা উদঘাটন। [মা'ছূমগণের (আঃ) ফয়সালাকে আল্লাহর ফয়সালা গণ্য করার কারণ, মা'ছূমগণ নিজের পক্ষ থেকে মনগড়া কোনো কথা বলেন না, বরং আল্লাহ্ তা'আলার ওয়াহীর ভিত্তিতে কথা বলেন বা ওয়াহীর সঠক ও নির্ভুল ব্যাখ্যা প্রদান করেন।]

অতএব, এখানে আল্লাহ্ ও রাসূল (ছ্বাঃ)- এর সাথে শরীক করার প্রশ্নই ওঠে না। বিশেষ করে এ ধরনের মতামতের প্রায়োগিক তাৎপর্য ক্ষেত্রবিশেষে খুবই গুরুতর হতে পারে। কারণ, একই যুক্তির ভিত্তিতে কেউ দাবী করতে পারে (এবং কেউ কেউ করছেও) যে, কোরআনের বর্তমানে

হাদীছের প্রয়োজন নেই। কারণ, হযরত রাসূলে আকরাম (ছ্বাঃ) নিজ থেকে কোনো কথা বলেন নি, বরং তিনি কোরআনের প্রচার- প্রতিষ্ঠার জন্যই আগমন করেন এবং সে দায়িত্বই পালন করে যান। অতএব, হাদীছ নামে হযরত রাসূলুল্লাহ্ (ছ্বাঃ)- এর বাণী, কাজ ও অনুমোদন নামে যা কিছু বলা হয় তার যতোটুকু কোরআনের অনুরূপ তার প্রয়োজন নেই, কারণ, তা তো কোরআনেই রয়েছে। আর এর বাইরে যা কিছু রয়েছে তা তাঁর নামে তৈরী করে চালিয়ে দেয়া হয়েছে। এমতাবস্থায় তারা বলতে পারে যে, হাদীছ মানার অর্থ হচ্ছে কোরআনের সাথে হাদীছকে তথা আল্লাহর সাথে রাসূল (ছ্বাঃ)- কে শরীক করা। কিন্তু আমরা জানি যে, এ ধরনের যুক্তি ঠিক নয়। কারণ, অনেক বিষয়ে কোরআন মজীদে সাধারণ বিধান নাযিল হয়েছে; বিস্তারিত বা প্রায়োগিক বিধান দেয়া হয় নি; এ সব ক্ষেত্রে স্বয়ং রাসূলুল্লাহ্ (ছ্বাঃ)- এর কথা, আচরণ ও অনুমোদনই অবশ্য অনুসরণীয় বিধান। যেমন: নামাযের ন্যূনতম শর্তাবলী, রাকা‘আত- সংখ্যা ও প্রক্রিয়া (তারতীব্), যাকাতের নেছাব ও হার ইত্যাদি।

একইভাবে কোরআন মজীদের আয়াতের সঠিক তাৎপর্য গ্রহণ ও হাদীছ পরীক্ষা- নিরীক্ষা করে রাসূলুল্লাহ্ (ছ্বাঃ)- এর বা মা‘ছূম- এর প্রকৃত ফয়সালা ও সম্ভাব্য ফয়সালা বের করার জন্য বিশেষজ্ঞের প্রয়োজন; মুজতাহিদই হচ্ছেন সেই বিশেষজ্ঞ। অসংখ্য জাল হাদীছ এবং ছ্বাহীহ্ নামে অভিহিত অসংখ্য পরস্পর বিরোধী হাদীছের উপস্থিতিই এ ধরনের বিশেষজ্ঞের প্রয়োজনীয়তা প্রমাণ করে।

এছাড়া, ইতিপূর্বে যেমন উল্লেখ করা হয়েছে, সর্বসম্মতভাবে গ্রহণযোগ্য বিবেচিত হাদীছ অনুযায়ী আলেমগণ নবী- রাসূলগণের (আঃ) উত্তরাধিকারী ও প্রতিনিধি - বিচারবুদ্ধিও যা গ্রহণ করে। এভাবে ইজতিহাদ- বিরোধীরা যখন হাদীছকে যথেষ্ট গণ্য করে ইজতিহাদ ও মুজতাহিদের প্রয়োজনীয়তাকে প্রত্যাখ্যান করছেন, তখন হাদীছই ইজতিহাদ ও মুজতাহিদকে স্বীকৃতি দিচ্ছে। তাছাড়া স্বয়ং কোরআন মজীদ (সূরা আত্- তাওবাহ্: ১২২) থেকেও সমাজের জন্য ফক্বীহ্ বা ইসলাম- বিশেষজ্ঞ থাকা ফরযে কেফায়ী বলে প্রমাণিত হয় এবং মুজতাহিদই হচ্ছেন সেই ফক্বীহ্ বা ইসলাম- বিশেষজ্ঞ।

অন্যদিকে, যারা ইজতিহাদের বিরোধিতা করেন ও কোরআন- হাদীছের অনুসরণকে যথেষ্ট বলে দাবী করেন, তাঁরাও কিন্তু প্রকারান্তরে এক ধরনের ইজতিহাদ করে থাকেন এবং এক ধরনের ইজতিহাদ অনুসরণ করে থাকেন। তাঁদের মধ্যেও পরস্পরবিরোধী হাদীছ পরীক্ষা- নিরীক্ষা ও গ্রহণ- বর্জন করার জন্য হাদীছ- বিশেষজ্ঞ (মুহাদ্দিছ) রয়েছেন এবং হাদীছ সংকলকগণ (হাদীছের ইমামগণ) নিজেরা হাদীছ পরীক্ষার কতোগুলো নিয়মনীতি 'উদ্ভাবন করে' তার ভিত্তিতে হাদীছ বাছাই করে সংকলিত করেন এবং হাদীছকে যথেষ্ট গণ্যকারী ইজতিহাদ- বিরোধীরা সেই সব সংকলনের ওপর নির্ভর করেন।

মুজ্তাহিদগণের ন্যায় হাদীছ- সংকলনসমূহের সংকলকগণও নবী- রাসূল বা মা'ছুম ইমাম ছিলেন না এবং ভুলের উর্ধে ছিলেন না। হাদীছ সংকলনের মাধ্যমে ইসলামের যে বিরাট খেদমত তাঁরা করেছেন সে জন্য তাঁদেরকে শ্রদ্ধা ও কৃতজ্ঞতার সাথে স্মরণ করা সত্ত্বেও এ সত্যটি স্বীকার করতে হবে। এমতাবস্থায় তাঁদের ওপর অন্ধ নির্ভরতা যদি আল্লাহ্ ও রাসূলের (ছ্বাঃ) সাথে শরীক করা না হয়, তাহলে মুজতাহিদের অন্ধ অনুসরণ (অ- মুজতাহিদ সাধারণ মুসলমানের জন্য) আল্লাহ্ ও রাসূলের (ছ্বাঃ) সাথে শরীক করা বলে গণ্য করা হবে কেন?

বস্তুতঃ হাদীছ বাছাই করার মূলনীতি নির্ধারণ ও তার প্রয়োগও এক ধরনের ইজতিহাদ বৈ নয়। ইজতিহাদের মূলনীতি নির্ধারণ ও তা প্রয়োগ তথা ইজতিহাদ একই ধরনের কাজ, তবে তা অধিকতর বিশেষজ্ঞত্বের সাথে আঞ্জাম দেয়া হয়।

একজন মুজতাহিদ যখন একজন মুহাদ্দিছ কর্তৃক ছ্বাহীহ্ বলে চিহ্নিত কোনো হাদীছকে প্রত্যাখ্যান করেন তখন তার মানে এ নয় যে, তিনি হযরত রাসূলে আকরাম (ছ্বাঃ)- এর (এবং শিয়া মতে, সেই সাথে কোনো নিষ্পাপ ইমামের) কোনো কথা, কাজ বা কাজের অনুমোদনকে প্রত্যাখ্যান করছেন। বরং প্রকৃত ব্যাপার হচ্ছে এই যে, হাদীছ যাচাই- বাছাই করার এক ব্যাপকতর ও নির্ভুলতর মানদণ্ডে পরীক্ষা- নিরীক্ষা করে তিনি এ সিদ্ধান্তে পৌঁছেছেন যে, এটা আদৌ ছ্বাহীহ্ হাদীছ নয় অর্থাৎ হযরত রাসূলে আকরাম (ছ্বাঃ) বা যে নিষ্পাপ ব্যক্তিত্বের নামে এটি বর্ণিত হয়েছে তিনি আদৌ এ কথা বলেন নি বা এ কাজ করেন নি বা এরূপ কাজের অনুমোদন দেন নি,

অথবা এটি ছিলো স্থান, কাল বা পরিস্থিতি দ্বারা সীমাবদ্ধ কোনো বিষয়ের সাথে জড়িত যা উচ্চতর মূলনীতি অনুযায়ী আলোচ্য বিষয়ে প্রযোজ্য নয় তথা যে বিষয়ের ফয়সালা করা হবে তা দৃশ্যতঃ হাদীছে বর্ণিত বিষয়ের সাথে অভিন্ন হলেও প্রকৃত পক্ষে তা ভিন্ন বিষয়, অতএব, তার ফয়সালাও হবে ভিন্ন। বস্তুতঃ এভাবে তিনি নব- উদ্ভূত বিষয়ে সঠিক ফয়সালা উদঘাটনের চেষ্টা করেন।

উদাহরণস্বরূপ, কোরআন মজীদে 'আঙ্গুরের রস' (খামর্)- কে হারাম করা হয়েছে। কিন্তু একজন মুজতাহিদ জানেন যে, ইসলাম- পূর্ব যুগে আরব মুশরিকরা আঙ্গুরের রসকে আগুনে জ্বাল দিয়ে বা রোদে উত্তপ্ত করে তাতে মাদকতার গুণ সৃষ্টি হবার পর তা পান করতো; আঙ্গুর থেকে রস বের করে তাজা তাজাই তা পান করতো না। তাই মুজতাহিদ মাদকতার গুণবিহীন আঙ্গুরের তাজা রসকে (বর্তমান যুগে যার যথেষ্ট ব্যবহার আছে) কোরআন মজীদে বর্ণিত উক্ত হুকুমের বহির্ভূত ভিন্ন বিষয় বলে গণ্য করেন। একইভাবে, আঙ্গুরের রসে মাদকতা সৃষ্টির পরেও তা জ্বাল দেয়া অব্যাহত রাখলে তা কমে এক চতুর্থাংশের নীচে নেমে সির্কায় পরিণত হলে তাতে আর মাদকতা থাকে না বিধায় মুজতাহিদ এ ঘনীভূত আঙ্গুর- রসকে তৃতীয় একটি বিষয় বলে গণ্য করেন এবং এর প্রতি খামর্- এর হুকুম প্রযোজ্য মনে করেন না। অন্যদিকে ভাত পচানো মদ বা তালের রসের তাড়ির কথা কোরআন মজীদে বা হাদীছে উল্লেখ না থাকলেও মুজতাহিদ অভিন্ন গুণের কারণে খামর্- এর হুকুম এতদুভয়ের প্রতি প্রযোজ্য গণ্য করেন।

ইজতিহাদে মতপার্থক্য ও তার ক্ষেত্র

হাদীছ সংকলনের ও হাদীছ- বর্ণনাকারীর গ্রহণযোগ্যতা ও অগ্রহণযোগ্যতা এবং হাদীছ পরীক্ষার মূলনীতি ও ইজতিহাদের মূলনীতি প্রশ্নে মতপার্থক্য সহ বিভিন্ন কারণে অনেক বিষয়ে বিভিন্ন মুজতাহিদের রায়ে বিভিন্নতা দেখা যায়।

এছাড়া যারা ইজতিহাদের বিরোধী ও শুধু কোরআন- হাদীছের অনুসরণের পক্ষপাতী এবং এ হিসেবে নিজেদেরকে 'হাদীছপন্থী' (আহলে হাদীছ) বলে অভিহিত করে থাকে তাদের মধ্যেও একাধিক গোষ্ঠী রয়েছে, যেমন: সুন্নী ধারার হাদীছপন্থীরা "আহলে হাদীছ" নামে এবং শিয়া ধারার হাদীছপন্থীরা "আখবারী" নামে পরিচিত।

সুন্নী ধারার "আহলে হাদীছ" গোষ্ঠীর মধ্যে এমনও অনেকে আছে যারা আহকামের ক্ষেত্রে কোরআনকে বাদ দিয়ে শুধু হাদীছকেই যথেষ্ট গণ্য করে এবং কোরআনকে শুধু তেলাওয়াত করে থাকে। কারণ, তাদের কথা, হাদীছ হচ্ছে রাসূলুল্লাহ্ (ছ্বাঃ) কর্তৃক কোরআনের মৌখিক ও কার্যতঃ ব্যাখ্যা। কিন্তু তারা এ ব্যাপারে সচেতন নয় যে, যা কিছুই রাসূলুল্লাহ্ (ছ্বাঃ)- এর নামে বর্ণিত হয়েছে তার সব কিছুই সত্যি সতিই তাঁর থেকে এসেছে এমন কোনো নিশ্চয়তা দেয়ার উপায় নেই।

এ সব গোষ্ঠীর মধ্যকার মতপার্থক্যের কারণ, ক্ষেত্র ও গুরুত্ব নির্ণয় এবং এ থেকে উদ্ভূত সমস্যা নিরসনের পন্থার ওপর সংক্ষেপে হলেও আলোকপাত করা অপরিহার্য বলে মনে হয়। আমরা ইতিপূর্বে হাদীছ গ্রহণের ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় পূর্বশর্তাবলী উল্লেখ করেছি। এখানে আরো কতোগুলো বিষয় উল্লেখ করছি।

এ প্রসঙ্গে প্রথমেই মানব জীবনের বিভিন্ন দিক সম্পর্কে ইসলাম প্রদত্ত বিধিবিধান সমূহের মধ্যকার প্রকৃতিগত পার্থক্যের ওপর আলোকপাত করতে হয়।

ইবাদত সংক্রান্ত বিধিবিধানের কোনো প্রাকৃতিক মানদণ্ড নেই; এ ব্যাপারে আল্লাহ্ তা'আলার পক্ষ থেকে নাযিলকৃত এবং তাঁর অনুমোদন সাপেক্ষে হযরত রাসূলে আকরাম (ছ্বাঃ) কর্তৃক নির্ধারিত বিধিবিধানসমূহই চূড়ান্ত। কারণ, এ সব বিধিবিধানের মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে আল্লাহ্ তা'আলার প্রতি বান্দাহর আনুগত্য পরীক্ষা করা। এ কারণে, যে সব আদেশ প্রদান করা হয়েছে তার পরিবর্তে যদি ভিন্ন ধরনের কোনো আদেশ দেয়া হতো তাহলে বান্দাহর জন্য তা-ই মেনে চলা অপরিহার্য হতো। তাই এ জাতীয় আদেশের পিছনে কোনো বাস্তব বা পার্থিব কারণ অনুসন্ধান করা অনুচিত। যদিও এ ধরনের কোনো কোনো বিধান পালনের পার্থিব সুফল অনুসন্ধান করলে অনেক সুফল আবিষ্কৃত হতে পারে, কিন্তু এ সব সুফলের লক্ষ্যেই এ আদেশ দেয়া হয়েছে বলে মনে করলে ভুল হবে এবং এ সব সুফল পাওয়ার উদ্দেশ্যে আদেশ পালন করলে তা ইবাদত বলে গণ্য হবে না অর্থাৎ প্রকৃত পক্ষে আল্লাহ্ তা'আলার আদেশ পালন করা হবে না।

কতগুলো বিধিবিধান প্রাকৃতিক মানদণ্ডের ওপর ভিত্তিশীল। যেমন: খাদ্যদ্রব্যের হালাল-হারামের বিষয়টি। মানুষের শরীর, মন, নৈতিকতা ও চরিত্রের মধ্য থেকে একটির ওপরও বিরূপ প্রভাব পড়বে না এমন কোনো বস্তুকে হারাম করবেন অথবা বিরূপ প্রভাব পড়বে এমন কোনো বস্তুকে হালাল করবেন - এরূপ দুর্বলতা থেকে আল্লাহ্ তা'আলা প্রমুক্ত। অতএব, সন্দেহ নেই যে, হযরত আদম (আঃ) থেকে শুরু করে রাসূলে আকরাম হযরত মুহাম্মাদ (ছ্বাঃ) পর্যন্ত এ তালিকা অভিন্ন। অবশ্য কখনো কোনো জনগোষ্ঠীর আনুগত্য পরীক্ষা করা বা কোনো অপরাধের শাস্তিস্বরূপ শুধু ঐ জনগোষ্ঠীর জন্য কোনো চিরন্তন হালাল বস্তুকে সাময়িকভাবে বা স্থায়ীভাবে হারাম করা হতে পারে, সংশ্লিষ্ট গোষ্ঠী ও মেয়াদের বাইরে যার কোনো কার্যকরিতা থাকে না এবং যে সম্পর্কে জানা থাকে যে, পরীক্ষা বা শাস্তির উদ্দেশ্যেই সংশ্লিষ্ট বস্তুকে হারাম করা হয়েছে।

সামাজিক বিধিবিধান। এ ক্ষেত্রে স্থান-কাল ও পরিস্থিতির পরিবর্তনশীলতার প্রেক্ষিতে আল্লাহ্ তা'আলা কতক সাধারণ মূলনীতি ও কতক গুরুত্বপূর্ণ বিধান প্রদান করেছেন; অবশিষ্ট বিষয়গুলো হযরত রাসূলে আকরাম (ছ্বাঃ) ও তাঁর উত্তরাধিকারীদের এখতিয়ারে এবং প্রচলিত

রীতিপ্রথার ওপর ছেড়ে দিয়েছেন। যেমন: বিবাহে দেনমোহর ও নাফাক্বাহ্ (ভরণ- পোষণ)- এর বিধান দেয়া হয়েছে, কিন্তু তার পরিমাণ রীতিপ্রথা ও সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের আর্থিক অবস্থা ও সামাজিক অবস্থানের ওপর ছেড়ে দেয়া হয়েছে।

অর্থনৈতিক ক্ষেত্রেও প্রায় অনুরূপ অবস্থা লক্ষ্য করা যায়। যেমন: কোরআন মজীদে মীরাছ বণ্টনের সুনির্দিষ্ট বিধান দেয়া হয়েছে ও খুমস্ সুনির্দিষ্ট করা হয়েছে, কিন্তু যাকাত ফরয করা হলেও তার নেছ্বাব্ ও হার নির্দিষ্ট করে দেয়া হয় নি, বরং তা হযরত রাসূলে আকরাম (ছ্বাঃ) কর্তৃক নির্ধারিত হয়েছে।

দণ্ডবিধির ক্ষেত্রেও একই অবস্থা পরিলক্ষিত হয়। কতক ক্ষেত্রে কোরআন মজীদে সুনির্দিষ্ট বিধান দেয়া হয়েছে এবং কতক ক্ষেত্রে বিষয়টি হযরত রাসূলে আকরাম (ছ্বাঃ)- এর সিদ্ধান্ত গ্রহণের ওপর ছেড়ে দেয়া হয়েছে। যেমন: বিবাহিত স্বাধীন নারী- পুরুষের যেনা বা ব্যভিচারের শাস্তি হিসেবে প্রস্তরাঘাতে হত্যার বিধান কোরআন মজীদে নেই, [১৯] কিন্তু হযরত রাসূলে আকরাম (ছ্বাঃ) যে এ শাস্তি কার্যকর করতেন সে ব্যাপারে দ্বিমত নেই।

রাজনৈতিক, টনৈতিক ও সামরিক বিষয়ে কতক স্থায়ী মূলনীতি প্রদান করে বাস্তব সিদ্ধান্ত গ্রহণের বিষয়টি হযরত রাসূলে আকরাম (ছ্বাঃ)- এর বিবেচনার ওপর ছেড়ে দেয়া হয় - যা তাঁর অবর্তমানে তাঁর স্থলাভিষিক্ত ও উত্তরাধিকারীদের অধিকার।

এবার ভিন্ন এক দৃষ্টিকোণ থেকে বিষয়টির প্রতি দৃষ্টি দেয়া যাক। তা হচ্ছে, আল্লাহ্ তা'আলা যে সব মৌলিক দায়িত্ব পালনের জন্য নবী- রাসূলগণকে (আঃ) প্রেরণ করেন তা সংক্ষেপে তিনটি: (১) মানুষের নিকট জীবন ও জগতের অন্তরালে নিহিত মহাসত্য সম্পর্কে সঠিক বিষয় তুলে ধরা ও তার প্রচার, (২) আল্লাহ্ তা'আলা মানুষের জন্য যে সব কাজ অপরিহার্য কর্তব্য (ফরয) রূপে নির্ধারণ করেছেন ও যে সব কাজ নিষেধ (হারাম) করেছেন তা জানিয়ে দেয়া এবং (৩) নবীর দাও'আত্ গ্রহণকারীদের নেতৃত্ব দান ও পরিচালনা।

এখানে দ্বিতীয় বিষয়টি সম্পর্কে বলতে হয় যে, ফরয ও হারাম সম্পর্কে জানানো যেহেতু নবীর মৌলিক দায়িত্ব সেহেতু নবী তাঁর অনুসারীদেরকে সর্বজনীনভাবেই তা অবগত করাবেন; এ

বিষয়ে তিনি তাঁর অল্প সংখ্যক অনুসারীকে জানাবেন তা সম্ভব নয়। অতএব, আমরা এ উপসংহারে উপনীত হতে পারি যে, চারটি সূত্রে ফরয ও হারাম প্রমাণিত হতে পারে: (১) কোরআন মজীদের দ্ব্যর্থহীন ঘোষণা, (২) হযরত রাসূলে আকরাম (ছ্বাঃ)-এর যুগ থেকে ধারাবাহিকভাবে চলে আসা উম্মাহর অভিন্ন আমল (ইজমা'), (৩) মুতাওয়াতির হাদীছ ও (৪) 'আক্বলের অকাট্য রায়। অর্থাৎ খবরে ওয়াহেদ হাদীছ দ্বারা ফরয বা হারাম প্রমাণিত হয় না। অবশ্য খবরে ওয়াহেদ হাদীছের অন্যবিধ গুরুত্বপূর্ণ বহু ক্ষেত্র রয়েছে, যেমন: জ্ঞান-বিজ্ঞানের তথ্য সম্বলিত হাদীছ এবং প্রায়োগিক ক্ষেত্র সংশ্লিষ্ট ছোটখাটো বা বিস্তারিত বিধান সংশ্লিষ্ট হাদীছ। আল্লাহ্ তা'আলা যা কিছু ফরয করেছেন তা সম্পাদন না করলে বান্দাহ্ অবশ্যই শাস্তিযোগ্য হবে এবং তিনি যা কিছু হারাম করেছেন সে সব কাজ সম্পাদন করলেও শাস্তিযোগ্য হবে (যদিও অন্যের অধিকার হরণ বা বিনষ্ট বা লঙ্ঘন করা ব্যতীত যে সব অপরাধ করা হয়েছে আন্তরিক অনুতাপ সহ তার পুনরাবৃত্তি থেকে বিরত থাকলে আল্লাহ্ তা'আলা তার শাস্তি মওকুফ করে দেবেন)। এই ফরয ও হারাম ব্যতিরেকে মানব জীবনের বাকী সকল ক্ষেত্রে বান্দাহ্ পুরোপুরি স্বাধীন। অবশ্য এই স্বাধীন ক্ষেত্রের মধ্যে কতক কাজ ফরয না হলেও উত্তম, কল্যাণকর ও আল্লাহ্ তা'আলার পসন্দনীয়; হযরত রাসূলে আকরাম (ছ্বাঃ) এ ধরনের কাজ সম্পাদন করতেন ও তা করার জন্য অন্যদেরকে উৎসাহিত করতেন এবং যে সব কাজ হারাম না হলেও অপসন্দনীয় ও রুচিবিগর্হিত, রাসূলুল্লাহ্ (ছ্বাঃ) তা থেকে বিরত থাকতেন ও তাঁর অপসন্দ প্রকাশ করতেন। এ ধরনের বিষয়ের বেশীর ভাগই খবরে ওয়াহেদ হাদীছে পাওয়া যায়।

এই শেষোক্ত বিষয় সমূহে অর্থাৎ পসন্দনীয় ও অপসন্দনীয় বিষয়সমূহে ক্ষেত্রবিশেষে তথ্যগত মতপার্থক্য রয়েছে এবং ক্ষেত্র-বিশেষে তথ্যগত মতপার্থক্য না থাকলেও সিদ্ধান্ত গ্রহণ তথা হাদীছের ব্যবহারিক দিক নির্ণয়ে মতপার্থক্য হয়েছে। অর্থাৎ কোনো বিষয়কে কেউ হয়তো ফরয অর্থে গ্রহণ করেছেন, আবার কেউ পসন্দনীয় অর্থে গ্রহণ করছেন। তেমনি কোনো বিষয়কে কেউ হারাম অর্থে গ্রহণ করেছেন, আবার কেউ অপসন্দনীয় অর্থে গ্রহণ করেছেন। কিন্তু সঠিক কথা হচ্ছে এই যে, বিতর্কিত মতামত দ্বারা ফরয বা হারাম নির্ধারিত হয় না। কারণ, আল্লাহ্

তা‘আলা বা তাঁর পক্ষ থেকে তাঁর রাসূল (ছ্বাঃ) কোনো কাজকে ফরয বা হারাম বলে নির্ধারণ করলে তা খবরে ওয়াহেদ হাদীছের মতো খুবই সীমিত সংখ্যক সূত্রের বর্ণনার মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকতো না।

কতগুলো মতপার্থক্য ঘটেছে বিস্তারিত বা বাস্তবায়নসংক্রান্ত বিধি-বিধানের ক্ষেত্রে অথবা গৌণ বিষয়ে, অথবা একটি বিষয় আদৌ বিধান হিসেবে গণ্য কিনা সে ব্যাপারে। যেমন: দৈনিক পাঁচ ওয়াক্তে সতেরো রাক্‘আত্ নামায ফরয হবার ব্যাপারে বিতর্ক নেই, নামাযের পূর্বপ্রস্তুতি ও নামাযের মধ্যকার ফরয কাজগুলো নিয়েও বিতর্ক নেই। কিন্তু সূরা ফাতেহার পরে একটি পুরো সূরা পড়তে হবে, নাকি আংশিক পড়লেই যথেষ্ট হবে - এ ব্যাপারে বিতর্ক আছে। এ বিতর্কই প্রমাণ করে যে, বিষয়টি ফরয সংক্রান্ত নয়, অর্থাৎ পূর্ণ সূরা পড়া অপরিহার্য নয়। কারণ, অপরিহার্য হলে স্বয়ং হযরত রাসূলে আকরাম (ছ্বাঃ)-এর যুগ থেকে এ ব্যাপারে মুসলমানদের ধারণা ও আমল অভিন্ন হতো এবং বিতর্কের সৃষ্টি হতো না। তেমনি নামাযের তাশাহহুদ্, দরূদ ও সালামের বাক্যাবলীতে শব্দগত বিভিন্নতা দেখা যায় - যা প্রমাণ করে যে, এর মূল বিষয়টা যরূরী, তবে এর শব্দাবলীতে বিভিন্নতা থাকতে পারে। কিন্তু প্রত্যেক রাক্‘আতে সূরা ফাতেহার পূর্বে “বিসমিল্লাহির্ রাহমানির রাহীম” পড়তে হবে কিনা সে প্রশ্নের সমাধান ‘আক্বলী দলীলের দ্বারা করতে হবে। তা হচ্ছে, যেহেতু সূরা তাওবাহর শুরুতে “বিসমিল্লাহ্” নেই সেহেতু অন্যান্য সূরার শুরুতে যে “বিসমিল্লাহ্” রয়েছে তা ঐ সব সূরার (সূরা ফাতেহাহ্ সহ) অংশ, অতএব, তা না পড়লে ঐ সব সূরা পাঠ সম্পূর্ণ হবে না।

নামাযের ভিতরে পঠনীয় তাশাহহুদ্ ও দরূদের পাঠে মতপার্থক্য থেকে বুঝা যায় যে, হযরত রাসূলে আকরাম (ছ্বাঃ) এ ব্যাপারে বিভিন্ন সময় বিভিন্ন শব্দাবলী ব্যবহার করেছেন; এ ব্যাপারে তিনি সব সময় অভিন্ন শব্দাবলী ব্যবহার করলে মতপার্থক্য হতো না। তেমনি নামাযে হাত কী অবস্থায় থাকবে তার সাথে নামাযের আদৌ কোনো সংশ্লিষ্টতা আছে বলে মনে হয় না। তাই এ ব্যাপারে তিন ধরনের মত ও আমল দেখা যায়, তবে কেউই বিষয়টিকে নামাযের অন্যতম ফরয কাজ বলে গণ্য করেন না বা তাঁদের মতের অন্যথা হলে নামায বাতিল হয়ে যাবে বলেও মনে

করেন না। তা সত্ত্বেও অনেকে বিষয়টি নিয়ে বাড়াবড়ি করে থাকেন যা বিভেদের কারণ হয়ে দাঁড়ায়।

মতপার্থক্যের কতগুলো বিষয় হচ্ছে সামাজিক, অর্থনৈতিক ও বিচার- ফয়সালা সংক্রান্ত। এ সব ক্ষেত্রে সাধারণতঃ বিভিন্ন হাদীছে প্রাপ্ত তথ্যাদির মধ্যকার পার্থক্য থেকে মতপার্থক্য ঘটেছে। যেমন: কোনো কোনো দ্রব্যে যাকাত প্রযোজ্য হওয়া বা না- হওয়া প্রশ্নে মতপার্থক্য। কিন্তু এ জাতীয় শাখাগত বিধান যেহেতু সরাসরি আল্লাহ্ তা'আলার পক্ষ থেকে নির্ধারিত নয়, সেহেতু নিঃসন্দেহে তা হযরত রাসূলে আকরাম (ছ্বাঃ)- এর এখিতয়ারাধীন বিষয় ছিলো। এ কারণে হয়তো তিনি বিভিন্ন সময়ে গৃহীত সিদ্ধান্তে পার্থক্য করে থাকবেন। হয়তো তিনি কোনো এক সময় একটি দ্রব্যের ওপর যাকাত আরোপ করে থাকবেন এবং অন্য এক সময় তিনি দ্রব্যটিকে যাকাত- বহির্ভূত রেখে থাকবেন। অথবা হয়তো বাস্তব অবস্থা বিবেচনায় তিনি একই দ্রব্যের ক্ষেত্রে কারো কাছ থেকে যাকাত গ্রহণ করে থাকবেন এবং কাউকে ঐ বস্তুর জন্য যাকাত প্রদান থেকে রেহাই দিয়ে থাকবেন।

বলা বাহুল্য যে, আর্থ- সামাজিক বিষয়ে স্বীয় এখিতয়ারাধীন ক্ষেত্রে হযরত রাসূলে আকরাম (ছ্বাঃ)- এর জন্য বাস্তব অবস্থা বিবেচনায় বিভিন্ন সিদ্ধান্ত গ্রহণের এখিতয়ার ছিলো এবং এরূপ ক্ষেত্রে হযরত রাসূলে আকরাম (ছ্বাঃ)- এর উত্তরাধিকারীদের জন্যও বিচার- বিবেচনা অনুযায়ী সিদ্ধান্ত গ্রহণের এখিতয়ার রয়েছে বলে মনে করা যেতে পারে। এ ক্ষেত্রে প্রায়োগিক ব্যাপারে, ইতিপূর্বে খবরে ওয়াহেদ্ হাদীছ গ্রহণের জন্য যে সব শর্তের উল্লেখ করা হয়েছে তা পূরণ সাপেক্ষে বিভিন্ন হাদীছের মধ্য থেকে যার কাছে যেটি অধিকতর নির্ভরযোগ্য মনে হয় তিনি সেটির অনুসরণ করলে বা স্বীয় বিবেচনা অনুযায়ী নতুন সিদ্ধান্ত নিলেও অসুবিধা নেই।

আল্লাহ্ তা'আলা যেভাবে ধরণীর বুকে তাঁর প্রকৃত প্রতিনিধি নবী- রাসূলগণকে (আঃ) বিধিবিধানের ক্ষেত্রে পুরোপুরি হাত- পা বেঁধে দেন নি, বরং কিছু ক্ষেত্রে স্বাধীনভাবে সিদ্ধান্ত গ্রহণের এখিতয়ার দিয়েছেন, তেমনি তিনি নবী- রাসূলগণের (আঃ) উত্তরাধিকারী ও প্রতিনিধিগণকেও পুরোপুরি হাত- পা বেঁধে দেন নি, যদিও তাঁদের স্বাধীন এখিতয়ারের ক্ষেত্র

অবশ্যই নবী- রাসূলগণের (আঃ) স্বাধীন এখতিয়ারের ক্ষেত্রের তুলনায় অপেক্ষাকৃত সঙ্কুচিত এবং নবী- রাসূলগণের (আঃ) এখিতয়ার আল্লাহ্ তা'আলার বিধান দ্বারা সীমাবদ্ধ হলেও তাঁদের এখিতয়ার একই সাথে সংশ্লিষ্ট নবীর অকাট্য ও শর'ঈ বিধান দ্বারাও সীমাবদ্ধ।

কিন্তু নবীর উত্তরাধিকারী ও প্রতিনিধি যখন আর্থ- সামাজিক ও রাজনৈতিক বিষয়াদির আওতাভুক্ত কোনো বিষয়ে নবীর সিদ্ধান্তটিকে 'নীতিগত বা শর'ঈ সিদ্ধান্ত নয়, বরং সমাজনেতা ও রা নেতা হিসেবে তাঁর পক্ষ থেকে আর্থ- সামাজিক বা রাজনৈতিক গৌণ সিদ্ধান্ত' হিসেবে দেখতে পান - যা বিশেষ স্থান, কাল বা পরিস্থিতির সাথে সম্পর্কযুক্ত, সে ক্ষেত্রে তিনি যথাযথ মনে করলে স্বত সিদ্ধান্তও গ্রহণ করতে পারেন, যদিও নবীর সিদ্ধান্তের হুবহু অনুসরণ ও বাস্তবায়নে কোনো অসুবিধা না হলে তিনি তাকেই অগ্রাধিকার দেবেন।

এ প্রসঙ্গে একটি উদাহরণ দেয়া যেতে পারে। হযরত রাসূলে আকরাম (ছ্বাঃ) তাঁর পালকপুত্র হযরত যায়দেক (রাঃ) স্বীয় স্ত্রীকে ত্বালাক্ব দেয়া থেকে বিরত থাকতে বলেছিলেন। কিন্তু এরপরও যায়দ্ (রাঃ) স্বীয় স্ত্রীকে ত্বালাক্ব দিয়েছিলেন। কারণ, হযরত রাসূলে আকরাম (ছ্বাঃ)- এর এ নিষেধ কোনো শর'ঈ নির্দেশ ছিলো না, বরং তাঁর এ নির্দেশ ছিলো যায়দ্ (রাঃ)- এর মুরুব্বী হিসেবে তাঁর কল্যাণকামিতা। যেহেতু আল্লাহ্ তা'আলা ত্বালাক্ব দানের অনুমতি দিয়েছেন, অতএব, রাসূলের (ছ্বাঃ) কথা না শুনে স্বীয় স্ত্রীকে ত্বালাক্ব দেয়ায় যায়দ্- এর কোনো গুনাহ্ হয় নি।

যদিও, কোরআন মজীদের ঘোষণা অনুযায়ী, মুসলমানদের ওপর তাদের নিজেদের চেয়েও রাসূলের (ছ্বাঃ) বেশী অধিকার রয়েছে - এ দৃষ্টিতে বলা যেতে পারে যে, যায়দের পক্ষে হযরত রাসূলে আকরাম (ছ্বাঃ)- এর নিষেধ অমান্য করা ঠিক হয় নি। তবে দেখতে হবে যে, এ নিষেধটি কোন্ পর্যায়ের; নিঃসন্দেহে এ নিষেধ কোনো দৃঢ় পর্যায়ের নিষেধ ছিলো না, বরং এ ছিলো যায়দ্- দম্পতির কল্যাণকামনা থেকে উদ্ভূত নছ্বীহত্ মাত্র যা মেনে নেয়া বা না নেয়ার বিষয়টি তিনি ব্যক্তি যায়দের (রাঃ) ওপর ছেড়ে দিয়েছিলেন।

অন্যদিকে হযরত রাসূলে আকরাম (ছ্বাঃ) একজন ছ্বাহাবীর প্রতি তাঁর কন্যাকে অপর একজন ছ্বাহাবীর (যিনি ছিলেন নিঃস্ব) সাথে বিবাহ দিতে বললে কন্যার পিতা তাতে রাযী হন নি; এতেও ঐ ছ্বাহাবী কোনো শর'ঈ আদেশ লঙ্ঘন করেন নি। কিন্তু মেনে নেয়া অপরিহার্য না হওয়া সত্ত্বেও উক্ত কন্যা কেবল হযরত রাসূলে আকরাম (ছ্বাঃ) সন্তুষ্ট হবেন বিবেচনায় উক্ত নিঃস্ব ছ্বাহাবীকে বিবাহ করেন। তবে মুসলমানদের ওপর তাদের নিজেদের চেয়েও রাসূলের (ছ্বাঃ) যে বেশী অধিকার, রা ীয় ও সামাজিক- সামষ্টিক ব্যাপারে তা মুসলমানদের জন্য ফরয পর্যায়ভুক্ত, একান্ত ব্যক্তিগত ক্ষেত্রে নয়।

এ জাতীয় ঘটনাবলী থেকে প্রমাণিত হয় যে, হযরত রাসূলে আকরাম (ছ্বাঃ)- এর সকল আদেশ বা কাজই তাঁর উম্মাতের জন্য শর'ঈ আদেশ অথবা অপরিহার্যভাবে মেনে চলার পর্যায়ের আদেশ বা অবশ্য অনুসরণীয় কাজ ছিলো না।

এ প্রসঙ্গে আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, যেহেতু নবী মু'মিনদের ওপর তাদের নিজেদের চেয়েও বেশী অধিকার রাখেন সেহেতু তিনি উম্মাত, রা , সমাজ ও ব্যক্তিদের জন্য কল্যাণ বিবেচনা করলে তাদের ব্যক্তিগত অধিকারে হস্তক্ষেপ করার তথা ব্যক্তিগত অধিকারকে সঙ্কুচিত করার অধিকার রাখেন। অর্থাৎ নবী কাউকে হারাম কাজের নির্দেশ দিতে পারেন না (যা আসলে নবীর পক্ষ থেকে ঘটার প্রশ্নই ওঠে না), কিন্তু তিনি কল্যাণ বা অপরিহার্য বিবেচনা করলে তাদেরকে হালাল থেকে বিরত রাখার অধিকার রাখেন। উদাহরণস্বরূপ, মূলগতভাবে ইসলামী শরী'আতে দু'জন মু'মিন নর- নারীর মধ্যে বিবাহ অনুমোদিত হলেও নবী ইসলামী রা ের বাইরের কোনো নর- নারীর সাথে (যদিও তারা মুসলিম) ইসলামী রা ের নাগরিকদের বিবাহের ওপর নিষেধাজ্ঞা আরোপ করতে পারেন। তবে এটা কোনো স্থায়ী শর'ঈ বিধান হবে না, বরং এ হবে সাময়িক রা ীয় বিধান এবং তা কার্যকর রাখা যতোদিন অপরিহার্য বিবেচিত হবে ততোদিন তা কার্যকর থাকবে; অতঃপর নবী বা তাঁর উত্তরাধিকারী প্রয়োজনবোধে তা তুলে নিতে ও পুনরায় প্রয়োজন হলে তা পুনরায় আরোপ করতে পারেন। দ্রব্যমূল্য নিয় ণ, সম্পদ জাতীয়করণ বা ভূমি অধিগ্রহণ এ পর্যায়ের কাজ যে ক্ষেত্রে

নবীর যেমন স্বাধীন এখিতয়ার রয়েছে, তেমনি নবীর উত্তরাধিকারী বা প্রতিনিধিরও স্বাধীন এখিতয়ার রয়েছে।

এছাড়া হযরত রাসূলে আকরাম (ছ্বাঃ)- এর সুন্নাত্ (তাঁর প্রবর্তিত ঐতিহ্য) নিয়েও মতপার্থক্য হয়েছে। উদাহরণস্বরূপ, মুসলমান পুরুষদের দাড়ি রাখার প্রশ্নে ওলামায়ে ইসলামের মধ্যে মতৈক্য রয়েছে, কিন্তু দাড়ি ছাঁটা বা ছোট করা প্রশ্নে মতপার্থক্য রয়েছে। অতএব, সন্দেহ নেই যে, দাড়ি রাখাই সুন্নাত, সুনির্দিষ্ট মাপের দাড়ি রাখা সুন্নাত্ নয়। কারণ, সুনির্দিষ্ট মাপের দাড়ি রাখা সুন্নাত্ হলে এ বিষয়ে মতপার্থক্য সৃষ্টি হতো না। তেমনি কোরআন মজীদে তাক্ব্ওয়ার পোশাক পরিধান করার নির্দেশ দেয়া হয়েছে, কিন্তু হযরত রাসূলে আকরাম (ছ্বাঃ) যে লম্বা ঢোলা জামা পরিধান করতেন, তা কি তাক্ব্ওয়ার পোশাক হিসেবে পরতেন, নাকি আরবদের ঐতিহ্য ও আবহাওয়াগত কারণে পরতেন (যাতে অবশ্য তাক্ব্ওয়ার শর্তও পূরণ হতো) - এ ব্যাপারে মতপার্থক্য সৃষ্টি হয়েছে। যেহেতু এ ব্যাপারে মতপার্থক্য সৃষ্টি হয়েছে সেহেতু আরবদের পোশাকের মতো পোশাক পরিধান করা যে সুন্নাত্ নয় তাতে সন্দেহের অবকাশ নেই। কারণ, তা সুন্নাত্ হলে এ ব্যাপারে মতপার্থক্য সৃষ্টি হতো না।

এ আলোচনা থেকে সুস্পষ্ট যে, মতপার্থক্যের বিষয়গুলো মৌলিক বা মুখ্য নয়। তাই এ সব ক্ষেত্রে মতপার্থক্য থাকা সম্ভব হয়েছে এবং এসব বিষয়ে মতপার্থক্য থাকায় কোনো সমস্যাও নেই। সমস্যা হয় তখনই যখন এ সব বিষয়ের ওপর অতিরিক্ত গুরুত্ব আরোপ করা হয় অথবা এর ভিত্তিতে ফরয বা হারাম নির্ধারণের চেষ্টা করা হয়।

অবশ্য ইজতিহাদী মতপার্থক্যের কতগুলো বিষয় ইজতিহাদী নীতিমালা নির্ধারণে দুর্বলতা থেকে উৎসারিত। এ বিষয়টি যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ। এ কারণে ইজতিহাদের অব্যাহত চর্চা, মতপার্থক্যের বিষয়গুলোতে পারস্পরিক দলীল- প্রমাণকে আবেগমুক্তভাবে বিশ্লেষণ এবং ইজতিহাদী নীতিমালা ও মুজতাহিদের গুণাবলী সম্পর্কে পুনর্বিবেচনার জন্য মানসিক প্রস্তুতি অপরিহার্য। অর্থাৎ একজন মুজতাহিদের নিকট যখনই কোনো সত্য উদঘাটিত হবে তখনি তা গ্রহণ করে নেয়ার জন্য তাঁর মানসিক প্রস্তুতি থাকতে হবে। তেমনি একজন মুজতাহিদ জ্ঞান- বিজ্ঞানের শাখা- প্রশাখা সমূহে,

বিশেষ করে মানবিক বিজ্ঞান সমূহে যতো বেশী ব্যুৎপত্তির অধিকারী হবেন তাঁর পক্ষে বিভিন্ন সমস্যাকে সঠিকভাবে চিহ্নিত করা ও তার সঠিক সমাধান উদ্ভাবন করা ততোই সহজতর হবে।

এ কারণে, ইতিপূর্বে যেমন উল্লেখ করা হয়েছে, একজন মুজতাহিদের জন্য কোরআন নাযিলকালীন ও জাহেলিয়্যাত্ যুগের আরবদের ভাষার ব্যাকরণগত খুটিনাটি বিষয়ের সাথে পরিচিত থাকার পাশাপাশি জ্ঞানতত্ত্ব, তাৎপর্যবিজ্ঞান, ভাষাতত্ত্ব, যুক্তিবিজ্ঞান ও দর্শনে ব্যুৎপত্তির এবং ইসলামের মৌলিক উপস্থাপনা সমূহ (তাওহীদ, আখেরাত্ ও রিসালাত)কে বিচারবুদ্ধির আলোকে ও কোরআন মজীদের আলোকে পেশ করার যোগ্যতার অধিকারী হতে হবে। এছাড়া তাঁকে পরিবর্তনশীল চলমান জীবন ও জগতের পরিস্থিতি সম্পর্কে সদা অবহিত থাকতে হবে। তাঁকে বিভিন্ন ধারার উছূলে হাদীছ (হাদীছ শাস্ত্রের মূলনীতি) ও দেরায়াতে হাদীছ (হাদীছ পরীক্ষণ শাস্ত্র)- এর মানদণ্ড এবং উছূলে ফিক্বহ্ (ইজতিহাদের মূলনীতি) সম্পর্কে গভীর ধারণার অধিকারী হতে হবে। এভাবে তাঁকে পূর্ববর্তী হাদীছ সংগ্রাহক, হাদীছ বিশেষজ্ঞ ও মুজতাহিদগণের নির্ধারিত উছূলের ভুলত্রুটি চিহ্নিতকরণ ও সংশোধনের যোগ্যতার অধিকারী হতে হবে। কেবল তখনই তাঁর পক্ষে সকল ব্যাপারে প্রায় নির্ভুল সিদ্ধান্তে পৌঁছা ও মতপার্থক্য নিরসনে অবদান রাখা সম্ভব হবে।

কৃতজ্ঞতা

পুরোপুরি বিচারবুদ্ধির আলোকে জীবন ও জগতের অন্তরালে নিহিত মহাসত্য উদঘাটন করে পূর্ণাঙ্গ গ্রন্থ রচনা সম্ভবতঃ বাংলা ভাষায় এটাই প্রথম। এ পর্যায়ে ইতিপূর্বে বাংলা ভাষায় যে সব গ্রন্থ রচিত হয়েছে তার মধ্যে পুরোপুরি সুবিন্যস্ত ও পূর্ণাঙ্গ গ্রন্থ, বিশেষ করে বিচারবুদ্ধির ভাবাবেগমুক্ত উপস্থাপন অত্র গ্রন্থকারের চোখে পড়ে নি। তবে বিন্যাসে দুর্বলতা, অপূর্ণাঙ্গতা ও ভাবাবেগের সংমিশ্রণ সত্ত্বেও ইতিপূর্বে এ পথে যারা অবদান রেখেছেন তাঁরা বিরাট খেদমত আঞ্জাম দিয়েছেন। বিশেষ করে সূচনাকারীর গুরুত্ব অনেক বেশী। তাঁদের লেখা দ্বারা আমি যথেষ্ট অনুপ্রাণিত হয়েছি। অন্যদিকে আরবী ও ফার্সী ভাষায় এ বিষয়ে প্রচুর সংখ্যক সুবিন্যস্ত, পূর্ণাঙ্গ

ও ভাবাবেগমুক্ত গ্রন্থ্ প্রকাশিত হয়েছে। বিশেষ করে ফার্সী ভাষায় লেখা এতদসংক্রান্ত কতক গ্রন্থ্ লেখককে বিচারবুদ্ধির সুসংহত প্রয়োগে উদ্বুদ্ধ করেছে।

বিচারবুদ্ধির দলীল ব্যক্তিবিশেষের সম্পদ নয়, বরং সর্বজনীন সম্পদ এবং যে কেউ তা অধ্যয়ন করার পর তাকে সঠিক হিসেবে দেখতে পায় তখন তা তার নিজস্ব সম্পদে পরিণত হয়ে যায়। এ বিষয়টি অত্র গ্রন্থের ভূমিকায় উল্লেখ করেছি। তা সত্ত্বেও যে সব মনীষীর এ বিষয়ক লেখা অত্র গ্রন্থ্কারের বিচারবুদ্ধিকে শানিত করেছে এবং অত্র গ্রন্থ্ রচনায় উদ্বুদ্ধ করেছে, বিচারবুদ্ধির দলীলকে দুর্বল না করার লক্ষ্যে গ্রন্থ্মধ্যে তাঁদের নাম তথ্যসূত্র হিসেবে ব্যবহার না করলেও এবং ভূমিকায় তাঁদের নাম উল্লেখ না করলেও তাঁদের প্রতি কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করাকে নিজের জন্য অপরিহার্য গণ্য করছি। তাই এখানে তাঁদের কথা স্মরণ করতে চাই।

এ ব্যাপারে সর্বপ্রথম যার কথা স্মরণ করছি তিনি হলেন আমার দ্বীনী শিক্ষক পিতৃপ্রতীম হযরত মওলানা মুহাম্মদ আবদুর রহীম (রঃ)। তাঁর লেখা ‘মহাসত্যের সন্ধানে’ গ্রন্থ্ এ ব্যাপারে আমার মন- মগযকে যথষ্ট প্রভাবিত করেছে। অতঃপর স্মরণ করছি ইরানের স্বনামখ্যাত ইসলামী মনীষী হযরত আয়াতুল্লাহ্ জা‘ফার্ সোবহানী, হযরত আয়াতুল্লাহ্ তাক্বী মেছ্বাহ্ ইয়াযদী ও হু াতুল ইসলাম ওয়াল মুসলিমীন মোহাম্মাদ মোহাম্মাদী রেইশাহরী- কে (আল্লাহ্ তা‘আলা তাঁদেরকে শুভ প্রতিদান প্রদান করুন)। তাঁদের এতদ্বিষয়ক লেখা আমাকে জীবন ও জগতের অন্তরালে নিহিত মহাসত্যকে বিচারবুদ্ধির আলোকে দেখার ক্ষেত্রে ব্যাপকভাবে সাহায্য করেছে।

এ ছাড়া কতক ক্ষেত্রে হযরত ইমাম খোমেইনী (রঃ), শহীদ হযরত আয়াতুল্লাহ্ মোরতাযা মোতাহহারী (রঃ) ও হযরত আয়াতুল্লাহ্ মোহাম্মাদ তাক্বী জা‘ফারী (রঃ)- এর কোনো কোনো লেখা আমাকে তাৎপর্যের গভীরে প্রবেশে সহায়তা করেছে। বিশেষ করে হযরত আয়াতুল্লাহ্ মোহাম্মাদ তাক্বী জা‘ফারী (রঃ) বিষয়বস্তুর এতো গভীরে প্রবেশ করেছেন ও বিচারবুদ্ধির প্রয়োগকে এমনভাবে দূরতম ও সূক্ষ্মতম দুর্বলতা থেকেও মুক্ত করেছেন যে, তা আমাকে দারুণভাবে বিস্মিত ও অভিভূত করেছে। (আল্লাহ্ তা‘আলা এ মহান মনীষীদেরকে আলমে বারযাখের বেহেশতে সুখে- শান্তিতে রাখুন এবং শেষ বিচারে অবিনশ্বর জান্নাত্ নছ্বীব্ করুন।)

পরিশিষ্ট- ১

ডারউইনবিজ্ঞানের নামে অন্ধ বিশ্বাস :তত্ত্ব -

পাশ্চাত্য জগত থেকে বিজ্ঞানের নামে উদ্ভূত যে সব তত্ত্ব সারা বিশ্বে আলোড়ন সৃষ্টি করেছে তার মধ্যে ডারউনের তত্ত্ব অন্যতম। বিশেষ করে পাশ্চাত্য শিক্ষায় শিক্ষিত প্রাচ্যবাসীদের প্রায় সকলের নিকট এ তত্ত্ব অভ্রান্ত বলে গণ্য হয়েছে। এ কারণে, এমনকি পাশ্চাত্যের বিজ্ঞানীদের মধ্যেও এ তত্ত্বের যথার্থতা সম্বন্ধে বিতর্ক ও সংশয় সৃষ্টি হলেও প্রাচ্যে তা এখনো প্রায় ঐশী বাণীর ন্যায় চোখ বুঁজে গ্রহণ করা হচ্ছে।

বিস্ময়ের ব্যাপার এই যে, যে সব মৌলিক ধর্মগ্রন্থকে ঐশী বলে দাবী করা হয় অনেকে তার মধ্যে যেটিতে বিশ্বাসী বা ঈমানদার হবার দাবী করে সে গ্রন্থের অনেক কথার যথার্থতায় সন্দেহ পোষণ করলেও পাশ্চাত্য থেকে বিজ্ঞানের নামে প্রচারিত কোনো তত্ত্বে, বিশেষ করে ‘বিবর্তনবাদ’ (Theory of Evolution) নামে অভিহিত ডারউইনতত্ত্বে বিন্দুমাত্র সন্দেহ পোষণ - ইদানীং) করতে রাযী নয়।, বিশেষ করে পাঠ্যপুস্তকে Theory of Evolution - এর অনুবাদ ‘অভিব্যক্তিবাদ’ করতে দেখা যাচ্ছে যা এ বাংলা শব্দটির ‘প্রথম তাৎপর্যের’ বিচারে ভুল অনুবাদ; অবশ্য ‘ক্রমবিকাশবাদ’ অনুবাদ ভুল নয়।বৈশিষ্ট্য হচ্ছে অথচ বিজ্ঞানের অন্যতম (সন্দেহ পোষণ করা এবং সন্দেহ পোষণের পরিপ্রেক্ষিতে পর্যালোচনা ও অনুসন্ধান করা। কিন্তু অনেকেই বিজ্ঞানমনস্ক হবার ভান বা দাবী করলেও এ জাতীয় তত্ত্বের ক্ষেত্রে তাদের আচরণ পুরোপুরি অবৈজ্ঞানিক, বরং অন্ধ বিশ্বাসী আচরণ।

এ প্রসঙ্গে প্রথমেই উল্লেখ করতে হয় যে, কোনো তত্ত্বকে বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব বলে দাবী করা বা কোনো বিজ্ঞানীর পক্ষ থেকে উপস্থাপন করা হলেই যে তা সত্যি সত্যিই বৈজ্ঞানিক তত্ত্বের

পর্যায়ভুক্ত হবে তা মনে করার কারণ নেই। কারণ, একটি তত্ত্বের বিজ্ঞানভিত্তিক হবার জন্যে বিভিন্ন শর্ত রয়েছে; সে সব শর্তের সবগুলো পূরণ না হলে তাকে বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব বলা চলে না। যে কোনো বৈজ্ঞানিক তত্ত্বকেই বিষয়বস্তুভেদে অনুসন্ধান ও পর্যালোচনা বা পরীক্ষা দ্বারা অকাট্যভাবে প্রমাণিত হতে হবে। শুধু যুক্তি দ্বারা কোনো কিছু প্রমাণ করা দর্শনের কাজ, বিজ্ঞানের কাজ নয়। কিন্তু সকল যুগেই দেখা (বিজ্ঞান অর্থেপ্রচলিত সীমাবদ্ধ অর্থে তথা বস্তু) গেছে, বস্তুবিজ্ঞানী এমন বিষয়ে কথা বলেছেন (এবং দার্শনিকও)যা তাঁর বিষয়ের (Subject) আওতাভুক্ত নয়, অথবা আওতাভুক্ত হলেও অকাট্যভাবে প্রমাণিত হবার জন্যে প্রয়োজনীয় শর্তাবলী পূরণ করা হয় নি। কিন্তু তা সত্ত্বেও একজন প্রথিতযশা বিজ্ঞানীর পক্ষ থেকে উপস্থাপিত হবার কারণে লোকেরা তা অন্ধভাবে গ্রহণ করেছে।

কুসংস্কারাচ্ছন্ন খৃস্টান ধর্মের ধর্মনেতাদের নিপীড়নমূলক কঠোর নিয় ণের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে ইউরোপে যে রেনেসাঁ সংঘটিত হয় তার পৃষ্ঠপোষকতায় সেখানে বিজ্ঞান ও শিল্পের ব্যাপক উন্নতি সাধিত হয় (যদিও তা সম্ভব হয়েছিল প্রাচ্যের উপনিবেশসমূহ থেকে লু ি ত সম্পদল পুঁজি বিনিয়োগ করে)। এ কারণে পাশ্চাত্যে এক অর্থে বিজ্ঞান ধর্মের স্থলাভিষিক্ত হয় এবং বিজ্ঞানের নামে যা কিছু উপস্থাপিত হয় লোকেরা তাকেই অভ্রান্ত বলে অন্ধভাবে বিশ্বাস করতে থাকে। ফলে যে কোনো বক্তব্য গ্রহণ করানোর জন্যে সহজতম পন্থা হয়ে দাঁড়ায় তা বিজ্ঞানের নামে উপস্থাপন করা।

এ প্রবণতার কারণে পাশ্চাত্যে বিজ্ঞানের নামে এমন অনেক দাবী উপস্থাপন করা হয় যা পরবর্তীকালে অকাট্যভাবে ভ্রান্ত বলে প্রমাণিত হয়েছে অথবা সুস্পষ্ট হয়ে গেছে যে, সংশ্লিষ্ট তত্ত্বটি অকাট্যভাবে প্রমাণিত হয় নি। কিন্তু তা সত্ত্বেও সাধারণ মানুষ, বিশেষ করে হীনমন্যতায় আক্রান্ত প্রাচ্যের পাশ্চাত্যানুসারীরা তাকে অন্ধভাবে বিশ্বাস করতেই থাকে। ডারউইন- তত্ত্ব এ ধরনেরই একটি তত্ত্ব।

এ প্রসঙ্গে সর্বপ্রথম যে কথাটি উল্লেখ করা প্রয়োজন মনে করি তা হচ্ছে, অনেকে ডারউইনের বিবর্তন বা ক্রমবিকাশ তত্ত্বের ভিত্তিতে সৃষ্টিকর্তার প্রয়োজনীয়তাকে অস্বীকার করতে চাইছে যদিও

তা এক মূর্খতাব্যঞ্জক উপসংহার বৈ নয়। কারণ, বিবর্তনবাদ দ্বারা সৃষ্টিকর্তার অস্তিত্বের অপরিহার্যতা অপ্রমাণিত হয় না।

বস্তুতঃ প্রাণের সৃষ্টি ও প্রজাতিসমূহের উদ্ভব যদি বিবর্তনের মধ্য দিয়ে ঘটে থাকে তাহলেও এটা অনস্বীকার্য যে, তা ‘কারণ ও ফলাফল বিধি’র আওতায় (যাকে সাধারণতঃ ‘কার্যকারণ বিধি’ বলা হয়ে থাকে) সংঘটিত হয়েছিল।

কথিত বিবর্তনের বিধি সহ সকল প্রাকৃতিক বিধি এমনই সূক্ষ্ম ও নির্ভুল হিসাবনিকাশভিত্তিক - জ্ঞানিক বিধি যেবৈ, একজন সর্বজ্ঞ মহাবিজ্ঞানী ব্যতীত কারো পক্ষে এ সব বিধি তৈরী করা সম্ভব নয়; নিজে নিজেই এ সব বিধি তৈরী ও কার্যকর হওয়ার তো প্রশ্নই ওঠে না। এ ‘পরিবর্তনশীল বা বিবর্তনশীল’ বিশ্ব ও তার মধ্যস্থ অসংখ্য প্রাণশীল অস্তিত্ব ও প্রাণহীন বস্তুর উদ্ভব বা অন্ততঃ প্রথম সূচনার জন্যে পরিবর্তন ও বিবর্তনের উর্ধে একটি পরম বিজ্ঞানী উৎসের অস্তিত্ব অপরিহার্য। অন্যথায় অস্তিত্বজ -গতের সূচনাকে ব্যাখ্যা করা যায় না। কারণ, সৃষ্টির সূচনা কথিত প্রসারিত ‘আদি বস্তু’ থেকেই হোক বা ‘আদি কণিকা’ (Primary Particle) থেকেই হোক, তার উৎস এবং তাতে সৃষ্ট আলোড়ন বা বিস্ফোরণ যা অবশ্যই সুপরিকল্পিত বা উদ্দেশ্যমুখী) সৃষ্টির জন্যে একটি কারণের প্রয়োজন (ছিলোএবং অনিবার্যভাবেই সে কারণকে পরম ইচ্ছাশক্তি, পরম জ্ঞান ও সীমাহীন শক্তিক্ষমতার অধিকারী হতে হবে। এ রকম একজন সত্তার - ন ও দর্শন সৃষ্টিপ্রক্রিয়ার ব্যাখ্যা দিতে গিয়ে এক সময়অস্তিত্ব মেনে নেয়া ছাড়া সকল বিজ্ঞা‘জানি না’ বলে মুখ থুবড়ে পড়তে বাধ্য। আর ‘জানি না’ বলার পরে সংশ্লিষ্ট তত্ত্বের গোটাটাই ধ্বসে পড়তে বাধ্য।

অন্যদিকে যারা বলে, ‘এমনিতেই ছিলো’ বা ‘এমনিই হয়েছিলো’ তারা তাদের না- জানার কথা স্বীকার করার মতো সৎ সাহসও রাখে না এবং স্বীয় অজ্ঞতাকে অস্বীকার করতে গিয়ে প্রকারান্তরে কারণ ও ফলাফল বিধির দাবীকেও অস্বীকার করছে।

যা- ই হোক, সৃষ্টিকর্তার অস্তিত্বের বিষয়টি একটি স্বতঃপ্রমাণিত বিষয়। এখন প্রশ্ন হচ্ছে, তিনি কীভাবে এ বিশ্বলোক ও তার অন্তর্ভুক্ত সব কিছু সৃষ্টি করেছেন? প্রতিটি বস্তু ও প্রাণীপ্রজাতিকে স্বত ভাবে সৃষ্টি করেছেন, নাকি বিবর্তনপ্রক্রিয়ায়?

বলা বাহুল্য যে, সৃষ্টিকর্তা চাইলে প্রতিটি সৃষ্টিকে স্বত ভাবে সৃষ্টি করতে পারেন, আবার চাইলে কারণ ও ফলাফল বিধিকে এমনভাবে বিন্যস্ত করে দিতে পারেন যাতে বিবর্তনের প্রক্রিয়ায় যথাসময়ে একেকটি বস্তু ও প্রজাতির আবির্ভাব ঘটবে। এ ব্যাপারে তিনি পুরোপুরি স্বাধীন এবং উভয় অবস্থায়ই সমগ্র সৃষ্টি তাঁর মুখাপেক্ষী। তিনি এ দু'টি প্রক্রিয়ার কোনটি অবলম্বন করেছেন তা আমরা প্রত্যক্ষ ও পর্যবেক্ষণ করতে পারি নি, কারণ তা সুদূর অতীতের এমন এক সময়ের ব্যাপার যে সময়ের কোনো অকাট্য দলীল (Document) বা সাক্ষ্য (Evidence) থাকা সম্ভব নয়।

সৃষ্টিলোকের নিদর্শনাদির পরীক্ষামূলক বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণের মাধ্যমেও এ ব্যাপারে অকাট্য ধারণায় উপনীত হওয়া সম্ভব নয়, কারণ পরীক্ষামূলক বিজ্ঞান এখনো ততোখানি অগ্রগতি হাসিল করতে পারে নি; হয়তো ভবিষ্যতে কখনো হবে।

তবে পর্যবেক্ষণ থেকে অকাট্যভাবে এ ধারণায় উপনীত হওয়া যায় যে, প্রাণহীন বস্তুর প্রাকৃতিক পরিবর্তনসমূহ একটি পূর্বনির্ধারিত সুদীর্ঘকালীন যা ি ক প্রক্রিয়ায় তথা বিবর্তনপ্রক্রিয়ায় সংঘটিত হয়েছে। কিন্তু প্রাণীপ্রজাতিসমূহের উদ্ভব যা ি ক প্রক্রিয়ায় হওয়ার সম্ভাবনা পর্যবেক্ষণ ও যৌক্তিক উপসংহার কোনোটাতেই প্রমাণিত হয় না।

আজ পর্যন্ত বিজ্ঞানীরা এমন কোন যা ি ক প্রাকৃতিক বিধির সন্ধান পান নি যার ফলে কোনো প্রাণশীলের হস্তক্ষেপ ছাড়াই নিষ্প্রাণ পদার্থ থেকে স্বয়ংক্রিয়ভাবে প্রাণের বা প্রাণশীল কোনকিছু (এমনকি তা এক কোষ বিশিষ্ট অণুজীব হলেও) অস্তিত্বলাভ করতে পারে।

প্রকৃত পক্ষে বস্তুজগতে প্রাণের প্রথম বিকাশ এক মহাবিস্ময়। অন্যদিকে বিভিন্ন প্রজাতির মধ্যকার পার্থক্যগুলোও এমন যে, কারো হস্তক্ষেপ ছাড়া কেবল পরিবেশগত পরিবর্তনের কারণেই এক প্রজাতি থেকে অন্য প্রজাতির উদ্ভব ঘটা সম্ভব নয়। কারণ, বিভিন্ন প্রজাতির মধ্যকার পার্থক্য কেবল বাহ্যিক বা শারীরিক পার্থক্যই নয়, বরং অভ্যন্তরীণ পার্থক্যও বটে। অবশ্য একই

প্রজাতির বিভিন্ন শাখা- প্রশাখার মধ্যে (যাদের ক্রোমোজম্- সংখ্যা অভিন্ন ও জেনেটিক বৈশিষ্ট্য প্রায়- অভিন্ন) পরিবেশগত পরিবর্তনের কারণে (অভ্যাস পরিবর্তনও যার ওপর নির্ভরশীল) বাহ্যিক পার্থক্য গড়ে উঠতে পারে। কিন্তু দু'টি নিকটতর প্রজাতির মধ্যে ক্রোমোজমের পার্থক্য ও জেনেটিক গঠনের উল্লেখযোগ্য পার্থক্য পরিবেশগত পরিবর্তনের কারণে গড়ে উঠতে পারে না। এ ধরনের পরিবর্তনের দাবীদার ডারউইন বা তাঁর উত্তরসুরিরা তাঁদের এ সংক্রান্ত দাবীর সপক্ষে কোনো অকাট্য প্রমাণ (পরীক্ষণীয় বা পর্যবেক্ষণীয়) পেশ করতে পারেন নি।

ডারউইন ও তাঁর উত্তরসুরিগণ প্রজাতিবৈচিত্র্যের যে বিবর্তনবাদী ব্যাখ্যা দিয়েছেন তাতে তাঁরা বিভিন্ন স্তরের যে সব দৃষ্টান্ত পেশ করেছেন কয়েকটি কারণে তা থেকে তাঁদের দাবী প্রমাণিত হয় না। প্রথমতঃ বিবর্তন তত্ত্বের দাবী অনুযায়ী বিদ্যমান দু'টি নিকটতর প্রজাতির মাঝামাঝি আরো বহু প্রজাতির অস্তিত্ব থাকা অপরিহার্য যাদের প্রতি দু'টির মধ্যে খুব সামান্য পার্থক্য থাকবে। কিন্তু বাস্তবে তা নেই।

যে কোনো নিকটতর দুই প্রজাতির মধ্যে পার্থক্য এতোই বেশী যে, এক প্রজাতি থেকে অপর প্রজাতিতে উত্তরণ বিবর্তনের সাথে সামঞ্জস্যশীল সর্পগতিতে সম্ভব নয়, বরং কেবল ভেকগতিতে সম্ভব। আর বলা বাহুল্য যে, ভেকগতি বিবর্তন (Evolution) প্রমাণ করে না, বরং 'পরিবর্তন ঘটানো' (Revolution) প্রমাণ করে। অর্থাৎ কোনো সজ্ঞান শক্তির হস্তক্ষেপের ফলেই এরূপ পরিবর্তন সম্ভব। উদাহরণস্বরূপ, মানুষ ও তার নিকটতম প্রজাতি শিম্পাঞ্জী বা ওরাংওটাংএর মধ্যকার পার্থক্যের কথা বিবেচনা করা যেতে পারে। -

মানুষ ও শিম্পাঞ্জী বা ওরাংওটাং- এর মধ্যে শুধু দৈহিক আকৃতি ও বৈশিষ্ট্যগত পার্থক্যই বিরাট নয়, বরং তাদের অভ্যন্তরীণ বস্তুগত পার্থক্য আরো বেশী। কারণ, তাদের ক্রোমোজমের সংখ্যা এক নয় এবং তাদের জেনেটিক বৈশিষ্ট্যে পার্থক্য বিস্ময়কররূপে বেশী। বানর থেকে মানুষে উত্তরণের দাবীর সপক্ষে যুক্তি দেখাতে গিয়ে কেউ কেউ সাম্প্রতিক যে আবিষ্কারকে প্রমাণ হিসেবে পেশ করার চেষ্টা করেছেন তা হচ্ছে, মানুষ ও শিম্পাঞ্জীর ডিএনএ- র মধ্যে ৯৫ শতাংশ মিল

রয়েছে। তাঁরা অবশিষ্ট ৫ শতাংশ অমিলকে গুরুত্ব দিতে চান নি। অথচ এই পাঁচ শতাংশ পার্থক্য হচ্ছে এমন মৌলিক পার্থক্য যার বদৌলতে মানুষ সমগ্র প্রজাতিকুলের ওপর আধিপত্য করছে। একজন মানুষের মস্তিষ্কের একেকটি স্মৃতিকোষের ক্ষমতা একেকটি সুপার কম্পিউটারের সমান, আর একজন মানুষের মস্তিষ্কের স্মৃতিকোষের সংখ্যা ১০০ কোটি। এর সাথে একটি শিম্পাঞ্জীর স্মৃতিকোষের ক্ষমতা ও সংখ্যার তুলনা করুন।

দ্বিতীয়তঃ শিম্পাঞ্জী থেকে বিবর্তনপ্রক্রিয়ায় মানুষে উত্তরণের ধারণা মেনে নিলে এ দুই প্রজাতির মধ্যবর্তী আরো শত শত প্রজাতির অস্তিত্ব থাকা অপরিহার্য। কিন্তু বাস্তবে তা নেই। এমনকি ফসিল থেকে যে সব নিদর্শন পাওয়া গেছে তার সাহায্যে কোনোভাবেই এ ‘বিবর্তন- চেইন’ তৈরী করা সম্ভব নয়। মধ্যবর্তী প্রজাতিগুলো পুরোপুরি বিলুপ্ত হয়ে যাবার দাবীও গ্রহণযোগ্য নয়। কারণ, শিম্পাঞ্জী টিকে থাকবে, কিন্তু তা থেকে উদ্ভূত উন্নততর অসংখ্য প্রজাতির সবগুলোই পুরোপুরি বিলুপ্ত হয়ে যাবে, আবার এ ধারাক্রমে উদ্ভূত সর্বশেষ প্রজাতি মানুষ পুরোপুরি টিকে থাকবে - এরূপ দাবী একেবারেই অযৌক্তিক। বিবর্তন তত্ত্ব সঠিক হলে মানুষ ও শিম্পাঞ্জীর মধ্যবর্তী প্রজাতিসমূহের অন্ততঃ কতগুলোর কিছু শাখা- প্রশাখা টিকে থাকতো।

যদিও এমন কোনো কোনো প্রাণীর পূর্ণাঙ্গ বা অপূর্ণাঙ্গ ফসিল পাওয়া গেছে যেগুলোকে শিম্পাঞ্জীর চেয়ে উন্নততর এবং বর্তমান মানুষের চেয়ে নিম্নতর মধ্যবর্তী প্রজাতির বলে দাবী করা হয়েছে, তবে তা বর্তমান মানুষের পূর্বপুরুষ না হয়ে মানুষের সাথে সম্পর্করহিত কোনো স্বত প্রজাতিও হতে পারে যা কোনো না কোনো কারণে কালের প্রবাহে হারিয়ে গিয়ে থাকবে। এমনকি এ ধরনের ফসিল বর্তমান মানুষেরই সমপ্রজাতির কোনো শারিরীক ত্রুটিপূর্ণ সদস্যেরও হতে পারে এবং আমাদের থেকে তার পার্থক্য বর্তমান মানব প্রজাতির মধ্যকার ত্রুটিহীন উন্নততর ও ত্রুটিপূর্ণ নিম্নতর ব্যক্তির মধ্যকার পার্থক্যের সমতুল্য হতে পারে যাকে পর্যবেক্ষণক্ষমতার সীমাবদ্ধতার কারণে স্বত প্রজাতি মনে করা হয়েছে।

এ প্রসঙ্গে উল্লেখ্য যে, এ ধরনের ফসিলের সংখ্যা খুবই কম, একটি প্রজাতির অস্তিত্ব সম্পর্কিত সিদ্ধান্ত গ্রহণের জন্য যা মোটেই যথেষ্ট নয়। বিশেষ করে উন্নততর বুদ্ধিসম্পন্ন কোনো প্রজাতির

(যেমন: বানর ও মানুষ) ক্ষেত্রে খাদ্যাভাবে পুরো প্রজাতিরই ধ্বংস হয়ে যাওয়া অকল্পনীয়, কারণ, তাদের খাদ্যতালিকা অনেক প্রশস্ত। এরূপ প্রজাতির পুরোটা ধংস হয়ে যাওয়া কেবল ব্যাপক বিস্তৃত ভূমিকম্পে চাপাপড়ার মতো দুর্ঘটনার ফলেই সম্ভব। আর সে ক্ষেত্রে বিপুল সংখ্যক ফসিল- নিদর্শন প্রাপ্তিই স্বাভাবিক। এমনকি প্রাপ্ত ফসিলকে যদি শিম্পাঞ্জীর উত্তর পুরুষ ও মানুষের পূর্বপুরুষ কোনো মধ্যবর্তী প্রজাতির বলে ধরেও নেই তথাপি প্রশ্ন থেকে যায় যে, এর পূর্ববর্তী ও পরবর্তী অসংখ্য প্রজাতির কোনো নিদর্শনই থাকবে না এটা কেমন কথা?

বিষয়টি অন্য এক দৃষ্টিকোণ থেকেও দেখা যেতে পারে। তা হচ্ছে, বিভিন্ন প্রজাতির মধ্যকার গুণগত বৈশিষ্ট্যের পার্থক্যের দিকে গভীরভাবে দৃষ্টি দিলে বহু বিস্ময়কর বিষয় ধরা পড়ে। তবে লক্ষ্য করা যায় যে, মানুষ ও অন্যান্য প্রজাতির মধ্যকার গুণগত পার্থক্য সর্বোচ্চ বিস্ময়কর মাত্রায় অবস্থান করছে।

মানুষ ও অন্যান্য প্রজাতির মধ্যে সবচেয়ে বড় পার্থক্য হচ্ছে এই যে, অন্যান্য প্রজাতি প্রধানতঃ সহজাত প্রবণতা দ্বারা পরিচালিত হয় এবং মানুষের নিকটতর প্রজাতিসমূহেরও বুদ্ধিমত্তার (Intellect) পরিমাণ মানুষের তুলনায় খুবই কম। অন্যদিকে মানুষের প্রধান বৈশিষ্ট্যই হচ্ছে তার বুদ্ধিবৃত্তিকতা এবং তার মধ্যে নিহিত সম্ভাবনা যা থে (বা প্রতিভা)কে অন্যান্য প্রজাতি বঞ্চিত।

আবার অনেক ক্ষেত্রে কাছাকাছি প্রজাতিসমূহের মধ্যেও সহজাত প্রবণতায় বিস্ময়কর পার্থক্য বিদ্যমান। উদাহরণস্বরূপ, মৌমাছি যেভাবে মৌচাক তৈরী ও মধু উৎপাদন করে কাছাকাছি প্রজাতি হওয়া সত্ত্বেও বোলতা বা ভ্রমর তা পারে না বা দেখেও তাদের মধ্যে তা শেখার প্রবণতা তৈরী হয় না। অনুরূপভাবে চড়ুই পাখী ও বাবুই পাখী বাহ্যতঃ খুবই কাছাকাছি হলেও চড়ুইর মনে কখনো বাবুইর মতো শিল্পসমৃদ্ধ বাসা তৈরীর আগ্রহ জাগে না যদিও প্রকৃতিতে এর উপাদানের কোনোই অভাব নেই।

ডারউইন- তত্ত্বে পরিবেশগত পরিবর্তন ও তার অনিবার্য দাবী হিসেবে প্রয়োজনের তাগিদে অভ্যাস পরিবর্তনকে প্রজাতিসমূহের বিবর্তনের সর্বপ্রধান কারণ বলে দাবী করা হয়েছে। কিন্তু উদ্ভিদ জগতের বৈচিত্র্যকে এর আলোকে ব্যাখ্যা করা মোটেই সম্ভব নয়। উদাহরণস্বরূপ,

ট্রাভের্লাস্ ট্রি- র পাতাগুলো কলাগাছের পাতার ন্যায় গাছটির চারদিকে বিস্তৃত না হয়ে দুই দিকে সুবিন্যস্ত হয়ে এক অনুপম সৌন্দর্য সৃষ্টি করে। কোন্ প্রয়োজন এবং কোন্ অভ্যাস তাকে এ পর্যায়ে নিয়ে এসেছে? বরং এর একটাই ব্যাখ্যা হতে পারে, তা হচ্ছে, কোনো সৌন্দর্যবোধসম্পন্ন মহাশিল্পী স্রষ্টা সৌন্দর্য সৃষ্টির লক্ষ্যেই তাকে এভাবে সৃষ্টি করেছেন।

এক ধরনের ফুল আছে যার বিকশিত অবস্থা দেখে মনে হয়, একটি ফুলের ওপর একটি কালো প্রজাপতি বসে আছে। এটা কীভাবে সম্ভব হলো? ফুল নিজেই কি নিজের প্রয়োজনে এমন রূপ ধারণ করেছে? তাহলে তো তাকে মানুষ- বিজ্ঞানীদের চেয়েও বড় এক মহাবিজ্ঞানী শিল্পী বলতে হবে। নাকি কোনো মহাবিজ্ঞানী শিল্পী ইচ্ছাকৃতভাবেই সৌন্দর্য সৃষ্টির লক্ষ্যেই তাকে এমন করেই সৃষ্টি করেছেন?

উদ্ভিদজগতের অসংখ্য প্রজাতির বীচি থেকে চারা গজায় এবং প্রাথমিক অবস্থায় বীচির শাস তার নতুন চারার খাদ্য হিসেবে ব্যবহৃত হয়। কিন্তু কোনো কোনো প্রজাতির উদ্ভিদের বীচির ওপরে কেবল একটা খোসা থাকে এবং কোনো কোনো প্রজাতির উদ্ভিদে ফল হয় ও ফলের মধ্যে বীচি হয়। ঐ ফল উদ্ভিদটির বা তার চারার কোনো কাজেই লাগে না। তবে কি কোনো স্রষ্টা পশু- পাখী ও মানুষের খাদ্য হিসেবেই ঐসব ফল সৃষ্টি করেছেন?

তেমনি ওষধি উদ্ভিদসমূহে মানুষের (এবং অংশতঃ পশুপাখীর) রোগব্যাধি ও দুর্ঘটনাজনিত ক্ষত ও ব্যথা- বেদনার চিকিৎসার উপাদান নিহিত রয়েছে যা সংশ্লিষ্ট উদ্ভিদের নিজের কোনো কাজেই লাগে না। কোনো মহাবিজ্ঞানী স্রষ্টা কি মানুষ ও অন্যান্য প্রাণীর চিকিৎসার জন্যই এগুলো সৃষ্টি করেছেন?

শুধু উদ্ভিদজগত কেন, প্রাণীজগতেও অনুরূপ দৃষ্টান্তের অভাব নেই। ময়ূরের লেজে যে সুদীর্ঘ মনোহারী পালক আছে তা তার নিজের কোন্ কাজে লাগে? বিশেষ করে পুরুষ ময়ূর যে পেখম মেলে নাচে তা কি কেবল স্ত্রী ময়ূরকে আকৃষ্ট করার জন্যে? যে সব প্রজাতির পাখীর ময়ূরের ন্যায় সুদীর্ঘ মনোহারী পালক নেই সে সব প্রজাতির স্ত্রী পাখীরা কি পুরুষ পাখীদের প্রতি আকৃষ্ট হয় না? তাহলে ময়ূরের সুদীর্ঘ মনোহারী পালক গজানো, বিশেষতঃ পুরুষ ময়ূরের মধ্যে পেখম মেলে

নাচার সহজাত প্রবণতার পিছনে কি কোনো মহাবিজ্ঞানী মহাশিল্পীর পরিকল্পনা রয়েছে - যার অন্যতম, বরং প্রধান, উদ্দেশ্য হচ্ছে এক অনুপম সৌন্দর্য সৃষ্টি এবং সে সৌন্দর্য দ্বারা অন্য কোনো প্রজাতিকে, ধরুন মানুষকে, আনন্দদান করা?

পুরুষ সিংহের কেশরের পিছনেও কি অনুরূপ উদ্দেশ্য নিহিত?

যে ছোট্ট মাছটির লেজ ও পাখনা তার শরীরের প্রায় সমান আয়তনের যা দেখতে মসৃণ রেশমী কাপড়ের মতো - যে জন্য তাকে হাত বুলিয়ে আদর করতে ইচ্ছা করে, তা কি এ জন্য যে, মানুষ তাকে সযত্নে অ্যাকুরিয়ামে রেখে লালন- পালন করবে এবং তার সৌন্দর্য দেখে নয়ন পরিতৃপ্ত করবে?

অনেক মানুষ যেখানে ডলফিন হত্যা করে ভক্ষণ করে তা সত্ত্বেও ডলফিন কেন মানুষকে এতো পসন্দ করে এবং তার সাথে বন্ধুসুলভ আচরণ করে? তার কোন্ প্রয়োজন পূরণের জন্যে তার মধ্যে এ সহজাত প্রবণতা গড়ে উঠেছে?

পাখীর পাখা কি তার প্রয়োজনের কারণেই গজিয়েছে? মানুষেরও তো পাখার প্রয়োজন ছিল; অন্ততঃ বিমান তৈরীর পূর্ব পর্যন্ত। মানবপ্রজাতির অস্তিত্বের ইতিহাসে সম্ভবতঃ এমন কোনো যুগই ছিলো না যখন মানুষ পাখার অভাব বোধ করে নি এবং পাখা কামনা করে নি। কিন্তু তা সত্ত্বেও লক্ষ লক্ষ বছরেও কেন তার পাখা গজালো না? সে কি এ কারণে যে, তার সৃষ্টিকর্তা জানতেন যে, তার পাখা থাকলে সে পাখা নিয়েই সন্তুষ্ট থাকবে; স্পেসশিপ্ তো দূরের কথা, কোনোদিনই বিমান তৈরী করতে পারবে না?

মোদ্দা কথা, অনস্বীকার্য যে, প্রজাতিসমূহের উদ্ভব কোনো স্রষ্টা ছাড়া নিজে নিজে হয় নি। অবশ্য সৃষ্টিকর্তা চাইলে এমন একটি প্রোগ্রামের মাধ্যমে সৃষ্টির সূচনা করতে পারতেন যার ফলে স্বয়ংক্রিয়ভাবে বিবর্তন- প্রক্রিয়ায় প্রজাতিসমূহ সৃষ্টি হতো। কিন্তু তাহলে একবার সৃষ্টির সূচনা করে দেয়ার পর আর তাঁর কোনো কিছু করণীয় থাকতো না। কিন্তু সীমাহীন ক্ষমতার অধিকারী স্রষ্টা সদাই নিত্য নতুন সৃষ্টিকে অস্তিত্বদান করতে থাকবেন এটাই স্বাভাবিক; বিচারবুদ্ধির দাবীও এটাই।

তাছাড়া পর্যবেক্ষণ প্রমাণ করে যে,   প্রজাতিসমূহের উদ্ভব সর্প- গতিতে বা ক্রমবিবর্তনের মাধ্যমে ঘটে নি,   বরং ভেকগতিতে ঘটেছে। সে ক্ষেত্রে দু'টি প্রক্রিয়ায় তা হতে পারে: কোনো প্রজাতির কতক সদস্যের ওপর জেনেটিক অপারেশন চালিয়ে,   অথবা প্রাথমিক বা মৌলিক উপাদান দিয়ে পুরোপুরি নতুনভাবে সৃষ্টি। এর কোনো প্রক্রিয়াই সৃষ্টিকর্তার জন্য অমর্যাদাকর নয়। বিজ্ঞানের পক্ষে এখনো নিশ্চিত করে বলা সম্ভব নয় যে,   এ দু'টি প্রক্রিয়ার মধ্যে কোনটি অবলম্বন করা হয়েছিলো। তবে ধর্মীয় সূত্রের বর্ণনা অনুযায়ী,   অন্ততঃ মানুষকে মৌলিক উপাদান দ্বারা সরাসরি সৃষ্টি করা হয়েছে।

(সাপ্তাহিক রোববার,   ঢাকা: **১২ই নভেম্বর ২০০৬** সংখ্যায় প্রকাশিত)

পরিশিষ্ট- ২

স্রষ্টা ও পরকাল অস্বীকারবিজ্ঞানের নামে স্টিফেন হকি ়ংএর মূর্খতা -

পাশ্চাত্যের কতক বস্তুবিজ্ঞানী বিজ্ঞানের নামে ধর্মের মৌলিকতম বিষয় সৃষ্টিকর্তা ও মৃত্যুপরবর্তী জীবনের অস্তিত্বকে অস্বীকার করছেন, যদিও তাঁরা কেবল বিজ্ঞানের বিশেষ বিশেষ শাখায় বিশেষজ্ঞ, বস্তু- উর্ধ জগৎ সম্বন্ধে জ্ঞান রাখেন না। এ ধরনের আচরণকারীদের কাতারে সর্বশেষ যে বিখ্যাত বস্তুবিজ্ঞানীর নাম যুক্ত হয়েছে তিনি হলেন বৃটিশ বিজ্ঞানী স্টিফেন হকিং।

স্টিফেন হকিং বিশ্বলোকের সৃষ্টি সম্পর্কে তাঁর বিগ ব্যাং তত্ত্ব প্রচার করলে অত্যন্ত দ্রুত তা বিশ্বব্যাপী ছড়িয়ে পড়ে ও প্রায় সকলের কাছে গ্রহণযোগ্য বলে মনে হয়; তিনি এ বিষয়ে এ ি ফ্ হিস্ট্রি অব্ টাইম্ শিরোনামে যে পুস্তক লিখেছেন তা বিশ্বের অন্যতম বহুল প্রচারিত পুস্তকে পরিণত হয়।

বিগ্ ব্যাং তত্ত্বের মৌলিক দুর্বলতা

স্টিফেন হকিং- এর বিগ্ ব্যাং তত্ত্ব প্রকৃত অর্থে আদৌ কোনো বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব নয়, বরং এটি অনেকটা সায়েন্স ফিকশন ধরনের গালগল্প মাত্র। কারণ, বস্তুবিজ্ঞানে যে কোনো তত্ত্বই কেবল বাস্তব পরীক্ষা- নিরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়ার পরেই তা গ্রহণযোগ্য হিসেবে বিবেচিত হতে পারে। কিন্তু তিনি এমন এক তত্ত্ব উপস্থাপন করেছেন যা প্রমাণ করা তাঁর এবং যে কারো সাধ্যের অতীত। কারণ, বিশ্বের সৃষ্টির সূচনা কীভাবে হয়েছিলো তা না গবেষণাগারে অনুরূপ ঘটনার পুনরাবৃত্তি ঘটিয়ে প্রমাণ করা সম্ভব, না ঐ ঘটনার ভিডিও ছবি ধারণ করা ও তা দেখানো কারো পক্ষে সম্ভব।

এমনকি বস্তুবিজ্ঞানের আলোকেও বিগ্ ব্যাং তত্ত্বে যে সব মৌলিক দুর্বলতা রয়েছে এবং তিনি যে সব প্রশ্নের জবাব দিতে সক্ষম হন নি সেদিকে তেমন একটা দৃষ্টি দেয়া হয় নি। বিস্তারিত আলোচনায় না গিয়ে এখানে এ তত্ত্বের মাত্র কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ দুর্বলতার দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করা যেতে পারে।

তিনি ‘আদি বস্তুকণা’ থেকে সৃষ্টির সূচনার দাবী করেছেন। কিন্তু তিনি বলেন নি এ ‘আদি বস্তুকণা’ কোত্থেকে এলো? কোনো অবস্তুগত সজ্ঞান শক্তি কর্তৃক পরিকল্পিত অস্তিত্ব প্রদান করা না হলে ‘বস্তুকণা’র অস্তিত্বমানতা কী করে সম্ভব হতে পারে? এটি কী কোনো উৎস ছাড়াই অস্তিত্ব লাভ করেছিলো? বস্তুবিজ্ঞানের দৃষ্টিতে কোনো উৎস বা উপাদান ছাড়া কি একটি বস্তুকণার অস্তিত্ব লাভ সম্ভব? যদি তা বিভিন্ন উপাদানের দ্বারা তৈরী হয়ে থাকে তাহলে সে উপাদানগুলোর উৎস কী? কোন্ নিয়মে এ সব উপাদানে এটি গঠিত হলো এবং সে সব নিয়মের উৎস কী? আদি বস্তুকণা যদি যৌগিক হয়ে থাকে তাহলে এ প্রশ্নের জবাব দিতে হবে, আর যদি অ- যৌগিক হয়ে থাকে তাহলে তা বিভাজিত হয়ে সৃষ্টির সূচনা হতে পারে না।

বস্তুর ধর্ম হলো তাতে কোনো শক্তি (তা যে ধরনের শক্তিই হোক না কেন) ক্রিয়া না করলে একটি বস্তু অনন্ত কাল একই অবস্থায় (স্থির বা গতিশীল) থাকবে; বিভাজন, বিস্ফোরণ, স্থানান্তর,

গতিশীলতা অর্জন বা গতিরোধ হওয়া নির্বিশেষে কোনো ধরনের গতিশীলতাই তাতে সৃষ্টি হবে না। কিন্তু স্টিফেন হকিং আদি বস্তুকণায় যে বিস্ফোরণের কথা বলেছেন সে বিস্ফোরণ কোন্ শক্তির প্রভাবে হয়েছে তা তিনি বলতে পারেন নি।

কেবল কোনো শক্তি ক্রিয়া করলেই যে কোনো বস্তুতে কাঙ্ক্ষিত পরিবর্তন সাধিত হবে না, বরং ঐ বস্তুর মধ্যে যে সম্ভাবনা নিহিত আছে কেবল সে ধরনের পরিবর্তনই সম্ভবপর এবং ঐ সম্ভাবনার বিকাশের জন্য যে কোনো শক্তির প্রভাবই যথেষ্ট নয়, বরং বিশেষ শক্তি ও বিশেষ ধরনের প্রয়োগই কাঙ্ক্ষিত ফলাফল দেবে। এখন প্রশ্ন হচ্ছে, আদি বস্তুকণায় কি বর্তমান বিশ্বলোকের সৃষ্টির সম্ভাবনা নিহিত ছিলো, নাকি ছিলো না? থেকে থাকলে এ সম্ভাবনা কোন্ উৎস থেকে তাতে প্রদত্ত হয়েছিলো? দ্বিতীয়তঃ তাতে যে শক্তির প্রভাবে বিস্ফোরণ ঘটে সৃষ্টিপ্রক্রিয়া শুরু হলো সে শক্তির উৎস কী?

বস্তুর আরেকটি ধর্ম হলো কোনো বস্তু যদি সমভাবে বিন্যস্ত অভিন্ন উপাদানে গঠিত হয়ে থাকে তাহলে তার কেন্দ্রে শক্তি প্রয়োগ করা হলে তথা বিস্ফোরণ ঘটালে এবং তার বাইরে যদি কোনো কিছুই তার পথে বাধা না হয় বা তার ওপর প্রতিক্রিয়া না করে তাহলে তা সমভাবে ছড়িয়ে পড়বে; একে একটি প্রসারমান গোলাকার বস্তুর সাথে তুলনা করা যেতে পারে। এ ধরনের বিস্ফোরণের পরিণতিতে বিচিত্র ধরনের সৃষ্টি সম্ভব নয়। কেবল কোনো পরিকল্পিত বিস্ফোরণ থেকেই বৈচিত্র্যময় সৃষ্টি সম্ভব হতে পারে।

একটি আতশবাযী বিস্ফোরিত হয়ে আকাশে একটি নির্দিষ্ট দূরত্বে যাবার পর তা থেকে যে একটি ফুলের বা অন্য কোনো বস্তুর আকৃতি প্রকাশিত হয় তার কারণ আতশবাযীটি বিভিন্ন উপাদান দ্বারা তৈরী করা হয় এবং তা এমন সুপরিকল্পিতভাবে বিন্যস্ত করা হয় যে, তা বিস্ফোরিত হবার পর নির্দিষ্ট দূরত্বে গিয়ে একটি ফুলরূপে প্রকাশিত হবে। বলা বাহুল্য যে, এটা কেবল সজ্ঞান পরিকল্পনাবিদের পরিকল্পনার ফলেই সম্ভব। আর এর পরিবর্তে যদি কেবল একক কোনো বিস্ফোরণ- উপাদানের একটি গোলকের কেন্দ্রে বিস্ফোরণ ঘটানো হয় তাহলে বাইরে কোনো শক্তি (মাধ্যাকর্ষণ বা অন্য কিছু) ক্রিয়া না করলে তা বিস্ফোরিত হয়ে গোলক আকারে তার

প্রসারতা অব্যাহত থাকবে; অবশ্য সে ক্ষেত্রেও তা বিস্ফোরণ সৃষ্টিকারী থেকে মুখাপেক্ষিতাহীন নয়।

এ থেকে সুস্পষ্ট যে, সুপরিকল্পিত বিস্ফোরণ ছাড়া আদি বস্তুকণা থেকে বর্তমান বিশ্বলোক অস্তিত্বলাভ করতে পারে না। কারণ, সে ক্ষেত্রে বস্তুকণাগুলো চতুর্দিকে অনন্তকাল ধরে অভিন্ন গতিতে ছুটে যেতে থাকবে এবং সেগুলোর কোনোটির সাথে কোনোটির সংঘাত হবে না বিধায় না কোনোটির গতি ব্যাহত হবে, না কোনোটিতে নতুন গতি সৃষ্টি হবে। ফলে জ্যেতিষ্কমণ্ডলীর অস্তিত্বলাভ সম্ভব নয়।

এরপর আসে নিষ্প্রাণ বস্তুকণা থেকে প্রাণের অস্তিত্বলাভের প্রশ্ন। অবশ্য এটা অপরিহার্য নয় যে, অন্য কোনো মাত্রার জগৎ থেকে প্রাণ এনে বস্তুতে প্রদান করে প্রাণীকুলের উদ্ভব ঘটাতে হবে, বরং সরাসরি বস্তুর ভিতরেও প্রাণের উৎপত্তি ঘটানো হতে পারে। কিন্তু সুনির্দিষ্ট নিয়মে বস্তুতে ক্রিয়া- প্রতিক্রিয়া না ঘটা পর্যন্ত তাতে প্রাণের সৃষ্টি হতে পারে না। আর সে জন্য কোনো না কোনো পরিকল্পনাবিদের হস্তক্ষেপ অপরিহার্য।

স্টিফেন হকিং যখন তাঁর বিগ ব্যাং তত্ত্ব পেশ করেন তখন বিশ্বজগতের কোনো স্রষ্টা আছেন কিনা সে সম্বন্ধে নির্লিপ্ততা দেখান। তিনি আদি বস্তুকণা থেকে শুরু করেন; আদি বস্তুকণা কোত্থেকে এলো সে সম্বন্ধে নীরব থাকেন। অবশ্য তাঁর এ ি ফ্ হিস্ট্রি অব্ টাইম্ পুস্তকে যে চেতনা প্রতিফলিত হয়েছে তা সৃষ্টিকর্তার অস্বীকৃতির চেতনা, যদিও তাতে তিনি সরাসরি সৃষ্টিকর্তাকে অস্বীকার করেন নি। এর মানে হচ্ছে তাঁর তত্ত্বকে সৃষ্টিকর্তার অস্তিত্বের আওতায়ও ব্যাখ্যা করা সম্ভব ছিলো। কারণ, নিয়মের রচয়িতা সৃষ্টিকর্তা এ বিশ্বজগৎকে কীভাবে বা কোন্ নিয়মে সৃষ্টি করবেন সে ব্যাপারে কোনো ধরাবাঁধা নিয়ম থাকতে পারে না। অতএব, কেউ যদি মনে করে যে, সৃষ্টিকর্তা প্রথমে প্রায় সীমাহীন সম্ভাবনা প্রদান সহ একটি আদি বস্তুকণা সৃষ্টি করেন এবং পরে তাতে পরিকল্পিত বিস্ফোরণ ঘটিয়ে এ বিশ্বলোককে রূপ প্রদান করেন, তাহলে তাকে অসম্ভব মনে করার কোনো কারণ নেই (প্রকৃত পক্ষে সেভাবেই হয়ে থাক বা অন্যভাবেই হয়ে থাক)।

কিন্তু পরবর্তীকালে স্টিফেন হকিং সরাসরি সৃষ্টিকর্তা ও পরকালের অস্তিত্ব অস্বীকার করেন। তিনি ২০১০ সালে প্রকাশিত তাঁর দ্য গ্রান্ড্ ডিজাইন্ পুস্তকে বলেন যে, পদার্থবিজ্ঞানের অনেকগুলো ধারাবাহিক উন্নতির আলোকে বিশ্বসৃষ্টির তত্ত্বসমূহে কোনো দেবতার (dei t y) আর কোনো স্থান নেই।

প্রকৃত ব্যাপার হলো বস্তুবিজ্ঞানের বিস্ময়কর উন্নতি পরম জ্ঞানী সৃষ্টিকর্তার অস্তিত্বকে অধিকতর অকাট্যভাবে প্রমাণ করে। কারণ, বস্তুর মধ্যে নিহিত এমন জটিল ধর্ম ও সীমাহীন সম্ভাবনা কিছুতেই 'ঘটনাক্রমে' (accidentally) তৈরী হতে পারে না।

আসলে 'ঘটনাক্রমে' বলে কোনো কিছুর অস্তিত্ব নেই। যা কিছু ঘটে সবই 'কারণ ও ফলশ্রুতি' (cause and effect) বিধির আওতায় কোনো না কোনো কারণ বা কারণসমূহের প্রতিক্রিয়ায় ঘটে, আমরা যখন সে কারণ সম্পর্কে অবহিত না থাকি তখনই তাকে আমরা বলি 'ঘটনাক্রমে' সংঘটিত।

বস্তুবিজ্ঞানের ব্যাপক উন্নতির সাথে সাথে 'ঘটনাক্রমে'র কুসংস্কারাচ্ছন্ন ধারণার আওতা ক্রমেই সঙ্কুচিত হয়ে যাচ্ছে। কারণ, বস্তুজগতের এতো সব বিস্ময়কর নিয়ম ও সম্ভাবনা কী করে একজন সজ্ঞান পরিকল্পনাকারী ব্যতিরেকে অস্তিত্বলাভ করতে পারে? আজ পর্যন্ত বিজ্ঞানীরা স্বয়ংক্রিয়ভাবে কোনো নিয়ম ও সম্ভাবনা উদ্ভূত হতে দেখেছেন কি?

স্টিফেন হকিং- এর বিগ্ ব্যাং তত্ত্ব সম্বন্ধে ওপরে আমরা যে সংক্ষিপ্ত আলোচনা করেছি তা থেকেই একজন পরম জ্ঞানী সৃষ্টিকর্তার অপরিহার্যতা অকাট্যভাবে প্রমাণিত হয়। তারপরও আমরা এখানে সৃষ্টিকর্তার অপরিহার্যতার সপক্ষে আরো কিছু প্রমাণ তুলে ধরছি।

সৃষ্টিলোকে স্রষ্টার অস্তিত্বের প্রমাণ

আমরা এখানে গোটা সৃষ্টিলোকের আমাদের জানা অংশের সীমাহীন বিস্ময়ের মধ্য থেকে বিক্ষিপ্তভাবে কতগুলোর ওপর দৃষ্টিপাত করবো।

উদ্ভিদ প্রজাতিসমূহের মধ্যে বৈচিত্র্য, অর্থনৈতিক ও পরিবেশগত কল্যাণকারিতা, পুষ্টি ও রোগনিরাময়ক্ষমতা, শিল্প- সভ্যতায় এ সবের অবদান ইত্যাদি নিয়ে দীর্ঘ আলোচনা করা যেতে পারে যা একজন সুপরিকল্পনাকারী পরম জ্ঞানী স্রষ্টার অস্তিত্ব নির্দেশ করে। আমরা সেদিকে না গিয়ে যদি শুধু এর সৌন্দর্যের দিকে তাকাই তো আমাদেরকে ভেবে বিস্মিত হতে হয় যে, কত বড় শিল্পী তিনি যিনি এ পৃথিবীকে বিচিত্র উদ্ভিদরাজি দিয়ে এমন সুন্দর করে সাজিয়েছেন!

উদ্ভিদরাজির সামগ্রিক সৌন্দর্য ছাড়াও বিভিন্ন উদ্ভিদের নিজস্ব সৌন্দর্য পর্যবেক্ষণ করলে অধিকতর বিস্মিত হতে হয়। কতক উদ্ভিদের গঠনপ্রকৃতি দেখে মনে হয়, কোন সুনিপুণ শিল্পী বিশেষভাবে তাঁর পসন্দ মাফিক একে সৃষ্টি করেছেন।

বিভিন্ন শীতপ্রধান দেশে ‘সার্ভ্’ (سرو - cedar) নামক এক প্রকার চিরহরিৎ বৃক্ষ আছে যা প্রায় একশ’ ফুট পর্যন্ত উঁচু হয়ে থাকে। কিন্তু ছোটবড় সর্বাবস্থায়ই দূর থেকে দেখে মনে হয় যে -, একটি বিশালায়তন কলার মোচাকে বোঁটা নীচের দিকে রেখে দাঁড় করিয়ে রাখা হয়েছে। পান্থপাদক গাছের (traveller’s tree) দিকে লক্ষ্য করে চিন্তা করে দেখেছেন কি কীভাবে সে তার সুদীর্ঘ ও সুপ্রশস্ত ডাগরগুলোকে দুই বিপরীত দিকে বিন্যস্ত করে বিস্তার করে দিয়েছে এবং ভুলেও অপর দুই দিকে একটি ডাগরও বিস্তৃত হচ্ছে না!?

এর চেয়েও বিস্ময়কর এক ধরনের ছোট পুষ্প- উদ্ভিদ যার ফুলের পাপড়িগুলো পূর্ণ বিকশিত হলে দেখা যায় যে, ফুলটির কেন্দ্রস্থল থেকে সবগুলো পাপড়ির গোড়ার দিক জুড়ে একটি কালো প্রজাপতি অঙ্কিত রয়েছে, যেন কোনো খেয়ালী শিল্পী রং- তুলি দিয়ে ফুলটির বুকে প্রজাপতির

ছবি এঁকে দিয়েছেন। কোন্ সে শিল্পী যিনি ফুলের বুকে এভাবে প্রজাপতি আঁকেন? নাকি কোনো শিল্পী ছাড়াই এমনি এমনিই এ ধরনের ছবি অঙ্কিত হয়ে যাচ্ছে?

প্রাণীকুলের সৃষ্টিতেও এ ধরনের শৈল্পিক দৃষ্টিভঙ্গির পরিচয় পাওয়া যায়। কতক পাখী দেখতে খুবই সুন্দর এবং কতক পাখী সুক ী; এ সৌন্দর্য ও সুর ঐ সব পাখীর বস্তুগত প্রয়োজন পূরণের জন্য কী কাজে লাগে? অন্যান্য পাখী যদি ঐ ধরনের সৌন্দর্য ও সুর ছাড়া তাদের অস্তিত্ব অব্যাহত রাখতে পারে তাহলে এগুলোর মধ্যে এ ধরনের সুর ও সৌন্দর্য এলো কেন? নাকি তা অন্যদের দর্শনেন্দ্রিয় ও শ্রবণেন্দ্রিয়কে তৃপ্তি দানের উদ্দেশ্যে? অন্যান্য পাখীর যখন পেখম নেই তখন ময়ূরের পেখমের কী দরকার ছিলো? নাকি তার এ পেখম তার নিজের জন্য নয়, অন্যদের নয়ন তৃপ্ত করার জন্য?

এবার আমরা প্রাণীদের বাহ্যিক দিকের পরিবর্তে তার অভ্যন্তরীণ জটিলতার দিকে দৃষ্টি দিতে পারি।

প্রাণীকুলের প্রজাতিসংখ্যাও এক মহাবিস্ময় যা একজন সীমাহীন জ্ঞানময় স্রষ্টার অস্তিত্ব নির্দেশ করে।

এ পৃথিবীর বুকে ক্ষুদ্রতম প্রজাতির পিঁপড়া ও বৃহত্তম প্রাণশীল সৃষ্টি তিমির মাঝখানে অসংখ্য প্রাণশীল সৃষ্টি রয়েছে। প্রকৃত পক্ষে সৃষ্টিলোকে প্রাণশীল সৃষ্টিপ্রজাতিসমূহের সংখ্যা ও তার প্রকরণ সম্পর্কে সঠিক ধারণা লাভ করা এখনো মানুষের পক্ষে সম্ভব হয় নি। এ পর্যন্ত যে সব প্রজাতিকে চিহ্নিত করা সম্ভব হয়েছে তার এক অসম্পূর্ণ পরিসংখ্যান অনুযায়ী শুধু পৃথিবীর বুকে কোটি কোটি প্রাণীপ্রজাতি রয়েছে। এখানে আমরা কেবল পিঁপড়া ও মানুষের প্রতি সংক্ষিপ্ত দৃষ্টি নিক্ষেপ করবো।

খালি চোখে দেখার মতো ক্ষুদ্রতম প্রাণশীল সৃষ্টি হচ্ছে এক ধরনের ছোট পিঁপড়া যার শরীর একগাছি চুলের চেয়ে বেশী মোটা নয় এবং দৈর্ঘে সম্ভবতঃ এক সেন্টিমিটারের এক দশমাংশের বেশী নয়। আর তার পাগুলো তুলার আঁশের মত সরু, ফলে সে যখন পথ চলে তখন তার পাগুলো হাল্কা ছায়ার মতো মনে হয়। পিঁপড়া হচ্ছে সমাজবদ্ধ জীবন যাপনকারী প্রাণী যার

সমাজবদ্ধতার মান মানুষের সমাজবদ্ধতার মানের সমান না হলেও খুবই কাছাকাছি। তেমনি পিঁপড়ারা অত্যন্ত বুদ্ধিমান প্রাণী, যদিও মানুষের মতো বুদ্ধিমান নয়।

ক্ষুদ্রতম প্রজাতির পিপিলিকাটির ছ'টি পা রয়েছে, খাদ্য খাবার জন্য মুখ, কামড় দেয়ার জন্যে দু'টি দাঁত, মাথায় দু'টি এ্যান্টেনা (শিং), শ্বাস- প্রশ্বাসয , খাদ্য ধারণের জন্যে পেট ও তা হযমের জন্যে পরিপাকয , মলদ্বার, যৌনাঙ্গ ইত্যাদি এবং মাথার মধ্যে মস্তিষ্ক তথা প্রয়োজনীয় সব কিছুই রয়েছে। এক ধরনের অন্ধ প্রজাতির পিঁপড়া চোখ ছাড়াই তার মাথায় অবস্থিত শিং- এর সাহায্যে দর্শনের কাজ অত্যন্ত ভালভাবে সম্পাদন করে থাকে; এ ক্ষেত্রে সে মানুষের তুলনায় কোনো ধরনের অসুবিধারই সম্মুখীন হয় না। তারা যৌন সংসর্গ করে এবং তার ফলে স্ত্রী পিপিলিকা ডিম পাড়ে যার মাধ্যমে তাদের বংশবৃদ্ধি ঘটে। তাদের সমাজে কর্মবিভাজন আছে; যেমন কাজ করার জন্যে শ্রমিক আছে, বাসা পাহারা দেয়া ও শৃঙ্খলা রক্ষার জন্যে সৈনিক আছে এবং সমাজকেন্দ্রে একজন রাণী আছে।

শত্রুকে কাবু করার জন্যে তাদের শরীরে বিষের থলি আছে। এ বিষ এতোই মারাত্মক যে, সুঁই- এর ডগার ক্ষুদ্রতম বিন্দুতে যতোটুকু বিষ ধারণ করা সম্ভব মাত্র ততোটুকু বিষ একজন মানুষের চামড়ার সামান্য অভ্যন্তরে প্রবেশ করিয়ে দিলেই তাতে যে অসহনীয় তী জ্বালা হয় তা ঐ মানুষটিকে পরমাণুর অস্তিত্ব ও পারমাণবিক শক্তির ভয়াবহতার কথা স্মরণ করিয়ে দেয়ার জন্যে যথেষ্ট। আর একটি সুঁই- এর পিছন দিক এ বিষে স্পর্শ করলে তাতে যে পরিমাণ বিষ লেগে যাবে এ বিষ ততোটুকু পরিমাণে কোনো মানুষের শরীরে প্রবেশ করালে সাথে সাথে তার মৃত্যু অনিবার্য। কিন্তু এ ভয়ঙ্কর বিষ স্বয়ং পিপিলিকার শরীরেই উৎপন্ন হয় এবং এ বিষের থলি বয়ে বেড়ানো সত্ত্বেও এতে তার নিজের সামান্যতম ক্ষতিও সাধিত হয় না। শুধু তা- ই নয়, এ বিষ ব্যবহারের ক্ষেত্রে সে অত্যন্ত সুদক্ষ; কা'র বিরুদ্ধে কী পরিমাণে ব্যবহার করতে হবে সে ব্যাপারে তার মাত্রাজ্ঞান বিস্ময়করভাবে নিখুঁত।

আশ্চর্যের বিষয় এই যে, সে এ বিষ শুধু তার শত্রুকে কাবু করার জন্যেই ব্যবহার করে না, বরং খাদ্য সংগ্রহের জন্যে অর্থাৎ শিকার ধরার জন্যেও ব্যবহার করে। সে এমন নির্ভুল হিসাব-

নিকাশের ভিত্তিতে সঠিক মাত্রায় শিকারের শরীরে বিষ প্রয়োগ করে যার ফলে শিকার মারা যায় না, বরং চলচ্ছক্তিরহিত হয়ে পড়ে। শিকারের শরীরে প্রয়োগকৃত বিষের মাত্রা প্রয়োজনীয় পরিমাণের চেয়ে কম হলে শিকার চলচ্ছক্তি হারাবে না, বরং পালিয়ে যাবে; অন্যদিকে পরিমাণ বেশী হলে বিষক্রিয়ার ফলে শিকারটি মারা যাবে এবং এমতাবস্থায় তা খেলে ভক্ষণকারীদের জন্যে স্বাস্থ্যসমস্যা সৃষ্টি হবে, এমন কি মৃত্যুও ঘটতে পারে। কিন্তু পিঁপড়া যখন শিকারের শরীরে বিষ প্রয়োগ করে তখন তা প্রয়োজনীয় মাত্রার চেয়ে বেশী হয় না। ফলে এ ধরনের শিকার দীর্ঘ কয়েক মাস যাবত পিঁপড়াদের গুদামে অচেতন অবস্থায় পড়ে থাকে, মারা যায় না।

এর চেয়ে বিস্ময়কর আর কী হতে পারে! এতো বুদ্ধিমান, এতো কর্মঠ ও এতো সুশৃঙ্খল এ ক্ষুদ্রতম সামাজিক প্রাণীর সৃষ্টি এবং এর জীবনধারা, বুদ্ধিমত্তা, সমাজবদ্ধতা ও এক ধরনের রা পরিচালনা ব্যবস্থা কি নিজে নিজেই এবং কোনো মহাজ্ঞানী ও নিখুঁত পরিকল্পনাকারী সৃষ্টিকর্তা ছাড়াই অস্তিত্বলাভ করা সম্ভবপর?

একটি অত্যাধুনিক সুপার কম্পিউটার তৈরী করাই বেশী কঠিন, নাকি ক্ষুদ্রতম পিপিলিকাটিকে সৃষ্টি করাই বেশী কঠিন? নিঃসন্দেহে পিপিলিকাটিকে সৃষ্টি করাই বেশী কঠিন। এ কারণে বিজ্ঞানীরা সুপার কম্পিউটার তৈরী করতে সক্ষম হলেও এবং কারখানায় তা বিপুল সংখ্যায় উৎপাদন করা সম্ভব হলেও অন্য পিপিলিকার সাহায্য ব্যতীত গবেষণাগারে একটি ক্ষুদ্র পিপিলিকা সৃষ্টি করা বিজ্ঞানীদের পক্ষে আজো সম্ভব হয় নি। তাঁরা যদি ভবিষ্যতে তা করতে সক্ষম হন তো তাতেও প্রমাণিত হবে যে, পিপিলিকা সৃষ্টি করা সুপার কম্পিউটার তৈরীর তুলনায় অধিকতর কঠিন, এ কারণেই বিজ্ঞানের যে পরিমাণ উন্নতি সুপার কম্পিউটার তৈরীকে সম্ভব করেছে পিপিলিকা সৃষ্টির জন্যে তার তুলনায় অনেক বেশী বৈজ্ঞানিক উন্নতি অপরিহার্য।

এমতাবস্থায় স্বাভাবিকভাবেই প্রশ্ন জাগে যে, যে পিপিলিকা সৃষ্টি করা সুপার কম্পিউটারের তুলনায় অনেক বেশী কঠিন ও জটিল কাজ তা কি কোনো মহাবিজ্ঞানী স্রষ্টা ছাড়াই কেবল প্রকৃতিতে ঘটনাক্রমে (acci dent al l y) সৃষ্টি হতে পেরেছে?

জেনেটিক বিজ্ঞানের সাম্প্রতিক আবিষ্কার অনুযায়ী প্রাণীদেহের প্রতিটি কোষে এমন কতগুলো বিশেষ উপাদান- একক রয়েছে যা তার বংশগত বৈশিষ্ট্য বহন করে; জীববিজ্ঞানীগণ এগুলোর নামকরণ করেছেন ডিএন্এ, আর ডিএন্এ- র গঠন- উপাদান বা অংশসমূহের নামকরণ করেছেন জিন্। এই সাথে থাকে বিভিন্ন ধরনের রাসায়নিক উপাদান। একটি জিনে ১৫০ থেকে ৬, ০০০ নিউক্লিওটাইড্ থাকে। আর একটি ছোট ভাইরাস্- ডিএন্এ- তে ৫, ৩৮৬ জোড়া নিউক্লিওটাইড্ বেস্ থাকে। মানবদেহের প্রতিটি কোষে ৪৬টি ক্রোমোজম্ থাকে যার মধ্যে ২৩টি পিতার ও ২৩টি মাতার বৈশিষ্ট্য বহন করে। (পিতার শুক্রকীটে ২৩টি ক্রোমোজম্ থাকে এবং এই ২৩টি ক্রোমোজমের মধ্যে একটি থাকে সেক্স ক্রোমোজম্ যা থেকে নির্ধারিত হয় সন্তানটি ছেলে হবে নাকি মেয়ে হবে।) মানবদেহের একেকটি কোষে (৪৬টি ক্রোমোজমে) এক লাখ জিন্ ও ৬৬০ কোটি নিউক্লিওটাইড্ বেস্ থাকে এবং এতে জৈব রাসায়নিক উপাদানের সংখ্যা ৩০০ কোটি।

বিভিন্ন মানুষের জিনের মধ্যে অভিন্নতা ও বিভিন্নতা রয়েছে এবং সব মিলিয়ে মানবিক জিনের সংখ্যা ৩০০ কোটি জোড়ার মতো যার -মধ্যে ১৯৯৯ খৃস্টাব্দের শেষ নাগাদ ১০০ কোটি জোড়া চিহ্নিত করা সম্ভব হয়। ডিএন্এএর মতো বা বলা চলে -গুলোর গঠন মই -, যিপারের (zipper) মতো। এগুলো কত সূক্ষ্ম আর কত সরু তা এ থেকেই ধারণা করা যেতে পারে যে, আধা গ্রাম ডিএন্এলাখ ৩০কে সোজা করে সামনাসামনি জোড়া দিলে নয় কোটি - মাইল অর্থাৎ পৃথিবী) দীর্ঘ হবে। (থেকে সূর্য পর্যন্ত

প্রতিটি ডিএন্এ- র মধ্যে সংশ্লিষ্ট মানুষ বা প্রাণীর সারা জীবনের (দেহ থেকে বিচ্ছিন্ন হওয়া পর্যন্ত সময়ের) এবং তার পিতামাতার .... এভাবে প্রথম মানুষ পর্যন্ত (প্রতিটি স্তরে পিতা- মাতার শরীর থেকে বিচ্ছিন্ন না হওয়া পর্যন্ত সময়ের) পূর্বপুরুষদের জীবনের ইতিহাস (চিন্তা- চেতনার ধরন, চরিত্র ও কর্ম সহ) কোড্ আকারে লিপিবদ্ধ আছে যার মধ্য থেকে বড় বড় বৈশিষ্ট্যগুলো বর্তমানে গবেষণাগারে পরীক্ষা করে বের করা সম্ভব হচ্ছে।

কিন্তু কী আশ্চর্য! তার মস্তিস্কের কোষে কোষকেন্দ্র থাকলেও ক্রোমোজম্ নেই, ফলে কারো পক্ষে পূর্বপুরুষদের ইতিহাস, জ্ঞান ও চিন্তাধারা স্মরণ করা সম্ভব হয় না, বরং কেবল জ্ঞানার্জনের পন্থায়ই তা আয়ত্ত করা সম্ভব হয়। আর, একটি মানুষের মস্তিষ্কে রয়েছে একশ' কোটি স্মৃতিকোষ সহ বিভিন্ন ধরনের এক হাজার কোটি স্নায়ুকোষ। একটি স্মৃতিকোষ বা নিউরনের ক্ষমতা একটি সুপার কম্পিউটারের চেয়ে বেশী। অধিকাংশ মানুষই তার মস্তিষ্কের ক্ষমতার হাজার ভাগের এক ভাগও সারা জীবনে ব্যবহার করে না।

এই হলো মহাবিস্ময়কর ও জটিলতম সৃষ্টি মানুষ। বিজ্ঞানীরা আজ কৃত্রিম জীবকোষ তৈরীর চেষ্টা করছেন। আর এ জন্য কতো আয়োজন! একটি জীবকোষ সৃষ্টির জন্যে জটিলতম য পাতি সমৃদ্ধ গবেষণাগার সহ লক্ষ লক্ষ ডলারের বাজেট নিয়ে কাজ করছেন বিশ্বসেরা বিজ্ঞানীগণ। এমতাবস্থায় কোনো মহাবিজ্ঞানী স্রষ্টা ছাড়াই এমনি এমনিই প্রাণহীন পদার্থ থেকে এককোষ বিশিষ্ট জীবাণু ও তা থেকে পর্যায়ক্রমে প্রজাতিসমূহ এবং সবশেষে মহাবিস্ময়কর প্রাণশীল সৃষ্টি মানুষ অস্তিত্বলাভ করলো!?

মানুষ আজ মঙ্গল গ্রহে যাবার চেষ্টা করছে। আগামী দিনে সেখানে গিয়ে যদি তারা একটি কম্পিউটার দেখতে পায়, তাহলে তারা কি বলবে যে, "এটি এমনি এমনিই সৃষ্টি হয়েছে।"? নাকি বলবে যে, "কেউ এটা সৃষ্টি করেছে।"?

তারা সমগ্র মঙ্গল গ্রহে অনুসন্ধান চালিয়েও যদি এরূপ একটা কম্পিউটার তৈরীর উপযুক্ত কোনো প্রাণীর সন্ধান না পায়, তখন তাদের সামনে তিনটি সম্ভাব্য জবাব থাকবেএর স্রষ্টা কালের (১) : প্রবাহে মঙ্গলের মাটির সাথে মিশে গেছে, কিন্তু তার সৃষ্টি রয়ে গেছে, অথবা তৃতীয় কোনো (২) গ্রহ থেকে অথবা অন্য কোনো নক্ষত্রলোক থেকে কোনো বুদ্ধিমান প্রজাতির প্রাণী এসেছিলো বা পৃথিবী থেকেই গোপনে কেউ এসেছিলো এবং সে বা তারা এটি রেখে চলে গেছে, অথবা (৩) এর স্রষ্টা এই মঙ্গল গ্রহেই আমাদের আশেপাশেই রয়েছে, কিন্তু আমাদের ও তার বা তাদের অস্তিত্বের মধ্যকার মাত্রাগত (dimensional) পার্থক্যের কারণে আমরা তাকে বা তাদেরকে খুঁজে পাচ্ছি না।

কম্পিউটার তো এক বিরাট জটিল ব্যাপার; এমন কি সেখানে যদি একটা ক্ষুদ্র আলপিনও পাওয়া যায় তাহলেও তারা এই একই উপসংহারে উপনীত হবে এবং ধরে নেবে না যে, কোনো স্রষ্টা ছাড়া নিজে নিজেই আলপিনটি সৃষ্টি হয়েছে।

কিন্তু কী আশ্চর্য! অসংখ্য বিস্ময়কর সৃষ্টিতে গোটা প্রাকৃতিক জগৎ ভরপুর এবং তার প্রায় প্রতিটি সৃষ্টিই কম্পিউটারের চেয়ে বিস্ময়কর, কিন্তু তা সত্ত্বেও নাস্তিক লোকেরা এ বিশ্বজগতের পিছনে কোনো মহাজ্ঞানময় স্রষ্টার অস্তিত্ব মানতে রাযী নয়।

স্টিফেন হকিং তাঁর মস্তিষ্ককে কম্পিউটারের সাথে তুলনা করেছেন, কিন্তু এটা কেন তাঁর চিন্তায় এলো না যে, একটি কম্পিউটার যেখানে কোনো প্রাকৃতিক যা ি ক প্রক্রিয়ার ফসল নয়, বরং শত শত বিজ্ঞানীর শত শত বছরের সাধনার সমন্বিত ফসল, সেখানে বিস্ময়কর ধরনের জটিল একটি মানবমস্তিষ্ক কোনো পরম জ্ঞানী সুপরিকল্পনাবিদ স্রষ্টা ছাড়া স্বয়ংক্রিয়ভাবে প্রাকৃতিক যা ি ক প্রক্রিয়ায় অস্তিত্বলাভ করতে পারে না?

পরকালীন জীবন

স্টিফেন হকিং অতি সম্প্রতি এক সাক্ষাৎকারে পরকালীন জীবনের অস্তিত্ব অস্বীকার করেছেন। এটাই স্বাভাবিক। কারণ, স্রষ্টার অস্তিত্ব অস্বীকার করার পর পরকালীন জীবনের অস্তিত্ব স্বীকার করার মানেই হয় না। তবে স্রষ্টার অস্তিত্বের অস্বীকৃতি যে এ বিষয়ে অজ্ঞতা থেকে উৎসারিত তা আমরা ইতিমধ্যেই প্রমাণ করেছি। অতঃপর পরকালীন জীবন সম্পর্কে কেবল এতোটুকু উল্লেখ করাই যথেষ্ট বলে গণ্য হওয়া উচিত যে, যে পরম জ্ঞানী স্রষ্টা প্রথম বার সৃষ্টি করতে পেরেছেন তাঁর পক্ষে পুনরায় সৃষ্টি করা খুবই সহজ।

স্টিফেন হকিং পরকাল অস্বীকার করতে গিয়ে তাঁর মস্তিষ্ককে একটি কম্পিউটারের সাথে তুলনা করেছেন এবং বলেছেন যে, এটি অচল হয়ে গেলে আর কাজ করবে না। তিনি এ যুগের সবচেয়ে নামকরা বস্তুবিজ্ঞানী হয়ে এমন কথা কীভাবে বললেন ভেবে বিস্মিত হতে হয়। কারণ, স্বয়ং বস্তুবিজ্ঞানই নষ্ট হয়ে যাওয়া সব কিছু পুনর্গঠনের সম্ভাবনার কথা স্বীকার করছে।

বিজ্ঞান সাময়িকী ‘নিউ সায়েন্টিস্ট’-এর রিপোর্ট অনুযায়ী বিজ্ঞানীরা মৃতকে জীবিত করার সম্ভাবনার কথা বলেছেন। এ রিপোর্ট অনুযায়ী, মৃত্যুর কয়েকদিন পর মৃত ব্যক্তির দেহের কোষ নিয়ে গবেষণা চালিয়ে বিভিন্ন রাসায়নিক উপাদান দিয়ে বিজ্ঞানীরা তাতে প্রাণ সঞ্চার করতে পারবেন। মানুষ বিজ্ঞানীদের পক্ষে যদি এটা সম্ভব হয় তাহলে পরম জ্ঞানী স্রষ্টার পক্ষে পুনর্জীবন দান অসম্ভব মনে করার মতো অযৌক্তিক দাবী আর কী হতে পারে?

অবশ্য শরীর পচে-গলে মাটিতে মিশে যাবার যুক্তি তোলা হতে পারে - যা অবশ্য সকল যুগের (এমনকি চৌদ্দশ’ বছর আগেও) পরকাল অস্বীকারকারীরা তুলতো।

এমনকি প্রথম সৃষ্টিকারীর পক্ষে পুনঃসৃষ্টি সম্ভব - এ অকাট্য যুক্তি ছাড়াও জেনেটিক বিজ্ঞান ও পদার্থ বিজ্ঞানের আলোকেও পুনঃসৃষ্টি অকাট্যভাবে সম্ভব বলে প্রমাণিত হয়। কারণ, একজন মানুষের কোনো অঙ্গপ্রত্যঙ্গ কেটে ফেললে তার ব্যক্তিসত্তার পরিবর্তন হয় না।

শুধু তা-ই কেন, কয়েক বছরের ব্যবধানে একজন মানুষের গোটা শরীরের সকল কোষই পরিবর্তিত হয়ে যায়, কিন্তু তা সত্ত্বেও তার ব্যক্তিসত্তা পরিবর্তিত হয় না, বরং পুরনো কোষের সংস্পর্শে আসা নতুন কোষে পুরনো কোষের সকল বৈশিষ্ট্যই কপি হয়ে যায়। আর একটি মানুষ বা প্রাণীর শরীরের প্রতিটি ডিএন্এ-র মধ্যে সংশ্লিষ্ট মানুষ বা প্রাণীর সকল বৈশিষ্ট্য ও তার সারা জীবনের (দেহ থেকে বিচ্ছিন্ন হওয়া পর্যন্ত সময়ের) ইতিহাস কোড আকারে লিপিবদ্ধ থাকে। অতএব, একজন মানুষ বা প্রাণীকে পুনরায় সৃষ্টির জন্য তার একটি ডিএন্এ-ই যথেষ্ট। তবে একজন মানুষের বা একটি প্রাণীর বিক্ষিপ্ত হয়ে যাওয়া সকল ডিএন্এ-ও খুঁজে বের করা ও একত্র করা সম্ভব, কারণ, প্রতিটি প্রাণীর ডিএন্এ-র মধ্যে এমন কিছু স্বাত ্য আছে যে, কোনো অবস্থায়ই তা অন্যের কোনো ডিএন্এ-র সাথে অভিন্ন বলে ভুল হবে না।

সেই সাথে বস্তুর ওপর মানসিক শক্তির প্রভাব সংক্রান্ত সর্বশেষ আবিষ্কার-উদ্ভাবনকেও বিবেচনায় নেয়া প্রয়োজন। এর মধ্যে সর্বাধিক বিস্ময়কর হলো ে ন্ ওয়েভের ক্ষমতা আবিষ্কার - যা বস্তুর ওপরে ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া করে থাকে। আগামী দিনে ে ন ওয়েভ্ তথা ইচ্ছাশক্তির দ্বারা কম্পিউটার ও কম্পিউটার নিয় িত বিমান চালানো আগামী কালের সূর্যোদয়ের মতোই সত্য।

এমতাবস্থায় সীমাহীন শক্তি ও ক্ষমতার অধিকারী পরম জ্ঞানময় মহান স্রষ্টা ইচ্ছা করার সাথে সাথেই প্রতিটি প্রাণীদেহই নিজ নিজ মৃত্যুকালীন শরীরের সবগুলো বা কতক ডিএনএ ও প্রাকৃতিক জগৎ থেকে আরো প্রয়োজনীয় উপাদান নিয়ে পুনরায় আবির্ভূত হবে - এটা সুস্থ বিচারবুদ্ধির অধিকারী কোনো মানুষের পক্ষেই অস্বীকার করা মোটেই সম্ভব নয়।

প্রথম প্রকাশ: দৈনিক দিনকাল, ঢাকা: ১১ই জুন ২০১১।

পরিমার্জন: ৭ই ডিসেম্বর ২০১৩।

তথ্যসূত্র :

১. বিষয়টি যুক্তিবিজ্ঞানের দৃষ্টিতে কোন্ ধরনের তার ওপর নির্ভর করে। কারণ, যুক্তিবিজ্ঞানের দৃষ্টিতে কোনো বক্তব্য পাঁচ ধরনের মধ্য থেকে যে কোনো একধরনের হতে পারে, তা হচ্ছে : অকাট্য প্রমাণিত বক্তব্য (برهان), বিতর্কে প্রতিষ্ঠিত বা আপাতঃ প্রমাণিত বিষয় (جدال), আবেগময় ভাষণ (خطاب), কবিতা (شعر) ও ভ্রমাত্মক যুক্তি বা অপযুক্তি (مغالطة)। এর মধ্যে প্র মধরনের বক্তব্য সুস্থ বিচারবুদ্ধির নিকট অবশ্য গ্রহণযোগ্য । দ্বিতীয় ধরনের বক্তব্যের বৈশিষ্ট্য হচ্ছে এই যে, পরস্পরবিরোধী বক্তব্যসমূহের মধ্য থেকে একটিও অকাট্যভাবে প্রমাণিত না হলেও যেটি বাদে বাকীগুলোর ভ্রান্তি অকাট্যভাবে প্রমাণিত হয়ে যায় আপাততঃ সেটিকে গ্রহণ করা ছাড়া গত্যন্তর নেই, যদিও ভবিষ্যতে নতুন কোনো তথ্য হাযির হয়ে সেটিকে বাতিল করে দেয়ার সম্ভাবনা অস্বীকার করা যায় না। বাকী তিন ধরনের বক্তব্য দ্বারা কোনো কিছু প্রমাণিত হয় না। অন্যদিকে বিষয়বস্তুর বিভক্তির ওপরও কোনো বক্তব্যের প্রামাণ্যতা নির্ভর করে। অর্থাৎ কোনো বিষয়কে তৃতীয়ভাগের সম্ভাবনা বিহীনভাবে পরস্পর বিরোধী দুই ভাগে বিভক্ত করা হলে অনিবার্যভাবে সত্য তার একদিকে থাকবে, কিন্তু যেখানে উপস্থাপিত দুইভাগের বাইরে তৃতীয় ভাগের সম্ভাবনা থাকে সেখানে উপস্থাপিত পরস্পর বিরোধী উভয় দাবীই ভ্রান্ত হতে পারে এবং প্রকৃত অবস্থা অজানা বাঅনুপস্থাপিত থেকে যেতে পারে। যেমন : একটি বস্তু রং বিশিষ্ট বা রংহীন- এর মধ্য হতে যে কোনো একটি হতে বাধ্য, কিন্তু তা সাদা বা কালোর মধ্যে যেকোনো একটি হতে বাধ্য নয়, কারণ তা সাদা- কালোর মাঝামাঝি বা তৃতীয় কোনো রং বিশিষ্ট হতে পারে।

২. এ এক ঐতিহাসিক দুর্ঘটনা যে, উপযুক্ত পরিভাষা খুঁজে না পাওয়ার কারণে বাংলা ভাষায় 'ঈমান' (ايمان) - এর অনুবাদ করা হয়েছে 'বিশ্বাস'। অথচ প্রকৃত ব্যাপার হলো ايمان - এর আভিধানিক অর্থ 'নিরাপদকরণ'। কোরআন মজীদে এরশাদ হয়েছে : و آمنهم من خوف - "আর যিনি তাদেরকে ভীতি থেকে নিরাপদ করেছেন।" (সূরা আল্- কুরাইশ্ : ৪) শব্দটির পারিভাষিক অর্থ হলো আল্লাহ্, পরকালীন জীবন এবং আল্লাহর বাণী ও বাণীবাহক (নবী) কে আশ্রয় করে নিজেকে প্রকৃত ক্ষতি অর্থাৎ পরকালীন অনন্ত জীবনের ক্ষতি থেকে সুরক্ষিতকরণ। আর 'বিশ্বাস' - এর আরবী প্রতিশব্দ হচ্ছে ظن (বিশ্বাস বা ধারণা)। ظن (বিশ্বাস) ও شک (সন্দেহ)- উভয়ই 'ধারণা' মাত্র; কোনোটিই অকাট্য সত্য হওয়ার নিশ্চয়তার অধিকারী নয়। এ দু'টি পরিভাষার মধ্যে পার্থক্য কেবল এখানে যে, ظن (বিশ্বাস) পোষণকারী ব্যক্তি একটি ধারণাকে

সত্য বলে মনে করে এবং شک (সন্দেহ) পোষণকারী ব্যক্তি সংশ্লিষ্ট একটি ধারণাকে অসত্য বলে মনে করে। কিন্তু প্রকৃত সত্য উভয়ের ধারণারই বিপরীত বা তা থেকে ভিন্ন কিছু হতে পারে।

যেমন : একটি দরযা বন্ধ ঘরের সামনে এসে কোনো ব্যক্তি মনে করতে পারে যে, ঘরের ভিতরে কোনো মানুষ আছে এবং অপর একজন মনে করতে পারে যে, ঘরের মধ্যে কেউ নেই। অতঃপর উভয়ে ঘরটিতে প্রবেশ করার সাথে সাথে তাদের ওপর একটি বাঘ ঝাঁপিয়ে পড়তে পারে। আল্লাহ্ তা ‘ আলা এরশাদ করেন :

(ان الظن ل يغنى من الحق شيئا) - "নিঃসন্দেহে বিশ্বাস (বা ধারণা) সত্য থেকে মোটেই বেনিয়ায করে না "

(সূরা ইউনুস : ৩৪)

৩. জীবন ও জগতের পশ্চাতে নিহিত মহাসত্য উদঘাটনের লক্ষ্যে অত্র গ্রন্থে বিচারবুদ্ধিভিত্তিক যে আলোচনা করা হয়েছে আমাদেরকে তা কেবল পরম জ্ঞানময় সৃষ্টিকর্তার অস্তিত্ব ও গুণাবলীতেই উপনীত করে না, বরং আমরা যে তাঁর কাছ থেকে পথনির্দেশের মুখাপেক্ষী এ সত্যেও উপনীত করে - যে উপসংহার অত্র আলোচনার ধারাবাহিকতায় আরো কিছু পরেই আসছে। এ মুখাপেক্ষিতার পরিপ্রেক্ষিতে অনুসন্ধান চালিয়ে বিচারবুদ্ধি আমাদেরকে সে পথনির্দেশে উপনীত করে। সে পথনির্দেশের (কোরআন মজীদ) আলোকে পর্যালোচনা করে বিচারবুদ্ধি আমাদেরকে তাক্বদীর সংক্রান্ত সকল সমস্যার সমাধানে উপনীত করে। অত্র গ্রন্থকার প্রণীত ‘অদৃষ্টবাদ ও ইসলাম’ শীর্ষক গ্রন্থে এ বিষয়ে পূর্ণাঙ্গ আলোচনা করা হয়েছে।

৪. এখানে আরবী শব্দ توجه অপেক্ষাকৃত বেশী উপযোগী - যার ব্যবহারিক তাৎপর্য ‘ইচ্ছাকরণ’- এর প্রায় সমার্থক, কিন্তু বাংলা ভাষায় অধিকতর উপযোগী পরিভাষা না পাওয়ায় বিষয়টি সহজ করে বুঝাবার জন্য ‘মনোযোগ’ কথাটি ব্যবহার করতে হলো যদিও প্রকৃত অর্থে পরম প্রমুক্ত অপরিহার্য সত্তা সম্বন্ধে ‘মনোযোগ না দেয়া বা না থাকা’ পরিভাষা প্রযোজ্য নয়।

৫. আমরা এখানে ‘প্রথম বার’ কথাটি কালের গর্ভে সৃষ্ট সৃষ্টিসত্তার দৃষ্টিকোণ থেকে বলছি। নয়তো যিনি কালোর্ধ সত্তা তথা আমাদের কালগত অবস্থানের দৃষ্টিতে অনাদি ও অনন্ত সত্তা, তাঁর জন্য ‘প্রথম বার’ কথাটি প্রযোজ্য নয়। কারণ, তিনি অনাদি কাল থেকে অনবরত এই সৃষ্টিজগতের (আমরা যার অন্তর্ভুক্ত) ন্যায় অসংখ্য নব নব সৃষ্টিজগতের সৃষ্টিপ্রক্রিয়ার সূচনা করে আসছেন এবং এভাবে অনন্ত কাল পর্যন্ত নব নব সৃষ্টিসূচনা অব্যাহত রাখবেন।

৬. যদিও বিচারবুদ্ধিভিত্তিক আমাদের এ আলোচনার জন্য প্রাসঙ্গিক নয়, তবু উল্লেখ করা যেতে পারে যে, অধিকাংশ মানুষের ধারণার বিপরীতে, হযরত আদম (আঃ) ও তাঁর স্ত্রী হযরত হাওয়া (আঃ)- কে যে জান্নাতে

রাখা হয়েছিলো তা পরকালে পুরষ্কার হিসেবে দেয় অনন্তকালীন অবিনশ্বর জান্নাত (বেহেশত) নয়, বরং এ পৃথিবীরই একটি বাগান (জান্নাত) ছিলো। তবে যেহেতু আল্লাহ্ তা'আলা সেটিকে বিশেষভাবে তৈরী করেছিলেন তাই তা পার্থিব বাগানের সকল ত্রুটি ও অপূর্ণতা থেকে মুক্ত থাকা তথা পরকালীন জান্নাতের একটি নমুনা হওয়াই স্বাভাবিক। এটি যে অবিনশ্বর জান্নাত ছিলো না এরূপ ধারণা করার পিছনে বিচারবুদ্ধিজাত কয়েকটি কারণ পাওয়া যায়। প্রথমতঃ হযরত আদম (আঃ)- কে সৃষ্টিই করা হয়েছিলো পৃথিবীতে আল্লাহর প্রতিনিধিত্ব করার জন্য এবং কোরআন মজীদের কোনো কোনো আয়াত থেকে ধারণা পাওয়া যায় যে, তাঁকে পৃথিবীর উপাদান দিয়েই তৈরী করা হয়েছিলো। তাই পৃথিবীর প্রতিনিধিকে অবিনশ্বর জান্নাতে রাখার কথা অকল্পনীয়। দ্বিতীয়তঃ অবিনশ্বর জান্নাতে শয়তানের প্রবেশের কোনো সুযোগ থাকতে পারে না; যাকে স্রষ্টার সন্নিধান থেকে বিতাড়িত করা হয়েছে তাকে বেহেশতে প্রবেশের সুযোগ দেয়ার প্রশ্নই উঠতে পারে না। আর বেহেশতে যে ঐশী সুরক্ষা ব্যবস্থা আছে তাতে শয়তানের পক্ষে সেখানে প্রবেশ করতে পারার প্রশ্নই ওঠে না। তৃতীয়তঃ অবিনশ্বর বেহেশতে কেউ একবার প্রবেশ করলে সে সেখানকার অবিনশ্বর অধিবাসী হয়ে যায় এবং সেখান থেকে তাকে বের করে দেয়া অকল্পনীয়। কারণ, এরূপ কাজ বেহেশতের অবিনশ্বরতার বৈশিষ্ট্যের সাথে সাংঘর্ষিক।

৭. এ বিষয়ে অত্র গ্রন্থকারের 'নবী- রাসূলগণের (আঃ) পাপমুক্ততা' শীর্ষক একটি পাণ্ডুলিপি আছে। আল্লাহ্ তা'আলা তাওফীক দিলে ভবিষ্যতে তাকে যথাসাধ্য পরিপূর্ণতা প্রদান ও প্রকাশ করা হবে।

৮. এ বিষয়ে পরে অত্র প্রবন্ধের শেষ দিকে অপেক্ষাকৃত বিস্তারিতভাবে আলোচনা করা হয়েছে।

৯. খৃস্টানদের বিশ্বাস যে, তাঁকে ক্রুশবিদ্ধ করে হত্যা করা হয়েছে। কিন্তু কোরআন মজীদে সুস্পষ্ট ভাষায় বলা হয়েছে যে, তাঁকে হত্যা করা হয় নি, বরং আল্লাহ্ তা'আলা তাঁকে তুলে নিয়ে গেছেন, আর এ ব্যাপারে তারা (তৎকালীন ইয়াহূদী, রোমান ও খৃস্টানরা) চরম বিভ্রান্তির মধ্যে পড়েছিলো। এ আয়াত ও কতক হাদীছের ভিত্তিতে মুসলমানরা মনে করেন যে, আল্লাহ্ তা'আলা তাঁকে চতুর্থ আসমানে রেখেছেন এবং কিয়ামতের পূর্বে, হযরত ইমাম মাহদী (আঃ)- এর আবির্ভাব- যুগে তিনি আসমান থেকে নেমে আসবেন ও হযরত ইমাম (আঃ) কে সহযোগিতা করবেন। কোরআন মজীদে উল্লিখিত 'তাদের বিভ্রান্তির মধ্যে পড়া' সম্বন্ধে মুসলিম পণ্ডিতগণের ব্যাখ্যা হচ্ছে এই যে, হযরত ঈসা (আঃ)- এর যে বিশ্বাসঘাতক শিষ্য তাঁকে ধরিয়ে দিয়েছিলো তার চেহারা ঈসা (আঃ)- এর মতো হয়ে গিয়েছিলো এবং ফেরেশতারা ঈসা (আঃ)- কে তুলে নিয়ে যাওয়ার পর ঘরের মধ্যে ঐ ব্যক্তিকে একা পেয়ে রোমান শাসকের পুলিশরা তাকে ধরে নিয়ে যায় এবং তাকেই শূলে চড়িয়ে হত্যা করা হয়। অনেকে মনে করেন যে, ঐ ব্যক্তির চেহারা পরিবর্তিত হয় নি, বরং রোমানরা ঈসা (আঃ)- কে চিনতো না

বিধায় ফেরেশতারা তাঁকে নিয়ে যাওয়ার পর ঐ ঘরের মধ্যে ঐ ব্যক্তিকে একা পেয়ে তাকেই ঈসা (আঃ) মনে করে ধরে নিয়ে গিয়ে হত্যা করে।

১০. অবশ্য এর পরে ছাহাবী ও ইমামগণ থেকে বর্ণিত হাদীছ ও রেওয়ায়েতের ক্ষেত্রে বিভিন্ন স্তরের বর্ণনাকারীদের গ্রহণযোগ্যতার বিষয়টিও বিবেচনা করতে হবে।

১১. অত্র উপশিরোনামে আমরা বিচারবুদ্ধির আলোকে যে মতামত ব্যক্ত করেছি কোরআন মজীদ ও সুন্নাতে রাসূলে (ছ্বাঃ) ও তার সমর্থন পাওয়া যায়। কিন্তু আলোচনার বিচারবুদ্ধি ভিত্তিকতা বজায় রাখার লক্ষ্যে আমরা তার উল্লেখ থেকে বিরত থাকলাম। তবে এগুলো এতোই সুস্পষ্ট যে, কোরআন ও হাদীছ অধ্যয়নে অভ্যস্ত পাঠক-পাঠিকাগণ খুব সহজেই এগুলো পেয়ে যাবেন।

১২. যদিও আমাদের এ আলোচনা বিচারবুদ্ধির দৃষ্টিকোণ থেকে, তবে উল্লেখ করা অপ্রাসঙ্গিক হবে না যে, রাসূলুল্লাহ্ (ছ্বাঃ)-এর পরে তাঁর উম্মাতের মধ্যে সর্বাধিক ‘ইলমী যোগ্যতাসম্পন্ন ব্যক্তি সম্পর্কে মুতাওয়াততীর হাদীছে এবং পাপমুক্ত ব্যক্তিবর্গ সম্বন্ধে কোরআন মজীদের সূরা আল্-আযহাবের আয়াতে তাত্বহীরে উল্লিখিত হয়েছে।

১৩. আর ইসলামের ইতিহাস সাক্ষী যে, কোরআন ও সুন্নাহর জ্ঞানের ক্ষেত্রে সর্বাগ্রগণ্য ব্যক্তিকে ইমাম ও শাসকের পদে অধিষ্ঠিত না করার পরিণাম উম্মাহর জন্য ভয়াবহ হয়েছিলো - যার যের আজো শেষ হয় নি। অর্থাৎ উম্মাহর মধ্যে রক্তক্ষয়ী মতপার্থক্য ও বিভক্তিই প্রমাণ করে যে, রাসূলুল্লাহ্ (ছ্বাঃ)-এর ইন্তেকালের পরে উম্মাহর নেতৃত্ব নির্ধারণের জন্য অনুসৃত পদ্ধতি সঠিক ছিলো না।

১৪. “আহলে সুন্নাত্”, “খুলাফায়ে রাশেদীন্”, “ছ্বিহাহ্ সিত্তাহ্” ইত্যাদি পরিভাষা কোরআন মজীদ বা অকাট্যভাবে প্রমাণিত হাদীছে রাসূল (ছ্বাঃ) থেকে প্রাপ্ত কোনো পরিভাষা নয়, বরং অনেক পরে বিশেষ উদ্দেশ্যে এগুলো তৈরী করা হয়। “আহলে সুন্নাত্” পরিভাষা তৈরীর উদ্দেশ্য ছিলো এটাই বুঝানো যে, এর বহির্ভূত যে সব ইসলামী গোষ্ঠী ছিলো (বা রয়েছে), বিশেষ করে শিয়া মাযহাবের অনুসারীরা, তারা রাসূলুল্লাহ্ (ছ্বাঃ)-এর সুন্নাতের অনুসারী নয়, বরং বিদ্‘আতী গোষ্ঠী। তেমনি “ছ্বিহাহ্ সিত্তাহ্” পরিভাষা তৈরীর উদ্দেশ্য ছিলো এটাই বুঝানো যে, এর বহির্ভূত হাদীছ-সংকলনগুলো (শিয়া ধারার সংকলনগুলো এবং মুওয়াত্ত্বা’, মুসনাদে আহমাদ ইবনে হাম্বাল্, মুস্তাদরাকে হাকেম্ ইত্যাদি সুন্নী ধারার সংকলন) ছ্বাহীহ্ নয়। “সুন্নী”র ন্যায় আজকের পারিভাষিক অর্থে তথা মাযহাব্ হিসেবে “শিয়া” পরিভাষাও পরবর্তীকালের। অবশ্য “শিয়া” শব্দের ব্যবহার (আভিধানিক অর্থে ‘ক্ষুদ্র গোষ্ঠী’) পূর্বেও ছিলো; রাসূলুল্লাহ্ (ছ্বাঃ)-এর জীবদ্দশায় হযরত ‘আলী (আঃ)- এর ঘনিষ্ঠ ভক্ত-অনুরক্তদেরকে “‘আলীর শিয়া” বলা হতো। কিন্তু তখন বিভিন্ন মাযহাবের অস্তিত্ব

ছিলো না। পরবর্তীকালে হযরত রাসূলে আকরাম (ছ্বাঃ)- এর আহলে বাইতের ইমামগণের অনুসারীদের বাইরে বিভিন্ন ফিক্বহী গোষ্ঠী তৈরী হলে এবং সেগুলোকে "মালেকী", "হানাফী" ইত্যাদি ও সামগ্রিকভাবে "সুন্নী" নামকরণ করা হলে আহলে বাইতের ইমামগণের অনুসারীগণ "শিয়া" ও তাঁদের ফিক্বাহ্ "শিয়া মাযহাব্" হিসেবে পরিচিত হয়, যদিও তাঁরা কোনো মাযহাব্ সৃষ্টি করেন নি। যা- ই হোক, আমরা এখানে "আহলে সুন্নাত্" কথাটি প্রচলিত পারিভাষিক অর্থে ব্যবহার করেছি, এর আভিধানিক অর্থে নয়।

১৫, অবশ্য পরবর্তীকালে ইমাম মালেক তাঁর নীতিগত অবস্থান পরিবর্তন করেন এবং 'আব্বাসী সরকারের সাথে সহযোগিতা করেন ও সরকারী পৃষ্ঠপোষকতায় মালেকী মাযহাব্ প্রতিষ্ঠা করেন। অন্যদিকে ইমাম আবূ হানীফাহ্ সরকারের সাথে অসহযোগিতা করলেও এবং কোনো মাযহাব্ তৈরী না করলেও তাঁর শিষ্য আবূ ইউসুফ ও মুহাম্মাদ্ বিন্ হাসান শয়বানী সরকারের সাথে সহযোগিতা করেন এবং ইমাম আবূ হানীফার সুনাম কাজে লাগিয়ে সরকারী পৃষ্ঠপোষকতায় হানাফী মাযহাব তৈরী করেন।

১৬. কারো কাছে একটি বিষয় এমনভাবে সুস্পষ্ট হয়ে যাওয়া যে, তার মধ্যে এ ব্যাপারে বিন্দুমাত্র সন্দেহ- সংশয় না থাকে। অতঃপর সে যদি বিষয়টি গ্রহণ না করে তাহলে তা নেফাক্বের পরিচায়ক হবে, নচেৎ নয়। এ কারণেই, কোনো নবীকে নবী হিসেবে মেনে নেয়ার বিষয়টিও ইত্মামে হু াত্- এর ওপর নির্ভরশীল; কারো জন্য ইতমামে হু াত্ না হলে নবীকে নবী হিসেবে স্বীকার না করার কারণে শেষ বিচারে কাউকে পাকড়াও করা হবে না। তবে আল্লাহরমনোনীত নবী বা ইমামের প্রশ্ন বাদেও মানুষ তার এখিতয়ারাধীন বিষয়েও জ্ঞাতসারে সর্বোত্তমকে বেছে না নিলে, তা যদি অসদুদ্দেশ্যে হয় তো তাকে শেষ বিচারে জবাবদিহি করতে হবে এবং যদি অসাবধানতার কারণে হয় তবু তার নিজের বা অন্যদের ওপর এর ইহকালীন ক্ষতিকর প্রতিক্রিয়া বর্তাবেই।

১৭. এ ধরনের একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হচ্ছে নবী- রাসূলগণের (আঃ) পাপমুক্ততা। আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় এই যে, কোরআন মজীদের কোনো আয়াতের হুকুম মানসূখ্ হতে পারে না এবং হুকুম বজায় রেখে কোনো আয়াতের তেলাওয়াত মানসূখ্ হতে পারে না; শেষোক্ত ধরনের হুকুম থাকলে তা স্বয়ং রাসূলুল্লাহ্ (ছ্বাঃ) থেকে বলে গণ্য করতে হবে - যা আল্লাহ্ প্রদত্ত এখিতয়ার বলে তিনি প্রদান করেন। (মূলতঃ কোরআন মজীদের আয়াতে মানসূখ্ কথাটি পূর্ববর্তী কিতাব সমূহের ক্ষেত্রে বলা হয়েছে।)

১৮. ইজতিহাদ সম্পর্কিত আরো কিছু বিষয় নিয়ে পরে আলোচনা করা হয়েছে।

১৯. কতক হাদীছের বর্ণনার ভিত্তিতে অনেকে মনে করেন যে, এ ব্যাপারে কোরআন মজীদে আয়াত নাযিল হয়েছিলো, কিন্তু সংশ্লিষ্ট আয়াতের পাঠ (text) পরবর্তী সময়ে রহিত) মানসূখ্ (হয়ে যায়, তবে তার হুকুম বহাল থেকে যায়। কিন্তু ইতিপূর্বে যেমন আমরা উল্লেখ করেছি, প্রকৃত পক্ষে কোরআন মজীদের কোনো

আয়াতের পাঠ বা কোনো আয়াতের হুকমু ই রহিত হয় নি। কোরআন মজীদে যে আয়াতে ‘আয়াত রহিতকরণ বা ভুলিয়ে দেয়া ’ র কথা বলা হয়েছে তাতে কোরআন মজীদের আয়াত রহিতকরণের কথা বলা হয় নি, বরং পূর্ববর্তী আসমানী কিতাব সমূহের আয়াত রহিতকরণের কথা বলা হয়েছে। এ বিষয়ে আমরা ‘কোরআনের পরিচয় ’ গ্রন্থে বিস্তারিত আলোচনা করেছি।

সূচিপত্র

ভূমিকা..2

বিচারবুদ্ধি ও ইসলাম 8

জীবন জিজ্ঞাসার জবাব সন্ধানে জ্ঞানতত্ত্বের পথনির্দেশ 25

বস্তুবিজ্ঞানের দৃষ্টিতে অবস্তুগত অস্তিত্ব..........................48

বিশ্বলোকে স্রষ্টার অস্তিত্বের নিদর্শন 59

সৃষ্টি মানেই তার স্রষ্টা আছে..............................63

সৃষ্টিলোকের আয়তন ও বস্তুর গঠনকাঠামো.......................65

মানুষ মহাবিস্ময়ের আধার...............................76

বিচারবুদ্ধির দৃষ্টিতে অপরিহার্য সত্তার গুণাবলী.....................82

সৃষ্টির সাথে সম্পর্ক নির্দেশক গুণাবলী.........................100

অপরিহার্য সত্তার উলুহিয়্যাত্ বা উপাস্যতা......................106

বিচারবুদ্ধির দৃষ্টিতে অপরিহার্য সত্তার একত্ব 107

ঈশ্বরের গুণাবলীর দেবমূর্তি নির্মাণ..........................116

দ্বি-ঈশ্বরবাদী ধারণা.................................118

ত্রিত্ববাদী ধারণা...................................120

বিচারবুদ্ধির দৃষ্টিতে সৃষ্টি ও ব্যবস্থাপনার প্রক্রিয়া.................126

সৃষ্টিকর্তার জ্ঞান ও স্বাধীন সৃষ্টির ভবিষ্যৎ 131

স্রষ্টার কর্মের সাথে কালের সম্পর্ক.........................133

সৃষ্টিলোকে 'অবাঞ্ছিত' উপাদানসমূহের অস্তিত্বের তাৎপর্য 137
গোটা সৃষ্টিলোক অভিন্ন লক্ষ্যাভিসারী 140
'অবাঞ্ছিত' প্রতিক্রিয়া মানুষের উন্নতির কারণ 143
পিতামাতার কারণে সন্তানের দুর্ভাগ্য কেন? 147
বিচারবুদ্ধির দৃষ্টিতে স্রষ্টা ও সৃষ্টির সম্পর্ক 154
স্রষ্টার বাইরে সৃষ্টির অস্তিত্ব নেই 157
মানুষের জন্য সৃষ্টিকর্তার পথনির্দেশ 167
বিচারবুদ্ধির দৃষ্টিতে মৃত্যুপারের জীবন 170
পরকালীন জীবন সম্ভব কি? 180
শাস্তি ও পুরস্কারঃ শারীরিক, না মানসিক? 186
মানুষ বিশেষ পথনির্দেশের মুখাপেক্ষী 191
আইনপ্রণেতার প্রয়োজনীয়তা 196
স্রষ্টা মনোনীত পথনির্দেশক 199
নবী চেনার উপায় 201
মু'জিযাহ্ কী? 205
নবীর পাপমুক্ততা 210
নবী চেনার ক্ষেত্রে স্থান-কালের ব্যবধানগত সমস্যা 219
কোরআন ব্যতীত সব গ্রন্থই মানবরচিত 225

যার কোনো নবী নেই 230
বিচারবুদ্ধির দৃষ্টিতে নবুওয়াতে মুহাম্মাদী)ছ্বাঃ(. . . . 232
শ্রেষ্ঠতম ও সর্বোত্তম মানুষ. 240
অবিকৃত কোরআন 247
কোরআন: অবিনশ্বর মু‘জিযাহ্ 254
খাতমে নবুওয়াত্ঃ ইসলাম-গৃহের ভিত্তি 264
বিচারবুদ্ধির আলোকে হযরত মুহাম্মাদের)ছ্বাঃ (উত্তরাধিকারিত্ব. 270
রাসূলুল্লাহর (ছ্বাঃ) স্থলাভিষিক্ত নির্ধারণের দায়িত্ব কা’র?. 274
রাসূলুল্লাহর (ছ্বাঃ) উত্তরাধিকারিত্ব: বিচারবুদ্ধির দাবী. 277
ইমাম মাহদী (আঃ) সম্পর্কে মতপার্থক্য. 282
আহলে বাইতের)আঃ(ইমামগণ ও আহলে সুন্নাত 285
রাসূলুল্লাহর (ছ্বাঃ) স্থলাভিষিক্ততা বিতর্কের প্রায়োগিক গুরুত্ব 292
ইমাম মাহদী (আঃ)-এর আবির্ভাবপূর্ব দ্বীনী নেতৃত্ব. 296
ইজতিহাদে মতপার্থক্য ও তার ক্ষেত্র 311
ডারউইন-তত্ব:বিজ্ঞানের নামে অন্ধ বিশ্বাস 323
স্রষ্টা ও পরকাল অস্বীকার:বিজ্ঞানের নামে স্টিফেন হকিং-এর মূর্খতা. 333
বিগ্ ব্যাং তত্ত্বের মৌলিক দুর্বলতা. 334
সৃষ্টিলোকে স্রষ্টার অস্তিত্বের প্রমাণ. 338

পরকালীন জীবন 345
তথ্যসূত্র :. 347